Dhaka University Institutional Repository

সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ফাতেহা বেগম
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৬৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮ (পুনঃ)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ডিসেম্বর-২০২১

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ফাতেহা বেগম এই মর্মে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি যে, **"সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় আমি এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করি এবং এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভের জন্য বা প্রকাশের নিমিত্তে এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা এর কোন অংশবিশেষ ইতিপূর্বে উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো ঘোষণা প্রদান করছি যে, আমার রচিত অভিসন্দর্ভে কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

ফাতেহা বেগম
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি নং : ৬৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮ (পুনঃ)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক ফাতেহা বেগম কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। গবেষণা কর্মটি মৌলিক উপকরণ থেকে রচিত এবং একক গবেষণার দ্বারা সমৃদ্ধ। আমার জানামতে, ইতিপূর্বে কোথাও বা কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অনুমোদন প্রদান করছি।

আমি এই মর্মে আরো প্রত্যয়ন করছি যে, ফাতেহা বেগম রচিত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমার জানামতে কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের নামে চালানো) নেই।

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ (Abstract)

সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা

প্রকৃতির সুরম্য লীলা নিকেতন সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন ভূখণ্ড। সুরমা, কালনী, যাদুকাটা, রক্তি, বোলাই, কংস, মহাসিং, বোকাই, সোমেশ্বরী প্রভৃতি নদী বিধৌত ১০৮৯টি হাওড় পরিবেষ্টিত এলাকা সুনামগঞ্জ। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সুনামগঞ্জ ছিলো রসুলগঞ্জ রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজ আমলে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৮৭৭ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টি করা হয়। সিলেট জেলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জ মহকুমা ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে।

প্রকৃতির অফুরন্ত দানে সমৃদ্ধ সুনামগঞ্জ জেলা। এর একই অঙ্গে আছে নানা মূল্যবান রত্নালঙ্কার। এ জেলায় রয়েছে সিমেন্ট তৈরির চুনাপাথর, কাঁচ তৈরির উপযোগী সিলিকা (বালু), জ্বালানী গ্যাস, কাগজের মণ্ড তৈরির উপযোগী নল খগড়া, মাছে পরিপূর্ণ হাওর, নদী-নালা ও খাল-বিল। এতে রয়েছে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক। মনিপুরী মেয়েরা হাতে তৈরি করে চাদর, কাপড় ও শাল। যেগুলোর বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এখানে আরো আছে অফুরন্ত চুন, বালি, পাথর, বোল্ডার ও কয়লা। এ কারণেই সুনামযুক্ত সুনামগঞ্জের নাম স্বার্থকতা লাভ করেছে। এটি নামে ও সম্পদে সমৃদ্ধ সীমান্ত সংলগ্ন একটি জনপদ। এ জনপদে ছড়িয়ে থাকা সম্পদগুলো শুধু জেলার নয়, সমগ্র দেশের অর্থনীতির জন্য একটি স্তম্ভ স্বরূপ। এ সম্পদের যথাযথ আহরণ ও ব্যবহার হলে এগুলো জাতীয় সম্পদ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পদে পরিণত হতে পারে।

সুনামগঞ্জের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে তার শিক্ষার ইতিহাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুনামগঞ্জের প্রাচীন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা-সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রধান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট আগমনের পর পরই এ জেলায় ইসলামী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠলে উদ্যোগী মুসলিম মনীষিগণ সুনামগঞ্জে অনেক এম.ই মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। এ সব মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষাও প্রদান করা হতো। উপরোক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মাদরাসাগুলোর মধ্যে ছিল সুনামগঞ্জ টাউন এম.ই মাদ্রাসা, জয়কলস এম.ই মাদরাসা ও চর মহল্লা এম.ই মাদরাসা। কালক্রমে অনেক এম.ই মাদরাসা পুরোপুরি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

সিলেটে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মনীষিদের মধ্যে অনেকেই এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। ১৮৬৯ সালে ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে সিলেটে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কিন্তু তারও পূর্বে ১৮৫৫ সালে সুনামগঞ্জের ছাতকে এবং ১৮৭৪ সালে দুহালিয়ায় মধ্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭৭ সালে মরমী কবি হাছন রাজা সুনামগঞ্জে হাছন এম.ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম মনীষিদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তাতে ইসলামী ভাবধারার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

সুনামগঞ্জের সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসও অতি প্রাচীন। যা প্রায় পাঁচশত বৎসরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও শিক্ষার দিক দিয়ে নিজস্ব অবস্থান থেকে যে সমস্ত মুসলিম মনীষি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সুনামগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– সৈয়দ শাহনুর (১৭৩০-১৮৫৫), হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২১), দেওয়ান আহবাব চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭১), জনাব মুনাওর আলী (১৮৮৬-১৯৫১), ফজলুল হক সেলবর্ষী (১৮৯৩-১৯৬৮), মকবুল হোসেন চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৫৭), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-২০০১), মুসলিম চৌধুরী (১৯১১-১৯৯৪), মুহাম্মদ আব্দুল হাই (১৯২৯-১৯৮৩), আমিনুর রশিদ চৌধুরী (১৯১৫-১৯৮৫), অধ্যাপক শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১) ও মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী (১৯২৯-২০০৫) প্রমুখ। সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা বিস্তারে উপরোক্ত মনীষিদের অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় প্রয়োজনেই তাদের এ অবদান আলোচনা ও গবেষণার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হাজার বছরের সুষমামণ্ডিত। যুগ যুগ ধরে এ ঐতিহ্য ধারা লালন করে সুনামগঞ্জবাসী গৌরবান্বিত হয়েছে। সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক এ ধারায় রয়েছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ প্রয়াস ও প্রচেষ্টার এক সমৃদ্ধ ফলন। লোক সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি সুনামগঞ্জে বিরাজমান রয়েছে একটি অভিন্ন সামাজিক সাধারণ সংস্কৃতি, যাতে রয়েছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিরহগাথাসহ বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠান। এটি সুনামগঞ্জের আবহমান কালের সংস্কৃতি। সুনামগঞ্জের পল্লী ও লোক সংস্কৃতিতে রয়েছে মাঝির ভরাট গলার গান, রাখালের বাঁশির সুর, রয়েছে অসংখ্য আউল, বাউল, পীর, ফকির ও দরবেশের সৃষ্টিশীল গান ও গীত যা মানুষকে পরমেশ্বরের সন্ধান পেতে সাহায্য করে। এগুলো সুনামগঞ্জের সংস্কৃতির এক মূল্যবান রত্ন ভাণ্ডার। সুনামগঞ্জের আবহমান কালের প্রাণের স্পন্দন এ সংস্কৃতির উৎকর্ষতা ও বিকাশ সাধনে যে সমস্ত মুসলিম মনীষির অবদান অনস্বীকার্য, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মরমী কবি হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২), দুর্বিন শাহ (১৯২০-১৯৭৭), শাহ আব্দুল করিম (১৯১৬-২০০৯), গিয়াস উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০০৫), মরমী কবি কামাল পাশা (১৯০১-১৯৮৫), কারী আমির উদ্দিন (জ. ১৯৪৩), শাহ আছদ আলী (১২২০-১৩১২), মনিরুজ্জামান মনির (জ. ১৯৫২) ও রাগিব হোসেন চৌধুরী (জ. ১৯৫২) প্রমুখ। তাঁদের অমূল্য এ সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বিস্তৃত আকারে আলোচনা ও গবেষণা করলে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নবমাত্রা সংযোজিত হবে নিঃসন্দেহে।

"সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কর্মে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বিষয়বস্তুকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রতিটি অধ্যায়কে আবার একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম হচ্ছে :

প্রথম অধ্যায় : সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস, দ্বিতীয় অধ্যায় : শিক্ষা ও সংস্কৃতি : প্রকৃতি ও পরিচয়, তৃতীয় অধ্যায় : মুসলিম মনীষি পরিচিতি, চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জ জেলার মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা ও পঞ্চম অধ্যায় : সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা।

প্রথম অধ্যায়ে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে সুনামগঞ্জ জেলার ভৌগলিক পরিচয় ও ভূ-প্রকৃতি, জেলার প্রাচীন ইতিহাস, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় অবস্থার ক্রমবিবর্তন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পদ ও সম্ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপনের পর ইতিহাসের গতিধারায় সুনামগঞ্জ এবং জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ, পরিধি ও প্রকরণ, বিভিন্ন আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন আমলে সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার পর মানব সভ্যতায় ইসলামী সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য অবদান শীর্ষক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের পাঁচটি পরিচ্ছেদে মুসলিম মনীষিদের পরিচয়, তাঁদের চিন্তাধারা ও ধর্মীয় অভিভাবক হিসেবে মনীষিদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে যুগে যুগে বৃহত্তর সিলেট তথা সুনামগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিবেশ, সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত মনীষি ও আলিম-উলামার সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের অবদান, সুনামগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায়, পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পরিচালনায় মুসলিম মনীষিদের অবদান তুলে ধরার পাশাপাশি অধ্যায়ের শেষাংশে থানাভিত্তিক সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদে সুনামগঞ্জ জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধারা, সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত ১০ জন মনীষির জীবনী ও বর্ণাঢ্য অবদান এবং সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানী নাগরী লিপির প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর শেষে সংক্ষিপ্ত উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে।

"সুনামগঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা" শীর্ষক বিষয়ে আরো অধিক গবেষণা কর্মের সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমার গবেষণাকর্মটি সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি অনেক দেরীতে হলেও কাঙ্ক্ষিত গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার তাওফিক দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত কালজয়ী আদর্শের মূর্ত প্রতীক ইসলামের ধারক ও বাহক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যিনি মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ, অধ্যয়ন ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন এবং পৃথিবীর বুকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়ে গোটা মানব জাতিকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করেছেন।

অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের প্রারম্ভে সর্বপ্রথম আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমানের প্রতি, যিনি হাজারো ব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ দিক নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আমার গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আল্লাহ যেন তাঁকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ জীবন দান করেন–এ প্রার্থনা করি। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক মরহুম ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দীন ও মরহুম অধ্যাপক ড. মোজতবা হোসাইন স্যারকে, যারা বিভিন্ন সময়ে আমার গবেষণা কর্মের ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি আন্তরিক দোয়া দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল স্যারের প্রতি যারা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন এবং গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছেন।

আমি গভীর অনুভূতির সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় দু'জন শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আশরাফ আলী ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এমতাজ হোসেনকে। প্রথমজন আমাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ পরশ দিয়ে আমার শিক্ষা জীবনের পথচলাকে সুগম করেছেন। আর দ্বিতীয়জন বিভাগীয় শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আমার এম.ফিল গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গবেষণার বিষয়ে আমাকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদ্বয়কে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ নূরুল্লাহ ও ড.

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ তাজাম্মুল হককে। যারা তাদের বিভাগীয় ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমার গবেষণা কর্মে অফুরন্ত সময় ও শ্রম দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুর রব-কে (১৯৫১-২০২০)। যিনি গত বৎসর দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন, জীবদ্দশায় নিজ জেলার শিক্ষা বিস্তারে যার অনন্য ভূমিকা রয়েছে, যার তত্ত্বাবধান, অনুপ্রেরণা ও দোয়ায় আমি এ পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছি। আরো স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জনাব মরহুম মোঃ সাজিদুর রহমানকে (১৯১৩-২০১১), যিনি ২০১১ সালের মাহে রমজানে তারাবীর নামাজে সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। জীবদ্দশায় যিনি আমাকে লেখাপড়ার ব্যাপারে সদা উৎসাহ প্রদান করতেন এবং আমাকে আমার স্বামীর মত পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও শ্বশুরের জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি আল্লাহ যেন উভয়কে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার স্নেহাস্পদ ছোট ভাই ডা. আব্দুল হাই আল মনসুরকে, অনেক কষ্ট করে সে আমার গবেষণা কর্মের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে দিয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা ও অবদান রেখেছেন যথাক্রমে সুনামগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব জাহাঙ্গীর আলম, হলিয়ারপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মঈনুল ইসলাম পারভেজ, সুনামগঞ্জ জেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ, দারুল মোস্তফা উমাইরগাঁও এর সুপার মাওলানা ছাদিকুর রহমান মাশুক, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ ঢাকার শিক্ষক জনাব ফারুক আহমদ ও আমার স্নেহাস্পদ ভাগ্নে শামীম। আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণা কর্মের উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমি সুনামগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের দ্বারস্থ হয়েছি, প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তাঁরা সানন্দে সরবরাহ করে আমাকে ঋণী করেছেন। সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি তাদের প্রতিও আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তাছাড়া সুনামগঞ্জ ও সিলেটের বিভিন্ন লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা থেকে আমি প্রয়োজনীয় গবেষণা উপকরণ সংগ্রহ করেছি। উপরোক্ত লাইব্রেরিসমূহ ও বিভিন্ন পত্রিকার সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

Dhaka University Institutional Repository

আমার মমতাময়ী মা আক্তারুন্নাহার চৌধুরী হেনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। সুদুর আমেরিকা থেকে দেশে এসে আমার ছোট ছেলে-মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও আমার সাংসারিক দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে নির্ভার গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগের যে সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

পরিশেষে জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম অনন্য আন্তরিকতায় অভিসন্দর্ভটি সর্বাঙ্গ সুন্দর বিশেষ করে মুদ্রণের ক্ষেত্রে যে অপরিসীম শ্রম দিয়েছেন এ জন্য আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সর্বোপরি আমার উক্ত গবেষণা কর্ম অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাদের ঋণ স্বীকারসহ আমি তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ পরিচিতি

অনু.	:	অনুবাদ
অনূ.	:	অনূদিত
আ.	:	আলাইহিস সালাম/আলাইহাস সালাম
আল-কুরআন, ২:১৭	:	সূরা নম্বর ২ তথা সূরা বাকারা-এর ১৭০ নম্বর আয়াত
ই.ফা.বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কি.মি.	:	কিলোমিটার
খ্রি./খৃ.	:	খ্রিস্টাব্দ/খৃষ্টাব্দ
খৃ. পূ.	:	খৃষ্ট পূর্ব
ড.	:	ডক্টর
ডি.	:	ডিগ্রী
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
মৃ.	:	মৃত্যু
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
র.	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি/রাহিমাহুমুল্লাহু।
রা.	:	রাদ্বি আল্লাহু 'আনহু/'আনহা (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন)
সং./সংস্ক.	:	সংস্করণ
সম্পা.	:	সম্পাদিত
সা.	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)।
সে.	:	সেন্টিগ্রেড/সেলসিয়াস
সে.মি.	:	সেন্টিমিটার
হি.	:	হিজরী
P.	:	Page
Ed.	:	Edition
Pub.	:	Publisher
W.D.	:	Without Date.

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১-৬
	প্রথম অধ্যায় **সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস**	৭-৫৪
প্রথম পরিচ্ছেদ :	**ভৌগোলিক পরিচয় ও পরিসংখ্যান**	১২
	নামকরণ	১২
	ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি	১২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	**জনপদের ইতিকথা**	১৭
	হট্টনাথের পাঁচালী বর্ণিত সুনামগঞ্জ	২২
	মোগল আমল	২৪
	সুনামগঞ্জের বিভিন্ন পরগনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২৬
	সেলবরষ	২৭
	লক্ষণশ্রী	২৮
	গৌরারং	২৯
	দোহালিয়া	৩০
	কিসমত আতুয়াজান ও শিক সোনাইত্যা	৩১
	পাইল গাঁও	৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	**রাজনৈতিক অবস্থা**	৩২
	বৃটিশ আমলে সুনামগঞ্জ	৩২
	নানকার বিদ্রোহ	৩৫
	গণভোট	৩৬
	ভাষা আন্দোলন	৩৭
	স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ	৩৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	**ধর্মীয় অবস্থার ক্রমবিবর্তন**	৪২
	জাতি, বর্ণ ও ভাষা	৪২
	সুনামগঞ্জের গারো সম্প্রদায়	৪৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	**অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পদ ও সম্ভাবনা**	৪৬
	ইতিহাসের গতিধারায় সুনামগঞ্জ	৪৬
	সুনামগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান	৪৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : প্রকৃতি ও পরিচয় ৫৫-১০৮

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও পরিধি**	**৫৭**
		শিক্ষার প্রকরণ	৬৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	**বিভিন্ন আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা**	**৬৬**
		ওহী ভিত্তিক শিক্ষা	৬৬
		তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষা	৬৮
		নবুওয়াত ও রিসালাতভিত্তিক শিক্ষা	৬৯
		নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা	৭১
		সমন্বিত শিক্ষা ও আদর্শিক প্রেরণা	৭৩
		শিক্ষার উদ্দেশ্য	৭৫
		রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা ব্যবস্থা	৭৮
		খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা	৮০
		উমাইয়া আমল	৮১
		আব্বাসীয় আমল	৮২
		ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা	৮২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	**বিভিন্ন আমলে সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ**	**৮৬**
		সংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি : উৎপত্তি, স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা	৮৬
		ইসলামী সংস্কৃতি	৯১
		সংস্কৃতি ও সভ্যতা	৯৩
		ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য	৯৫
		ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ	৯৯
		সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১০১
		ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি	১০২
		ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ	১০৩
		মানব সভ্যতায় ইসলামী সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য অবদান	১০৬

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম মনীষি পরিচিতি ১০৯-১৪৭

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**মুসলিম মনীষির পরিচয়**	**১১০**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	**মুসলিম মনীষিগণের চিন্তাধারা ও সমাজ ব্যবস্থার রূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা**	**১১৭**

Dhaka University Institutional Repository

		সমাজ ব্যবস্থার রূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা	১১৭
		মুসলিম মনীষিগণের প্রত্যাশিত সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা	১২৫
		পর্দার বিধান চালু	১৩১
		পিতা-মাতার অধিকার প্রদানের ব্যাপারে বিধান	১৩২
		মদ জুয়ার বিরুদ্ধে বিধান	১৩২
		সমাজে যাকাতের বিধান চালু করা	১৩২
		জবাবদিহির ভয়	১৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	**আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা প্রদান**	**১৪০**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	**সতর্কবাণী**	**১৪২**
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	**ধর্মীয় অভিভাবক**	**১৪৪**

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জ জেলার মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা **১৪৮-৩৯১**

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**যুগে যুগে বৃহত্তর সিলেট তথা সুনামগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিবেশ**	**১৪৯**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	**শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জের স্বনামধন্য মনীষিগণ**	**১৫৮**
		শামসুল উলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩)	১৫৯
		মৌলভী মুনাওর আলী (১৮৮৬-১৯৫১)	১৭২
		শেখ আবদুর রশিদ (১৮৯৩-১৯৫৬)	১৭৬
		ফজলুল হক সেলবর্ষী (১৮৯৩-১৯৬৮)	১৭৯
		মকবুল হোসেন চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৫৭)	১৮৫
		দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭১)	১৯৩
		আব্দুল বারী চৌধুরী (১৯০১-১৯৫০)	১৯৯
		দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯)	২০৩
		বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী (১৯১০-১৯৭৪)	২২০
		মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী (১৯১১-১৯৯৪)	২২৫
		বঙ্গবীর জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী (১৯১৮-১৯৮৪)	২৩১
		কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১)	২৪২
		ড. আখলাকুর রহমান (১৯২৭-১৯৯২)	২৫১
		মুহাম্মদ আব্দুল হাই (১৯২৭-১৯৮৩)	২৫৮
		মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী (১৯২৯-২০০৫)	২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	**ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত আলিম-ওলামাগণ**	**২৭৬**
		মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক (জ. ১৯৪৫)	২৭৬
		মাওলানা নূরুল ইসলাম খান (জ. ১৯৫১)	২৭৮
		মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (রহ.) (১৯৫৪-২০২০)	২৭৯
		মুফতি মাওলানা আবুল কালাম যাকারিয়া (রহ.) (১৯৫৬-২০১৯)	২৮২
		মাওলানা আব্দুস সালাম আল মাদানী (জ. ১৯৫৯)	২৮৪
		মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দীন (জ. ১৯৬০)	২৮৭
		মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজীজ (জ. ১৯৬০)	২৯০
		এ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী (জ. ১৯৬৩)	২৯২
		মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ (জ. ১৯৭৫)	২৯৫
		ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ (জ. ১৯৭৪)	২৯৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	**শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায়, পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় মুসলিম মনীষিগণের অবদান**	**৩০৩**
		সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ	৩০৪
		সুনামগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ	৩০৭
		ছাতক সরকারী কলেজ	৩০৯
		গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ	৩১১
		দিরাই ডিগ্রী কলেজ	৩১৫
		ধর্মপাশা ডিগ্রী কলেজ	৩১৭
		জামালগঞ্জ কলেজ	৩১৯
		জাউয়া বাজার কলেজ	৩২০
		জয়নাল আবেদিন কলেজ, তাহিরপুর	৩২৩
		জনতা কলেজ, মঈনপুর	৩২৪
		জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ	৩২৬
		ছাতক বহুমুখী মডেল হাইস্কুল	৩২৮
		সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	৩৩২
		গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	৩৩৫
		এইচ.এম.পি উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ	৩৩৯
		জামালগঞ্জ সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪০
		বুলচান্দ হাইস্কুল	৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

	আব্দুর রশিদ হাইস্কুল	৩৪৩
	লবজান চৌধুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৪
	ইসলামপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৪৫
	মুজিবুর রহমান একাডেমী	৩৪৫
	সাতগাঁও হাইস্কুল	৩৪৬
	ভীমখালি উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৭
	আলাউদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৭
	জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৮
	সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫০
	হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫১
	বেহেলী উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫২
	তাহিরপুর বালিকা বিদ্যালয়	৩৫৩
	বুরাইয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা	৩৫৪
	সৈয়দপুর সৈয়দীয়া শামছিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসা	৩৫৬
	গোবিন্দনগর ফজলিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসা	৩৫৯
	নওগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা	৩৬২
	লক্ষীপুর তাওয়াক্কুলিয়া দাখিল মাদরাসা	৩৬৩
	জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল হাদীস, হাসনাবাদ	৩৬৪
	পঞ্চগ্রাম ইমদাদুল উলুম মাদরাসা, কামরূপ দলং	৩৬৪
	নয়াহালট ইসলামিয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	৩৬৬
	সৈয়দপুর হোসাইনিয়া হাফিজিয়া আরাবিয়া দারুল হাদীস টাইটেল মাদরাসা	৩৬৬
	দারুল হাদীস হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদরাসা	৩৬৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	**এক নজরে থানাভিত্তিক সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা**	**৩৬৯**
	সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলাভিত্তিক কলেজসমূহ	৩৬৯
	সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলাভিত্তিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ	৩৭০
	সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলাভিত্তিক মাদ্‌রাসাসমূহ	৩৭৯
	সুনামগঞ্জ জেলার কওমী মাদরাসাসমূহ	৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের মুসলিম মনীষিগণের অবদান **৩৯২-৫২৯**

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধারা**	**৩৯৩**
		বাউল গান	৩৯৮
		মেয়েলি গীত	৪০১
		বারোমাসি	৪০৪
		ভাটিয়ালি	৪০৭
		মাজারের গান	৪০৮
		আঞ্চলিক গান	৪১০
		বিচ্ছেদ গান	৪১২
		গাজির গীত	৪১৪
		দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্ব	৪১৫
		ধাঁধা	৪১৭
		প্রবাদ-প্রবচন	৪২১
		প্রাচীন লোক কবি	৪২৪
		ভেটু শাহ	৪২৪
		আদিল শাহ	৪২৪
		কবি সৈয়দা সামিনা বানু	৪২৫
		বাউলশাহ	৪২৬
		নূর আলী খাঁ	৪২৭
		বাছির শাহ মওলা	৪২৭
		করিম বকস	৪২৮
		আরবদি	৪২৮
		সৈয়দ ইসাক শাহ	৪২৯
		মোহাম্মদ সাদিক	৪৩০
		মমিনুল মউজদীন	৪৩১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	**সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত মুসলিম মনীষিগণ**	**৪৩২**
		মরমী কবি হাছন রাজা (১৮৫৪–১৯২২)	৪৩২
		দুর্বিন শাহ (১৯২০–১৯৭৭)	৪৪৯
		শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯)	৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

	মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ ও তাঁর অপরূপ সৃষ্টি গান ও কবিতা (১৯৩৫-২০০৫)	৪৬৯
	দেওয়ান একলিমুর রাজা কাব্যবিশারদ ও তাঁর কবি মানস (১৮৮৯-১৯৬৪)	৪৮২
	বাউল কামাল পাশা : ভাটি বাংলার সংস্কৃতির প্রবাদ পুরুষ (১৯০১–১৯৮৫)	৪৯০
	লোক কবি শাহ আছদ আলী (১৮১৩–১৯০৫)	৪৯৭
	মনিরুজ্জামান মনির এক কিংবদন্তীতুল্য গীতিকার (জন্ম ১৯৫২)	৫০৩
	কারী আমির উদ্দিন ও তাঁর বাউল গান (জন্ম ১৯৪৩)	৫০৬
	কবি রাগিব হোসেন চৌধুরী (জন্ম ১৯৫২)	৫১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	**সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানী নাগরী লিপির প্রভাব**	**৫১৬**
	নাগরী লিপির পরিচয়	৫১৬
	বর্ণপরিচয় ও অন্যান্য ভাষার প্রভাব	৫১৭
	নাগরী লিপির উদ্ভব	৫১৮
	নাগরী লিপির ক্রমবিকাশ	৫১৯
	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নাগরী লিপির প্রভাব	৫২০
	সাহিত্য চর্চায় নাগরী লিপির প্রভাব	৫২১
	নাগরী লিপির স্বর্ণযুগ	৫২২
	নাগরী লিপি ও সাহিত্যের প্রকাশনা শিল্প	৫২২
	শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে প্রভাব	৫২২
	নাগরী লিপির বর্তমান অবস্থা	৫২৩
	নাগরীর উৎকর্ষতায় সুনামগঞ্জের কৃতি মনীষিগণের অবদান	৫২৩
	উপসংহার	**৫৩০**
	গ্রন্থপঞ্জি	**৫৩৩**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

প্রকৃতির সুরম্য লীলা নিকেতন সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন ভূখণ্ড। সুরমা, কালনী, যাদুকাটা, রক্তি, বোলাই, কংস, মহাসিং, বোকাই, সোমেশ্বরী প্রভৃতি নদী বিধৌত ১০৮৯টি হাওড় পরিবেষ্টিত এলাকা সুনামগঞ্জ। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সুনামগঞ্জ ছিলো রসুলগঞ্জ রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজ আমলে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৮৭৭ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টি করা হয়। সিলেট জেলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জ মহকুমা ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে।

সুনামগঞ্জের শিক্ষা-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষা যে সিলেট অঞ্চলের ভাষারীতির অনুরূপ, সেটি প্রমাণ করেছেন সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী তাঁর 'চর্যাপদে সিলেটী ভাষা' (১৯৯৩) গ্রন্থে। কাজেই চর্যাপদ রচয়িতাদের কেউ কেউ যে সুনামগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন তা অনেকটা সুনিশ্চিত।

সিলেটি নাগরী হরফে সুনামগঞ্জের অনেক মুসলিম মনীষি মূল্যবান নানা গ্রন্থ রচনা করে সুনামগঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। আবার এ লিপির মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষতা সাধনের বিষয়কে উপজীব্য করে সুনামগঞ্জের দু'জন কৃতি পুরুষ গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। প্রথম ড. এস. এম গোলাম কাদির ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "সিলেটী নাগরীলিপি : ভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ের উপর এবং পরবর্তীতে ড. মোহাম্মদ সাদিক ২০০৫ সালে ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "সিলেটী নাগরী : ফকিরী ধারার ফসল" শীর্ষক গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। সুনামগঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে নাগরী লিপির অবদান তাই অনস্বীকার্য।

সুনামগঞ্জের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে তার শিক্ষার ইতিহাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুনামগঞ্জের প্রাচীন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা-সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রধান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট আগমনের পর পরই এ জেলায় ইসলামী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। এ শিক্ষার প্রসারের প্রথম উদ্যোগ সূচিত হয়েছিল জগন্নাথপুর থানার ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর গ্রামে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে। এ কেন্দ্রে কুরআন, হাদীসসহ ইসলামী বিভিন্ন শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সঙ্গী হযরত শাহ শামছুদ্দিন (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি কালক্রমে খারিজী ও জুনিয়র মাদরাসা এবং বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ সিনিয়র ফাজিল মাদরাসায় পরিণত হয়েছে। সে

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে এটি জেলার প্রাচীনত মাদরাসা। এভাবে জেলার অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন মুসলিম মনীষিগণ কর্তৃক অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠলে উদ্যোগী মুসলিম মনীষিগণ সুনামগঞ্জে অনেক এম.ই মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। এ সব মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষাও প্রদান করা হতো। উপরোক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মাদরাসাগুলোর মধ্যে ছিল সুনামগঞ্জ টাউন এম.ই মাদ্রাসা, জয়কলস এম.ই মাদরাসা ও চর মহল্লা এম.ই মাদরাসা। কালক্রমে অনেক এম.ই মাদরাসা পুরোপুরি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। উপরোক্ত শিক্ষার প্রসারে যারা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দেওয়ান গনিউর রাজা চৌধুরী, দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী, জনাব মুসলিম চৌধুরী ও জনাব মৌলভী জিয়া উল্লাহ প্রমুখ। মাদরাসা ছাড়া মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষার জন্য ছিল মক্তব। বিভিন্ন মুসলিম মনীষিগণ অসংখ্য মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। জনৈক কাদির বকশ ১৯২১ সালে তাঁর নামানুসারে কে.বি মিয়া মক্তব নামে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল অত্র এলাকার প্রাচীনতম মক্তব।

সিলেটে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মনীষিদের মধ্যে অনেকেই এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। ১৮৬৯ সালে ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে সিলেটে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কিন্তু তারও পূর্বে ১৮৫৫ সালে সুনামগঞ্জের ছাতকে এবং ১৮৭৪ সালে দুহালিয়ায় মধ্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭৭ সালে মরমী কবি হাছন রাজা সুনামগঞ্জে হাছন এম.ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম মনীষিদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তাতে ইসলামী ভাবধারার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এভাবে মুসলিম মনীষিগণ সময়ের প্রয়োজনে সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা বিস্তারে পরবর্তীতে অসংখ্য স্কুল-মাদরাসা স্থাপনের পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। সুনামগঞ্জ জেলায় সর্বপ্রথম কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৪৪ সালে। কলেজটির প্রতিষ্ঠায় সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত মনীষি দেওয়ান আনোয়ার রাজা চৌধুরী ভূমিদানসহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অনুরূপ জনাব আব্দুল হক সাহেবের স্মরণে গোবিন্দগঞ্জে স্থাপিত হয় আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ। পরবর্তীতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অনেক মনীষিদের প্রচেষ্টায় জয়নাল আবেদীন কলেজ, আলহাজ মতিউর রহমান কলেজ, জাউয়া বাজার কলেজ, মঙ্গলপুর জনতা কলেজ, বাদাঘাট কলেজ, জগন্নাথপুর কলেজ, দোয়ারা বাজার কলেজসহ অসংখ্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার সার্বিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মুসলিম মনীষিদের এ পৃষ্ঠপোষকতা ও অবদান বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই অজানা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিস্তারে এ সব মহান মনীষির অমূল্য অবদান ইতিহাসে তুলে ধরা এবং এ নিমিত্তে গবেষণা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সুনামগঞ্জের সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসও অতি প্রাচীন। যা প্রায় পাঁচশত বৎসরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও শিক্ষার দিক দিয়ে নিজস্ব অবস্থান থেকে যে সমস্ত মুসলিম মনীষি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সুনামগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– সৈয়দ শাহনুর (১৭৩০-১৮৫৫), হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২১), দেওয়ান আহবাব চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭১), জনাব মুনাওর আলী (১৮৮৬-১৯৫১), ফজলুল হক সেলবর্ষী (১৮৯৩-১৯৬৮), মকবুল হোসেন চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৫৭), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-২০০১), মুসলিম চৌধুরী (১৯১১-১৯৯৪), মুহাম্মদ আব্দুল হাই (১৯২৯-১৯৮৩), আমিনুর রশিদ চৌধুরী (১৯১৫-১৯৮৫), অধ্যাপক শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১) ও মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী (১৯২৯-২০০৫) প্রমুখ। সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা বিস্তারে উপরোক্ত মনীষিদের অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় প্রয়োজনেই তাদের এ অবদান আলোচনা ও গবেষণার দাবী রাখে।

সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হাজার বছরের সুষমামণ্ডিত। যুগ যুগ ধরে এ ঐতিহ্য ধারা লালন করে সুনামগঞ্জবাসী গৌরবান্বিত হয়েছে। সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক এ ধারায় রয়েছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ প্রয়াস ও প্রচেষ্টার এক সমৃদ্ধ ফলন। লোক সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি সুনামগঞ্জে বিরাজমান রয়েছে একটি অভিন্ন সামাজিক সাধারণ সংস্কৃতি, যাতে রয়েছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিরহগাথাসহ বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠান। এটি সুনামগঞ্জের আবহমান কালের সংস্কৃতি। সুনামগঞ্জের পল্লী ও লোক সংস্কৃতিতে রয়েছে মাঝির ভরাট গলার গান, রাখালের বাঁশির সুর, রয়েছে অসংখ্য আউল, বাউল, পীর, ফকির ও দরবেশের সৃষ্টিশীল গান ও গীত যা মানুষকে পরমেশ্বরের সন্ধান পেতে সাহায্য করে। এগুলো সুনামগঞ্জের সংস্কৃতির এক মূল্যবান রত্ন ভাণ্ডার। সুনামগঞ্জের আবহমান কালের প্রাণের স্পন্দন এ সংস্কৃতির উৎকর্ষতা ও বিকাশ সাধনে যে সমস্ত মুসলিম মনীষির অবদান অনস্বীকার্য, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মরমী কবি হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২), দুর্বিন শাহ (১৯২০-১৯৭৭), শাহ আব্দুল করিম (১৯১৬-২০০৯), গিয়াস উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০০৫), মরমী কবি কামাল পাশা (১৯০১-১৯৮৫), কারী আমির উদ্দিন (জ. ১৯৪৩), শাহ আছদ আলী (১২২০-১৩১২), মনিরুজ্জামান মনির (জ. ১৯৫২) ও রাগিব হোসেন চৌধুরী (জ. ১৯৫২) প্রমুখ। তাঁদের অমূল্য এ সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বিস্তৃত আকারে আলোচনা ও গবেষণা করলে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নবমাত্রা সংযোজিত হবে নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

নিজ জন্মভূমি সুনামগঞ্জ জেলার যে সমস্ত মুসলিম মনীষি জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে নানাবিধ অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন, তাদের পরিচিতি ও অবদান জাতির সামনে তুলে ধরার মানসে এবং ইতিহাসের একজন ছাত্রী হিসেবে নিজ দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে আমি ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীন এম.ফিল গবেষণার রেজিস্ট্রেশন লাভ করি। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল গবেষণা কর্মটি "সুনামগঞ্জে জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা" শীর্ষক পিএইচ.ডি গবেষণায় রূপান্তর করি। সুনামগঞ্জ জেলার উপর রচিত বই-পুস্তকের অপর্যাপ্ততা, মনীষিদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের অপ্রতুলতা, প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড সংরক্ষণে সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে গবেষণার প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তাছাড়া সাংসারিক ব্যস্ততা, সন্তানদের তত্ত্বাবধান এবং সর্বশেষ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব গবেষণা কর্মটিকে বিলম্বিত করেছে। এত সব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত আমি গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পারায় মহান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি।

আমার সম্পাদিত গবেষণা কর্মে ঐতিহাসিক ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বণ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে সেকেন্ডারী উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যয়ে প্রাথমিক উৎস থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাচাই করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। প্রথমত, উপাত্তের উৎসসমূহ যাচাই করা; দ্বিতীয়ত, উপাত্ত সমূহের যাচাই করা। তাই এ পর্যায়ে বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ সব পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটিকে যৌক্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গবেষণা কর্মটি যে সকল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে তা হলো সিলেট ও সুনামগঞ্জ কালেক্টর রুমে সংরক্ষিত চিঠিপত্র, জেলার মহাফেজ খানায় সংরক্ষিত তথ্যাবলি ও গেজেট, সুনামগঞ্জ সম্পর্কিত বিভিন্নজন রচিত গ্রন্থাবলি, সুনামগঞ্জের লেখকগণের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত স্মরণিকা, বার্ষিকী, প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রেকর্ড পত্রাদি ও ফাইল, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় পত্রিকা, সিলেট ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন লাইব্রেরিসহ বাংলাদেশের বিখ্যাত লাইব্রেরিতে রক্ষিত এতদসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া ক্ষেত্র বিশেষ সুনামগঞ্জের বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও কিছু তথ্য গবেষণা কর্মে সংযোজিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কর্মে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বিষয়বস্তুকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রতিটি অধ্যায়কে আবার একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম হচ্ছে :

প্রথম অধ্যায় : সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস, দ্বিতীয় অধ্যায় : শিক্ষা ও সংস্কৃতি : প্রকৃতি ও পরিচয়, তৃতীয় অধ্যায় : মুসলিম মনীষি পরিচিতি, চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জ জেলার মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা ও পঞ্চম অধ্যায় : সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা।

প্রথম অধ্যায়ে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে সুনামগঞ্জ জেলার ভৌগলিক পরিচয় ও ভূ-প্রকৃতি, জেলার প্রাচীন ইতিহাস, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় অবস্থার ক্রমবিবর্তন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পদ ও সম্ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপনের পর ইতিহাসের গতিধারায় সুনামগঞ্জ এবং জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ, পরিধি ও প্রকরণ, বিভিন্ন আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন আমলে সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার পর মানব সভ্যতায় ইসলামী সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য অবদান শীর্ষক বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়টি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে মুসলিম মনীষিদের পরিচয়, মুসলিম মনীষিদের চিন্তাধারা, সমাজ ব্যবস্থার রূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা, আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা ও সতর্কবাণী প্রদান এবং ধর্মীয় অভিভাবক হিসেবে মনীষিদের উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অধীন যুগে যুগে বৃহত্তর সিলেট তথা সুনামগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিবেশ, সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত ১৫ জন মনীষির জীবনী ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান, শিক্ষা বিস্তারে ১০ জন প্রখ্যাত আলিম-উলামার অবদান, শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায়, পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় মুসলিম মনীষিদের অবদান তুলে ধরার পাশাপাশি অধ্যায়ের শেষাংশে থানাভিত্তিক সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা সংযোজন করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদে সুনামগঞ্জ জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধারা, সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত ১০ জন মনীষির জীবনী ও বর্ণাঢ্য অবদান এবং সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানী নাগরী লিপির প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

অধ্যায়গুলোর শেষে সংক্ষিপ্ত উপসংহার সংযোজিত হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে নিজস্ব মতামত ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা পেশ করা হয়েছে তাই উপসংহারটি অতি সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হয়েছে। উপসংহার শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"সুনামগঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণার ক্ষেত্রটি অত্যন্ত সুবৃহৎ এবং বিশালও বটে। বিষয়টির ব্যাপ্তি বিবেচনায় আমি তার গুরুত্বপূর্ণ কিয়দংশ আমার অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত করেছি মাত্র। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত বিষয়ে আমার গবেষণা কর্ম যে কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত গবেষণা কর্ম– এমন দাবী সঙ্গত কারণেই করা যায় না। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো অধিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমার রচিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ফাতেহা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভৌগোলিক পরিচয় ও পরিসংখ্যান
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জনপদের ইতিকথা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক অবস্থা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় অবস্থার ক্রমবিবর্তন
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পদ ও সম্ভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস

সুনামগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের মধ্যে এক অপরূপ নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের জনপদ হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত। পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিস্নাত মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে সুবিন্যস্ত বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি ও মনোরম পরিবেশ সুনামগঞ্জ জেলাকে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ১১টি উপজেলা, ১২টি থানা, ৪টি পৌরসভা, ৮৭টি ইউনিয়ন, ১৫৮১টি মৌজা আর ৩৬৬৯.৫৯ বর্গকিলোমিটারের সমৃদ্ধশালী জেলা সুনামগঞ্জ।[১] বদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও জাতীয় পাখি দোয়েল বাড়ির ঝোঁপ-ঝাড়ে শিস দেয়, শাপলার শুভ্র হাস্যোজ্জ্বল ছবি মনকে আলোড়িত করে। সুনামগঞ্জ আপন বৈশিষ্ট্যে চিরভাস্বর অনন্য ও অদ্বিতীয়। সমগ্র জনপদে নদী ও হাওরের বর্ণাঢ্য অবস্থান তাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে অন্যদের থেকে। সুরমা, কালনীসহ ২৫টি নদীর প্রবহমান জলধারা স্বপ্নে অনুভবে দাগ কেটে যায়। সৃষ্টির অসাধারণ উপহার মন ভুলানো টাঙ্গুয়ার হাওরসহ সহস্রাধিক বিল হাওরের যে জলপ্রবাহ, তার বর্ণময় উপস্থাপনা কাল থেকে কালান্তরে আপ্লুত করে চলে একে অন্যকে। চিরসবুজ হিজল, করচ গাছের ঘন পতদল তারুণ্যের অহমিকা নিয়ে বারে বারে স্বাগত জানায়। অনেকাংশে বিদ্যুৎবিহীন, শব্দদূষণমুক্ত বিস্তীর্ণ জনপদের সমস্ত অবয়ব যখন ধবল জোৎস্নার প্রলেপ মেখে উর্বশীর রূপ নেয়, তখন তার সাথে তুলনা করা চলে না অন্য কারো। বৃষ্টি মুখর শেষরাতের মাদকতা সকলকে অভিভূত করে রাখে। আবার শুষ্ক মৌসুমে হাওরের পুষ্ট বক্ষদেশ যখন ধানক্ষেতের সবুজ শীষে পূর্ণ হয়ে যায় তখন তা অপরূপ দৃশ্য ধারণ করে যার সাথে তুলনা করা যাবে না মেঘনা পদ্মার সমতটের। এ জেলায় কখনো কখনো দেখা যায় হাওরের মৃত্তিকার গভীরে প্রাচীন বৃক্ষের জীবাশ্ম।

সুনামগঞ্জ মরমী কবির দেশ, বাউলের দেশ। মরমী কবি রাধারমণ দত্ত, হাছন রাজা, দূর্বিন শাহ, শাহ আব্দুল করিম, কালা শাহ, সৈয়দ শাহনুরসহ দেড় শতাধিক চারণ কবি ও গীতিকারের পদচারণায় ধন্য সুনামগঞ্জ। সকলে হয়তো কালি ও কলমে নিজেদের উপস্থাপন করেননি, তবুও আপামর জনগণ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এই মরমী গানের সুর মুর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে আছেন। তাদের এ সৃষ্টিকর্ম অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে সুনামগঞ্জের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে। দারিদ্র, হঠাৎ বন্যা, নিরক্ষরতা, আয়োডিনের অভাব সুনামগঞ্জবাসীর হৃদয়ের সুর-তাল-লয়কে কখনো ম্রিয়মান করতে পারেনি। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সুনামগঞ্জের বিশেষ অবদান রয়েছে। সীমান্তবর্তী ভলুকা রণাঙ্গনের সম্মুখযুদ্ধে শহীদ

---

১. জেলা প্রশাসন সুনামগঞ্জ ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, *সুনামগঞ্জ পরিচিতি* (সুনামগঞ্জ : আগস্ট ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন ৪৮জন বীর মুক্তিযোদ্ধা। দোয়ারা বাজার, ছাতক, তাহিরপুরেও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তাক্ত স্মৃতি রয়েছে।[২]

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে জেমস রেনেলের অংকিত মানচিত্রই বাংলাদেশের প্রাচীন মানচিত্র। এই মানচিত্রে সিলেট বিভাগের যে সীমানা, সেখানে সিলেটের নাম থাকলেও সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ বা মৌলভীবাজারের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের সুনামগঞ্জ জেলার সীমানার মধ্যে যে সকল স্থানের নাম মূল সীটে খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে লাউড় (Laour), জগন্নাথপুর (Jaganatpur), শ্রীপুর (Sirry poor), লাউয়াছড়া (Loarchura), চাওলা (Cowula), দিরাই (Diroa), Chamd pour, Chattu, Ducullus, Aurung pour ইত্যাদি।[৩] অনেক নামের উচ্চারণ পরিবর্তিত হলেও সুরমা নদী ঠিকই আছে। শিক্ষা ও সাহিত্যেও সুনামগঞ্জের ঐতিহ্যের ছাপ বিদ্যমান। কবিতার শহর নামে সুনামগঞ্জের পরিচিতি রয়েছে। সুনামগঞ্জ তার প্রতিবেশী চেরাপুঞ্জির মত বৃষ্টির জন্য বিখ্যাত। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০০০ থেকে ৬০০০ মিলিমিটার।

ঐতিহ্যবাহী জনপদ সুনামগঞ্জে আজো উন্নয়নের তেমন ছোঁয়া লাগেনি। সৈয়দ মোস্তফা আলী লিখেছেন, "বহির্জগতের সাথে সুনামগঞ্জের একমাত্র যোগসূত্র ছিল নদীপথ। বর্ষার দিনে শ্রীহট্ট হতে ভাটিয়াল স্টীমার ছাড়তো শেষ রাতে। ছাতক হয়ে সুনামগঞ্জ পৌঁছাত প্রায় দুপুরে।"[৪] এ অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি আজও। ১১টি উপজেলার মধ্যে শুধু ছাতক, দিরাই, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুরে সারা বছর সড়কপথে চলাচলা করা যায়। শাল্লা, বিশ্বম্ভরপুর ও তাহিরপুরে বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত সম্ভব হলেও শুষ্ক মৌসুমে চলাচলা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ডিজিটাল টেলিফোন আছে ৪টি উপজেলায়। কোন কোন উপজেলায় দিনের পর দিন বিদ্যুৎ থাকে না। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের যে দু'টি জেলায় শিশুঝুঁকির পরিমাণ সর্বোচ্চ (৬০.১+) তার মধ্যে সুনামগঞ্জ একটি।[৫] দারিদ্র, আয়োডিনের অভাব, পুষ্টিহীনতা বিভিন্ন দিক থেকে সুনামগঞ্জ জেলার নাম এসেছে সর্বাগ্রে। সুনামগঞ্জে মাছের প্রাচুর্য থাকলেও যারা এ ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রম করছেন তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। দেশের অন্যত্র যেমন Landlord রয়েছে সুনামগঞ্জে তেমনি রয়েছে Waterlord; কিন্তু মৎসজীবীদের উন্নয়নের জন্য তাদের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য নয়, স্বাক্ষরতার হারও নাজুক। সারাদেশের জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হারের অর্ধেকেরও কম স্বাক্ষরতার হার সুনামগঞ্জ জেলায়। গ্যাস ব্যবহারও

---

২. রুহুল ফারুক, *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (সিলেট : নভেম্বর, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৮৫

৩. *সুনামগঞ্জ পরিচিতি*, জেলা প্রশাসন সুনামগঞ্জ ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, সুনামগঞ্জ, ২০০২, পৃ. ২

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সীমিত। বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চলে গ্যাসের কোন ব্যবহার নেই, জ্বালানি কাঠও দুষ্প্রাপ্য। এ জন্য কেউ কেউ তুষের লাকড়ি বা চারকোল ব্যবহার করেন। ফলে মূল চাপ পড়ে গাছের উপর। কিন্তু বৃক্ষরোপণ হাওর অধ্যুষিত এলাকায় সহজসাধ্য নয়। শুধু হিজল, করচ, অশোক, বরুণ এ সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। সুনামগঞ্জ উদ্বৃত্ত ফসলের অঞ্চল; কিন্তু আগাম বন্যা ও পাহাড়ের ঢল এলে ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে যায়। একটি মাত্র বোরো ফসলের উপর নির্ভরশীল বহু পরিবার। তবে মৎস্যক্ষেত্রে বা ধানক্ষেতের জন্য অন্য জেলা থেকে আগত কর্মজীবীদের উপর নির্ভর করতে হয় যা সব সময় পাওয়া যায় না। টানা বৃষ্টির কারণে সবজি বাগানের জন্যও উপযুক্ত জায়গা মেলে না, ধান ভাঙ্গার জন্য নৌকায় করে ধান ভাঙ্গার মেশিন নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে দেখা যায়। সারা দেশের নির্মাণ শিল্পের জন্যে সুনামগঞ্জের বালু-পাথরের চাহিদা ব্যাপক। কিন্তু যে সকল বার্কি নৌকার মাঝি এই কষ্টসাধ্য কাজ করছেন তাদের আয় অত্যন্ত কম। সুরমা নদীর বুকে এই বার্কি নৌকার সারি বা একটি ইঞ্জিন নৌকায় অনেক বার্কি নৌকাকে টেনে চলা যে কোন পর্যটককেই অভিভূত করবে। তবে নৌকাও শুকনার সময় অনেক জায়গায় আটকে যায়। বৌলাইসহ বহু নদী খননের প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ফসল রক্ষার জন্য সময়োপযোগী বেশী সংখ্যক অস্থায়ী বাধ নির্মাণ। তাই সার্বিক বিচারে ও সারা দেশের উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য। এজন্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

আজকের সুনামগঞ্জ জেলা ১৪৩ বছর পূর্বে মহকুমাও ছিল না। জেমস রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭৮) সুনামগঞ্জের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম আদম শুমারীতে (১৮৭২) এই জেলার লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৬০,৮১২ জন। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র সিলেট বিভাগে ছিল মাত্র ২২টি পুলিশ থানা। তার ভিতরে রয়েছে আজকের সুনামগঞ্জের মাত্র ২টি থানা : সুনামগঞ্জ ও রসুলগঞ্জ (বর্তমানের জগন্নাথপুরের অংশ)। সারা সিলেটের ২৩টি বালক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুনামগঞ্জ অংশে চালু ছিল ২টি। ছাতক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ জন। সে সময় সিলেটব্যাপী মাত্র ২টি বালিকা বিদ্যালয়ের একটি ছাতক বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র ১১জন। এই সময় (১৮৬৬) একমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের বেতন ছিল ৪০ রুপি। সুনামগঞ্জের মুন্সেফ বাবু কেষ্ট চন্দ্র চ্যাটার্জি পেতেন ২৫০ রুপি, তার সেরেস্তাদার মোহাম্মদ হাজের পেতেন ২৫ রুপি। তখন এক মন চাউলের দাম ছিল দুই রুপি আট আনা। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করে তখন একজন কুলি পেতেন চার আনা।[৬] এসব তথ্য উদ্‌ঘাটনে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বর্ণাঢ্য জনপদের অন্যতম হচ্ছে লাউড় যার অধিকাংশ অঞ্চল বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত।

৬. সুনামগঞ্জ জেলা তথ্য বাতায়ন, *সুনামগঞ্জ জেলার অজানা ইতিহাস* (সুনামগঞ্জ : আগস্ট, ২০১৫ খ্রি.), ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

সুনামগঞ্জ সত্যিকার অর্থে এক ঐতিহ্যবাহী অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত অনন্য জনপদ। এখানে আছে টাঙ্গুয়ার হাওরের মত নয়ন জুড়ানো বিশাল জলরাশি, রাধারমন-হাছন রাজার মত মরমী শিল্পী, একাত্তরের গৌরবময় স্মৃতি, পাহাড়ের কোল ঘেষে নেমে আসা পললসমৃদ্ধ নিচু লোকালয় ঘিরে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের হাতছানি, সুরমা-কালনীসহ বহু সংখ্যক নদীর প্রবহমান স্রোতধারা আর যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা এই মাটির মানুষের দীপ্ত পদচারণা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
ভৌগোলিক পরিচয় ও পরিসংখ্যান

নামকরণ

'সুনামদি' নামক জনৈক মোগল সিপাহীর নামানুসারে সুনামগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছিল। এমন তথ্যই সুনামগঞ্জের ইতিহাসভিত্তিক প্রায় সকল গ্রন্থেই বিদ্যমান রয়েছে। 'সুনামদি' (সুনাম উদ্দিনের আঞ্চলিক রূপ) নামক উক্ত মোগল সৈন্যের কোন এক যুদ্ধে বীরোচিত কৃতিত্বের জন্য সম্রাট কর্তৃক সুনামদিকে এখানে কিছু ভূমি পুরষ্কার হিসেবে দান করা হয়। দানস্বরূপ প্রাপ্ত ভূমিতে পরবর্তীতে তাঁরই নামে 'সুনামগঞ্জ' বাজারটি স্থাপিত হয়েছিল। এভাবেই সুনামগঞ্জ নামের ও স্থানের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সুনাম অর্জনের জন্য সুনামদিকে সুনামগঞ্জ দান করা হয়, না সুনামদি সিপাহীর ঐতিহ্য চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য যে গঞ্জ বা বাজারটি স্থাপিত হয়েছিল তা আজ আর বিতর্কের বিষয় নয়। তবে সুনামগঞ্জের সাথে 'সুনাম' শব্দটির যে ঐতিহ্যময় সম্পর্ক রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।[৭]

ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি

সিলেট বিভাগের অন্যতম জেলা সুনামগঞ্জ। এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর হাওর-বাওর নদী-নালার জলোচ্ছ্বাস, মরমী বাউলের সুর, বিচিত্র পাখ-পাখালীর কলগুঞ্জনে কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুকেই মুখরিত করে রাখে। শারদীয় আমন্ত্রণে এখানে আগমন ঘটে অতিথি পাখির। হেমন্তে শস্যের সুবাস, শীতের সবুজ সমারোহে সবজীর সজীবতা, বসন্তের বাহারে লীন হয়ে যায়। আবার গ্রীষ্মের খরদাহে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঢামাডোলে বেজে উঠে নদী-নালা হাওরের মাঝে মানুষের বাঁচার আকুতি। প্রকৃতির অপার লীলার বিপরীতধর্মী এ দু'টি ছবি প্রতিবছর জেলার আপামর জনসাধারণকে আশা-নিরাশার দোদুল দোলায় দোল খাওয়ায়। বৈচিত্রময় এ জেলার মোট আয়তন ৩,৬৬৯.৫৮ বর্গকিলোমিটার। ২৪°৩৪′ থেকে ২৫°১২′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°৫৬′ থেকে ৯১°৪৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান। জেলার সীমানা চিহ্নিত করে আছে উত্তরে প্রতিবেশি ভারতের মেঘালয় রাজ্যের জয়ন্তিয়া গিরিমালা, দক্ষিণে খোয়াই নদীবিধৌত হবিগঞ্জ জেলা, পূর্বে হযরত শাহজালালের স্মৃতিবিজড়িত সিলেট জেলা এবং পশ্চিমে মলুয়া-মহুয়ার স্মৃতি বিজড়িত নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা। এ জেলার ছাতক ও তাহিরপুর উপজেলার কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় টিলা ব্যতীত সমগ্র জেলা পলল ভূমি ও বিলাঞ্চল নিয়ে গঠিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১/২ মিটার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৯/১০

---

৭. আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন, *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা : জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১০

মিটার উঁচু। বর্তমানে এ জেলার মোট জনসংখ্যা ২৪,৬৭,৯৬৮ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ১২,৩৬,১০৬ জন এবং মহিলা ১২,৩১,৮৬২ জন। অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের যেমন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান রয়েছে। এছাড়া এ জেলায় মণিপুরী, খাসিয়া, হাজং, গারো প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।[৮] ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সুনামগঞ্জ মহকুমায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সুনামগঞ্জ মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হয়। পৌরসভা গঠিত হয় ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে। জেলার এগারটি উপজেলার মধ্যে ধর্মপাশা উপজেলা সর্ববৃহৎ আয়তনের ৪৯৬.০৩ বর্গকিলোমিটার এবং সবচেয়ে ছোট উপজেলা বিশ্বম্ভরপুর ১৯৪.২৫ বর্গকিলোমিটার।[৯]

একনজরে সুনামগঞ্জ জেলার ১১টি উপজেলার সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি[১০]

উপজেলার নাম	আয়তন/বর্গ কি.মি	পৌরসভা	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রাম	জনসংখ্যা	শিক্ষার হার %
ছাতক	৪৩৪.৭৬	১	১৩	৩১১	৫২৪	৩,৯৪,৫৪৬	৩৬.৩%
জগন্নাথপুর	৩৬৮.২৭	১	৮	২৬৩	৩১০	২,৬০,৮৭১	৪৫.৩%
জামালগঞ্জ	৩৩৮.৭৪	-	৫	১০২	১৭৫	১,৯০,৯৮৫	২৯.৬%
তাহিরপুর	৩১৩.৭০	-	৭	১৩৬	২৪৪	২,৬৫,৫১৮	৩১.২%
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	২৮৬.২৫	-	৮	৯৩	৯৪	১,৭৪,৮৯২	৩১.৫৫%
দিরাই	৪২০.৯৩	১	৯	১৬৫	২২২	২,৩০,৭৯১	৩৫.৪%
দোয়ারাবাজার	২৮১.৪০	-	৭	১৬৬	২৯৫	১,৯৭,৫০১	৩০.৮%
ধর্মপাশা	৪৯৬.০৩	-	১০	১৮২	৩১৩	২,০২,৯৬৯	২৬.৪%
বিশ্বম্ভরপুর	১৯৪.২৫	-	৫	৫৯	১৮৩	১,৫০,২৫৯	২৮.৪%
শাল্লা	২৬০.৭৪	-	৪	৬৮	১১৫	১,৪০,২৯৮	৩৬.০%
সুনামগঞ্জ সদর	৩০১.৭১	১	৬	১৪৩	৩০৭	২,৫৯,৩৩৮	৪৮.৬৩%

সুনামগঞ্জ জেলার ভূ-প্রকৃতি গঠনে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র খেয়াল লক্ষ্য করা যায়। জেলার ১০৮৯টি হাওরের মাটি তুলে নিয়ে যেনো খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পর্বতমালা সাজানো হয়েছিল। সে পাহাড়ের ঝরনা ও নদী-নালা বয়ে ক্রমে শিলা, নুড়িপাথর, কাঁকর, বালি ও পলি এসে পুনরায় এর ভূ-গঠনের কাজ সম্পন্ন করেছে। তাই এখানকার মাটি ভিন্ন রকমের। পাথুরে কাঁকর মাটি, বেলে, দোয়াশ ও পলিমাটি। ভূ-

৮. সিলেট পিডিয়া, প্রাগুক্ত; মোঃ হাফিজুর রহমান ভূইয়া, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা* (সিলেট : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭১-৭২

৯. প্রাগুক্ত।

১০. https://www.sylhetpedia.com ; উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ, জুলাই ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ গঠনে দু'ধরনের মাটিই বেশি দেখা যায়। বেলে ও দোয়াশ মাটি নিয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চল যেখানে আমন চাষ হয়ে থাকে এবং বেশিরভাগ নিচু এলাকার পলিমাটি নিয়ে বোরো এলাকা। উপরিউক্ত ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য জেলার জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের উপর প্রভাব ফেলেছে। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুরই প্রাধান্য। শীতকালে শৈত্যের আধিক্য আবার গ্রীষ্মকালে গরমের প্রাবল্য অনুভূত হয়। তবে প্রচুর বর্ষণ আবহাওয়াকে নাতিশীতোষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। চেরাপুঞ্জির সান্নিধ্যে এবং মৌসুমি বায়ুর প্রবল প্রভাবে এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি। প্রচুর বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা পানি সুনামগঞ্জকে নদী-নালা ও হাওরের দেশে পরিণত করেছে। অসংখ্য নদী-নালার মধ্যে সুরমা, কালনী, যাদুকাটা, রক্তি, বৌলাই, কংশ, মহাশিন, বোকাই সোমেশ্বরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বহু নদী-নালা খননের অভাবে বর্তমানে ভরাট হয়ে গেছে। পাহাড়ী ছড়ার মধ্যে বনগাঁও, মকরিয়া ও লাকমা ছড়া উল্লেখযোগ্য। ১০৮৯টি হাওরের মধ্যে টাঙ্গুয়া, দেখার হাওর, শনির হাওর, খরচার হাওর, হুলিয়ার হাওর, মাটিয়াল, বাংলার হাওর, পঙিনার হাওর, টাঙার হাওর, বরাম হাওর এবং নলুয়ার হাওর; বাওরের মধ্যে ধারাম বিল, শায়লা বিল ও কামাল বিল প্রভৃতি প্রধান।[১১]

সুনামগঞ্জ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ জেলা– এ কথায় কোন অত্যুক্তি নেই। এর ভূ-অভ্যন্তরে রয়েছে তেলের সম্ভাবনাসহ গ্যাসের বিস্তৃতি। টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। এর নুড়িপাথর ও বালি বহন করে অসংখ্য নৌকা ও বার্জ অহরহ নদীপথে যাতায়াত করে। হাওর-বাওরের মৎস্য সম্পদ থেকে বছরে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আহরিত হয়। এর হিজল, করচ বাগান ও বেত বন বানের পানির প্রচণ্ডতা প্রশমিত করে আশ্রয় দেয় মৎস্য ও পক্ষীকুলকে। টেকেরঘাট খনি প্রকল্পের চুনাপাথর চালু রেখেছে ছাতকের সিমেন্ট কারখানা। সুনামগঞ্জ জেলার বাঁশ ও করচ জোগান দিচ্ছে ছাতক সিলেট কাগজ ও মণ্ড কারখানার কাঁচামালের। এর নদী গর্ভে রয়েছে অপরিমিত নুড়িপাথর ও বালু। টেকের ঘাটের চুনাপাথর খনিতে রয়েছে প্রচুর চুনাপাথর ও পীট কয়লা।

সুনামগঞ্জ জেলায় রয়েছে প্রচুর আবাদযোগ্য ভূমি। এর পরিমাণ সাত লক্ষ একরের উপরে। ভূ-স্তরে উঁচু নিচু থাকায় চাষাবাদ ও জমিতে জলধারণ বিঘ্নিত হয়। জমি সমতল করে সেচ সুবিধা দিতে পারলে সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডারে পরিণত হতে পারে। এখানে চার লাখ একরের বোরো ধান, এক লাখ একরের রোপা আমন, সত্তর হাজার একরে আউশ ধানের চাষ হয়। প্রায় দেড় লাখ একর জমিতে অন্যান্য ফসলাদি ও রবি শস্যের আবাদ হয়ে থাকে।[১২] জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে ধান। এ ছাড়া

---

১১. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা সুনামগঞ্জ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৫

১২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গম, সরিষা, বাদাম, ইক্ষু, পাট, পেঁয়াজ ও মরিচের চাষও হয়ে থাকে। কিছু কিছু এলাকায় কলারও আবাদ হয়। এখানে রবি শস্য ও সবজি আবাদের প্রচুর সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়াও প্রচুর পাখি পাওয়া যায়। অসংখ্য হাওরে এসব পাখি চষে বেড়ায়। আবার হাওরের পানিতে রয়েছে প্রচুর মৎস্য সম্পদ। প্রবাদ আছে, 'মাছ পানি ও ধান এ তিনে সুনামগঞ্জের সম্মান'। মাছ এ জেলার অন্যতম কার্যকরী ও মূল্যবান সম্পদ। এ জেলায় ১৩১৮টি জলমহাল রয়েছে যাতে ছোট-বড় ১৪০-এর অধিক প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।[১৩] এর ফলিত মাছ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা ও রাজধানী ঢাকা শহরে কার্গো, নৌকা, ট্রাক ও ট্রেন যোগে পাঠানো হয়। সুনামগঞ্জের মাছ বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যেও রপ্তানী করা হচ্ছে। সেসব স্থানে সুনামগঞ্জ হাওরের মাছের চাহিদা তুঙ্গে। শুধুমাত্র সুনামগঞ্জের মাছ থেকে বর্তমানে সরকার প্রচুর পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব পেয়ে থাকে। সুপরিকল্পনার মাধ্যমে এ আয় আরো বাড়ানো সম্ভব।

সুনামগঞ্জ জেলায় যে পরিমাণ খাস জমি রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। পরিমাণ কম হলেও হিজল, করচ বন ও অন্যান্য বনাঞ্চল নিয়ে এ জেলায় প্রায় বিশহাজার একরের উপর জমিতে বনভূমি বিদ্যমান। প্রচুর ভাসমান কাঠের থলও প্রভূত রাজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সুনামগঞ্জ জেলা প্রাচীনকাল থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্রিটিশ শাসনামল এমনকি তার পূর্ব থেকেই এর নদী পথে নৌকা, স্টীমার যাতায়াত করতো। সুদূর আসাম রাজ্যের সাথে সুরমা ও বরাক নদী পথে স্টীমার ও বার্জের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল এবং তখন অসংখ্য নদীবন্দরও গড়ে উঠেছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মোস্তফা আলী তার 'আত্মকথা' পুস্তকে লিখেছেন, "তৎকালে বহির্জগতের সাথে সুনামগঞ্জের একমাত্র যোগসূত্র ছিল নদীপথ। বর্ষার দিনে শ্রীহট্ট হতে ভাটিয়ালি স্টীমার ছাড়তো শেষ রাত্রে। ছাতক হয়ে সুনামগঞ্জ পৌঁছাত প্রায় দুপুরে। সন্ধ্যা নাগাদ সে স্টীমার মার্কুলী পৌঁছাত। ওখানে বর্ষাকালে কাছাড়-সুন্দরবন ডিপাচ সার্ভিস নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব হয়ে শিলচর পর্যন্ত পৌঁছত। ঐ বড় স্টীমারেই কলকাতা ও ঢাকার পণ্যদ্রব্যের চলাচলের রাস্তা ছিল। আবার প্রত্যেক রাত্রেই বিপুল পণ্যদ্রব্য নিয়ে মার্কুলী হতে স্টীমার রওয়ানা হতো এবং ভোরে সুনামগঞ্জ স্টীমারঘাটে ঘন্টা দুই থামতো। কাজেই সুনামগঞ্জ বাজারে ঢাকা ও কলকাতার জিনিসের অভাব ছিল না। স্টীমারে মাল চলাচলের জন্য মূল্যও কম ছিল।"[১৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পদেও ইন্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ও বেঙ্গল রিভার্স স্টীমার কোম্পানির

---

১৩. *সুনামগঞ্জ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৬

১৪. মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, *সিলেটের ইতিহাস*, সিলেট : আল্ ইসলাহ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৬৩ বাংলা, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

জাহাজ সুনামগঞ্জ-ছাতক থেকে মার্কুলী হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত যাতায়াত করেছে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ছাতক, সুনামগঞ্জ, সাচনাবাজার, মধ্যিনগর ইত্যাদি আজও ব্যস্ত নদীবন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত। অধুনা জাউয়া, বাধাঘাট, মঙ্গলকাটা, ভীমখালী, জয়নগর, মহেষখাল, ধর্মপাশা, বিশ্বম্ভরপুর ও চিনাকান্দি ব্যস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।[১৫]

সুনামগঞ্জ জেলার যাতায়াত ব্যবস্থা এক কথায় দুরূহ। পূর্বে নদীপথে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলেও অধুনা নদী ভরাটের কারণে তা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। সড়ক পথেও যোগাযোগ ব্যবস্থা এত ভালো নয়। সড়ক পথে যাতায়াত সীমিত হলেও এখন তা প্রসারিত হচ্ছে। সুনামগঞ্জ-ছাতক, সুনামগঞ্জ-সিলেট হয়ে ঢাকা পর্যন্ত গাড়ী চলাচল করে। সুনামগঞ্জ-দিরাই সড়ক পথেও বর্তমানে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এক সময় শহরের সব রাস্তাই ছিল ইট বিছানো। ১৯৫৭-১৯৫৮ সালে রাস্তা পাকা করণের কাজ শুরু হয়। শহরের অধিকাংশ রাস্তাই কংক্রিটের। এর প্রধান কারণ হলো, এখানে বালু, পাথর ও সিমেন্ট সস্তা ও সহজলভ্য। এখনও অনেক উপজেলা সদর থেকে গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মিত হয়নি। আবার যা আছে তাও পর্যাপ্ত পরিমাণে সংস্কার ও সম্প্রাসারিত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। বহুতল বিশিষ্ট দালান বা ভবনের তুলনায় সুনামগঞ্জের অধিকাংশ বাড়িঘর হালকা গাথুনি ও টিনের চাল দিয়ে তৈরি। অনুমান করা হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দের বড় ভূমিকম্পের পর মানুষ দালানকোঠা নির্মাণে এক প্রকার ভয় পায়।

শহরে প্রথম রিকশা আসে ১৯৬১ সালে। প্রথমে ছিল তাও মাত্র একখানা। যাত্রী ছাড়া বাকীরা ছিল এর দর্শক। রিকশার ভাড়া ছিল মাত্র চার আনা। সুনামগঞ্জ শহরে টেলিফোন আসে সর্বপ্রথম ষাটের দশকে। এটা ছিল মেগনেটো, এরপর হয় সিবি। ১৯৮৮ সালে স্বয়ংক্রিয় হয়েছে। বর্তমানে সদরে এনডব্লিউ সুবিধাসহ দশটি টেলিফোন একচেঞ্জ ও আটটি টেলিগ্রাম অফিস এবং নয়টি ব্রাঞ্চ অফিস এবং ৪৫টি সাব অফিসসহ ৫৪টি ডাকঘর রয়েছে।[১৬] ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৯৩ সালে সিলেট জেলার ভিতর দিয়ে কাছাড়ের শিলচর পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপিত হয়। এর আওতায় ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে দোয়ারা বাজার থেকে খাসিয়া পাহাড় পর্যন্ত একটি রেল লাইন চালু করা হয় যা ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। দোয়ারা বাজার খাদ্য গুদামের কাছে এখনো স্টেশনপাড়া নামে একটি পাড়া আছে। এতে প্রতীয়মান হয়, একাদা এখানে একটি রেল স্টেশন ছিল। পরে ১৯৫৪ সালে ছাতক সিলেট রেললাইনটি নির্মিত হয় যা আজো বহাল আছে।[১৭]

---

১৫. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা সুনামগঞ্জ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৬
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন, *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জনপদের ইতিকথা

সুনামগঞ্জের ইতিহাস যেমন সমৃদ্ধ তেমনি ঐতিহ্যে ভরপুর। এটি একটি প্রাচীন জনপদ। এর সভ্যতা-সংস্কৃতিও প্রাচীন। অসংখ্য কিংবদন্তী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও তথ্যাবলিতে তা সমৃদ্ধ। প্রাচীনকালে[১৮] সুনামগঞ্জ 'কামরূপ'[১৯] রাজ্যের অংশ ছিল। আবার কোন এক সময় তা 'কিরাত'[২০] রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলে অস্ট্রীক জাতি গোষ্ঠীর লোক বাস করত। তারা পাথর বা হাড় দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করত, কৃষিকাজেও তাদের দক্ষতা ছিল। এ দেশে ধানের চাষ তারাই শুরু করে।[২১] অস্ট্রীকদের পরে এতদঞ্চলে আসে মঙ্গোলীয় গোত্রের লোক। খাসিয়া, গারো প্রভৃতি এদের বংশধর। তারপর আসে আর্য্যগণ ৫ম মতান্তরে ৬ষ্ঠ শতকে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে আগমন ঘটে মুসলমানদের। চতুর্দশ হতে পঞ্চদশ শতকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এখানে বসতি স্থাপন করে। ষোড়শ শতকে মোগলগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পাঠানগণ সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নেয়।[২২]

---

১৮. **প্রাচীনকাল :** ইতিহাসকে তিনটি পর্যায় বৃত্তায়নে বিভক্ত করা যায় : ক. প্রচীন যুগ, খ. মধ্য যুগ, গ. আধুনিক যুগ। ইতিহাস প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক প্রবাহমানতার কালভিত্তিক বিভাজনের নামই পর্যায় বৃত্তায়ন। সিলেট তথা উপমহাদেশে তুর্কী আফগান শাসন আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয় প্রাচীন যুগ। আবার প্রাচীন ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, ক. প্রগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক। যে যুগের সূচনা কেবল অনুমান নির্ভর, যাতে লিখিত উপাদানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, সে যুগই প্রাগৈতিহাসিক। আর যে যুগের লিখিত সন্ধান পাওয়া যায় সে যুগই ঐতিহাসিক যুগ। প্রাচীন লিখিত লিপি মতে শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ সপ্তম শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়েছিল। সুতরাং এর পূর্বরে যুগই হল প্রাচীন যুগ বা অলিখিত যুগ। (দ্রষ্টব্য : মেহাম্মাদ মুমিনুল হক, *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত* (লন্ডন : ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৫)।

১৯. **কামরূপ :** প্রাচীনকালে সিলেটের সমগ্র ভূমি ছিল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতের যুগে কামরূপের রাজা ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেন। কামরূপ রাজ্যের বিস্তার সব সময় একরূপ ছিল না। কোন কোন সময় এটা পশ্চিমে করতোয়া নদী ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার কোন সময় সম্পূর্ণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাও এর অধীনে ছিল না। যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের এরূপ সীমানা বর্ণিত আছে। সেই সাথে সিলেটের সীমা সম্পর্কে রয়েছে একটি শ্লোক, এতে শীহট্র শব্দের উল্লেখ আছে। লাউড় পাহাড়ে ভগদত্তের একটি রাজধানী ছিল। ঐ পাহাড়ে একটি স্থানকে এখনো ভগদত্ত রাজার বাড়ি বলা হয়। (cf: H. Kulke and D. Ruthermund, A History of India, 1998, p. 366)

২০. **কিরাত রাজ্য :** বিষ্ণু পুরাণে কিরাত রাজ্যের উল্লেখ আছে। হিন্দু পুরাণ মতে, বঙ্গদেশ আর্য্যভূমির পূর্ব সীমা, তার পূর্বে কিরাত ভূমি। শক্তি সঙ্গমতন্ত্রে কিরাত ভূমির মধ্যে হরিপুরের তন্তকুণ্ড প্রস্রবনের উল্লেখ আছে। উত্তরে হরিপুর কিরাত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিধায় ধরে নেয়া যায়, সমগ্র সিলেট অঞ্চলই এক সময়ে কিরাত রাজ্যভূক্ত ছিল। ম্যাকক্রিন্ডেল এর বর্ণনা মতে, কিরাতিয়া রাজ্যে চীনের বণিকগণ তেজপাতা, শীতলপাটি ও সিল্কবস্ত্র বিনিময় করত। তেজপাতা ও শীতলপাটি সিলেটেরই বিশেষ পণ্যদ্রব্য। এতে প্রমাণ মিলে যে, সিলেট অঞ্চল কিরাত রাজ্যের অংশ ছিল। (দ্রষ্টব্য : *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)।

২১. ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* (সিলেট : ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৭

২২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুনামগঞ্জ জেলার সমগ্র অঞ্চল এককালে আসামের কাপরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুনামগঞ্জের লাউড় পরগণায় এখানো প্রবাদ হিসেবে কথিত আছে যে, লাউড় পাহাড়ের উপর কামরূপের রাজা ভগদত্তের রাজধানী ছিল। এ ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলেও কিংবদন্তী রয়েছে। ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলেও উক্ত রাজার বাড়ির চিহ্ন রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, এ ভগদত্ত ও মহাভারতের উল্লেখিত ভগদত্ত এক ব্যক্তি নন; বরং কথিত ভগদত্ত মহাভারতের অনেক পরের কালের মানুষ। এটাই সত্য। কারণ কিংবদন্তী ও ইতিহাসের যেখানে মিল পাওয়া যাবে না সেখানে ইতিহাসকে ভিত্তি ধরাই বিধেয়।[২৩]

বৃহত্তর সিলেট সুদূর অতীতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ রাজ্যগুলো হচ্ছে– লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তিয়া। গৌড় রাজ্যটি বর্তমান সিলেট জেলার জৈন্তা, কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট ব্যতীত সমগ্র জেলা ও সুনামগঞ্জ জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এ সর্ম্পকে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, "সুনামগঞ্জ ও সিলেটের অন্তর্গত ইছাকলস পরগণা থেকে বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানা পর্যন্ত গৌড় রাজ্য বিস্তৃত ছিল।"[২৪] ১৩০৩ সালে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নেতৃত্বে গৌড় রাজ্য মুসলিম শাসনাধীনে আসে।[২৫] তবে লাউড় রাজ্যের সাথে সুনামগঞ্জের সর্ম্পক সর্বজনবিদিত। অনুমান করা হয়, এ লাউড় রাজ্যের সীমানা বর্তমান সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলা ও ময়মনসিংহ এবং হবিগঞ্জ জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এ রাজ্যে হবিগঞ্জের আট পরগণা, সিলেট সদরের শিক সুনাইত্যা, কৌড়িয়া এবং ইছাকলসসহ সুনামগঞ্জের অপরাপর সামগ্রিক সীমানা ব্যাপীই বিস্তৃত ছিল।[২৬] এ রাজ্যের রাজধানী ছিল 'লাউড়'। লাউড় নামে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে যে পরগণাটি বিদ্যমান আছে এর সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে এর অবস্থান সম্পর্কে গবেষকগণ ঐক্যমত পোষণ করেন।[২৭]

তাহিরপুর উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নের 'হলহলিয়া' গ্রামে লাউড়ের রাজা বিজয় সিংহের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। স্থানীয়ভাবে এ অঞ্চলটি হাবেলী বা হাওলী নামে পরিচিত। লাউড় রাজ্যের নৌঘাটটি (ন্যাভেল বেস) ছিল দিনারপুর (জিনারপুর) নামক স্থানে। স্থানটি বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। লাউড় রাজধানী থেকে নৌঘাট পর্যন্ত সারা বছর চলাচল উপযোগী একটি ট্রাংক রোডের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সমর্থন রয়েছে। সুনামগঞ্জের তদানীন্তন ডেপুটি

---

২৩. মোহাম্মদ মুমিনুল হক, *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত* (লন্ডন : সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৬-২৭

২৪. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৪

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১

২৭. ১৮৬০ ইং সনে খাক জরিপে মাহরাম পরগনার ২৭৮৭ নং খাকে পুরাণ লাউড় নামে যে মৌজার উল্লেখ ছিল। (দ্রষ্টব্য : *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্সপেক্টর অব স্কুলস জনাব মোহাম্মদ ওয়াসিল এ ট্রাংক রোডের ধ্বংসাবশেষ থেকে এ তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন।[২৮] মনে করা হয়, লাউড়ের রাজা এ ট্রাংক রোডটি নৌঘাটিতে সংযোগ স্থাপনের জন্য নির্মাণ করেছিলেন।

সুনামগঞ্জ জেলার বেশিরভাগ অঞ্চল এককালে একটি সাগরের বুকে নিমজ্জিত ছিল যা কালে কালে পলি ভরাটজনিত কারণে ও ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। সুনামগঞ্জে চুনাপাথরের খনি ও কয়লা আবিষ্কারের পরে এরূপ বক্তব্যের পেছনে সমর্থন পাওয়া যায়। এছাড়া এখানকার শত শত হাওর ও এগুলোর গঠন প্রকৃতি বিবেচনায়ও এ বক্তব্য সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনামগঞ্জের টেকেরঘাটে প্রাপ্ত চুনাপাথর এক ধরনের ক্যালসিয়াম যা সামুদ্রিক প্রাচীন শামুক ও শৈবাল দ্বারা সৃষ্ট। এ কারণেও এ বক্তব্যটি সমর্থিত হয়েছে বৈজ্ঞানিকভাবে।[২৯] একদা সুনামগঞ্জের প্রাচীন গানে বন্দনা রীতি প্রচলিত ছিল। এ রূপ একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

> "পূবেতে বন্দনা করি পূবে উদয় বানু
> একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর
> পশ্চিমে বন্দনা করি, মক্কা ভালা স্থান
> যে জায়গায় জন্ম নিছে কিতাব আর কোরান ॥
> উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
> যে জায়গায় নিছে মালামের পাথর
> দক্ষিণে বন্দনা করি 'কালীদহ' সাগর
> যে জায়গায় বাণিজ্য করে চান্দ সদাগর।"[৩০]

এ বন্দনা গানে দক্ষিণে যে বিশাল সাগরের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এতদাঞ্চলের প্রাক-ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়। প্রায় সব ঐতিহাসিক এতদাঞ্চল যে এককালে সাগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে সাগর যে 'কালিদাহ' সাগর তা চিহ্নিত করেছেন। একটি আঞ্চলিক গান যে তার সমকালের সাক্ষী হতে পারে এটা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ কালিদহ সাগর সুনামগঞ্জ জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক-জগন্নাথপুর এর পূর্ব কিয়দংশ ও উত্তর সীমান্তের খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দক্ষিণকুল ঘেষে অবস্থিত অঞ্চলটুকু এ জেলার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে

---

২৮. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫, উৎস সংস্করণ ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১২৭

২৯. *সুনামগঞ্জ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৩০. চাঁদ সওদাগর এর মধুকরের সপ্ত ডিংগা সম্পর্কে পদ্ম পুরাণে বর্ণনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কিঞ্চিৎ উঁচু। এ অঞ্চল মূলত একই ব্যান্টের আওতায় ছিল। এ ছাড়া এ ব্যান্টের পশ্চিমাঞ্চলে ছিল বিরাট জলরাশি। এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনার পেছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে না পাওয়া গেলেও সিলেটের তদানীন্তন কালেক্টর মি. লিন্ডসের অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত বর্ণনা থেকে এর অনেকটা সমর্থন পাওয়া যায়। রবার্ট লিন্ডসের বর্ণনা নিম্নে উদ্বৃত করা হলো :

> In the pre-historic days the southern part of the sadar subdivision and the northern part of Molvibazar and Habiganj subdivision and nearly the entire Sunamganj subdivision were a part of the bay of Bangal or a large lake, along with the land of near by district Comilla, Mymensing, Dhaka and Noakhali. There are many proofs at this. The Chinese traveller Heven Sumg in the seventh century A.D. has described the Sylhet area as silichot courtry on the sea shore. The famous saint Hazrat Shahjalal (R.H) arrieved at Sylhet of Silhatta in 14^{th} century A.D. it is said that nearly all the land from Sadarghat or Dinarpur of the present Habiganj subdivision upto Mona Rory's tilla in Sylhet was under deep water. [৩১]

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ শিব প্রসন্ন লাহিড়ীর 'সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' শীর্ষক পুস্তকে সিলেটের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঘব্রত নামে একটি পূজার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মাঘব্রত পূজায় কালিদহ সাগরের জলের উপর সাত গাছা দূর্বাসহ একটি মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এতেও বুঝা যায় বৃহত্তর সিলেটের কোথাও 'কালিদহ' সাগর নামে কোন এককালে একটি সাগর ছিল, যাতে পূর্বোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এ সমস্ত তথ্য ও অভিমত থেকে সুনামগঞ্জ জেলার বিরাট অঞ্চল বিশাল 'কালিদহ' নামক সাগরের নিচে নিমজ্জিত থাকার উক্তির অকাট্যতা প্রমাণিত হয়। তাই রবার্ট লিন্ডসের বিরাট জলরাশিই অতীতকালের 'কালিদহ' সাগর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। এ কারণেই সম্ভবত সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চল আজো বিশাল হাওরে পরিপূর্ণ ও তুলনামূলক নিচু রয়ে গেছে। হাওর শব্দটি মূল সাগর (সায়র) থেকে পরে হাওর হয়েছে– এ মতও স্বতসিদ্ধ। বর্ষাকালে এ সমস্ত অঞ্চল এখানো সাগরের আকৃতি ধারণ করে থাকে। সুদূর অতীতে 'কালিদহ' সাগর এর বিস্তৃতি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছিল মনে করা হয়। যার উপর দিয়ে ১০১১ খ্রি. চীনা পরিব্রাজক হিউয়ের সাং জাহাজে চড়ে সরাসরি তাম্রলিপ্ত থেকে সিলেট পৌঁছেছিলেন বলে তাঁর লিখনী থেকে জানা যায়।[৩২] ধারণা করা হয়, তিনি এ পথেই চীন পৌঁছেছিলেন। তাঁর মতে, নহরী আজরক নামে একটি নদী কামরূপের পাহাড় থেকে

---

৩১. Robert Lindsay, Oriental Miscellanies : Anecdotes of an Indian Life, 1840, P. 21

৩২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, *সিলেটে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বেরিয়ে এসে হাবাঙ্গ শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদী দিয়ে বাংলায় ও গৌড়ে যাওয়া যেত। বর্ণিত নদীকে অনেকে প্রাচীন সুরমা বলে মনে করেন।[৩৩]

প্রাচীন লাউড় রাজ্যের রাজধানী বর্তমান লাউড় পরগণায় অবস্থিত ছিল। এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশব মিশ্র নামক জনৈক ব্যক্তি। খ্রিষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতকে তিনি কনৌজ থেকে এখানে আসেন। তিনি ছিলেন একজন ব্রাক্ষ্মণ।[৩৪] কারো কারো মতে, রাঢ় অঞ্চল বংগ বিজয়ের পর মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ায় সেখানকার বিতাড়িত ও পরাজিত সম্ভ্রান্তজনেরা প্রাণ ও মান বাঁচানোর জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন। তারই কোন এক ব্যক্তি এখানে এসে রাজত্ব গড়ে তোলেন। এই 'রাঢ়' শব্দ থেকেই পরবর্তীতে 'লাউড়' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। লাউড় ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য। সম্রাট আকবরের শাসনামলে লাউড় রাজ্য পার্শ্ববর্তী খাসিয়া উপজাতিদের আক্রমণে আক্রান্ত ও পদানত হলে কিছুদিনের জন্য এর রাজধানী বানিয়াচুংগে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অতঃপর লাউড় রাজা গোবিন্দ সিংহ তা পুনরায় শত্রুমুক্ত করেন ও লাউড়ে রাজধানী পুনঃস্থাপন করেন। ঐতিহাসিক ডব্লিও ডাব্লিও হান্টার এর মতে, "মোগল অধিকারের পর সম্ভবত ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে লাউড় প্রথমবারের মত তার স্বাধীনতা হারায় ও মোগলদের করতলগত হয়।"[৩৫] লাউড় রাজারা ছিলেন কাত্যান গোত্রীয় মিত্র। তাদের উপাধি ছিল সিংহ। এ রাজাদের জগন্নাথপুর ও বানিয়াচুংগে আরো দু'টি উপরাজধানী ছিল। লাউড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিব্য সিংহ নামে জনৈক রাজা রাজত্ব করতেন। কথিত আছে, বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক অদ্বৈতাচার্যের পিতা কুবের আচার্য দিব্য সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। কুবেরাচার্যের পিতা নরসিংহ নাড়িয়াল রাজা গনেশের মন্ত্রী ছিলেন। লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যভার তদীয় পুত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং তদীয় মন্ত্রী পুত্র অদ্বৈতাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই অদ্বৈতাচার্যই বৈষ্ণব সাহিত্যের অদ্বৈত মহাপ্রভু বলে খ্যাত এবং এই দিব্য সিংহ লাউড়ীয়া কৃষ্ণদাশ নামে পরিচিত। এরা প্রাচীন সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাশ বা দিব্যসিংহ তদীয় মন্ত্রীপুত্র ও গুরু অদ্বৈত মহাপ্রভুর জীবনী গ্রন্থ 'বাল্যালীলাসূত্র' রচনা করেছিলেন।[৩৬] তিনি লাউড়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরে তিনি নবদ্বীপে চলে যান ও সেখানে দেহধারণ করেন।

অদ্বৈতাচার্যের অপর শিষ্য লাউড় নিবাসী ঈশান নাগর 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামক গ্রন্থটি ১৫৬৮ সালে রচনা করেন।[৩৭] এই সাধক ও সিদ্ধপুরুষ অদ্বৈতাচার্য অদ্বৈত মহাপ্রভু নামে খ্যাত। কথিত আছে,

---

৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. S. N. Rizai, *District Gazzetter,* Sylhet, 1975, P. 60
৩৫. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Assam,* Vol. 2, P. 260.
৩৬. শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস* (কলকাতা : ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ১৯
৩৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অদ্বৈত মহাপ্রভুর মা লাভাদেবী জীবিতাবস্থায় গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গাস্নান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাকে বৃদ্ধাবস্থায় এতদূর নিয়ে গঙ্গাস্নান করানো সম্ভবপর ছিল না বিধায় অদ্বৈত মহাপ্রভু তার মাতৃবাক্য পালনের উদ্দেশ্যে যোগ সাধনা বলে সমস্ত তীর্থের জল, রেনুকা (যা তাহিরপুর থানার বর্তমান যাদুকাটা নদীর প্রাচীন নাম) নদীর জলের ধারায় একত্রিত করে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি মাতৃ আজ্ঞা পূরণ করেন। তাঁর সাধনা সিদ্ধ ফল 'বারুণীযোগ' নামে অভিহিত।[৩৮] বর্তমানে যাদুকাটা নদীর তীরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিবছর 'বারুণী মেলা' হয় ও ঐ নদী তীরে 'পণাতীর্থে' (পণ্যতীর্থে) হিন্দুরা প্রতিবছর চৈত্র মাসে এই শীর্ষ কায়া নদীতে পুণ্যস্নান করে। ঐ নির্দিষ্ট দিনে এ নদীতে স্নান করাকে হিন্দুরা গঙ্গাস্নানের সমতুল্য জ্ঞান করে থাকে। এতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় বলে তাদের বিশ্বাস। নিম্নোক্ত পংক্তিতে তা ফুটে উঠেছে–

> "তদবধি পণাতীর্থ হৈল তার নাম
> পানাব গাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম।"[৩৯]

১৪৭৪ খ্রি. মোবারক দৌলা নামে লাউড়ের রাজার একজন উজির ছিলেন বলে সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যদিও ঐ সময়কার লাউড়ের রাজার নাম সংক্রান্ত কোন তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এই খ্যাতিমান উজিরের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা রাজার নামের চাইতেও গুরুত্ব পেয়েছিল। এ কারণেই তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকতে পারে। সোনারগাঁয়ে প্রাপ্ত ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মোবারক দৌলা মালিক উদ্দিন নামক মোয়াজ্জমাবাদ ও লাউড়ের উজির একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[৪০] প্রখ্যাত দার্শনিক দেওয়ান আজরফের মতে, লাউড়ের রাজবংশের ইতিহাস তিনি জানতে পারেন লাউড়ের রাজাদের বংশধর ও অধঃস্তন পুরুষ বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের কাছ থেকে। এই বংশের রাজা গোবিন্দ সিংহ ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মান্তরিত হয়ে হাবিব খাঁ নামধারণ করেন। তাঁরই অধঃস্তন পুরুষ হচ্ছেন বর্তমান বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান পরিবার।[৪১]

হট্টনাথের পাঁচালী বর্ণিত সুনামগঞ্জ

প্রাচীন ইতিহাসের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হলো হট্টনাথের পাঁচালী।[৪২] সিলেটের ভাটেরায় প্রাপ্ত তাম্র ফলকের সাথে পাঁচালীর অনেক বর্ণনার মিল পাওয়া যায়। পাঁচালীর বর্ণনা অনুযায়ী কামরূপের

---

৩৮. অচ্যুতচরণ চৌধুরী, *তত্ত্বনিধি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৯১৭ খ্রি., পৃ. ৩৯
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৪০. Shamsuddin Ahmed, *Inspection of Bengal,* Vol. IV, 1960, P. 121.
৪১. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪২. হট্টনাথ গৌড় রাজ্যের কুলদেবতা : পাঁচালী মূলত স্মৃতি গাথা। গণেশরাম শিরোমণি 'হট্টনাথের পাঁচালী' গ্রন্থ আকারে সংকলন করেন। পাঁচালী ৩৬ হাজার শ্লোক সম্বলিত ও সাত খণ্ডে বিভক্ত। ভাটপাড়ার জাহ্নবী ভট্টাচার্য্য প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

রাজা কামসিন্ধুর মৃত্যুর পর কামরূপ আক্রান্ত হয়। রানী উর্মি তখন প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে জৈন্তা পাহাড়ের সংলগ্ন নারী রাজ্যের কিছু অংশ নিয়ে একটি রাজ্যের পত্তন করেন। রানী উর্মির কন্যা ছিল উর্বরা। তিব্বত দেশের হাটক নগরের যুবরাজ 'কৃষক' নারী রাজ্যে ভ্রমণে এসে রানী উর্মির রুপসী কন্যা উর্বরার প্রেমে পতিত হন ও তাকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে তাদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় যার নাম রাখা হয় হাটক। যথাসময়ে হাটক মাতামহীর সিংহাসনে বসেন। হাটকের পুত্রের নাম গুহক। হাটকের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র গুহক সিংহাসনে আসীন হন। গুহকের ছিল তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদের নাম লড্ডুক, গুড়ক ও জয়ন্তক আর দু'কন্যা শিলা ও চটলা। গুহকের মৃত্যুর পর তার রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। লড্ডুকের অংশের নাম লাউড়, গুড়কের অংশের নাম গৌড় এবং জয়ন্তকের অংশের নাম জয়ন্তিয়া বা জৈন্তা।[৪৩] লাউড় রাজ লড্ডুকের মৃত্যুর পর তার পুত্র শম্মুক রাজা হন। তারপর তার বংশীয় আদিত্য, দেবদত্ত, ভগদত্ত, নবার্জ্জুন, মাধব, প্রমর্দন পর পর লাউড়ে রাজত্ব করেন। প্রমর্দন সম্ভবত দ্বাদশ শতকে রাজত্ব করতেন। তিনি গৌড় রাজ ক্ষেত্রপালের সমসাময়িক ছিলেন। প্রমর্দনই 'কৃষক' বংশীয় শেষ রাজা।[৪৪] তারপর আচার্য বংশীয় অরুণাচার্য লাউড়ের সিংহাসনে বসেন। তারপরে রাজা হন বিজয় মানিক্য। রাজা বিজয় মানিক্য রাজা থাকাকালে জগন্নাথ মিশ্র নামক জনৈক কাত্যান গোত্রীয় বিপ্র রাঢ় দেশ থেকে পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন। তিনি রাজা বিজয় মানিক্যের আশ্রয়ে এক বাসুদেব স্মৃতি স্থাপন করেন। দ্বিজভক্ত রাজা সেই জগন্নাথ মিশ্রকে দেবসেবা নির্বাহারে জন্য যে ভূমি দান করেন সে স্থান জগন্নাথ বিপ্রের নামানুসারে পরবর্তীতে জগন্নাথপুর নামে খ্যাত হয়।[৪৫] বিজয় মানিক্যের দুই মহিয়ষী ছিলেন। তাদের নাম লক্ষীও শ্রী। উক্ত মহিয়ষীদের নামে তিনি বাসুদেব মন্দিরের পেছনে দুইটি পুস্করিনী বা পুকুরও খনন করেন।

জগন্নাথপুরের কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাক্ষণগণ নিজেদেরকে লাউড়ের রাজার বংশধর বলে পরিচয় দেন। দিব্য সিংহের পুত্রের পর রামানাথ নামক এক ব্যক্তি লাউড়ের রাজা হন। তার ছিল তিন পুত্র। প্রথম পুত্র কাশিবাসী হন, দ্বিতীয় পুত্র লাউড়ের সিংহাসনে বসেন এবং তৃতীয় পুত্র কেশব জগন্নাথপুরে এসে বসবাস করেন। এই কেশবই জগন্নাথপুর রাজবংশের আদিপুরুষ। কেশবের পুত্র শনি বা সনাই,

---

একশত বৎসর পূর্বে আখালিয়ার কুলচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে 'হট্টনাথের পাঁচালী'র ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন। বাবু কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী ১৯৪০ সালে 'হট্টনাথের পাঁচালী'র উপর ভিত্তি করে শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

৪৩. আব্দুল হামিদ মানিক ও অধ্যাপক কাজী আব্দুর রউফ, *সিলেট গাইড* (ঢাকা : দি বিজনেস পোস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৯-২০

৪৪. ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, সিলেট, ১৯৯১, পৃ. ৩০

৪৫. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *প্রসঙ্গ বিচিত্রা* (সিলেট : ফেব্রু. ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

তার পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতির পুত্র হলেন দূর্বার খাঁ। দূর্বার খাঁ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। জগন্নাথপুররে বিরাট দীঘিটি তারই কীর্তি। দূর্বার সিংহ এ দীঘি খনন করে সম্রাট আকবার থেকে খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। দূর্বার খাঁর পুত্র রাজসিংহ। রাজসিংহের তিন পুত্র জয়সিংহ, বিজয় সিংহ ও পরমানন্দ সিংহ। এই সময় লাউড়ের রাজা মারা যান। লাউড় রাজ্য কুমারদের প্রাপ্য ছিল; কিন্তু কার্যত তা হয়নি। সম্ভবত এ কারণেই সম্রাট আকবরের আমলে পূর্বোক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল।[৪৬]

অন্য এক তথ্য সূত্রে জানা যায়, সুনামগঞ্জে আরেকটি সামন্ত রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের নাম ছিল মগধ। মগধ রাজ্যের রাজপুত্র রাজ্যহারা হয়ে ঐ এলাকায় আগমন করেন। খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে মগধ নামে একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে চম্পাগাছের বাগানে এক সুন্দর পরিবেশে ঐ রাজপুত্রকে খাসিয়ারা তাদের রাজা হিসেবে বরণ করে নেয়। চম্পাতলায় সে অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে রাজধানীর নামকরণ করা হয় চম্পাতলা। এ চম্পাতলা স্থানীয়ভাবে 'চামতলা' নামে পরিচিত। এই রাজ্যে ধনুরাজা নামক জনৈক রাজা খুব প্রভাবশালী ও নামজাদা রাজা ছিলেন। তিনি রণবিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি জগন্নাথপুরের রাজকন্যা ও দোহালিয়ার জনৈক জমিদার কন্যাকে বিবাহ করেন।[৪৭] দোহালিয়ার অদূরে চন্দ্রকলার বাগ আজো এর স্মৃতি বহন করে। চামতলার জমিদারদের বংশধরদের একাংশ হরিণাপাটিতে রয়েছেন বলে জনাব আবু আলী সাজ্জাদ হোসেন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আজকের লাউড় দেখে অনুমান করার উপায় নেই যে, এটি এককালে একটি বিশাল রাজ্যের রাজধানী ও অনেক ইতিহাস সৃষ্টিকারী নগরী ছিল। আজকের লাউড় নিস্তব্ধ ও ছিন্নভিন্ন এক ম্রিয়মান এলাকা যা ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। লাউড় রাজাদের বংশধর বলে যারা দাবী করেন তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ আজো লাউড় এলাকায় রয়েছেন। তাছাড়া জগন্নাথপুরে এ বংশের উত্তরাধিকারী বলে পরিচয় দিতে গৌরববোধ করেন এমন পরিবারও আছেন। এই বংশের তারানাথ চৌধুরী ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'জগন্নাথপুরের ইতিহাস' রচনা করেন।[৪৮] এদিক থেকে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য চর্চায় সুনামগঞ্জ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের দাবীদার।

মোগল আমল

মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫) লাউড়ের রাজা গোবিন্দ সিংহ তার জ্ঞাতি ভ্রাতা জগন্নাথপুরের রাজা বিজয় সিংহের সাথে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হন। এ বিবাদের

---

৪৬. অচ্যুত চরণ চৌধুরী, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, শিলচর, ১৯১০, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬
৪৭. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪
৪৮. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রে রাজা বিজয় সিংহ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। বিজয় সিংহের বংশধরগণ এ হত্যার জন্য গোবিন্দ সিংকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে সম্রাট আকবরের রাজ দরবারে নালিশ করে বিচার প্রার্থনা করেন। এ জন্য সম্রাট আকবর দিল্লী থেকে সৈন্য পাঠিয়ে গোবিন্দ সিংহকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। বিচারে গোবিন্দ সিংহের ফাঁসির হুকুম হয়। গোবিন্দ সিংহের অপর নাম ছিল 'জয়সিংহ'। সমসাময়িক সময়ে জয়সিংহ নামে অপর এক ব্যক্তি রাজা গোবিন্দ সিংহের সাথে সম্রাট আকবরের কারাগারে আটক ছিল। প্রহরীরা ভুলবশত রাজা গোবিন্দ সিংহের পরিবর্তে ঐ জয়সিংহকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়। ফলে নির্দিষ্ট দিনে গোবিন্দ সিংহের পরিবর্তে ঐ জয়সিংহ নামক ব্যক্তিটি ফাঁসিতে প্রাণ হারান। গোবিন্দ সিংহের প্রাণ এভাবে দৈবাৎ রক্ষা পাওয়ায় তিনি সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সম্রাট আকবরের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। গোবিন্দ সিংহের নামকরণ করা হয় হাবিব খাঁ। সম্রাট আকবর গোবিন্দ সিংহ (হাবিব খাঁ)-কে তার হৃত রাজ্য পুনরায় দান করেন। সাব্যস্ত হয় হাবিব খাঁ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করবেন এবং এর জন্য সম্রাটের জমার পরিবর্তে ৬৮ খানা কোষা নৌকা নির্মাণ করে তিনি সম্রাটকে সরবরাহ করবেন। এ নৌকা খাসিয়াদের আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার জন্য মোগল ও স্থানীয় বাহিনী কর্তৃক নৌপথে রণতরী হিসেবে ব্যবহার করা হবে।[৪৯] মরহুম আব্দুল হাই-এর মতে, "লাউড় রাজা এ বশ্যতার ফলে রাজা থেকে জমিদারে পরিণত হন। কারণ কোষ নৌকা বা জলযান প্রদানের শর্ত ভঙ্গ হলে এ রাজার জমিদারীর অধীন পরগনা বিশেষ কেড়ে নিয়ে পৃথক পৃথক স্থানীয় জমিদার সৃষ্টির মাধ্যমে উক্ত জমিদারকে শায়েস্তা করা হবে বলে সাবধান করা হয়। এ সময় সীমান্ত রক্ষার ভার কুমেদানদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাদের অধীনে ছোট ছোট সৈন্য দল থাকত।"[৫০] মুক্তি পেয়ে তিনি অনেক মোগল সৈন্যসহ দেশে ফিরে আসেন। তার দুর্বলতার কথা খাসিয়াদের বুঝতে বাকী ছিল না। এ কারণে খাসিয়াদের উৎপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি লাউড় ছেড়ে বানিয়াচুংগে গিয়ে সপরিবারে বসবাস করতে শুরু করেন। এ কারণেই বানিয়াচুংগের বর্তমান দেওয়ানারা তাঁর বংশধর। সৈয়দ মুর্তজা আলীর মতে, হাবিব খাঁর পৌত্র ছিলেন মজলিশ আলম খাঁ। মজলিশ আলম খাঁর পুত্র ছিলেন আনোয়ার খাঁ। খাসিয়াদের উৎপাতের কারণে আনোয়ার খাঁ সপরিবারে লাউড় ছেড়ে বানিয়াচুংগে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। আনোয়ার খাঁ অত্যন্ত প্রতাপশালী জমিদার ও বারঁভূইয়াদের অন্যতম ছিলেন। আনোয়ার খাঁ মৌলভীবাজারে রাজা সুবিদ নারায়ণের সাথে যুদ্ধে বংগের শেষ মুসলিম বীর উসমান খাঁকে সাহায্য করেন। ফলে উসমান খাঁ যুদ্ধে

---

৪৯. *সুনামগঞ্জ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৫০. আব্দুল হাই, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

জয়লাভ করেন ও সুবিদ নারায়ণ পরাজিত হন।[৫১] 'বাহারিস্থান-ই গায়বী'র মতে, আনোয়ার খাঁ ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁর চেয়ে কম পরাক্রমশালী ছিলেন না। খাজা উসমান বুকাইনগর থেকে বিতাড়িত হলে আনোয়ার খাঁ মোগলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। আনোয়ার খাঁ ও তাঁর অপরভ্রাতা হোসেন খাঁকে বন্দী করে ঢাকায় সুবায়ে বাংলার দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানে বন্দী করে রাখা হয়। সেখানে তিনি প্রহরীদের ভাং (নেশাজাতীয় দ্রব্য) খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে পালাতে সক্ষম হন। পালিয়ে তিনি বানিয়াচুংগে আসেন ও তার স্ত্রী ও কন্যাদের নিজ হাতে হত্যা করে মোগলদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে অগ্রসর হন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি বিশাল মোগল বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত ও পুনরায় বন্দী হন।[৫২]

লাউড়ের রাজবংশ পূর্বেই প্রায় নির্বংশ হয়ে গিয়েছিল। হাবিব খাঁর বংশধর লাউড় ও বানিয়াচুংগ উভয়স্থানে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতেন। ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে খাসিয়াদের আক্রমণে লাউড় রাজধানী সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেলে লাউড় রাজার বংশধররা বানিয়াচুংগে চলে যান। পরে হাবিব খাঁর অধঃস্তন পুরুষ জনৈক উমেদ রাজা লাউড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এ দুর্গের ধ্বংসাবশেষই লাউড়ের হাবেলী নামে পরিচিত। পরে বানিয়াচুংগ পর্যন্ত এ আক্রমণ সম্প্রসারিত হওয়ার আশংকায় উমেদ রাজা বানিয়াচুংগ রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বানিয়াচুংগের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে তা সুরক্ষিত করেন।[৫৩] এ পরিখার ধ্বংসাবশেষ আজও বানিয়াচুংগে বিদ্যমান আছে।

সুনামগঞ্জের বিভিন্ন পরগনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সুনামগঞ্জ জেলায় ৩২টি পরগনা রয়েছে। তন্মধ্যে আতুয়াজান, আদুয়াজান (কিসমত), আটগাও, চামতলা, ছাতক, জাতুয়া (হাগল), জায়ার, জাতুয়া (বাজু), পাগলা, লক্ষণশ্রী, শিক সুনাইত্যা, দোহালিয়া, হাগল সুনাইত্যা, নইগং, সুখাইড়, পাইলগাঁও, সিংচাপাইড়, দোওজ, বেহেলী, গৌরারাং, নাওড়া বেতাল, খালিসা, বড়াথিয়া, বংশীকুণ্ডা, হাসনাবাদ, সফিনগর, বেতাল, মাহরাম ও সেলবরষ পরগনা।[৫৪] কথিত আছে যে, আতুয়া, জাতুয়া ও পাগল নামক চংগ জাতীয় তিন ব্যক্তি মৎস্য শিকারের জন্য এখানে এসে এলাকার প্রাচুর্যে প্রলুব্ধ হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করে। এরা পরস্পর বিরোধিতা

---

৫১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১২৮

৫২. মির্জা নাথান, অনু. খালেকদাদ চৌধুরী, *বাহার-ই-স্তান-ই গায়বী* (ঢাকা : ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৬২

৫৩. Assam District Gazetter, Vol. 11, Sylhet Chapter 11, P. 25

৫৪. মোহাম্মদ মুমিনুল হক, *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ, লন্ডন, ২০০১, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

এড়ানোর জন্য নিজেদের মধ্যে এলাকা চিহ্নিত করে বণ্টন করে নেয়। একের এলাকায় অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না। এস্থানগুলো পরবর্তীতে তাদের নিজেদের নাম ও তাদের পছন্দমত নামকরণের মাধ্যমে প্রথমে পরিচিত ও পরে খ্যাত হয়। এগুলোই পরবর্তীতে পরগনা হিসেবে পরিচিত ও পরিণত হয়।[৫৫] এ পরগনাগুলো আবার অসংখ্য মৌজায় বিভক্ত, নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরগনা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো।

সেলবরষ

রাধাবল্লভ নামে জনৈক ব্যক্তি রাঢ় অঞ্চল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে ধর্মপাশা থানার সলপ নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি উক্ত গ্রামের জনৈকা কায়স্থ পরিবারের অপরের বাগদত্তা কন্যাকে বিবাহ করেন। এ অসবর্ণ বিবাহকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বর্ণবিভক্ত স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে উক্ত বিরোধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপলাভ করে। এ বিরোধে রাধাবল্লভ স্থানীয় চণ্ডালদের সমর্থনে প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মিয়াময়মন নাম ধারণ করেন। মিয়াময়মন স্থানীয়ভাবে নিজ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য বাংলার সুবেদার এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে বাংলার সুবেদার প্রদত্ত সাহায্য নিয়ে এলাকায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বাংলার সুবেদার তাকে এ অঞ্চলটি চল্লিশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত প্রদান করেন। চল্লিশ শব্দের ফার্সি হলো চেহেল। চেহেল এর সংক্ষিপ্ত রূপ ছেল বা সেল। 'চেহেল' বা চল্লিশ বৎসর এই নাম থেকেই সেলবরষ পরগনার নামকরণ করা হয়। অন্য একটি তথ্য মতে, সেলবরষের প্রতিষ্ঠাতা মিয়াময়মনের পূর্ববাড়ি বগুড়ার 'সেলবর্ষ' নামক এলাকায় ছিল। তারই নামানুসারে এলাকার নামকরণ করা হয় সেলবর্ষ বা সেলবরষ।[৫৬]

সেলবরষের জমিদারদের জনৈক পূর্বপুরুষ গোবর্ধন মীর জুমলার সময়ে চল্লিশশালা বন্দোবস্ত নিয়ে এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। সে সময় সেলবরষ পরগনা ছিল বিরাট জলরাশি ও গভীর জংগলে পরিপূর্ণ। সিলেটের তৎকালীণ কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসে ১৭৮৮ সালে সেলবরষ পরগনা সম্পর্কে একটি রির্পোট তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন। যাতে তিনি বর্ণনা করেন, "পার্শ্ববর্তী আসামের দুর্ধর্ষ খাসিয়া রাজ্যের লোকজন সেলবরষসহ কয়েকটি পরগনার উপর আক্রমণ চালায় ও তারা প্রায় তিনশ লোককে হত্যা করে এ সমস্ত এলাকার বিষয়সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে।"[৫৭] এ থেকে অনুমান করা যায়, খাসিয়ারা সর্বদাই এ অঞ্চলে লুটপাট ও দস্যুবৃত্তি করত। এদের আক্রমণে লাউড় রাজা বার

৫৫. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৫৬. *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, পূর্বাংশ, ২য় ভাগ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১
৫৭. Robert Lindsay, *Oriental Miscellanies : Anecdotes of an Indian Life,* P. 89

Dhaka University Institutional Repository

বার পর্যুদস্ত ও শেষে লাউড় ছাড়া হন। এদের আক্রমণ সম্পর্কে সম্রাট আকবরও অবহিত ছিলেন। এছাড়া এ সমস্ত অঞ্চল গভীর জংগলে পরিপূর্ণ থাকায় এখানে অন্যান্য স্থানের ডাকাতরা এসে আত্মগোপন করে থাকত ও সুযোগ বুঝে এ সমস্ত এলাকায় নির্যাতন ও দস্যুবৃত্তি করতো। ক্রমাগত হত্যা, লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির ফলে উক্ত এলাকাটি সাধারণ নিরীহ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সিলেট ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে উক্ত এলাকার সামগ্রিক অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন ক্রমে নন্দলাল নামক জনৈক সরকারী কর্মকর্তা জেলা কালেক্টরের নিকট যে প্রতিবেদন প্রেরণ করে তা থেকে জানা যায়, এ সময় সেলবরষ পরগনার মালিকানা দু'টি হিস্যায় বিভক্ত ছিল। সিতারাম পাটওয়ারী ছিলেন ছয় আনা হিস্যার মালিক আর দশ আনা হিস্যার মালিক ছিলেন রাজসিংহ। প্রেরিত রির্পোটে উক্ত হিস্যা মালিকদের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা ও এলাকার শান্তিরক্ষায় তাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দায়ে তাদের অভিযুক্ত করে তাদের অপসারণ দাবী করা হয়।[৫৮] উল্লেখ্য, উক্ত মালিকদের কেউই বর্তমান জমিদার বংশের পূর্বসুরী নন। ফলে মিয়াময়মনের বংশধরেরা কিভাবে মালিক জমিদার হন, তার পরিষ্কার কোন চিত্র পাওয়া যায় না। উক্ত এলাকার ইতিহাস লেখক জনাব আহমদ তওফিক চৌধুরীও এ বিষয়ে এ ধারার মতপোষণ করেছেন। তার মতে, "মিয়াময়মনের বংশধররা ঐ সময় সাময়িকভাবে জমিদারী দায়িত্বে না থাকলেও ১৭৮৯ সালের দশসনা বন্দোবস্ত ও পরে ১৭৯৩ সালের ২২ শে মার্চের ঘোষিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন।"[৫৯] এই সেলবরষ শব্দটি প্রথম নামের শেষে পরিচিতিমূলক পদবী হিসেবে ব্যবহার করেন প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিক জনাব ফজলুল হক সেলবরষী। সেলবরষের জনাব আব্দুল হান্নান চৌধুরী ছিলেন অবৈতনিক হাকিম। জনাব আব্দুল খালেক আহমদ এ এলাকারই সুসন্তান। এ ছাড়াও অনেক লেখক, গবেষক, কবি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিসহ জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্ম হয়েছে এ এলাকায়।

লক্ষণশ্রী

লক্ষণ রাম দাস নামক জনৈক ব্যক্তির নামাসনুসারে এ পরগনার নামকরণ করা হয় লক্ষণশ্রী। লক্ষণ রাম দাসের পদবী ছিল দেওয়ান। জয়কৈলাশ এর ব্রাক্ষ্মণগণ এ দেওয়ানদের পুরোহিত ছিলেন। রাঢ় দেশ থেকে জনৈক ভট্টাচার্য তার শিষ্যগণসহ কামরূপ গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সেবা শুশ্রুষাসহ আনুষঙ্গিক কারণে উক্ত পরিবারকে তখন

---

৫৮. District Gazetter, Sylhet, Vol. 111, P. 127

৫৯. আহমদ তওফিক চৌধুরী, *সেলবরষের ইতিহাস* (ময়মনসিংহ : কে. এস. পাবলিকেশন ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

এখানে থেকে যেতে হয়। এছাড়া তার সংগীয় অপর শিষ্য অতুল রামেরও একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এ কারণে তারা এতদঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। সম্ভবত মায়া-মমতা ও এলাকাটিতে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে একটা আন্তরিক টানের সৃষ্টি হওয়ায় তারা এখানে স্থায়ী হয়ে যান। অতুলরামের বংশের জনৈক দেওয়ান লক্ষণরামের নামেই এ পরগনার নামকরণ করা হয়।[৬০] অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির মতে, "গৌরারং চৌধুরী বংশের জনৈক অনন্তরাম মুসলমান হয়ে ওয়েজদী খাঁ নাম ধারণ করেন। তিনি ধর্মান্তরিত হলেও পিতার অর্ধেক সম্পত্তি লাভ করে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং একটি খাল খনন করেন। উক্ত পরগণায় সে অনুসারে পরে উক্ত এলাকাটির নাম ওয়েজখালি হয়। লক্ষণশ্রী গ্রামে পরে কোন এক সময় তার বংশধররা আবাসস্থল গড়ে তোলেন। এ কারণেই লক্ষণশ্রী ও গৌরারং জমিদারদের মধ্যে রক্তের বন্ধন রয়েছে।"[৬১] মোগল আমলে খাসিয়াদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সীমান্তবর্তী পরগনাসমূহে একশত সৈন্যবহিনী নিযুক্ত থাকতো, যার অধিনায়কের উপাধি ছিল সদুয়াল। লক্ষণশ্রীর সদুয়াল ছিলেন গোলাম আলী। গোলাম আলী এ সুবাদে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে বৃটিশ কোম্পানী থেকে বন্দোবস্ত লাভের সুবাদে জমিদারে পরিণত হন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তার সম্পত্তি তার ভাগ্নেদ্বয় খোদা বকস ও আমির বকস চৌধুরীকে দান করে দেন। এই আমির বকস চৌধুরীর স্ত্রী ছিলেন হুরমত জান বিবি যার গর্ভে জন্ম হয় বাংলাদেশের প্রখ্যাত মরমী কবি হাছন রাজার।[৬২] এছাড়াও এ পরগনায় অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তির জন্ম হয়েছে।

গৌরারং

গৌরারং জমিদার বংশের আদিপুরুষ ছিলেন নিধিরাম। যশোহর অঞ্চলে তার মূল বাড়ি ছিল। তিনি ছিলেন একজন কায়স্থ। বংগদেশ থেকে পদোন্নতি পেয়ে মহুরী নিযুক্ত হয়ে তিনি সিলেটে আসেন। এতদঞ্চলের জনৈকা দাস বংশীয় মহিলাকে বিয়ে করে তিনি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। জনৈক রাজপুরুষের অনুগ্রহে সুরমা নদীর পশ্চিম পাড়ে তিনি একখণ্ড বিরাট জংলা ভূমি লাভ করেন। ঐ গ্রামের নাম ছিল লক্ষণশ্রী বর্তমানে যা পুরাতন লক্ষণশ্রী নামে পরিচিত। তৎপরবর্তীতে তিনি গৌরারং চলে যান এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তার বংশধরদের একাংশ পরবর্তীতে এখানকার জমিদার নিযুক্ত হন। গৌরারং জমিদারী বিশাল ও প্রসিদ্ধ ছিল। এই বংশের বিখ্যাত ছিলেন নগেন্দ্র চৌধুরী।

---

৬০. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৬১. *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, পূর্ব্বাংশ, পৃ. ৬৭
৬২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দোহালিয়া

বংগাধিপতি হোসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীমন্তদেব নামে রাঢ় দেশের একজন পদস্থ, সম্ভ্রান্ত হিন্দু দোহালিয়ায় আগমন করেন এবং পানাইল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এ বংশের প্রেমনারায়ণ ১১২০ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার নাম হয় মুহাম্মাদ ইসলাম চৌধুরী। এই বংশের প্রখ্যাত দার্শনিক জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ দেশের সাহিত্য চর্চা, দর্শন-শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সমর্থ হন। একই বংশের দেওয়ান আহবাব চৌধুরীও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন।[৬৩] ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, ইটার বাৎস্য গোত্রিয় রাজা সুবিদ নারায়ণের বংশোদ্ভূত জনৈক বাসুদেব দোহালিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই বংশের জনৈক মহেশ্বর নামক ব্যক্তি ঢাকার নবাবের সহযোগিতায় দোহালিয়া পরগনা থেকে ধনুরাজা নামক জনৈক খাসিয়া রাজার অবৈধ জবরদখল উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি উক্ত খাসিয়া রাজাকে যুদ্ধে পরাস্থ করেছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত ধনু রাজা মুখদেন পাহাড়ে ফিরে যাবার পথে তার দলবলসহ একটি খরস্রোতা নদীতে ডুবে মারা যান। তারপর থেকে উক্ত নদীর নাম হয় 'খাসিয়া মারা নদী' (স্থানীয়ভাবে খাই মারা), তারপর উক্ত মহেশ্বর দেওয়ান উপাধি লাভ করেন।[৬৪]

১৭৯৩ সালের পূর্ববর্তী সুনামগঞ্জের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত সময়ে (দশশালা বন্দোবস্ত থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত) সুনামগঞ্জে মোট বারজন জমিদার ছিলেন। এরা হলেন বড়াক্ষিয়ার গঙ্গাসিংহ ও বারুদাশ, দোহালিয়ার মোহাম্মাদ বাসির দর্পনারায়ণ ও কুশলরাম, চামতলার জফির মোহাম্মাদ, মুহাম্মাদ মীর্জা ও মোহাম্মাদ রাজা, লক্ষণশ্রীর গোলাম আলী ও মোহাম্মাদ লায়েক, সুখাইড়ের মোহাম্মাদ আমীর ও সেলবরষের সীতারাম পাটওয়ারী।[৬৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পূর্ব সময়ে বৃহত্তর সিলেটের কোন কোন জমিদার কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এদের মধ্যে সুনামগঞ্জের বড়ক্ষিয়ার জমিদার গঙ্গাসিংহ ও দোহালিয়ার জমিদার কুশলরাম অন্যতম। এরা কোম্পানির নৌকা আটক করে গোলা-বারুদ, রসদ লুট করেন। কোম্পানী ফৌজ বারবার পরাজিত হলে অবশেষে জেমসজীপের নেতৃত্বে এক বিশেষ বাহিনী এ বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হয়। যুদ্ধে জেমসজীপ বন্দি হন ও আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়।

মোগল আমলে খাসিয়ারা অত্যন্ত প্রতাপশালী, দুর্দান্ত ও লুটেরা প্রকৃতির জাতি ছিল। এদেরকে প্রতিহত করার জন্য পরগনায় একশত সৈন্যের একটি বাহিনী ছিল যার অধিনায়কের উপাধি ছিল

---

৬৩. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১২৩
৬৪. প্রাগুক্ত
৬৫. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

সদুয়াল। এ সমস্ত অধিনায়করাই পরে সর্বপ্রথম দশসনা বন্দোবস্ত লাভের অধিকারী হয়েছিলেন। দোহালিয়া এলাকায় নিযুক্ত সদুয়াল এর নাম ছিল সৈয়দ গোলাম হোসেন। তিনি ইসলাম চৌধুরীর (প্রেমনারায়ণ চৌধুরী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর এ নাম গ্রহণ করেন) কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এ পরগনা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য বিখ্যাত।

কিসমত আতুয়াজান ও শিক সোনাইত্যা

শিক সোনাইত্যার বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশের আদিপুরুষ রাঘব ভট্টাচার্য রাঢ় দেশ থেকে এ দেশে আগমন করেন। তার সংস্পর্শে এসে জগন্নাথপুরের রাজা বিজয়সিংহ তার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও তাকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেন। এই রাঘবের বেদান্তরত্ন উপাধি ছিল। তার ছিল তিন পুত্র– বিষ্ণুদাশ, রামনাথ ও বংশীবাধন। লাউড় রাজা গৌবিন্দ সিংহ কর্তৃক নিয়োজিত গুপ্ত ঘাতকের হাতে বিজয়সিংহ যখন নিহত হন তখন রাঘবের তিন সন্তান অতিশয় শিশু। রাজা বিজয়সিংহ মৃত্যুকালে গুপ্ত ঘাতককে অনুরোধ করেন যে, তার সম্পত্তির কিয়দংশ যেন তার গুরুকে দেয়া হয়। ঘাতক রাঘবের নিকট উপস্থিত হলে তিনি মুর্চ্ছা যান ও দেহত্যাগ করেন। নিহত রাজা বিজয়সিংহ ও রাঘবের মৃত্যু সংবাদে উভয় পরিবারের সদস্যগণ পলায়ন করেন। গোবিন্দ সিংহ (হাবিব খাঁ) বিজয় সিংহের অধিকৃত আতুয়াজান পরগনার দশপণ অংশ নিজ কর্মচারী চৌধুরীকে দিয়েছিলেন। সেই দশপণ অংশই কিসমত আতুয়াজান নামে ও বাকী ছয়পণের কিছু অংশ বিজয় সিংহের উত্তরাধিকারী পরিচয় দানকারীকে প্রদান করা হয়, তা শিক সোনাইত্যা নামে পরিচিত হয়।[৬৬]

পাইল গাঁও

রাঢ় দেশের মঙ্গলকোট গ্রামের গৌতম গোত্রীয় কানাই লাল ধর নামক এক ব্যক্তি এ দেশে এসে গৃহজামাতা হন ও পালবংশীয় পদ্মলোচনের কন্যা রেহিনীকে বিয়ে করেন। এ বংশের জনৈক হুলাশ বাম চৌধুরী বানিয়াচুংগের জমিদার উমেদ রাজার প্রধান কর্মচারী ছিলের। সে সুবাদে তিনি উক্ত জমিদার থেকে বহু ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। পাইল গাঁও পরগনার জমিদারী ছিল অনেক কারণে বিখ্যাত। সিলেটের মহিলা কলেজ এ জমিদারী সম্পত্তিতে স্থাপিত। এ বংশের ব্রজনাথ চৌধুরী সিলেটে ওকালতী করতেন। তিনি ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন সজন সুধী।[৬৭]

উপরোল্লিখিত পরগনারগুলো ব্যতীত সুনামগঞ্জের অন্যান্য পরগনাগুলোরও স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। সিলেটের শিক্ষা-সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনির্মাণে যুগ যুগ ধরে সে পরগনাগুলোর রয়েছে অনবদ্য অবদান।

৬৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাজনৈতিক অবস্থা

বৃটিশ আমলে সুনামগঞ্জ

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মোগল আবিষ্কৃত বৃহত্তর সিলেট জেলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি বৃহত্তর সিলেট ঢাকা প্রশাসন হতে স্বতন্ত্র হয়ে মহাকুমার সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত জেলা সদর থেকে শাসিত হতে থাকে। কোম্পানি দেশের শাসনভার গ্রহণ করে তাদের শাসনের সুবিধার্থে স্থানীয় কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। সিলেট ডিস্ট্রিক রেকর্ডে উল্লেখিত ২০.১০.১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের এক সরকারী পত্রে সিলেটকে ১০টি রাজস্ব জেলায় বিভক্ত করে। এগুলো হলো : নবীগঞ্জ, লস্করপুর, শংকরপাশা, তাজপুর, পারকুল হিংগাজিয়া, রাজনগর, নোয়াখালী, লাতু ও রসূলগঞ্জ।[৬৮] ইংরেজ কালেক্টর উইলিশের সময় এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়। ১৬৪টি পরগনা (কসবে সিলেট ব্যতীত) উক্ত দশটি রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আপতদৃষ্টিতে এগুলোকে সংস্কারমুখী মনে হলেও মূলত এগুলো ছিল বৃটিশদের স্বার্থসিদ্ধির কূটকৌশলের অংশবিশেষ। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'[৬৯] ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফলে শাসন ব্যবস্থায় তথাকথিত এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। একই সনে আধুনিক থানা ব্যবস্থার বুনিয়াদও প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২৬.১১.১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বড় বড় বাজার ও গঞ্জকে থানায় রূপান্তর করা হয়। এতে সুনামগঞ্জসহ বৃহত্তর সিলেটে মোট ৩০টি থানার সৃষ্টি হয়।

এ দেশের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব একটি স্মরণীয় ঘটনা। এরপর রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসননীতি সম্বন্ধে কতিপয় ঘোষণা প্রকাশ করেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, স্থানীয় প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে সরকারী হস্তক্ষেপ করা হবে না। সিপাহী বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান 'The Causes of Indian Revolt' নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে Mr. Allen Octarion Hurne লিখেছেন,

It was after reading Syed Ahmed Khan's book on the causes of the Indian Mutlng that I first felt the need for having a forum of Public opinion of India and eventually the Indian National Congress came into existance.[৭০]

---

৬৮. *সিলেট ডিস্ট্রিক রেকর্ডস*, খণ্ড ০৩, পৃ. ১০০

৬৯. প্রথমে এ নিয়ম দশ বছরের জন্য ছিল বলে এটাকে দশসনা বন্দোবস্ত বলা হত। পরে বিলাতের কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরীলাভ করলে ১৭৯৩ সালে এটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপ নেয়। বিলাতে এ প্রজ্ঞাপনই আইনে পরিণত হয়ে ১৭৯৩ 'ইংরেজীর ১ আইন' নামে খ্যাত হয়।

৭০. Mr. Jinnah, Hector Volitho, P. 40

Dhaka University Institutional Repository

এ বক্তব্য থেকে দেশের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা যায়। এ সময় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও এতদ্দেশে দ্বিজাতি তত্ত্বের (Two Nation Theory) বুনিয়াদ সর্বপ্রথম ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ ঘোষণা করেন। দেশের এই যখন অবস্থা তখন ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে এক অধ্যাদেশ দ্বারা সিলেটকে বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের আসাম প্রদেশের সাথে যুক্ত করা হয়। সিলেট গেজেটিয়ারের ভাষ্যে :

> Sylhet was in Dacca Division of Bengal province still 1874, but transferred to chief commissionership of Assam in order to make the chief commissioners province of Assam economically viable and to secure the services of a number of educated and enlightened persons to administer it. There were, however loud protests from Sylhet against its inclusion in Assam as people of Sylhet wanted to remain in Bengal with which it had linguistic and cultural links. It was necessary for the Governor General Lord North Brook to come down to Sylhet to pacify the people.[৭১]

সিলেটকে আসামের সাথে সংযুক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে ব্যাপক আপত্তি উঠলে গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক সিলেটে আসেন ও প্রতিশ্রুতি দেন যে, সিলেটকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এর বিধি-ব্যবস্থা আগের মতই অপরিবর্তিত থাকবে এবং এ অঞ্চলের শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা কার্যক্রম যথাক্রমে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কোলকাতা হাইকোর্টের অধীনে পূর্ববৎ চালু রাখা হবে।

এরপর বৃহত্তর সিলেট জেলার রাজস্ব আয়কে আরো বহুগুণ বৃদ্ধির প্রয়োজনে মহকুমা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটকে চারটি সাব-ডিভিশন বা মহকুমায় বিভক্তির ঘোষণা দেয়া হয়। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সিলেট জেলার প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয় সুনামগঞ্জে। মহকুমা বা সাব-ডিভিশন প্রতিষ্ঠার সুফল ও স্বার্থকতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ই এ গেট নিম্নরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন :

> "One of the first improvements brought about under the new regime was the introduction of the sub-Division, System into the Sylhet district, which had previously been administered entirely from H. Q. station. It was clearly impossible in this way, to deal adequately with the requirements of a tract containing a population of 2 millions, and possessing a most difficult and complicated system of land tenures, and in which the communications was so bad that many parts were almost inaccessible at certain seasons of the year. It is now possible for the people in all parts of the district to obtain justice, paying their land revenue and transact other business with the officers of

৭১. District Gazetteer, Sylhet (1974), P. 79

Dhaka University Institutional Repository

Govt. with reasonable distance of their own homes, and for the officers to obtain and adequate knowledge of the beal customs prevailing in areas which they have to administer."[৭২]

মিস্টার ব্লেক সুনামগঞ্জের প্রথম মহকুমা প্রশাসক বা এস.ডি.ও নিযুক্ত হন। সাবডিভিশনাল অফিসারের বাসভবন ও কাচারী নির্মাণের জন্য কোম্পানি সে সময় মাত্র দুই হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়।

ব্রিটিশ শাসনে এ দেশের মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। মুসলমানদের দেওয়ানী অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেড়ে নিয়ে তা হিন্দুদেরকে প্রদান করা হয়েছে। সেনা বিভাগ ও বিচার বিভাগে মুসলমানদের নিয়োগ বন্ধ ছিল। তেমনি ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিস- আদালতের ভাষা করার ফলে মুসলমান আমলা সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৮৪৭ সালে মুসলিম সমাজের ভোগ দখলকৃত ওয়াকফ জায়গীর প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করে হিন্দু সমাজের লোকদের কাছে বন্দোবস্ত দেয়ায় এ সব ভূমির উপস্বত্বভোগী মুসলিম সমাজ একেবারে নিঃস্ব শ্রেণিতে পরিণত হয়।[৭৩] উপরোক্ত পটভূমিতে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের আমলে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হলে আসামের সাথে সিলেটও এ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলমানরা একে সমর্থন করলেও হিন্দুরা এর ঘোর বিরোধিতা করে। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য হিন্দু সম্প্রাদায় সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হলে অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেওয়া হয়।[৭৪] পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জীবনকাল ছিল ৬ বছর। এ ছয় বছর সিলেটের ভাগ্য বাংলাদেশের সাথে জড়িত ছিল। সিলেট পুনরায় আসামের জেলারূপে পরিগণিত হয় ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল। এ অন্তর্ভুক্তির ফলে সিলেটে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এ প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দানা বাঁধে বৃটিশ বিরোধী খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের। যে আন্দোলনে বৃটিশরা এ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ পর্যায়ে রেডক্লিফ রোয়েদাদ বিষয়ের অবতারণা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বৃটিশরা চলে যাবার প্রাক্কালে পাকিস্তান ও ভারতের সীমানা নিয়ে যে তুলকালাম করেছে এটিই রেডক্লিফ রোয়েদাদ নামে পরিচিত। স্যার সিরিল রেডক্লিফ ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই দিল্লী এসে পৌঁছেন। তিনি ছিলেন বাংলা বিভক্ত সংক্রান্ত সীমানা নির্ধারণ কমিশনের চেয়ারম্যান। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিচারপতি বি. সি. বিশ্বাস ও বিচারপতি বি. কে মুখার্জী এবং মুসলিম লীগের পক্ষে ছিলেন বিচারপতি ছালেহ মোহাম্মাদ ও বিচারপতি এস. এ রহমান। লর্ড মাউন্ট ব্যাটন এ কাজের জন্য তাকে মাত্র পাঁচ

৭২. ই. এ. গেট আই. সি. এম, *হিস্টরী অব আসাম*, ১৯০৬ খ্রি., পৃ. ৩৩৫

৭৩. W.W. Hunter, *The Indian Mussalmans*, অনু. জাস্টিস আব্দুল মওদুদু (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৯

৭৪. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তাহ সময় বেঁধে দেন। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এতে নাম সর্বস্ব সদস্য ছিলেন, বিধায় স্যার রেডক্লিফ ছুরি চালিয়ে একাই সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি চূড়ান্ত করেন। এতে তিনি মাত্র চার সপ্তাহ সময় ব্যয় করেন। মাত্র চার সপ্তাহ সময়ে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করে লর্ড মাউন্ট ব্রাটনের কাছে বাংলা ও সিলেট বিভাগ সংক্রান্ত দু'টি রিপোর্ট তিনি প্রদান করেন। যার আলোকে সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমার পাথরকান্দি, রাতাবাড়ি ও বদরপুর থানা এবং করিমগঞ্জ থানার অধিকাংশ এলাকা সিলেট থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতের সাথে সংযুক্ত হয়। রংপুর হারায় আঙ্গুরপোতা ও দহগ্রাম।[৭৫] এতে সিলেটবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সারা দেশের ন্যায় সুনামগঞ্জসহ সমগ্র সিলেটে বৃটিশ তাড়ানোর আন্দোলন আরো জোরদার হয়। সুনামগঞ্জের যারা এ আন্দোলনে প্রথম কাতারে ছিলেন তারা হলেন, দেওয়ান আসফ চৌধুরী, বাবু করুণা সিন্ধু রায়, ফজলুল হক সেলবর্ষী, মকবুল হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ জমিলুল হক, মৌলানা আব্দুল খালেক, আছাবুর রাজা চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলানা আবুল আসাদ, নুরুল হক, আব্দুল বারী চৌধুরী, কুমুদ চৌধুরী, রুহীনি দাশ, দেবেনদত্ত, দীনেশ চৌধুরী, মুন্সী ওয়াহাব উল্লাহ, মুন্সী আহমদ উল্লাহ, মৌলনা আব্দুল কাইয়ুম, মুন্সী আব্দুর রাজ্জাক, হাজী আব্দুল লতিফ, চঞ্চল শর্মা, যোগেন্দ্র শর্মা, দেওয়ান আহবাব চৌধুরী, মুন্সী আব্দুল মান্নান, মুনাওর আলী, আফতাব আলী প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য।[৭৬]

নানকার বিদ্রোহ

বৃহত্তর সিলেট জেলায় অধিকার আদায়ের সংগ্রামী ইতিহাসে 'নানকার আন্দোলন' একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। জমিদার বা বড় বড় জোতদারদের ফাই-ফরমাশ খাটার বিনিময়ে বিনা খাজনায় যারা কিছু জমি ভোগের সুযোগ পেত তাদেরকে নানকার বলা হতো। এদের আবার কিরাণ, রায়ত, চাকর, বেগার প্রভৃতি নামে ডাকা হতো।[৭৭] নানকার শব্দটির আভিধানিক অর্থ দ্বারা এর তাৎপর্য কিছুটা অনুধাবন করা যায়। নান অর্থ রুটি। কারো মতে, রুটি বা ভাতের বিনিময়ে যে শ্রমশক্তি বিক্রি করা হতো জমিদারের কৃষিক্ষেত্র, বাগান বাড়ি কিংবা অন্দর মহলে সেই নানকার প্রজা, আবার কারো মতে 'ননকর' থেকে নানকার শব্দটির উৎপত্তি অর্থাৎ খাজনা বা কর ছাড়াই যে জমিদারের কাছ থেকে বসতি ভিটা ও সামান্য জমি লাভ করতো তাকেই 'নানকার' বলা হতো।[৭৮] মালিক বা জমিদার যে কোন সময় ঐ জমি বা বাড়ি

---

৭৫. আব্দুল মুনীম চৌধুরী, সিলেটের গণভোট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, *মাসিক আল-ইসলাহ*, ৩৮শ বর্ষ, নবম সংখ্যা, পৃ. ১৭৪

৭৬. তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৬

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

থেকে নানকারকে উচ্ছেদ করতে পারতেন। সিলেট অঞ্চলে জমিদার, মিরাশদার, তালুকদার শ্রেণির ভূস্বামীরা নানকার প্রজা রাখতেন, নানকার প্রজাদের নিজস্ব বলতে কিছু ছিল না। মালিকের ফরমায়েশ শোনা, যে কোন হুকুম তামিল করাই ছিল তাদের কর্তব্য। ছেলে-মেয়ে বৌ-ঝিদেরও পুরুষানুক্রমে এই শৃংখলে বাধা থাকতে হত। কিরাণ, ভাণ্ডারী, নমশুদ্র, পাটনী, মালি, চুলী, ধোপা, জেলে, ক্ষৌরকার প্রভৃতি পেশাভিত্তিক শ্রেণির লোকজন ছিল নানকার প্রজাভূক্ত। জমিদাররা কথায় কথায় নানকারদের উপর চালাতো হাজারো রকম জুলুম নির্যাতন।

জমিদারদের এ অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে নানকাররা সংগঠিত হয়ে যে আন্দোলনের সূচনা করে তাই 'নানকার আন্দোলন' বা 'নানকার বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। উল্লেখ্য এ আন্দোলনের সূচনা হয় সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা থানার সুখাইড় থেকে ১৮৯২-৯৩ সালে। এরপর ১৯৩৮-৩৯ সালে এটি সম্প্রসারিত হয় দিরাই থানার রফিনগর গ্রামে। পরবর্তীতে এ আন্দোলন সিলেট জেলার অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই ১৯৩৭ সালে সিলেটে প্রজাস্বত্ত্ব আইন প্রণীত হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন সুনামগঞ্জের সন্তান সাংসদ বাবু করুণা সিন্ধু রায়। ১৯৪৭ এরপর এ আন্দোলনটি আরো জোরদার হয়। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের এক অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে নানকার প্রথাকে বেআইনী ঘোষণা করলে ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটে। অনেক প্রতিবাদ ও নির্যাতনের পর সংগ্রামী প্রজাদের সম্মিলিত সংগ্রামে ১৯৫০ সালে নানকার প্রথা বিলুপ্ত হয়। সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান দেশের প্রথিত যশা দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ নিজে জমিদার হওয়া সত্ত্বেও জমিদার বিরোধী নানকার আন্দোলনে শুধু জোরালো সমর্থনই দেননি; বরং একমাসের মধ্যেই আপন জমিদারীতে এক হাজার নানকারকে জমির স্বত্ব দান করে এক বিশাল মহানুভবতার পরিচয় দেন।[৭৯]

গণভোট

বৃহত্তর সিলেট পাকিস্তানে আসার পক্ষে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয় এরই প্রেক্ষিতে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত গণভোটকে বৃহত্তর সিলেটবাসী জিহাদ হিসেবে গ্রহণ করে। অধ্যাপক শাহেদ আলী সম্পাদিত 'পাক্ষিক প্রভাতী' এ আন্দোলনের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ সালের ৭ জুলাই এ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৫২,৭০০ ভোটের ব্যবধানে কুড়াল মার্কা জয়যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৮০] পাকিস্তান আমলে সব কটি

---

৭৯. ফজলুর রহমান, *সিলেটের আরও একশ একজন* (সিলেট : ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৫০

৮০. অধ্যাপক শাহেদ আলী, 'সোনার অক্ষরে লেখা একটি অভিজ্ঞতা সিলেট রেফারেন্ডাম', *জালালাবাদ বার্ষিকী* (ঢাকা : জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ১৯৯৮-৯৯), পৃ. ১৩

রাজনৈতিক আন্দোলনে সুনামগঞ্জবাসী সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। লাইন প্রথা আন্দোলন, বঙ্গাল খেদা আন্দোলন, নানকার আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলনকে স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি বলা হয়। এ আন্দোলনে সিলেটবাসী ছিলেন প্রথম কাতারে। পৃথক সংগ্রাম করে সিলেট পাকিস্তানে যোগ দেয়, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন আসতেই দেখা গেল পাকিস্তান আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালনকারী সিলেটের মুসলিম লীগের অনেক নেতা-কর্মীই বাংলার পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেন। শতকরা ৫৬ ভাগ বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও কৌশলে সংখ্যালঘুদের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র বাংলার সচেতন মানুষ মেনে নিতে পারেনি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন মূলত ১৯৪৮ ও ১৯৫২ এ দু' পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের উভয় পর্যায়ে সুনামগঞ্জের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিশ' পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ নামক পুস্তিকা প্রকাশ করে। ৯ নভেম্বর '৪৭ মুসলিম সাহিত্য সংসদের সভায় সুনামগঞ্জের মুসলিম চৌধুরী বাংলার পক্ষে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[৮১] অধ্যাপক শাহেদ আলী সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সৈনিক' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ এর ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রীর বাংলা বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে ১১ মার্চ দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে সুনামগঞ্জের দু'জন কৃতিপুরুষ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব মাহমুদ আলীর পরিচালনায় ও প্রখ্যাত দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক নওবেলাল' রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সাহসী ভূমিকা পালন করে।[৮২] ১৯৪৮ সালের শুরু থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন চলে সুনামগঞ্জসহ সমগ্র সিলেটে। '৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই সরকার সিলেটে ১৪৪ ধারা জারি করে, কিন্তু ঢাকায় গুলি হওয়ার সংবাদ পৌঁছা মাত্র সুনামগঞ্জসহ সমগ্র সিলেটের রাস্তায় নামে জনস্রোত। প্রায় ১৫ দিন চলে ধর্মঘট। এ ধর্মঘট শুধু শহরে নয় ছড়িয়ে পড়ে থানায়-থানায়, গ্রামে-গ্রামে। মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন সুনামগঞ্জের পথিকৃৎ সংবাদিক মকবুল হোসেন চৌধুরী, মাহমুদ আলীসহ অনেকে।[৮৩] রাষ্টভাষা বাংলাকে মর্যাদা পেতে হয়েছিল বহু রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে। এটি আমাদের জন্য যত না শোকের তার চেয়েও বেশী গৌরবের। পৃথিবীর ইতিহাসে এ নজীর অনন্য। অন্যান্য

---

৮১. *সিলেট গাইড*, পৃ. ৩৪

৮২. মোস্তফা কামাল, *ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন* (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৫৩

৮৩. *সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের মত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সুনামগঞ্জবাসীদের যে অবদান রয়েছে তা অনস্বীকার্য। সুনামগঞ্জের যে সমস্ত প্রথিতযশা খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ এ আন্দোলনে বিভিন্ন পর্যায়ে অসামান্য অবদান রখেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক শাহেদ আলী, মকবুল হোসেন চৌধুরী, দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ, মাহমুদ আলী, হাজেরা মাহমুদ, জননেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, ড. আখলাকুর রহমান, মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, আব্দুল হক, অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী, কমরেড বরুণ রায়, আলতাফ উদ্দিন আহমদ, হোসেন বখত, মুসলিম চৌধুরী, রিয়াছত আলী, শাহেরা বানু চৌধুরী প্রমুখ।[৮৪]

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আসে আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন। জাতির আত্মবিকাশের লড়াইয়ের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে দান করেছে নিজস্ব ঠিকানা ও রাষ্ট্রীয় পরিচিতি। সুনামগঞ্জবাসী সংগ্রামী ঐতিহ্যের হাত ধরে এ চূড়ান্ত সংগ্রামে জানপ্রাণ দিয়ে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ রাত থেকেই প্রতিরোধের জন্য সুনামগঞ্জ প্রস্তুত ছিল। ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় পর্যন্ত দেশ-বিদেশে, যুদ্ধের মাঠে, যুদ্ধ পরিচালনায়, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনে সুনামগঞ্জ তথা সমগ্র সিলেটবাসী স্থাপন করেছে অতুলনীয় নজীর।[৮৫] জাতির এ ক্রান্তি লগ্নে সুনামগঞ্জের তরুণ সমাজ দলে দলে যোগ দেয় মুক্তিবাহিনীতে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সক্রিয় হয়ে উঠেন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। সশস্ত্র বাহিনীর অভিজ্ঞ প্রবীণ ও উদ্যমী নবীন সদস্যরা দেশ মাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রবাসীরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনমত গঠন এবং অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেন। সবচেয়ে গৌরবের বিষয় এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীর জন্মস্থান সুনামগঞ্জ জেলায়। আর মুক্তিযুদ্ধে মিত্র দেশগুলোর সমর্থন আদায় ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহযোগিতা ও সমর্থন আদায়ের জন্য প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধি হয়ে যিনি বিশ্ব দরবারে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সেই প্রধান রাজনীতিক জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ সুনামগঞ্জেরই কৃতি সন্তান। তিনি ঐ সময় জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়েছিল তার নেতৃত্ব দেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ জেলা ছিল ৫ নং সেক্টরের অধীনে। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী। সুনামগঞ্জের নেতৃবৃন্দ বালাট, মৈলাম, সেলা, মহেষ খাল

---

৮৪. *সুনামগঞ্জ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৮৫. *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি সীমান্ত ফাড়ি দিয়ে আশ্রয় শিবিরে একত্রিত হন। তারা প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের জন্য লোক বাছাই করতে শুরু করেন। এভাবে ব্যাচ ওয়াইজ ট্রেনিং হতে থাকে। ভারতের তোরা পাহাড় ছিল তাদের অন্যতম ট্রেনিং ক্যাম্প। আশ্রয় শিবির পরিচালনা, লোক বাছাই করে ট্রেনিং-এ পাঠানো এবং আশ্রয় শিবিরের শরণার্থীদের কাজে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলতাফ উদ্দিন আহমদ, আসদ্দর আলী চৌধুরী, আকমল আলী, আব্দুল বারী, খলিলুর রহমান চৌধুরী, মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, আফাস উদ্দিন, মতসিন আলী, দেওয়ান কামাল রেজা চৌধুরী, সৈয়দ দেলওয়ার হোসেন, সামরান আলী, নাজির বক্স, আলী ইউনুছ, আব্দুল লতিফ সর্দার, ডা. হারিছ উদ্দিন, হোসেন বখত, মদরিছ চৌধুরী, আকল মিয়া, আব্দুর রহমান প্রমুখ। সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলায় প্রায় ১১ হাজার মুক্তিযোদ্ধা সক্রিয়ভাবে এ মহান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে সক্রীয়ভাবে সুনামঞ্জের যারা এ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোলাম রব্বানী, বজলুল মজিদ চৌধুরী, বরকত আলী, মতিউর রহমান, সাব্বির আহমদ, সুধীর গৌরাঙ্গ, এবাদুর রহমান, আসদ্দর আলী, শামসুল হক, মালদার আলী, আব্দুল হাসিম, মনোয়ার বখত, শাহজাহান বখত, নাসির চৌধুরী, তালেব উদ্দিন আহমদ, মুজিবর রহমান চৌধুরী, সাধনভদ্র, কাজী বসির উদ্দীন, মানিক কোরাশী, আলী আমজদ, মালেক হোসেন পীর, কামাল মিয়া, তারা মিয়া, নওশাদ জসিম উদ্দিন, আমির হোসেন, বোরহান উদ্দিন, বাচ্চু চৌধুরী, আশ্রব আলী, নবাব মিয়া প্রমুখ।[৮৬]

সুনামগঞ্জ জেলাকে ৫নং সেক্টরের আওতায় ৪টি সাবসেক্টরে বিভিক্ত করা হয়েছিল। এগুলো হলো :

১. ভোলাগঞ্জ সাবসেক্টর : প্রথম দিকে এর অধিনায়ক ছিলেন কায়েস চৌধুরী, পরে এর নেতৃত্ব দেন লে. মো. তাহের উদ্দিন আখঞ্জি।
২. সেলা সাবসেক্টর : এর নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন এ. এস হেলাল উদ্দিন
৩. বালাট সাবসেক্টর : প্রথমে এর নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন, পরে এর নেতৃত্ব দেন মেজর এম. এ মুত্তালিব।
৪. টেকেরঘাট সাবসেক্টর : প্রথমে দায়িত্বে ছিলেন শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, পরবর্তীতে দায়িত্বে আসেন মেজর (অব.) মুসলিম উদ্দিন।

ছাতক আক্রমণের জন্য শহীদ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন 'জেডফোর্স'-এর অধীনস্থ তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন অধিনায়ক মেজর সাফায়েত জামিল ৫ নং সেক্টরে

৮৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।[৮৭] তৃতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের এই অংশে ৪টি কোম্পানি ছিল। সেগুলো হলো : ১. আলফা, ২. ব্রাডো, ৩. চার্লি, ৪. ডেল্টা। এই কোম্পানিগুলোর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন, ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, ক্যাপ্টেন মহসীন উদ্দিন আহমদ ও লে. নুরুন্নবী খান। এছাড়া আরও যারা এখানে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন তারা হলেন লে. মঞ্জুর ও লে. ফজলে হোসেন।[৮৮]

১৩ অক্টোবর রাতেই সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত নোয়ারাই গ্রাম ও সিমেন্ট কারখানা মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। সেখানে ক্যাপ্টেন আনোয়ার প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলেন। ১৪ অক্টোবর সকালে পাকিস্তানী বাহিনীর একটি লঞ্চ ছাতক যাবার পথে মুক্তিবাহিনী রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে তা ডুবিয়ে দিলে ৯ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর সাড়াশি আক্রমণে পাকিস্তানী সৈন্যরা সিমেন্ট কারখানা ছেড়ে ছাতকে পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন আনোয়ার সিমেন্ট কারখানায় অবস্থান নেন। এদিকে ক্যাপ্টেন মহসীন তখন দোয়ারা বাজার আক্রমণের উদ্দেশ্যে সুরমা নদী পার হচ্ছিলেন। দোয়ারা বাজারে পূর্ব থেকে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যরা তখন গুলিবর্ষণ শুরু করলে ক্যাপ্টেন মহসীন ও তার সহযোগী সৈন্যরা নৌকা থেকে মাঝ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ ঘটনায় ১৮জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এর দু'দিন পর ক্যাপ্টেন মহসীন ও এই ছত্রভঙ্গ কোম্পানীর জীবিত সৈন্যরা চেলায় ফিরে আসেন। অনুরূপভাবে গোবিন্দগঞ্জেও পাকিস্তানীদের প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ক্যাপ্টেন নবী ডাউকী সীমান্তের দিকে সরে যান। ফলে পাকিস্তানী সৈন্যরা সহজেই ছাতক ও দোয়ারা বাজার পৌঁছে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩০ ফ্রাটিয়ার ফোর্স ও ফন্টিয়ার ফোর্স কনস্টেবলারি দোয়ারাবাজার থেকে ছাতক সিমেন্ট কারখানা আক্রমণ করে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করে মুক্তিবাহিনী পিছু হটতে থাকে। এভাবে ছাতকের যুদ্ধ ১৩ অক্টোবর শুরু হয় ১৭ অক্টোবর শেষ হয়। এ যুদ্ধে সত্তরজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাকবাহিনীরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ অপারেশনে ১২জন নিহত ও চার শতাধিক পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়।[৮৯] মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ছাতক অপারেশন মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহস ও বীরত্বের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক রচিত 'Withness to Surrender' গ্রন্থে ছাতক অপারেশনের সবিশেষ উল্লেখ ও মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ পারদর্শিতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।[৯০]

---

৮৭. রুহুল ফারুক, *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সিলেট, ২০০৪, পৃ. ১৯৪

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৮৯. *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৩

৯০. মোহাম্মাদ আলী ইউনুছ, *মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ* (সুনামগঞ্জ : ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ জেলায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে সেলা সাবসেক্টরের অধীনে অপারেশন দূর্বিনটিলা, আধারটিলা, টেংরাটিলা ও পেপারটিলা (১৪.০৮.৭১), বালিউর যুদ্ধ, মহব্বতপুর যুদ্ধ, বেতুরার যুদ্ধ, জাউয়া ব্রিজ, ডাবর ফেরি অভিযান ও টেবলাই যুদ্ধ। বালাট সাবসেক্টরের অধীনে রাজাবাজার অপারেশন (সেপ্টেম্বর প্রথম সপ্তাহ), মুসলিমপুর অপারেশন (২০.০৮.৭১), বিরামপুর (২৭.০৭.৭১), কৃষ্ণতলা (২৭.৮.৭১), ভাদেরটেক (০৯.০৯.৭১), নলুয়া গুজাবিল (২৭.০৯.৭১), বালিউর (১২.১০.৭১), গনিগঞ্জ (০৭.১১.৭১), ভোলাগঞ্জ সাবসেক্টরের অধীনে গৌরীনগর অপারেশন, চানপুর অপারেশন এবং টেকেরঘাট সাবসেক্টরের অধীনে জামালগঞ্জ ও তাহিরপুর অপারেশন উল্লেখযোগ্য।[৯১]

জগন্নাথপুর থানার সিরামিশী গ্রামে ৩১ আগস্ট ১৯৭১ সালে সকাল ১০টার দিকে পাক হানাদারদের দেশীয় দালালরা পথ দেখিয়ে হানাদার বাহিনীকে এনে স্থানীয় হাইস্কুলের ভেতরে লুকিয়ে রেখে প্রচার চালায় যে, এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য স্কুলে সভা হবে। এ সভাতে অনেকেই সমবেত হয়েছিলেন। সমবেতদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক, মাওলানা, তহশীল অফিসের কর্মচারী, ইউপি সদস্যরাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সভা থেকে ছাত্র, যুবক, শিক্ষক জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারীসহ ১২৬ জন নিরীহ লোককে পিছন দিক দিয়ে বেঁধে নিয়ে জড়ো করা হয় স্থানীয় শহীদ নাজির মিয়ার পুকুর পাড়ে। অতঃপর বিনা অপরাধে তাদের সকলকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং ২৫০টি বাড়িঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্মিভূত করা হয়। অনুরূপ জগন্নাথপুর থানার রাণীগঞ্জ বাজারে রাজাকারদের সাহায্য নিয়ে হানাদার বাহিনী ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে ৩০ জন নিরীহ লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং বাজারে আগুন দিয়ে ১৫০টি দোকান-ঘর মালামালসহ পুড়িয়ে দেয়।[৯২] মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ জেলার প্রথম শহীদ হলেন আবুল হোসেন। তাঁর বাড়ি সদর থানার লালপুর গ্রামে। এ জেলা থেকে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদ্রিস আলী, মোঃ আব্দুল মজিদ ও মোঃ আব্দুল হালিমকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৯৩]

---

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৭

৯২. প্রাগুক্ত

৯৩. *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ধর্মীয় অবস্থার ক্রমবিবর্তন

জাতি, বর্ণ ও ভাষা

বাংলাদেশের অপরাপর জেলার লোকদের মতো সুনামগঞ্জ জেলার লোকদের রক্তের মধ্যে প্রটো অস্ট্রেলয়েড বা অস্ট্রিক জাতীয় লোকের রক্ত সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট আগমনের পরে আন্তভাষা বিবাহের কারণে তুর্কি, মোগল ও সেমেটিক রক্তের মিশ্রণ হলেও তা অতি নগণ্য ও সীমিত। সুনামগঞ্জ তথা বৃহত্তর সিলেটের পাল বা সেন রাজাদের আধিপত্যের কোন নিদর্শন নেই। সেন রাজাদের দ্বারা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার লোকদের আর্যকরণ যেভাবে হয়েছে বৃহত্তর সিলেটে সেভাবে হয়নি।

সুনামগঞ্জবাসীদের রক্তের মধ্যে গারো, কোচচ, কুকি, নাগা, মনিপুরী প্রভৃতি আসামী লোকদের রক্ত নেই বললেই চলে।[৯৪] সুনামগঞ্জে বিভিন্ন জাতি ও বংশের লোক একত্রিতভাবে বাস করে। জাতিগতভাবে হিন্দু ও মুসলমান এখানকার প্রধান অধিবাসী। তবে মুসলমানরাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এছাড়া স্বল্পসংখ্যক খ্রিষ্টান, খাসিয়া ও গারো জাতির বাস রয়েছে। জেলায় অল্পসংখ্যক উড়িষ্যা, মাদ্রাজি, দেশওয়ালী লোকের বাসও আছে, যারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে ঝাড়ুদার বা এ ধরনের ছোট কাজ করে আসছে, বিভিন্ন সময়ে এরা দেশত্যাগ করলেও আজো তাদের একাংশ এখানে রয়ে গেছে।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট আগমনের পরই এখানে মুসলমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া তাঁর সঙ্গীয় ৩৬০ আউলিয়ার কতিপয় এ জেলায় স্থায়ীভাবে আবাস গড়ার কারণে তাদের বংশধর সৃষ্টি হয়। এ জেলার সৈয়দ কামালী, কোরাশী প্রভৃতিরা উক্ত আওলিয়াদের বংশধর বলে দাবী করে থাকেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ৩৬০ সাথীর মধ্যে হযরত আলাউদ্দিন বাগদাদী আরওরঙ্গ-পুরের নিকটবর্তী সৈয়দপুর গ্রামে হযরত শাহকামাল শাহারপাড়া গ্রামে, হযরত শেখ কালু এবং সৈয়দ আহমদ পীরের গাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন। এ সমস্ত গ্রামে তাদের বংশধরেরা এখানো আছেন। দাওয়াই নামক টিলার উপর হযরত দাওর বকস খতিব এবং সৈদের গাঁও গ্রামে হযরত ইউসূফ ইরাকীর মাজার রয়েছে। জগন্নাথপুরের সৈয়দপুর গ্রামে এসেছিলেন ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ সৈয়দ শামসুদ্দিন। ইনি হযরত আলী (রা.)-এর একজন অধঃস্তন বংশধর। সৈয়দপুর গ্রামের অধিকাংশ সৈয়দরাই তাঁর বংশধর বলে দাবি করে থাকেন। হযরত শাহ শামসুদ্দিন

---

৯৪. দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

কোরেশীর দুই বংশধর সোনাত্যা থেকে সৈয়দপুর গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। সৈয়দপুর গ্রাম ও আশপাশ এলাকায় তাদের বংশধর রয়েছে।[৯৫]

সুনামগঞ্জ জেলায় বহু প্রচীন অভিজাত প্রাক্তন জমিদার পরিবার রয়েছে। প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকর হওয়ার পর এদের অধিকাংশ বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গেলেও তাদের অনেক পরিবার এখনও আধুনিক শিক্ষা, রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা তাদের প্রভাব বহাল রেখে চলেছেন। ভাটিপাড়া, পাইলগাঁও, সিংচাপইড়, সেলবরষ, বীরগাঁও, দোহালিয়া, লক্ষণশ্রী প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারগণের এককালে খুব নামডাক ছিল। তাদের বংশধর এসব এলাকায় এখানো তাদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে বেশিরভাগই ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর তাদের আত্মমর্যাদা রক্ষা ও প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের একাংশ অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এ সমস্ত অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। মূল ভূখণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার এ সম্প্রাদায়ের মূলধারা। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট বিজয়ের পর এদের অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর ১৯৪৭ এর দেশবিভাগ ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন কারণে এদের অনেকে এ দেশ ত্যাগ করলে স্বাভাবিক কারণে তাদের বাকীদের পূর্ব প্রতাপ ক্ষুণ্ন হয়। তথাপি অনেক পরিবার তাদের দীর্ঘ ঐতিহ্যসহ এখনও সগর্বে নিজ ধর্মে নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করছেন। তবে শিক্ষা দীক্ষায় এরা বরাবরই মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসরমান ছিলেন।

বৃহত্তর সিলেটের অংশ হলেও সুনামগঞ্জ জেলার অধিবাসীদের উপভাষা বৃহত্তর সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের উপভাষা থেকে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আবার সুনামগঞ্জ জেলার সমগ্র অঞ্চলের ভাষা ও উচ্চারণ এক রকম নয়। যেমন ছাতক সদর এর উচ্চারণ সিলেট-এর মত, ধর্মপাশার উচ্চারণ ময়মনসিংহের মত আবার শাল্লা এলাকার উচ্চারণ হবিগঞ্জের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত।[৯৬] সুনামগঞ্জের উপভাষায় অপিনিহিতির প্রভাব খুব বেশি। শব্দের মাঝে ‘ই’ বা ‘উ’ থাকলে সে ‘ই’ বা ‘উ’ কে আগে উচ্চারণ করার রীতিকে বলা হয় অপিনিহিত। যেমন আজ–আইজ, রাত–রাইত ইত্যাদি। ‘ক’ ‘প’ প্রভৃতি অল্প প্রাণ শব্দগুলো এখানে প্রায় ‘খ’ ‘ফ’ প্রভৃতি মহাপ্রাণ শব্দরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন পানি–ফানি, কড়ি–খড়ি, পান–ফান ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত ধ্বনি যোগ করেও শব্দকে উচ্চারণ করা হয়। যেমন ভাল–ভালা, কালো–কালা, লম্বা–লাম্বা ইত্যাদি। উর্দু, ফার্সী ও আরবীর প্রভাবও এ অঞ্চলের ভাষায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আছে। যেমন ‘আযরাম’ উর্দু ‘আরহা হে হাম’। গারো, খাসিয়া ও কুলিরা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। পাশাপাশি স্থানীয় ভাষাও তাদের আয়ত্বে

৯৫. *জালালাবাদের কথা*, প্রাগুক্ত।

৯৬. মুহাম্মাদ আসাদ্দর আলী সম্পাদিত, *সিলেট একাডেমি পত্রিকা*, সিলেট, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে পুরোপুরি। সুনামগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা এতো বেশি সমৃদ্ধ যে, এক অঞ্চলের একাধিক শব্দ ও টান এক মাইল সীমার মধ্যে ভিন্নতর শোনা যায়। তবে এ অঞ্চলের ভাষা বাইরের লোকদের বুঝতে সময় লাগে না। উচ্চারণও মোটামুটি মার্জিত ও কোমল যা অত্যন্ত শ্রুতিমধুরও বটে।

সুনামগঞ্জের গারো সম্প্রদায়

সুনামগঞ্জের গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এখানকার একটি আদি ও অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যরা এ দেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তাদের সাথে আদিম অধিবাসীদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরবর্তীতে এ আদিম সম্প্রদায় অনার্য বলে পরিচয় লাভ করে। আর্য-অনার্য যুদ্ধে অনার্যরা পরাজিত হয়ে বনে-জঙ্গলে ও পর্বতগুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কালক্রমে সে সমস্ত গহীন বনারণ্যকে তারা তাদের আবাসভূমিতে পরিণত করে। এরা স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা-দীক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। এদের গায়ের রং ছিল ময়লা, নাসিকা ছিল চেপ্টা। বর্তমান গারো সম্প্রদায়কে এদের বংশোদ্ভূত বলে গণ্য করা হয়।[৯৭] পাক-ভারত উপমহাদেশে অনার্যদের বাসস্থান রয়েছে পর্বত ও জঙ্গলে। বাংলাদেশের গারো পাহাড়, লুসাই পাহাড়, খাসিয়া পাহাড় ও ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরায় এদের ব্যাপক বাস। গারোরা মূলত গারো পাহাড়ের বাসিন্দা ছিল। আর্যদের শ্যেন দৃষ্টির অগোচরে এরা গহীন জঙ্গলে চলাফেরা করত। আজো তারা কোলাহল বর্জিত জীবন অর্থাৎ পর্বত, পাহাড় ঘেষেই বসবাস করতে আগ্রহী। তাদের বসবাসের ফলে গহীন জঙ্গল এখন অনেকটা আবাদ ও সমতল হয়ে গেছে। এভাবে তারা বর্তমান সমাজের একাংশ হয়ে আছে। সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে এদের বসবাস রয়েছে। সুনামগঞ্জের বিশম্ভরপুর থানা, সদর থানা, তাহিরপুর ও ছাতক থানার একাংশেও এরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এরা অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও নিরীহ প্রকৃতির নাগরিক। এরা বাঁশ ও কাঠের মাচা দিয়ে একসময় বাসগৃহ নির্মাণ করলেও এখন বৃহৎ সমাজের মতো তারাও বাড়িঘর তৈরি করছে। ঘরের সাথে তারা পাকের ঘর, শুকরের ছোট ছোট খোয়ার তৈরি করে বাড়ি নির্মাণ করে। বারান্দাকে তারা সাধারণত বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করে। সুনামগঞ্জে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে হাজং, মনিপুরী, কুচ, বানাই ও হাদি সম্প্রদায়েরও বসবাস রয়েছে। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়ণতলা, আশউরা গ্রামে এসব সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনো বসবাস করছেন। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার কাইতকোনা, কালীপুর, আমড়াপাড়া, রাজাপাড়া, গামাইরতলা, গোলগাও, আছুকোনা ও দিগলবাগ এলাকায় হাজং, মনিপুরি ও গারো সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। তাহিরপুর উপজেলার কাকইগড়া, রাজাই, লালঘাট, মাঝটিলাতে গারো ও হাজং সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে। দোয়ারাবাজার উপজেলার ছনবাড়ি ও ধনীটিলা

---

৯৭. *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

এবং বাজারগাঁও গ্রামে মনিপুরী সম্প্রদায়ের একাধিক পরিবার রয়েছে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর আলাদা নিয়ম-কানুন রয়েছে। এদের বিয়ে-শাদিও আলাদা ধরনের। মনিপুরী, হাজং, বুকবানাই সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের। কিছু সংখ্যক খ্রিষ্টানও রয়েছে যার বেশির ভাগ প্রটেস্টেন্ট, কেথলিক নেই বললেই চলে। ইদানিং প্রটেস্টেন্টরা বিদেশী নির্ভরতার কারণে আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছেন। খাসিয়ারা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালিত। মা-ই তাদের পরিবারের কর্তা। এরা কোন সম্পত্তির মালিক হয় না। পুরুষদের বিয়ে হলে তারা শ্বশুর বাড়ি চলে যেতে হয়। এদের সাংস্কৃতিক জীবনও বেশ জমজমাট। এরা আনন্দ, বিবাহ ও উৎসবে নৃত্যগীত করে থাকে। তাদের গান তাদের ভাষায় রচিত। তবে এগুলোর সুর বেশ মিষ্টি। এরা সব সময় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। গোষ্ঠী প্রধানই তাদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এদের অনেকেই এখন স্থানীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন।[৯৮]

---

৯৮. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পদ ও সম্ভাবনা

প্রকৃতির অফুরন্ত দানে সমৃদ্ধ সুনামগঞ্জ জেলা। এর একই অঙ্গে আছে নানা মূল্যবান রত্নালঙ্কার। এ জেলায় রয়েছে সিমেন্ট তৈরির চুনাপাথর, কাঁচ তৈরির উপযোগী সিলিকা (বালু), জ্বালানী গ্যাস, কাগজের মণ্ড তৈরির উপযোগী নল খগড়া, মাছে পরিপূর্ণ হাওর, নদী-নালা ও খাল-বিল। এতে রয়েছে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক। মনিপুরী মেয়েরা হাতে তৈরি করে চাদর, কাপড় ও শাল। যেগুলোর বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এখানে আরো আছে অফুরন্ত চুন, বালি, পাথর, বোল্ডার ও কয়লা। এ কারণেই সুনামযুক্ত সুনামগঞ্জের নাম স্বার্থকতা লাভ করেছে। এটি নামে ও সম্পদে সমৃদ্ধ সীমান্ত সংলগ্ন একটি জনপদ। এ জনপদে ছড়িয়ে থাকা সম্পদগুলো শুধু জেলার নয়, সমগ্র দেশের অর্থনীতির জন্য একটি স্তম্ভ স্বরূপ। এ সম্পদের যথাযথ আহরণ ও ব্যবহার হলে এগুলো জাতীয় সম্পদ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পদে পরিণত হতে পারে। যার বিনিময়ে অর্জিত হতে পারে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা, এতে হতে পারে হাজারও শ্রমিকের কর্মসংস্থান। এ জেলায় রয়েছে দেশের দু'টি সিমেন্ট কারখানা। তন্মধ্যে একটি সরকারী (ছাতক সিমেন্ট কারখানা), অপরটি বেসরকারী উদ্যোগে সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে (আইনপুর সিমেন্ট ফ্যাক্টরী)। টেকেরঘাটে রয়েছে মূল্যবান চুনাপাথরের খনি ও উত্তোলন কেন্দ্র। বেসরকারী উদ্যোগে শত শত চুনাপাথরের চুল্লি (পাজুয়া)ও ইদানিং নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া এ জেলায় রয়েছে ক্লিংকার ফ্যাক্টরী, টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড, কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানা এবং মণ্ড তৈরির উপযোগী কাঁচামাল তথা নল ও খগড়া। কাঁচ তৈরির উপযোগী বালু, কয়লা, নুড়ি ও বোল্ডার পাথর। মাছ এখানকার অন্যতম সম্পদ। অসংখ্য হাওরে ও বিলে শতাধিক প্রজাতির মাছ এ জেলাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। টেকেরঘাট এলাকায় ইউরোনিয়াম এর মত মূল্যবান উপাদান রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ সম্পদের যথার্থ অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহারের সার্বিক কোন পরিকল্পনা নেই বললেই চলে। যে যেভাবে পারছেন এ সম্পদকে ব্যবহার করছেন এবং অপচয় করছেন। এ অমূল্য সম্পদ রক্ষায় সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য।

ইতিহাসের গতিধারায় সুনামগঞ্জ

১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	মবারক দৌলা মালিক লাউড়ের উজির নিযুক্ত হন।
১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	খাসিয়া কর্তৃক সেলবরষ, রামদীঘা ও বংশীকুণ্ডা পরগনা আক্রমণ ও ৩০০ লোক হত্যা।
১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ	:	দশসনা বন্দোবস্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৭৮৮-৯০ খ্রিষ্টাব্দ	:	হস্তবোধ জরিপ
১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ	:	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	ছাতকে ইংলিশ কোম্পানি স্থাপন
১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ	:	মরমী কবি রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থের জন্ম
১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	মরমী কবি হাছন রাজার জন্ম
১৮৬০-৬৬ খ্রিষ্টাব্দ	:	যাকবন্দোবস্ত জরিপ
১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ	:	প্রথম আদম শুমারী
১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	বৃহত্তর সিলেট জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্তকরণ
১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	সুনামগঞ্জ মহাকুমা স্থাপন
১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ	:	সুনামগঞ্জ সদর থানা স্থাপন
১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	সরকারী জুবিলী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা
১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	ভয়াবহ ভূমিকম্প
১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ	:	গৌরিপুর জমিদার কর্তৃক ছাতকের ইংলিশ কোম্পানী ক্রয়
১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ	:	বঙ্গভঙ্গ
১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ	:	বঙ্গভঙ্গ রদ
১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ	:	মরমী কবি রাধা রমণ দত্তের মৃত্যু
	:	বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমের জন্ম
১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ	:	শাল্লা থানা স্থাপন ও সুনামগঞ্জ পৌরসভা প্রতিষ্ঠা
১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ	:	মরমী কবি দুর্বিন শাহ এর জন্ম
১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ	:	মরমী কবি হাছন রাজার মৃত্যু এবং ছাতক ও জগন্নাথপুর থানা স্থাপন
১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ	:	সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন
১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ	:	জামালগঞ্জ থানা স্থাপন ও ছাতক সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠা
১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ	:	তাহিরপুর, দিরাই, ধর্মপাশা থানা স্থাপন
১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	সুনামগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ	:	সাধারণ নির্বাচন
১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	গণভোট ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম
১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ	:	পূর্ব বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন প্রনয়ণ ও জমিদারী প্রথার বিলোপ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও ছাতকে রেললাইন প্রতিষ্ঠা
১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ	:	মহকুমা আইনজীবি সমিতি প্রতিষ্ঠা
১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ	:	সুনামগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা
১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ	:	সুনামগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা
১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ	:	স্বাধীনতা লাভ
১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ	:	বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার ও মধ্যনগর থানা স্থাপন
১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	সুনামগঞ্জ অফিসার্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা
১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	সুনামগঞ্জ মহাকুমা জেলায় উন্নীত
১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	:	সিলেট বিভাগের কার্যক্রম শুরু
২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানা স্থাপন।

সুনামগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

ছবির মত সুন্দর এবং বৈচিত্রময় সুনামগঞ্জ জেলা। এই জেলায় অনেক ঐতিহাসিক মনোরম নয়নাভিরাম দর্শনীয় স্থান রয়েছে। তন্মধ্যে শাহ আরেফিনের মাকাম, টেকেরঘাট চুনাপাথর খনি প্রকল্প, পনাতীর্থ স্থান তাহিরপুর, যাদুকাটা নদী, শনির হাওর, হাসান রাজা মিউজিয়াম, সুখাইড় জমিদার বাড়ি, গৌরারং জমিদার বাড়ি, নারায়ণতলা, উলুরা শহীদদের সমাধি সৌধ, পাগলা মসজিদ, পাইলগাও জমিদার বাড়ি, টাঙ্গুয়ার হাওর, সুনামগঞ্জ ঐতিহ্য যাদুঘর, বারিক্কা টিলা, বর্ডার হাট, জর্জ ইংলিশ টিলা, রোপওয়ে বাংকার, ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি, শিমুল বাগান, কোয়ারি-ল্যাইমস্টোন লেক, টেকেরঘাট, লাউড়ের গড়, টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড, দোহালিয়া জমিদার বাড়ি, টাউন জামে মসজিদ, সৈয়দ উমেদ হারুন বোগদাদী (রহ.)-এর মাজার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কতিপয় ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদানের প্রয়াস পাবো।

১. **হযরত শাহ আরেফিনের মাকাম :** হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সঙ্গী হলেন হযরত শাহ আরেফিন (রহ.), যাকে বলা হতো জিন্দা পীর। যার অসংখ্য কারামত আজো মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। হযরত শাহ আরেফিন (রহ.)-এর মূল আস্তানা ভারতের খাসিয়া পাহাড়ে হলেও সীমান্ত সংলগ্ন সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে তার সরব পদচারণা ছিল। বর্তমান যাদুকাটা নদীর তীরবর্তী পাহাড়ের পাদদেশে যে জায়গায় তাঁর মাজার সে জায়গাটা অনেকটা ঢালু ও পিচ্ছিল। হাজারো ভক্তবৃন্দ প্রতিনিয়ত জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তার মাজারে আসেন। প্রতিবছর একবার এখানে ওরস

Dhaka University Institutional Repository

হয়। লাউড় রাজ্যের মাটি ও মানুষের কল্যাণে তিনি ধর্ম পালন করে গেছেন আর পাশাপাশি দীক্ষা দিয়েছেন তাঁর শিষ্যদের। এসব কারণে আজো ওরসের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করা হয়। ওরসের সময় বিজিবি-বিএসএফের সমঝোতায় ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। তাঁর মাকামে এখনো তার স্মৃতি বিদ্যমান আছে। যেমন ৭টি কুয়া, সুড়ঙ্গ পথ, পাথরের উপর নামাজ পড়ার পদচিহ্ন প্রভৃতি।[৯৯] ভক্তবৃন্দ এ সব স্মৃতি চিহ্ন অবলোকনে আপ্লুত হন এবং তাঁকে গভীরভাবে স্মরণ করেন ও দু'আ করেন।

২. **টেকেরঘাট চুনাপাথর খনি প্রকল্প :** তাহিরপুরের টেকেরঘাটে চুনা পাথরের প্রাকৃতিক ভাণ্ডারে রয়েছে এক অপরূপ সৌন্দর্য। বিচিত্র উপায়ে চুনাপাথর সংগ্রহের পদ্ধতি সত্যই বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকরও বটে। সিমেন্ট শিল্পের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই চুনাপাথরকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে গ্রামীণ আবহে পাহাড়ী খনি অঞ্চল। একদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের মধ্য থেকে চুনাপাথর সংগ্রহ প্রক্রিয়ার আধুনিক আয়োজন, অন্যদিকে বিশাল বিস্তৃত হাওর। দিগন্তে মেশা সবুজ ধানের মাঠ সত্যিই প্রকৃতির সাজানো এক মনোরম আঙ্গিনা। চুনাপাথর শিল্পকে ঘিরে টেকেরঘাটের মানুষের জীবনযাত্রায়ও এসেছে ভিন্নতা। সাধারণত প্রতিবছর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চুনাপাথর সংগ্রহের কাজ চলে। টেকেরঘাটের বড়ছড়া দিয়ে কয়লা আমদানী করা হয়ে থাকে ভারত থেকে। প্রতিবছর ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা আমদানি হচ্ছে এই শুল্ক স্টেশন দিয়ে। ভারতের পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ী অধিবাসীদের কয়লা আহরণ পদ্ধতি, বিচিত্র জীবনধারা সত্যিই চমৎকার ও বিস্ময়কর। এখানে রয়েছে কেয়ারী-লাইমস্টোন লেক যা বাংলাদশের কাশ্মীর নামে পরিচিত। অনেকে আবার এটাকে নীলাদ্রি লেক নামেও ডাকেন। টেকেরঘাট চুনাপাথরের পরিত্যক্ত খনির এই লাইমস্টোন লেকের পানির রং এতটাই নীল এবং এর প্রকৃতির মায়াবী রূপ মুহূর্তেই আচ্ছন্ন করে যে কাউকে। মাঝের টিলাগুলো আর ওপারের পাহাড়ের নিচের অংশটুকু বাংলাদেশের শেষ সীমানা। এই লেকটির এক সময় চুনাপাথরের সাপ্লাই ভাণ্ডার ছিল যা এখন বিলীন।

৩. **পনাতীর্থ স্থান তাহিরপুর :** হিন্দুধর্মের সাধক পুরুষ অদ্বৈত মহাপ্রভুর মা লাগ দেবীর গঙ্গা স্নানের ইচ্ছা পূরণার্থে অদ্বৈত মহাপ্রভু যোগসাধনা বলে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পুণ্য জল এক নদীতে এক ধারায় প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। এই জলধারাই পুরনো রেনুকা নদী বর্তমানে যা যাদুকাটা নদী নামে প্রবাহিত। তাহিরপুর উপজেলায় এই নদীর তীরে পনাতীর্থে প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ

---

৯৯. *সুনামগঞ্জ জেলার অজানা ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তাহে বারুণী মেলা হয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুণ্যার্থীরা পুণ্য লাভের প্রত্যাশায় স্নান করতে আসেন এ মেলায়। অনেক মুসলমানও এই মেলা দেখার জন্য পনাতীর্থে যান।

৪. **হাছন রাজা মিউজিয়াম :** সুনামগঞ্জ পৌরসভা এলাকার তেঘরিয়ার সুরমা নদীর কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে হাছন রাজার স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি। এ বাড়িটি সুনামগঞ্জের একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। হাছন রাজা ছিলেন মূলত একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার, মরমী সাধক। হাছন রাজা জীবনে অসংখ্য গান রচনা করে আজ অবধি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছেন। তিনি মরমী ভাবধারা গানের পথিকৃৎ। কালোত্তীর্ণ এ মহাপুরুষ সাধকের ব্যবহৃত কুর্তা, খড়ম, তরবারি, পাগড়ী, ঢাল, থালা, বই ও নিজের হাতের লেখা কবিতা ও গানের পাণ্ডুলিপি আজও বহু দর্শনার্থীদের আপ্লুত করে। এই মরমী কবির রচিত গানে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাছন রাজাকে পত্রের মাধ্যমে অভিনন্দন ও প্রশংসা জানিয়েছেন।[১০০]

৫. **নারায়ণতলা :** সুনামগঞ্জ উপজেলার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে নারায়ণতলা ও এর আশেপাশের অঞ্চল। শহর থেকে ১২ কি.মি দূরে একদম সীমান্ত ঘেষে মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে এর অবস্থান। নারায়ণতলা যে শুধু সৌন্দর্যর দিক থেকে অনবদ্য তা কিন্তু নয়, ঐতিহাসিক দিক দিয়েও এ স্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, নারায়ণতলার ভালুকায় বৃক্ষরাজীর শীতল ছায়াতলে ৪৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। মুক্তিযুদ্ধে বালাট সাব-সেক্টরের অধীন সম্মুখ সমরে শহীদ এ বীর যোদ্ধাদের মাজারে শ্রদ্ধা জানাতেও অসংখ্য দর্শনার্থী প্রতিদিন এখানে ভিড় জমায়। তাছাড়া নারায়ণতলার মুগাইর পাড় গ্রামটি গারো অধ্যুষিত হওয়ায় গারো সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও ঐতিহ্য জানার জন্যও তা বিখ্যাত। এখানে রয়েছে স্যার টমাসের গির্জাসহ খ্রিস্টান মিশনারী পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এছাড়া ডলুয়ার পাশ ঘেষে বয়ে চলা চলতি নদীও পর্যটকদের জন্য বেশ আকর্ষণীয়। চলতি নদীর তীরবর্তী বিশাল বালুকাময় প্রান্তরকে মনে হয় বেলাভূমি। সব মিলিয়ে নারায়ণতলার সৌন্দর্য অনবদ্য।

৬. **পাগলা মসজিদ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ :** সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের পার্শ্বে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পাগলা নামক স্থানে মহাসিং নদীর তীরে পাগলা মসজিদ অবস্থিত। মূলত অপূর্ব নির্মাণশৈলী ও অসাধারণ কারুকাজের জন্য এই মসজিদটি বিখ্যাত। এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি স্থাপত্য শিল্প। এলাকার ব্যবসায়ী ইয়াসীন মির্জা ব্যবসার কাজে ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য জায়গার স্থাপত্যশৈলী দেখে এ মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯৩১ সালে নির্মাণ কাজ শুরু

---

১০০. *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে টানা ১০ বছর এর নির্মাণ কাজ চলে। এর প্রধান মিস্ত্রি আনা হয় কলকাতা থেকে। দোতলা মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার, প্রস্থ ৫০ মিটার, গম্বুজের উচ্চতা ২৫ ফিট, দেয়ালের পুরত্ব ১০ ফিট।[১০১] মসজিদের ৩টি গম্বুজ ও ৬টি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। মসজিদের দোতলার ছাদে রেললাইনের স্লিপার ব্যবহার করা হয়েছে। দোতলার অভ্যন্তরীণ দেয়ালের বিভিন্ন নকশা, গম্বুজের ভিতরের নকশায় দামী পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য মহাসিং নদীর সাথে এর সংযোগ স্থাপন করা হযেছে। মসজিদ প্রাঙ্গনের নদীঘাট মনে হয় মসজিদেরই একাংশ। এলাকায় মসজিদটি 'রায়পুর বড় মসজিদ' নামেও পরিচিত। তার সুন্দর গম্বুজ বহু দূর থেকে সবার দৃষ্টি কাড়ে। মসজিদটি অবলোকনে যে কোনো দর্শনার্থীরই মন প্রাণ ভরে যায়।

৭. **টাঙ্গুয়ার হাওর :** বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত একটি হাওর। প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এ হাওর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মিঠা পানির জলাভূমি। স্থানীয় লোকজনের কাছে হাওরটি নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল নামেও পরিচিতি। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার স্থান। প্রথমটি সুন্দরবন। জেলার ধর্মপাশা ও তাহিরপুর উপজেলার মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে হাওরটির অবস্থান। মেঘালয় পাহাড় থেকে ৩০টিরও বেশি ঝরা (ঝরণা) এসে মিশেছে এই হাওরে। দুই উপজেলার ১৮টি মৌজায় ৫১টি হাওরের সমন্বয়ে ৯৭২৭ হেক্টর এলাকা নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওর জেলার সবচেয়ে বড় জলাভূমি। পানিবহুল মূল হাওর ২৮ বর্গকিলোমিটার এবং বাকি অংশ গ্রামগঞ্জ ও কৃষিজমি। এক সময় গাছ-মাছ-পাখি আর প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্রের আধার ছিল এই হাওর। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গুয়ার হাওরকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখনই অবসান হয় দীর্ঘ ৬০ বছরের ইজারাদারির। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি এই হাওরকে 'রামসার স্থান' (Ramsar Site) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। হাওর এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ড সরকারের মধ্যে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর থেকে হাওরের নিয়ন্ত্রণ নেয় জেলা প্রশাসন। শীত মৌসুমে পানি শুকিয়ে গেলে এখানকার প্রায় ২৪টি বিলের পাড় (স্থানীয় ভাষায় কান্দা) জেগে উঠলে শুধু কান্দার ভিতরের অংশেই আদি বিল থাকে। আর শুকিয়ে যাওয়া অংশে স্থানীয় কৃষকরা রবিশষ্য ও বোরো ধানের আবাদ করেন। বর্ষার থৈথৈ পানিতে নিমগ্ন হাওরের জেগে থাকা উঁচু কান্দাগুলোতে আশ্রয় নেয় পরিযায়ী পাখিরা, রোদ পোহায়, ডানা ঝাপ্টায়, জিরিয়ে

১০১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নেয়। কান্দাগুলো এখন আর দেখা যায় না বলে স্থানীয় এনজিও ও সরকারী ব্যবস্থাপনায় সেখানে পুঁতে দেয়া হয়েছে বাঁশ বা কাঠের ছোট ছোট বিশ্রাম দণ্ড। টাঙ্গুয়ার হাওর প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ। এ হাওর শুধু একটি জল মহাল বা মাছ প্রতিপালন, সংরক্ষণ ও আহরণের স্থান নয়; এটি একটি মাদার ফিশারী। হিজল করচের দৃষ্টিনন্দন সারি এ হাওরকে করেছে মোহনীয়। এছাড়াও নলখাগড়া, দুধিলতা, নীল শাপলা, পানি ফল, শেলা, হেলঞ্চা, শতমূলি, শীতলপাটি, স্বর্ণলতা, বনতুলসী ইত্যাদিসহ প্রায় দু'শ প্রজাতির বেশি গাছ-গাছালী রয়েছে এ প্রতিবেশ অঞ্চলে। বর্তমানে এ হাওরে রয়েছে ছোট-বড় ২০৮ প্রজাতির পাখি, ৩৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬ প্রজাতির কচ্ছপ, ৭ প্রজাতির গিরগিটি, ১৪০ প্রজাতির মাছসহ নানাবিধ প্রাণীর বসবাস, যা হাওরের জীববৈচিত্রকে করেছে ভরপুর।[১০২] বর্তমানে শীত মৌসুমে অতীত সকল রেকর্ড ভেঙ্গে ব্যাপক পাখির আগমন ও অবস্থানে মুখরিত হয় টাঙ্গুয়ার হাওর। টাঙ্গুয়ার হাওর মাছ, পাখি ও উদ্ভিদের পরস্পর নির্ভরশীল এক অনন্য ইকোসিস্টেম। মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা এমনকি বিদেশী পর্যটকরাও প্রায়শই টাঙ্গুয়ার হাওর পরিদর্শনে আসেন।

৮. **শিমুল বাগান :** শিমুল বাগান যা একশ বিঘার বেশি জায়গা জুড়ে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে যাদুকাটা নদীর তীরে অবস্থিত। বসন্তের দুপুরে পাপড়ি মেলে থাকা শিমুলের রক্তিম আভা মন রাঙ্গায়, ঘুম ভাঙ্গায় সৌখিন হৃদয়ের। এ যেন কল্পনার রঙে সাজানো এক শিমুলের প্রান্তর। ওপারে ভারতের মেঘালয় পাহাড়, মাঝে যাদুকাটা নদী আর এ পাড়ে শিমুল বন। সব মিলে মিশে গড়ে তুলেছে প্রকৃতির এক অনবদ্য কাব্য। ২ হাজার ৪০০ শতক জমিতে ১৪ বছর আগে শুধু সৌখিনতার বসে এই শিমুল বাগান গড়ে তোলেন জয়নাল আবেদীন নামে স্থানীয় এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। বসন্ত এলে যখন একসাথে দু হাজার গাছ ফুলে ফুলে ভরে উঠে তখন এর সৌন্দর্য কল্পনাকেও হার মানায়। ফাল্গুনের শুরুতে দলে দলে পর্যটক ভিড় জমান এ শিমুল বাগানে।

৯. **গৌরারং জমিদার বাড়ি :** গৌরারং জমিদার বংশের আদি পুরুষ নিধিরাম সুরমা নদীর পশ্চিম দিকে গৌরারং গ্রামে প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে তৈরি করেন সুরম্য জমিদার প্রাসাদ। এ বংশের নগেন্দ্র চৌধুরী সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তার ভূমিকার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। গৌরারং এর জমিদার প্রাসাদে দেখার মতো রঙ মহল, বাঁধাই করা বিরাট পুকুর ঘাট, অন্ধকূপ, যাত্রামঞ্চ যে কোনো পর্যটককেই মুগ্ধ করে।

---

১০২. *সুনামগঞ্জ জেলার অজানা ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

১০. **দোহালিয়া জমিদার বাড়ি :** ইটার বৎস্য গোত্রীয় রাজা সুবিদ নারায়ণের বংশদ্ভূত জনৈক বাসুদেব দোহালিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। এ বংশের জনৈক মহেশ্বর নামক ব্যক্তি খাসিয়া রাজা ধনুরাজের কাছ থেকে অবৈধ দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করে দোহালিয়ায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দোহালিয়ার জমিদার কুশল রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বার বার কোম্পানী বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন। এই পরগণা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এ বংশের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অন্যতম। মরমী কবি ও জমিদার হাছন রাজার পরিবারের সাথে দোহালিয়ার জমিদার পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। দোহালিয়া জমিদার বাড়িতে এখনো স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে অবশিষ্ট আছে কাঠের তৈরি দু'তলা বাড়ি, একটি চুনসুরকির তৈরি শতবর্ষীয় প্রাচীন মসজিদ ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন।

১১. **রোপওয়ে বাংকার :** ছাতক শহরের একপ্রান্তে সুরমা নদী ঘেষে রেল স্টেশনের সীমানায় বাংলাদেশ রেলওয়ের অন্যতম প্রকল্প 'রোপওয়ে বাংকার', যা ছাতককে দিয়েছে অনন্য মর্যাদা। উক্ত স্থানে রোপওয়ে প্রকল্পের রিগের উপর দিয়ে মোটা তার ধরে আছে দুই টনের বাকেট। একাধারে বাকেটগুলো তার বাহিত হয়ে দশমাইল দূরত্বের ভোলাগঞ্জ চলে যায়। আবার পাথর, মানুষ ও মালামাল নিয়ে ফিরে আসে। বাকেটে চড়ে তার ঝুলে প্রায় বিশ ফুট উপর থেকে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করা যায়। এই প্রকল্পকে আরো সম্প্রসারিত করে পরিকল্পনা মাফিক সাজাতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

১২. **সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, পেপার মিল :** একমাত্র পুরাতন সিমেন্ট ফ্যাক্টরী হিসেবে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী বাংলাদেশের মধ্যে পরিচিত ও সর্বজনবিদিত। সুরমা নদীর পাড় ঘেষে প্রতিষ্ঠিত ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী এবং পেপার মিল। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের কারণে ছাতক শিল্প নগরীর মর্যাদা লাভ করেছে। এ মিল দু'টিতে আধুনিক সরঞ্জামাদি, রাসায়নিক ল্যাবরেটরি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তার তথা শিল্পের উন্নয়নের জন্য সহায়ক জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব।

১৩. **রাধারমণের সমাধি-সৌধ :** এটি জগন্নাথপুর উপজেলার কেশবপুর গ্রামে অবস্থিত। দু হাজারের অধিক গানের রচয়িতা মরমী কবি রাধারমণের জন্মস্থান ও তাঁর সমাধি-সৌধ এখানে রয়েছে। হাজার হাজার পর্যটক প্রতিবছর শিকড়ের সন্ধানে রাধারমণের সমাধি সৌধ পরিদর্শন করেন।

১৪. **ধলমেলা :** দিরাই থানার ধল গ্রামে শাহ আব্দুল করিমরে জন্ম ১৯২১ সালে। শাহ আব্দুল করিম একজন খ্যাতনামা গায়ক ও বাউল। তার গলার সুর যেমন মিষ্টি তেমনি তার গানে রয়েছে গভীর

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্দৃষ্টি। আর এতে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নিজের অতি কাছের বিষয় ও উপমা। এজন্য আসল পল্লীর সুর তার গানে ও কথায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। তার স্মরণে প্রতিবছর তার গ্রামে যে মেলা হয় তাই ধলমেলা হিসেবে খ্যাত। এ মেলায় সমগ্র দেশ থেকে প্রতিবছর সঙ্গীতানুধ্যায়ী তার ভক্তবৃন্দসহ অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়।

১৫. **সৈয়দ উমেদ হারুন বোগদাদী (রহ.)-এর মাজার :** সুনামগঞ্জ পৌর এলাকার মোহাম্মাদপুর গ্রামে সৈয়দ উমেদ হারুন বোগদাদী (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। উক্ত মাজারটি মোহাম্মাদপুর মোকাম নামেও পরিচিত। তিনি ১২৩০ বাংলা সনে ইন্তিকাল করেন।[১০৩] মোহাম্মাদপুর গ্রামের একপাশে শান্ত, সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে এই মহান বুযুর্গ চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। প্রতিদিন অসংখ্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সঙ্গী এ মহান সাধকের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় তার মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হন।

সুনামগঞ্জের এসব ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থাপনা সত্যিকার অর্থেই সুনামগঞ্জকে বাংলাদেশের মধ্যে যেমন দিয়েছে ভিন্ন পরিচিতি তেমনি সুনামগঞ্জ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ঐতিহ্যবাহী অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত এক অনন্য জনপদে।

১০৩. *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : প্রকৃতি ও পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও পরিধি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন আমলে সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা ও সংস্কৃতি : প্রকৃতি ও পরিচয়

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির স্বরূপ অন্বেষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কারণ শিক্ষা একটি জাতির অবয়ব নির্মাণ করে, সাহিত্যে সে অবয়বের প্রতিফলন ঘটে আর সংস্কৃতি তাকে পূর্ণতা দান করে। এভাবেই একটি জাতির পরিচয় বিধৃত হয় তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। তাই মুসলিম জাতিসহ যে কোন জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার সাথে তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দুনিয়ায় সাধারণত বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে এক একটি জাতির অবয়ব নির্মিত হয়। তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাই এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এগুলোকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনচক্র আবর্তিত হয়। ফলে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অনুধাবনকরত আলোচ্য অধ্যায়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ও পরিধি

শিক্ষা মানবজীবনের অপরিহার্য অংশ। আহার্য, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই পাঁচটি বিষয় মানুষের অপরিহার্য বা মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে সকল সভ্যদেশ ও জাতির নিকট স্বীকৃত। শিক্ষা দ্বারা চিন্তাজগতের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং সে জাতির মান নির্ণয় করা যায়। কুরআন মাজীদের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতেই শিক্ষার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার করণেই মানবজাতি সৃষ্টির সেরা মর্যাদার আসনে সমাসীন। শিক্ষাহীন জাতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর ন্যায়। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, Education is the backbone of a nation 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'।

বস্তুতপক্ষে শিক্ষা ও জীবন একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষের শিক্ষাকাল ব্যাপৃত। শিক্ষা মানুষেরর জীবন বিকশিত করে ও অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। শিক্ষা হলো জ্ঞানার্জন, আনুষ্ঠানিকভাবে হতে পারে আবার অনানুষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সমান। শিক্ষা হলো অভ্যাস, চর্চা, অনুসরণ বা অনুশীলন দ্বারা কোন বিষয় জানা, আয়ত্তে নেয়া ও অভিজ্ঞতা অর্জন।[১]

সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে 'শিক্ষা' শব্দটি উদ্ভূত।[২] সংস্কৃত 'শাস' শব্দটি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দেয়া বা পরামর্শ দেয়া।[৩] শিক্ষার বাংলা প্রতিশব্দ বিদ্যা যা সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। বিদ অর্থ জানা বা জ্ঞান আহরণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা, অজানাতে জানা ও অবোধ্যকে বুঝা।[৪] শিক্ষা হলো বস্তুর পরিচয়, বিদ্যা অর্জন, কতকগুলো বিষয় বা শব্দের বুৎপত্তি লাভ।[৫] শিক্ষার অন্য প্রতিশব্দ জ্ঞানের অর্থে বলা হয়েছে– বোধ, বুদ্ধি, অনুভব করা, সংজ্ঞা, চেতনা, বুঝবার বা বিচার করবার ক্ষমতা, বিবেচনা, অবগতি, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা, পরমতত্ত্ব ইত্যাদি।[৬] শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটে, জ্ঞান যাচাই-বাছাই করা হয় এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা হয়, এই জ্ঞান হতে পারে শিল্প, ধর্ম, নৈতিকতা, সাহিত্য, সমাজ, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিগত।[৭]

---

১. প্রফেসর রাশিদা বেগম, ড. আ.খ.ম শামসুদ্দোহা, প্রফেসর শামসুল কবীর, *শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা* (ঢাকা : হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩
২. এ.বি.এম আব্দুল মান্নান মিয়া, *ইসলাম শিক্ষা* (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২য় সংস্করণ, ২০০২খ্রি.), পৃ. ১
৩. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা : সংকট ও উত্তরণ ভাবনা* (ঢাকা : সেন্টার ফর ইস্ট ওয়েস্ট স্টাডিজ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১
৪. সম্পাদনা পরিষদ, *প্রতীতি* (খুলনা : বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৬
৫. ড. শরিফা খাতুন, *দর্শন ও শিক্ষা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১০
৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৮২
৭. ড. আলী আসগর, *শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৩

শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Education। প্রকৃতপক্ষে Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে আগত। যার অর্থ To Lead এবং To drow out, পরিচালিত করা, শিক্ষাদান ও প্রতিপালন করা, টেনে বের করা।[৮] অর্থাৎ মানব মনের অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও শক্তি সম্ভাবনাকে পরিচালিত ও বিকশিত করে তোলাই শিক্ষা। ল্যাটিন লেখক Varro বলেন, educit হচ্ছে ধাত্রীবিদ্যা, educat হচ্ছে সেবক বা শিক্ষক, docut হচ্ছে প্রশাসক যার অর্থ ধাত্রী বাচ্চা আনয়ন করে, সেবিকা লালন করে এবং শিক্ষক শিক্ষা দেয়।[৯]

শিক্ষার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে تعليم যার উৎপত্তি علم ধাতু থেকে। علم অর্থ জ্ঞান, অবহিতি, বিজ্ঞতা ইত্যাদি।[১০]

শিক্ষার ব্যবহারিক অর্থে تعليم শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।"[১১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

"তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।"[১২]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.

"আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"[১৩]

---

৮. Editorial Board, *Samsad Bangla-English Dictionary,* August 2001, P. 945

৯. S. N. Jha, *The Concept of Socialism, Secularism, Democracy and Education* (Delhi : Amar Prakhashon, 1987), P. 28

১০. মহিউদ্দীন খান, *আল-কাওসার* (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৫২

১১. আল-কুরআন, ৫৮:১১

১২. আল-কুরআন, ২:২৬৯

১৩. আল-কুরআন, ৪:১১৩

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা.) বলেন,

من يرد الله خيرًا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي.

"আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের বুৎপত্তি দান করেন। বস্তুত আমি বণ্টনকারী এবং দাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ।"[১৪]

ইসলাম মানব জাতির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন করে। তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জনকে ফরয ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

"জ্ঞান অন্বেষণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।"[১৫]

মহান আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাবান বান্দা হতে হলে অবশ্যই ইল্‌ম (শিক্ষা) অর্জন করে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি ক্ষেত্রসমূহ জেনে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে অগ্রসর হয়, মহান আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা কি রূপ? নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَه طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَه مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

"আমি রাসূল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনিছে, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণের লক্ষ্যে পথ চলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন। তালিবুল ইল্‌ম (জ্ঞান সন্ধানী)-এর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা তাদের জন্য বিছিয়ে দেন। আর আলিম ব্যক্তির জন্য আসমান-যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মাছও। ইবাদতে রত ব্যক্তির তুলনায় আলিম ব্যক্তির মর্যাদা ঠিক সেরূপ যেমনটি পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা সমস্ত তারকার উপর। আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কাউকে দীনার বা দিরহামের উত্তরাধিকার

১৪. শায়খ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কিতাবুল ইলম (সাহারানপুর : মেরাজ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ৩২

১৫. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২২০, মাকতাবাতুশ শামিলাহ, http://www.alislam.com

Dhaka University Institutional Repository

করে যাননি। তারা উত্তরাধিকারী ইলমের। যে ব্যক্তি তা অর্জন করল সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করল।"[১৬]

অন্য হদীসে বলা হয়েছে, أفضل العبادة طلب العلم "সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে শিক্ষা অর্জন করা।"[১৭]

এভাবে পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও অগণিত হাদীস দ্বারা ইলম বা শিক্ষা অর্জন করাকে আবশ্যক করা হয়েছে এবং শিক্ষা অর্জনকারীর মর্যাদা বর্ণনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের বিষয়কে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন দার্শনিক, মনীষি ও শিক্ষাবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিখ্যাত আরব দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ আবু ইবন রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) ধর্ম ও দর্শনকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলতে ধর্ম একটি মৌলিক নিদের্শনা দেয়, তা হলো সৎ ও সত্য পথে চলা। অনুসন্ধিৎসা ও সাধনা ছাড়া সত্যের পরিচয় লাভ দুঃসাধ্য। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যের এই সাধনা ও প্রচেষ্টা হল শিক্ষা।[১৮] দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, সুস্থ দেহ সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা।[১৯] দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, মিথ্যার অপনোদন এবং সত্যের আবিষ্কারই শিক্ষা।[২০] প্লেটো বলেন, দেহ ও আত্মার পূর্ণতা সাধনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, তাই হলো শিক্ষা।[২১] রুশো বলেন, শিক্ষা হচ্ছে সুঅভ্যাস গড়ে তোলা এবং শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জনই নয় বরং প্রাকৃতিক শক্তির বৃদ্ধিও, এটা ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বৃদ্ধির অর্জন।[২২] রুশো আরো বলেন, কেবল কিছু জ্ঞান ও তথ্য অর্জনই শিক্ষা নয়, এটা সহজাত প্রাকৃতিক শক্তি এবং কার্যকলাপের উন্নয়ন।

শিক্ষাকে ব্যক্তি এবং সমাজের একটা প্রচেষ্টাও বুঝায়, যার দ্বারা সফলতম বংশধরদের মূল্যবোধ প্রথা এবং তাদের জীবনের ধারণা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো বুঝায়, যার দ্বারা তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রম কার্যকরী এবং সফলভাবে পরিচালনা করতে পারে।[২৩]

---

১৬. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশআস আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনানু আবু দাউদ* (দিমাশক : মাকতাবাতু ইবনে হাজার, ২০০৪ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৪

১৭. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৯

১৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২৬

১৯. Aristotole, *The Politics,* Book III (Oxford University Press, 1946), P. 630

২০. কে. এম. এ হোসাইন, *ইসলাম কি ও কেন?* (ঢাকা : জুলাই, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৮৬

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

২২. প্রাগুক্ত

২৩. Manzoor Ahmed, *Islamic Education, Redifinition of Aims and Methodology* (New Delhi : Qazi Publications and Distributions, 1982), P. 11

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Jhon Park বলেন, নিদের্শনা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান আর অভ্যাস অর্জন ও প্রদানের কৌশলই শিক্ষা। শিক্ষা হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত একটি প্রক্রিয়া যা বিকশিত মানব সত্তাকে বিশ্বনিয়ন্তার সাথে উন্নতভাবে সম্পর্কিত করে।[২৪] Dr. Sekandar Ali Ibrahimy উল্লেখ করেন যে,

> Education means systematic instruction. Education is a physical, mental and moral training which produces in the society highly we hered man and women to discharge their duties and responsibilities in all the spheres of their lives as the slaves and vicegerents of Almighty Allah and inspires them to sacrifice their lives for securing the pleasure of him.[২৫]

কারো কারো মতে, শিক্ষা হচ্ছে মানসিক গুণাবলির অনুশীলন মাত্র। আবার কারো কারো মতে, বস্তু জগতের দ্রব্যসামগ্রী ও তার গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার নামই শিক্ষা। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের অর্থই শিক্ষা।[২৬] দর্শন ও ভাবধারার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সব কিছুর পরশ কাঠিই হলো শিক্ষা।[২৭] স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানুষ যে পূর্ণতা নিয়ে ধরাধামে আগমন করে তার যথাযথ বিকাশই শিক্ষা।[২৮] অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে ব্যক্তি আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনই শিক্ষা।[২৯] মহাকবি মিল্টনের মতে, Education is the harmonious development of body, mind and soul অর্থাৎ শিক্ষা হলো দেহ মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন।[৩০] কবি রবীন্দনাথ ঠাকুর বলেছেন, তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমদের জীবনকে গড়ে তোলে।[৩১] আল্লামা ইকবালের মতে, শিক্ষা হলো খুদী বা আত্মার উন্নতি সাধন।[৩২] মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্চা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।[৩৩]

---

২৪. অধ্যাপক ড. এ আর. এম. আলী হায়দার, *ইসলাম শিক্ষা* (ঢাকা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. ড. মোঃ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ* (ঢাকা : জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
২৮. মোহাম্মদ আজগর আলী, *পাঠদান, পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২
২৯. আবু বকর ছিদ্দিক, *স্নাতক ও স্নতকোত্তর মনোবিজ্ঞান* (ঢাকা : সাহিত্য কোষ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৬৪
৩০. জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলন, ১৯৯৭, পৃ. ২০
৩১. প্রাগুক্ত।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বলেন, العلم إدراك الشيء لحقيقته অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা।[৩৪] আবু নাসের আল-ফারাবী বলেন, মানুষকে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত আত্মা ও বুদ্ধির পরিচালনা ও সুনিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাতে হয় তাই শিক্ষা।[৩৫] বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা বলেন, সূত্র অনুসন্ধান ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশকে শিক্ষা বলা হয়।[৩৬]

মূলত শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, কর্মদক্ষতা ও মানবিক শক্তির বিকাশের প্রয়াসে মানুষকে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাই শিক্ষা।

আর ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করা। অর্থাৎ যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজকে এবং স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যা আল-কুরআন, সুন্নাহ, তাওহীদ ও রিসালাতভিত্তিক তাকেই ইসলামী শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব আমরা পবিত্র কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত হতে পাই। মহান আল্লাহ বলেন :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

"পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[৩৭]

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে– ক. মহান স্রষ্টার সর্বপ্রথম নির্দেশ হচ্ছে পড়। খ. জমাট রক্তের মত সাধারণ ও তুচ্ছ বস্তু থেকে সৃষ্ট মানুষের জন্য মহিমান্বিত প্রতিপালক এর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞান সাধনা বা শিক্ষা অর্জনকে মাধ্যম বা সেতুবন্ধন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ. কলমের সাহায্যে তিনি মানবজাতিকে শিক্ষা দান করেছেন।[৩৮] এ মহামূল্যবান জ্ঞানের কল্যাণেই মানবজাতি ফেরেশতা তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। আর এ কারণেই মানুষ মহান

---

৩৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৩৫. প্রাগুক্ত
৩৬. John Adams, *Education Theores* (London: University of London Press, 2nd Edition, 1994), P. 30
৩৭. আল-কুরআন, ৯৬:১-৫
৩৮. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, একাদশ সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিভাষাগুলো[৩৯] স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইমাম গাযযালী (রহ.) (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) বলেন,

قال كان العلم مطلق على العلم بالله تعالى واياته وبافعاله في عباده وخلقه.

"আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নির্দেশাবলি এবং বান্দা ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে শিক্ষা বলা হয়।"[৪০]

ড. হাসান জামান বলেন, কুরআন হাদীসের আলোকে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে সেই লব্ধ জ্ঞানকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করাই হলো ইসলামী শিক্ষা।[৪১]

শিক্ষা আলো সদৃশ, শিক্ষা অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত করে মানব হৃদয়ে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করে। শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ দান। ইসলামী শিক্ষাই মানুষের জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, দক্ষতা ও প্রেরণাকে পার্থিব ও পারলৌকিক অর্থাৎ সামগ্রিক কল্যাণের পথে পরিচালিত করে থাকে। কেননা, ইসলামী শিক্ষার রূপকার স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং এ শিক্ষা সমগ্র সৃষ্টির জন্য সার্বিক ক্যলাণকর।

সাইয়েদ মুহাম্মদ কুতুব (রহ.)-এর মতে, ইসলামী শিক্ষা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচির নাম যাতে মানুষ তার দেহ, বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মা, তার বস্তুগত, আত্মিক ও পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের কোনটি পরিত্যাগ করে না, আবার কোনটির প্রতি অবহেলা বা মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ে না।[৪২]

---

৩৯. ইসলামী শিক্ষা বলতে নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়– التعليم الإسلامي : ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বা বিদ্যার্জন করা (Islamic learning), التعليم الإسلامية : ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা বা শিক্ষা দেয়া এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কলা-কৌশল ও পদ্ধতি আয়ত্ত করা (Islamic teaching)। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে Islamic teaching শব্দটি ইসলামের আদর্শ, অনুকরণীয়-অনুসরণীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে বুঝায়। التربية الإسلامية : সিলেবাসভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরবীতে তারবিয়া বলা হয়। দ্বীন ইসলামকে কেন্দ্র করে সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম অনুসারে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Islamic education)। المعرفة الإسلامية : ইসলামী জ্ঞান, ইসলাম সম্পর্কে জানা, অবগত হওয়া বা ইসলামকে সঠিকভাবে চিনতে পারা। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় এবং প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান (Islamic knowledge)। تعليم الإسلام : অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বা বিদ্যা অর্জন করা (Education of Islam)। التربية الدينية এ জাতীয় শিক্ষা হলো দ্বীনি বা ঈমানী শিক্ষা যা আমাদের দেশের মাদরাসা শিক্ষাকেই Religious Education বলা হয়। الدراسات الإسلامية : উপরে বর্ণিত ইসলামী শিক্ষার খণ্ডিত চিত্রসমূহের একক সমাহার। Islamic learning, Islamic teaching, Islamic education, Islamic knowledge, Education of Islam, Religious Education-এর একত্রিত ও সমন্বিত রূপের নাম Islamic Studies বা ইসলামী শিক্ষা (*বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা, সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১)।

৪০. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৪৬

৪১. মোঃ আবুল ফজল, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে বগুড়া জেলার মাদরাসাসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪৬

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা সকল সৃষ্টির জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর। শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। যে কোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জাতির বিশ্বাস, জীবনাচার, ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ধারণ করে গড়ে উঠে। ইসলাম যেহেতু একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন বিধান, মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগে এর নিজস্ব নির্দেশনা ও বিধান বিদ্যমান। তাই সঙ্গত কারণেই শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের স্বকীয় ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এতে শুধু মুসলিম জাতি নয়, বরং সর্বকালের গোটা মানবজাতির সকল সমস্যার জীবনমুখী সমাধান এতে নিহিত আছে। ইসলামী শিক্ষা মানবজাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন করার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং নতুন প্রজন্মকে সে আদলে গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। তাই সঙ্গত কারণেই মানবরচিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

এ সম্পর্কে আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায়, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে জীবন গড়ার দৃঢ় মনোভঙ্গি, পার্থিব উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহারের দক্ষতা এবং সমাজ ও সভ্যতায় অবদান রাখার মত যোগ্যতা সৃষ্টির উপকরণ বিদ্যমান, তাকে ইসলামী শিক্ষা বলে।[৪৩] আর এরূপ শিক্ষাই মানবজাতির জন্য জাতীয় শিক্ষার মর্যাদা পাওয়া উচিত। মহাকবি আল্লামা ইকবাল (রহ.) তার শিক্ষাদর্শনে অনুরূপ শিক্ষার কথাই বলেছেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় মুসলিম জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৪৪]

ইল্‌ম প্রকরণ

ইল্‌ম বা জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয হলেও সকল ইল্‌ম অর্জন কিন্তু এক পর্যায়ের নয়; বরং এর বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সে হিসেবে ইল্‌ম বা শিক্ষা তিন পর্যায়ের :

প্রথমত, ফরযে আইন : দীন সম্পর্কীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির ইল্‌ম (শিক্ষা) হাসিল করা ফরযে আইন, যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এ পর্যায়ে রয়েছে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহ শিক্ষা করা অর্থাৎ যে সমস্ত আকীদা পোষণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বলা চলে না, সেই বিশ্বাসাবলির জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। ঈমানে মুফাস্‌সালে এসব বিষয়ের উল্লেখ আছে।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

“আমি ঈমান আনলাম– ১. আল্লাহর প্রতি, ২. ফেরেশতাগণের প্রতি, ৩. তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, ৪. তাঁর রাসূলগণের প্রতি, ৫. আখিরাতের প্রতি, ৬. তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এর প্রতি এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।”

৪৩. এ. কে এম. নাজির আহমদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৭

৪৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ইল্‌ম হাসিল করা ফরযে আইন। অনুরূপ পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্পর্কিত আহকাম ও মাসাইল, নামায, রোযাসহ অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত এবং হালাল-হারাম মাকরূহ বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইল্‌ম হাসিল করা ফরযে আইন। হজ্জ যার উপর ফরয তার জন্য হজ্জের মাসয়ালা জানা, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানায় নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা এবং বিয়ে-শাদীর উদ্যোগ গ্রহণকারীর জন্য বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন।[৪৫]

দ্বিতীয়ত, ফরযে কিফায়া : যে সমস্ত ইল্‌ম বা শিক্ষা জরুরী বটে; কিন্তু সকলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করা আবশ্যিক নয়। সমাজের একশ্রেণি বিশেষভাবে তা অর্জন করলেই গোটা সমাজ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। এ ইল্‌মকে ফরযে কিফায়া পর্যায়ের ইলম বলা হয়ে থাকে। তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন গ্রন্থে ফরযে কিফায়া ইল্‌মের বর্ণনা এভাবে এসেছে : গোটা কুরআনের সম্পূর্ণ অর্থ জানা এবং কুরআনে বর্ণিত সকল বিষয় অনুধাবন করা, হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা, হাদীস শাস্ত্রের বুৎপত্তি অর্জন করা এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে গৃহীত বিধানাবলির জ্ঞান লাভ করা এতো ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে গোটা জীবন ব্যয় করেও এতে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই ইসলামী শরীয়তে একে ফরযে কিফায়া বলে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক এই সকল জ্ঞান অর্জন করে নিলে অন্যান্যরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।[৪৬] চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান প্রভৃতি এ পর্যায়ে পড়ে। সমাজের একাংশ এ বিদ্যা অর্জন করলেই গোটা সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। মুআমালাত, অসিয়্যত ও ফারাইয বা উত্তরাধিকার বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাও এ পর্যায়ের শিক্ষার অর্ন্তগত।[৪৭]

তৃতীয়ত, নফল ইল্‌ম : নফল শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত, শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয, ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক পর্যায়ের নয়, অথচ এর বনিমিয়ে সওয়াব লাভ হয়, এগুলোর ইল্‌ম বা শিক্ষা অর্জন করা নফল। নফল ইবাদত সম্পর্কে ইল্‌ম অর্জন করা বা অন্য যে কোন বিষয়ের উপর জ্ঞান লাভ করা এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।[৪৮]

---

৪৫. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
৪৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ), *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত)*, পৃ. ৫৯৭
৪৭. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৪৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

ওহী ভিত্তিক শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের অন্যতম দু'টি নাম হলো عليم (আলীম) ও حكيم (হাকীম) অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান। কুরআন কারীমের অসংখ্য স্থানে তাঁর এ দু'টি গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইল্ম বা জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। তিনি দয়া করে যাকে যতটুকু শিক্ষা দান করেছেন সে ততটুকু শিক্ষাই লাভ করেছে। তাই সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) এর শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا.

"আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন।"[৪৯]

আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা ব্যতীত মানুষ স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।"[৫০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

"আপনি বলুন, এর জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। আর আমি তো পরিষ্কার ভীতি প্রদর্শনকারী।"[৫১]

অন্য আয়াতে এসেছে :

هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

"তিনি এমন প্রভু যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নেই। তিনি সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুসমূহের সম্যক জ্ঞান রাখেন।"[৫২]

---

৪৯. আল-কুরআন, ২:৩১
৫০. আল-কুরআন, ৩:১৬৪
৫১. আল-কুরআন, ৬৭:২৬
৫২. আল-কুরআন, ৫৯:২২

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হলো মহান আল্লাহ তা'আলা। এ সঠিক ও প্রকৃত উৎস হতে আহরিত জ্ঞানই কেবল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। তাই ওহীভিত্তিক জ্ঞান তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানকেই ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত ও সঠিক জ্ঞানের উৎস হিসেবে চিত্রিত করা হয়। নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহ তা'আলা যে প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত করেছেন তারই পারিভাষিক নাম ওহী।[৫৩] নবী কখনও নিজ থেকে কিছু বলেননি, যা বলেছেন সবই ওহী দ্বারা নির্দেশিত হয়ে বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"এবং তিনি (মহানবী সা.) মনগড়া কথা বলেন না, তিনি যা বলেন ওহীপ্রাপ্ত হয়েই বলেন।"[৫৪]

সুতরাং নবী করীম (সা.) তাঁর হাদীসের মাধ্যমে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাও ওহীভিত্তিক ইল্‌ম। হাদীস বিশারদগণ তাই হাদীসকে 'ওহীয়ে গায়রে মাতলু' নামে অভিহিত করেন। কুরআন ও হাদীসের এই ওহীভিত্তিক জ্ঞানসম্ভার থেকে যারা সরাসরি শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে আকাশের নক্ষত্র সম আলোর দিশারী রূপে গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন সেই সাহাবায়ে কেরামগণের নিকট থেকে যে ইল্‌ম বা জ্ঞানসম্ভার পাওয়া যায় তাও নির্ভরযোগ্য ইল্‌ম। মহানবী (সা) বলেছেন :

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوْرِثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ.

"নিশ্চয় আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কাউকে দীনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী করে যাননি। তারা উত্তরাধিকারী করেন ইল্‌মের।"[৫৫]

আল-কুরআন প্রত্যক্ষ ওহী এবং হাদীস বা সুন্নাহ পরোক্ষ ওহী। আল-কুরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্বে। ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ "এটা এমন এক গ্রন্থ যার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই।"[৫৬] সুতরাং সর্বশেষ ওহী তথা আল-কুরআন মানবজাতির জ্ঞানের মূল উৎস। তাই ইসলামী শিক্ষায় আল-কুরআনকে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মানব রচিত শিক্ষা ব্যবস্থা কখনো নির্ভুল শিক্ষানীতি প্রদান করতে পারেনি। কেননা, মানব রচিত শিক্ষা পদ্ধতিতে আজকে যেটা গ্রহণযোগ্য আগামীতে তা সংশোধন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় মানবজাতিকে নির্ভুল ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি উপহার দেয়ায়

---

৫৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৫৪. আল-কুরআন, ৫৩:৩-৪
৫৫. *আস-সুনানু আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৪
৫৬. আল-কুরআন, ২:২

Dhaka University Institutional Repository

জন্য জ্ঞানের নির্ভুল উৎস ওহীর মানদণ্ডের উপর নির্ভর করা হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত সংশোধন-সংযোজন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন নেই।

এজন্য ইসলামী শিক্ষা ওহীকে জ্ঞানের নির্ভুল ও যথার্থ উৎস হিসেবে গ্রহণ করে একটি নির্ভুল সার্বজনীন শিক্ষানীতি মানবজাতিকে উপহার দিতে চায়। যাতে গোটা মানবগোষ্ঠী সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষা ও পথনির্দেশনার অনুসরণ করে জগতে প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষা

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। সত্তাগত দিক থেকে তিনি যেমনিভাবে এক ও অদ্বিতীয় অনুরূপভাবে গুণাবলির দিক থেকেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি লা শারীক। ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারেও তাঁর কোন শরীক নেই। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

"তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি দয়াময় অতি দয়ালু।"[৫৭]

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"বলুন তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"[৫৮]

আল-কুরআনের অন্যত্র একাধিক ইলাহের সম্ভাবনাকে নাকচ করে বলা হয়েছে :

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

"যদি ভূমণ্ডল নভোমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত আরো ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র মহান।"[৫৯]

এরূপ অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা, পালনকর্তা, শাসনকর্তা, বিধানদাতা সাবভৌমত্বের অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ। কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ "সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।"[৬০] সৃষ্টিকুল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে এবং তাঁর হুকুমের অধীনে। সকলকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। এরই নাম মূলত তাওহীদ। ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে

৫৭. আল-কুরআন, ২:১৬৩
৫৮. আল-কুরআন, ১১২:১-৪
৫৯. আল-কুরআন, ২১:২২
৬০. আল-কুরআন, ৬:৫৭

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। মহান আল্লাহ বলেন : إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ "সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ।"[৬১] অন্যত্র বলা হয়েছে : وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا "আমার প্রভুর জ্ঞান সকল কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত।"[৬২]

ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। এ শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টিকর্তা, শাসনকর্তা এবং ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে কেবল আল্লাহ তা'আলকে বিশ্বাস ও স্বীকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। স্রষ্টার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসী এবং মনে-প্রাণে আস্থাশীল ব্যক্তি সমাজ ও দেশের জন্য সুনাগরিক ও আদর্শ মানুষ হতে বাধ্য। তার দ্বারা কোন প্রকারের অপকর্ম সাধিত হয় না। তাই ইসলামী শিক্ষা এরূপ অনিন্দ্য সুন্দর তুখোড় আদর্শবান এক মানব কাফেলা গঠনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বস্তুত ইসলামী শিক্ষাদর্শন এভাবে চিরন্তন ও শাশ্বত একক সত্তা বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিকট নিজেকে সোপর্দ করতে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করে। এতে সে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এবং ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত আকীদা থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারে। ফলে সে এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতে, অন্য কারো আনুগত্য করতে কিংবা কোন শক্তির নিকট মাথা নত করতে পারে না। এভাবে একজন শিক্ষার্থী আল্লাহর নেক ও সৎ বান্দাহরূপে নিজের যোগ্যতাসমূহের বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়। যে তার মানসিক ও প্রকৃতিগত ঝোঁক প্রবণতা সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে এবং আল্লাহর প্রকৃত বান্দারূপে নিজের মানসিক, দৈহিক ও নৈতিক ভিত্তিকে সুসংহত করতে পারে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর যে সব ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব অর্পিত হয় তা সে নিষ্ঠার সাথে পালন করতে সক্ষম হয়। এটিই হচ্ছে তাওহীদভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার অনন্য রূপ।[৬৩] সুতরাং শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যময় বিশ্ব গড়তে সকল মানবিক শক্তি ও কল্পিত শক্তির নাগপাশ থেকে সরিয়ে বিশ্ব মানবতাকে এক আল্লাহর শক্তির নীচে ঐক্যবদ্ধ করতে তাওহীদভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই।

নবুওয়াত ও রিসালাতভিত্তিক শিক্ষা

মানুষ সৎ পথে চলার যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে প্রবৃত্তির তাড়নায়, শয়তানের প্ররোচনায় এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সাধারণত অসৎপথে পরিচালিত হয়। ফলে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির মত জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আবার কখনো

---

৬১. আল-কুরআন, ৪৬:২৩

৬২. আল-কুরআন, ৬:৮০

৬৩. মোঃ আবুল ফজল, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে বগুড়া জেলার মাদরাসাসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব*, সম্পাদিত (বগুড়া : প্রেরণার মিছিল, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪৮-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে অতি ক্ষমতাবান মনে করে মানুষ সমাজে নানা ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অত্যাচার-অনাচার ও পাপাচারে সমাজ তখন হয়ে যায় চরম কলুষিত। সামাজিক এরূপ অবক্ষয়রোধে প্রয়োজন নবী-রাসূলদের শিক্ষা। নবী-রাসূলদের শিক্ষা-দীক্ষায় সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। যাবতীয় পাপাচার দূরীভূত হয়, সহিংস সমাজ ফিরে পায় তার প্রকৃত অহিংস ও শান্তিময় পরিবেশ। অসভ্য সমাজ রূপান্তরিত হয় সুসভ্য সমাজরূপে। তাই নবুওয়াত ও রিসালাতভিত্তিক শিক্ষা মানবজাতির জন্য শাশ্বত ও বিশ্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বার উদ্ঘাটন করে। মানবজাতিকে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার নিদের্শিত শান্তি ও সম্প্রীতিময় সমাজ গড়ার জীবন যাপন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য যুগে যুগে নবী- রাসূলগণই ছিলেন মহান শিক্ষক। বিশ্বনবী বলেছেন, إنما بُعثت معلّمًا "আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"[৬৪] তাই মহান আল্লাহর প্রেরিত ও মহান শিক্ষকগণের শিক্ষানীতি বা কর্মনীতি সম্পর্কে জানা ইসলামী শিক্ষার একটি অপরিহার্য বিষয়। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই শিখন ও প্রশিক্ষণের মহান ব্রত পালন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন : وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ "আর নবী-রাসূলগণ তোমাদের অজানা বিষয় শিক্ষা দেন।"[৬৫] তাঁরা আল্লাহর বাণী (আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, ভয় ও সুসংবাদ ইত্যাদি) মানুষকে শুনিয়েছেন। তাঁদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়েছেন, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানত না। এভাবে তাঁরা মানুষকে প্রকৃত কল্যাণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দীক্ষিত করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা সারা জীবন মানুষের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের প্রবর্তিত রিসালাতের শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নবী-রাসূলগণকে প্রকৃত ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। রাসূল (সা.)-এর শৈশব হতে যৌবন এরপর নবুওয়াত প্রাপ্তি, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনসহ তাঁর জীবনের স্তরে স্তরে যাবতীয় বিষয়গুলো তাদের সামনে শিক্ষণীয় উপাদান হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এর মাধ্যমে তারা ইসলামের প্রকৃত রূপের সাথে পরিচিত হয়ে আত্মগঠনের প্রেরণা লাভ করে। সেদিক বিবেচনা করে নবুওয়াত ও রিসালাতভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা মানবজাতির জন্য আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে গণ্য। নবুওয়াত ও রিসালাতকেন্দ্রিক শিক্ষা যেহেতু রাসূল (সা.)-এর বাস্তব জীবনভিত্তিক তাই এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। বস্তুত মানুষ হচ্ছে আল্লাহর বান্দা। আর আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যত কিছু আছে মানুষ তা কেমন করে ব্যবহার করবে

---

৬৪. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭; মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, পৃ. ২২৯

৬৫. আল-কুরআন, ২:১৫১

Dhaka University Institutional Repository

এবং কি করে আল্লাহর দাসত্ব করবে তা জানার জন্য শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট নয় বলেই মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং বুদ্ধি-বিবেচনালব্ধ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে বলে এতে নানা ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহীভিত্তিক জ্ঞানে ভুল-ভ্রান্তির আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই নবুওয়াত ও রিসালাতভিত্তিক জ্ঞানই একমাত্র নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান।[৬৬] এজন্য ইসলামী শিক্ষায় নবুওয়াত ও রিসালাতভিত্তিক শিক্ষাকে অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা

শিশু-কিশোররাই আগামী দিনের কর্ণধার। কাজেই আদর্শ সমাজ ও উন্নত পরিবেশ গঠন করতে হলে শিশু-কিশোররা কেমন করে উন্নত চরিত্র এবং অনুপম আদর্শের অধিকারী নৈতিকতাসম্পন্ন সুনাগরিক হতে পারে সে বিষয়ের প্রতি অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। চরিত্র গঠন বলতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খারাপ বা দুষ্ট চরিত্রের (أخلاق ذميمة) প্রতি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং উন্নত চরিত্র (أخلاق حميدة) দ্বারা তাদেরকে বিভূষিত করা বুঝায়। যেমন অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, মূর্খতা, উদাসীনতা, হত্যা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, যেনা করা ইত্যাদির প্রতি তাদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করা। সাথে সাথে তাদের মাঝে আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, কুরআন-সুন্নাহ, ইত্যাদির প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সততা, আমানতদারী, মানবাধিকার, অঙ্গীকার পূরণ করা, দানশীলতা, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচার ইত্যাদি মহৎ গুণাবলি শিক্ষা দেয়া। ইসলামী শিক্ষা উপরোক্ত দিক বিবেচনায় শিক্ষার্থীকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) বলেছেন, إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق "আমাকে নৈতিক চরিত্রের উৎকৃষ্টতা সাধন ও পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।"[৬৭]

একটি শাশ্বত মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে না। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য উন্নত জ্ঞানের মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য।[৬৮] মূল্যবোধের সাহায্যে মানুষ ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করে থাকে। ইসলামী শিক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টিকে অত্যন্ত

---

৬৬. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৬৭. *কানযুল উম্মাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮; *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৬৮. *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে বগুড়া জেলার মাদরাসাসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব*, প্রাগক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা মানব চরিত্রের পাশবিকতা দমন করে সর্বস্তরে একটি শাশ্বত মূল্যবোধভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন :

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

"আর আমি তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদণ্ড যেন জনগণ ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার সহকারে জীবনযাপন করতে পারে।"[৬৯]

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ যে মানদণ্ড বা মূল্যবোধের কথা বলেছেন তা মূলত ভাল-মন্দ পার্থক্য করার শাশ্বত মানদণ্ড। ইসলামী শিক্ষায় মানবচরিত্রের পাশবিকতা দমন করে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার একটি শাশ্বত প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত করা হয় এবং বাস্তব জীবনে এর অনুশীলন অব্যাহত রাখার শিক্ষা দেয়া হয়, যা মানব চরিত্রের দ্বৈত প্রবণতার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করার একটি টেকসই কৌশল। ফলে অনুকূল পরিবেশের প্রভাব ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত এবং উত্তরোত্তর তা আরো শানিত হবে এবং মানুষ নৈতিক মূল্যবোধ ভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে নিজের আত্মা ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করবে এবং সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় যথাযথ নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার অভাবে মানুষ বিবেক বিবর্জিত কুপ্রবৃত্তির ঘৃণ্য দাসে পরিণত হয়। তখন সে তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা হারিয়ে পশুর চেয়ে নীচে নেমে যায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী :

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ.

"তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা তারা অনুধাবন করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা দর্শন করে না, তাদের কান রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা শ্রবণ করে না, তারা যেন পশুর মত বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।"[৭০]

এরূপ পশুর আচরণ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে রক্ষার লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষায় তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক আকীদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও আমলভিত্তিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ও নবী-রাসূলগণ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষার এ ধারাকে অব্যাহত রাখা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

৬৯. আল-কুরআন, ৫৭:২৫
৭০. আল-কুরআন, ৭:১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত শিক্ষা ও আদর্শিক প্রেরণা

মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

"আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[৭১]

এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে জগতে জিন ও মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁর ইবাদত করা। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ.

"যখন তোমরা সালাত শেষ করবে তখন জীবিকার সন্ধানে যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।"[৭২]

বর্ণিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইবাদত করা এবং জীবিকা সন্ধান করা উভয়টাই আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা। মহানবী (সা.) বলেছেন : الدنيا مزرعة الاخرة "পৃথিবী পরকালের ক্ষেত স্বরূপ।"[৭৩] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! জগতে আমাদেরকে কল্যাণ দান কর এবং পরকালে কল্যাণ দান কর আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের মুক্তি দাও।"[৭৪]

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, জগত সংসারের সকল কর্মকাণ্ডকে সামনে নিয়ে পরকাল অন্বেষণ করাই হচ্ছে ইসলামের মূল লক্ষ্য। সাংসারিক কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়ে ইসলাম নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন : لا رهبانية في الإسلام "ইসলামে কোন বৈরাগ্যতা নেই।"[৭৫] ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আর এই পরিপূর্ণ জীবন বিধানের জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন।

ইসলামী শিক্ষা শুধুমাত্র বৈষয়িক কিংবা কোন ধর্মীয় শিক্ষা নয়, এটি একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এ শিক্ষায় যেমন ধর্মকে পার্থিব বিষয় থেকে আলাদা করে দেখা হয় না তেমনি এ শিক্ষায় শুধু দুনিয়ার উন্নতি ও ভোগ-বিলাস নিয়ে আলোচনা হয় না; বরং দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের আলোকে

---

৭১. আল-কুরআন, ৫১:৫৬
৭২. আল-কুরআন, ৬২:১০
৭৩. আবুল ফজল আসকালানী, *ফাতাহুল বারী* (বৈরুত : দারুল মাআরিফা ১৩৭৯ হি.), ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৩০
৭৪. আল-কুরআন, ২:২০১
৭৫. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করা হয়। যেহেতু এ জগৎ পরকালের ক্ষেত স্বরূপ, তাই জাগতিক সকল কর্মকাণ্ড বিধাতার দেয়া বিধান মতে করলে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য। মানুষ যথাযথভাবে দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদত করলে পরকালে রয়েছে তার জন্য অনাবিল সুখ-শান্তির স্থায়ী ব্যবস্থা তথা জান্নাত যা একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড় সফলতা। এ বিষয়গুলো ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অন্তরে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, যাতে সে ধর্মীয় জীবনকে পার্থিব জীবন থেকে পৃথক না করে। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়ের সমন্বিত রূপই ইসলামী শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান করে। মানব জীবনের প্রত্যেক দিকের পথ-নিদের্শনা এ শিক্ষায় বিদ্যমান। মানুষের অন্তর্নিহিত সর্বাধিক মুক্তির সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে ইহকালীন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি যেমন অর্জন করা প্রয়োজন অনুরূপভাবে পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করার কৌশলও শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় এ দু'টি বিষয়কে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই এটি ভাসাম্যপূর্ণ ও সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলে সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে যেমন সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, খনিজ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞানসহ যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য পবিত্র কুরআনে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো ব্যাপক চর্চা, অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত সূত্র ও তথ্যাবলিকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সমন্বিত ও প্রামাণ্য করে উপস্থাপন করা ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব।[৭৬] এক কথায় মানুষের জীবন ও জগৎ, আকীদা ও বিশ্বাস, আমল ও প্রত্যয়, বস্তু ও আত্মা, ধর্ম ও নৈতিকতা, জ্ঞান ও বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এসব কিছুকে ওহীভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে সমন্বিত করে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করার কৌশল ইসলামী শিক্ষানীতির অপরিহর্য বিষয়। মহানবী (সা.) তাঁর শিক্ষা কৌশলকে মানবজীবনের দু' একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। আধুনিক যুগের প্রায় সব শিক্ষা ব্যবস্থায় একমুখী বস্তুবাদী শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে; কিন্তু মহানবী (সা.) একই সাথে আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, শারীরিক, সামাজিক ও অন্যান্য সকল প্রকারের শিক্ষা প্রদানের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করেন নি; বরং এগুলোকে একটি এককের অধীন করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি শিক্ষার সকল বিভাগে সুসাসঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার ব্যবস্থা করেছেন যা অনুসরণ করলে মানুষ 'আদর্শ মানুষে' পরিণত হতে পারে।[৭৭]

---

৭৬. ড. এ. কে. এম নরুল আলম, *ইসলামী দাওয়াহর মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১১

৭৭. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

ইসলামী শিক্ষা একটি শাশ্বত, চিরন্তন ও সার্বজনীন শিক্ষা। এ শিক্ষা কোন দেশ, জাতি, অঞ্চল, ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বিশেষ বর্ণের লোকদের জন্য নয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা সর্বকালে যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলায় নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে মানব কল্যাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এতে ইজতিহাদ তথা চিন্তা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে এটি যুগ বা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সময়োপযোগী প্রগতিশীল শিক্ষার মর্যাদা লাভ করেছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

যে কোন জাতির জন্য শিক্ষা অমূল্য সম্পদ। জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতির মাধ্যম হিসেবে শিক্ষাকেই গণ্য করা হয়। বিভিন্ন মনীষি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য করেছেন। প্লেটোর মতে, শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। সক্রেটিসের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার। এরিস্টটলের মতে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা। পারকার বলেন, পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্মপ্রকাশের জন্য যেসব গুণাবলি নিয়ে শিক্ষার্থী এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব গুণাবলির যথাযথ বিকাশ সাধন। ফ্রুবেলের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একটা সুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি। শিক্ষাবিদ ডিউ বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মতবাদের ধারাবাহিক পুনর্বিন্যাস।[৭৮] ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে,[৭৯]

১. শিক্ষার্থীর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা।
২. শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন।
৩. ব্যক্তির সহজাত ও গুণাবলির সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রাণিত করে তোলা।
৫. শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও মননে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়বোধ গড়ে তোলা।
৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন ও বিকাশে সহায়তা করা।
৭. বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি।
৮. মানুষের প্রতি সৌহার্দ ও সহমর্মিতাবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

---

৭৮. মোহাম্মদ আজহার আলী, *পাঠদান, পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২
৭৯. *শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

৯. সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখানো এবং অসম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি করা।

১০. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ সাধন।

১১. অন্যে মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হতে শেখানো।

১২. এর মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি ও কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

১৩. মৌলিক চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করা, সমাজে মুক্তচিন্তা এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো।

১৪. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি ।

১৫. শিক্ষাক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৈষম্য দূরীকরণ। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও জাতীয় আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটবে।

ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে মানবিক গুণে বিকশিত করা, নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্রবান, সৎ, যোগ্য, আদর্শবান সুনাগরিক তৈরি করে মহান আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাহ এবং রাসূল (সা.)-এর সত্যিকার উম্মত হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এ শিক্ষায় শুধু জ্ঞানই উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃত বিষয় জানতে হবে, যথার্থ সত্য উপলদ্ধি করতে হবে এবং সেই জানা ও উপলব্ধির পর যে মহাসত্য উদ্ঘটিত হবে তা নিজের জীবন, সমাজ ও পরিবেশে বাস্তবায়ন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের মাঝে অর্জিত জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার করা, তাদেরকে সজাগ ও সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করাও এ শিক্ষার উদ্দেশ্য।[৮০] শিক্ষার্থীকে জনসাধারণের নিকট এ ধরনের আহ্বান জানানোর কৌশল শিক্ষা দেয়া– পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় যে আহ্বান করাকে دعوة الحق বা সত্যের আহ্বান হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"তার চাইতে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর পথে আহ্বান করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে আর বলে, নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারী।"[৮১]

শিক্ষার্থীর আত্মগঠন ও অন্যকে গড়ার যুগপৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামী শিক্ষা একদল ন্যায়বিচারক, শাসক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সমাজসেবক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, কূটনৈতিক ইত্যাদি সৃষ্টি করার কৌশল প্রয়োগ করে। এদিক বিবেচনায় ইসলামী শিক্ষার মৌলিক কয়েকটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

৮০. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৮১. আল-কুরআন, ৪১:৩৩

Dhaka University Institutional Repository

১. বান্দা হিসেবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ উম্মত হিসেবে নিজকে শিরক-বিদআত মুক্ত জীবনে অভ্যস্ত করা এবং কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে যথার্থ অবদান রাখা। রাসূল (সা.)-এর জীবন দর্শন মানুষের জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।[৮২]

৩. মানুষকে ইসলামী সংস্কৃতি-সভ্যতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং অপসংস্কৃতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও বিরত রাখা, মানুষের মধ্যে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দৈহিক, মানসিক, আত্মিক ও নৈতিকতার পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

৪. মনুষ্যত্ব ও মানবতার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলি জাগ্রত করে পশুসুলভ আরচণ বর্জন করা।

৫. মানুষের মৃত্যুর পর তার ইহলৌকিক জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করার প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত করা এবং তাদের মাঝে পারলৌকিক মুক্তির প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৮৩]

৬. মানুষ জগতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। সেই প্রতিনিধিত্ব করতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও নীতির আলোকে সামগ্রিক জীবন গঠন এবং ঈমান ও নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান জনশক্তি তৈরি করে সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ ও জাতি গড়ে তোলা।[৮৪]

৭. ইসলামী শিক্ষার আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিমদের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরে হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে উৎসাহ প্রদান করা।

৮. সময় ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে জীবনমুখী ও আধুনিক শিক্ষা প্রদান করা, প্রয়োগমুখী সৃজনশীল শিক্ষা দেয়া, সৎ, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী, চরিত্রবান, নীতিবান ও বিবেকবোধসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরি করা, ইসলামী মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সুসমন্বয় ঘটানোসহ জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথাযোগ্য গুণাবলি সৃষ্টি করা।

৯. সময় ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বিচারক, সৈনিক, প্রশাসক, সমাজসেবী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ,

---

৮২. এ. বি. এম আব্দুল মান্নান মিয়া, *ইসলাম শিক্ষা* (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৫

৮৩. অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ, *ইসলামী শিক্ষা মূলনীতি* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৭

৮৪. ড. আ. ই ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৫

ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে সকল ক্ষেত্র ও বিভাগে উপযুক্ত লোক তৈরি করা।[৮৫]

১০. সর্বোপরি ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মমত কিংবা রাজনৈতিক মতবাদ নয়; বরং মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করাই ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মাঝে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হয়। আচার-আচরণ পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়। এতে চারিত্রিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়, মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে, মানবতা সমুন্নত হয়। সর্বোপরি মনুষত্বের বিকাশ ও মানবতাবোধ সৃষ্টির জন্য এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন অত্যাবশ্যকীয়। ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবন বিধান। বিশ্ব জগতের সকলের একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের কল্যাণময় আদর্শ ও নীতি বিশ্বের সকল ভূখণ্ডে সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলামের সাম্য ও শান্তির বাণী সর্বমহলে প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে শান্তি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যময় পৃথিবী গড়তে ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা পথহারা মানবজাতিকে হিদায়াতের সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে প্ররণ করেছেন। প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই ছিলেন শিক্ষার আলোয় আলোকিত ও সুশিক্ষার ধারক ও বাহক। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন সে ধারার সর্বশেষ ও সর্বোত্তম প্রেরিত পুরুষ। তাঁর মাধ্যমে ঐশী শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর নাযিল করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যাতে রয়েছে মানবজীবন পরিচালনার সকল দিক- নির্দেশনা, যা পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের আধার। পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনাকে বাস্তবে রূপদান করে মহান শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। নবী-রাসূলগণের এ পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য তথা শিক্ষার মিশন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনি সেই মহান সত্তা যিনি একটি জাতির মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আর শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। বস্তুত তারা ইতোপূর্বে ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।"[৮৬]

---

৮৫. এ. বি. এম আব্দুল মান্নান মিয়া, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ মহানবী (সা.)-কে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই বলেন, أنا بعثت معلّمًا "নিশ্চয় আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"[৮৭] তিনি একটি কার্যকর বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে আরবের অসভ্য, মূর্খ ও বর্বর একটি জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন। যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন অল্প সময়ে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় বিশ্বের মানুষের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে নিজেদের ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন এবং ইসলামের মহান বার্তা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দান করার জন্য শিক্ষিত যুদ্ধবন্দিদের নিয়োজিত করতেন। বদর যুদ্ধের কয়েদীরা এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। বদরের যুদ্ধে সত্তরজন অমুসলিমকে বন্দি করে মদীনায় আনা হয়। তন্মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতেন মুক্তিপণ হিসেবে প্রত্যেক দশজন নিরক্ষরকে তারা লেখাপড়া শিক্ষা দিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। এভাবে শিক্ষাদানের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দি মুক্তি লাভ করত। এ ধরনের ব্যবস্থা শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে অনন্য ও নজিরবিহীন।[৮৮]

বর্তমান কালের মতো মহানবী (সা.)-এর সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। তখন মসজিদ-ই ছিল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় হযরত যায়দ ইব্ন আকরাম (রা.)-এর বাসস্থান ছিল শিক্ষা কেন্দ্র। এটাই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এই বাড়িটি 'দারুল আরকাম' নামে পরিচিত। মহানবী (সা.) ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সাহাবীগণ ছিলেন এর ছাত্র। এ ব্যবস্থার ফলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর সর্বপ্রথম মসজিদে নববী নির্মাণ করে এর একটি অংশ শিক্ষায়তন হিসেবে নির্দিষ্ট করেন যা 'সুফ্ফা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৮৯] এটাই ইসলামের প্রথম জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সুফ্ফার শিক্ষার্থীদেরকে নিজেই শিক্ষা দিতেন এবং যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করতেন। পরে শিক্ষা বিভাগ দেখাশোনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-কে। এছাড়া হযরত যায়দ ইব্ন সাবেত (রা.), হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা.), হযরত ইব্ন সাঈদ (রা.), হযরত ইবনুল আস (রা.), হযরত উবাই ইব্ন সামেত (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত থাকতেন।[৯০]

---

৮৬. আল-কুরআন, ৬২:২

৮৭. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৮৮. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব ও এ. এস. এম আলাউদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১০

৮৯. প্রাগুক্ত।

৯০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরে ছড়িয়ে পড়লে সুফ্ফার শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবীদের শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। তাঁরা বিভিন্ন গোত্রের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা.) আত্তাব ইব্‌ন উসাইদ (রা.) ও হযরত মুআজ (রা.)-কে মক্কার লোকদেরকে পবিত্র কুরআন ও দ্বীনের জ্ঞান দান করার জন্য মক্কায় নিয়োজিত করেন। এমনিভাবে হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে নাজরান এলাকায়, হযরত মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা.) ও হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন।[৯১] এভাবে বিভিন্ন এলাকার লোকেরা রাসূল (সা.)-এর নিকট শিক্ষক চেয়ে আবেদন পাঠালে তিনি সেসব এলাকায় প্রশিক্ষিত সাহাবায়ে কেরামদের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করতেন। ফলে অতি দ্রুত ইসলামী শিক্ষা আরবসহ অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তিরোধানের পর তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন খোলাফায়ে রাশেদীন তথা চার খলিফা। নতুন নতুন এলাকায় ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে সেখানে ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে তারা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনের ব্যাপক পঠন-পাঠন, গবেষণার পাশাপাশি সিলেবাসভিত্তিক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চার খলিফা হযরত আবু বরক সিদ্দিক (রা.) (৬৩২-৬৩৪), হযরত উমার ফারুক (রা.) (৬৩৪-৬৪৪), হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬), হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১) ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও পণ্ডিত। তাদের খিলাফতের সময়কালে মূলত ইসলামী শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ইয়ামামার যুদ্ধে সত্তরজন হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করলে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করে যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা.)-এর মাধ্যমে কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর এ মহান উদ্যোগ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা রক্ষার ব্যাপারে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে হযরত উসমান (রা.) তাঁর শাসনামলে কুরআন সংকলনের কাজটি চূড়ান্তরূপে সম্পাদন করে তার সাম্রাজ্যের সকল স্থানে কুরআনের সংকলিত চূড়ান্ত কপি বিতরণ করে পবিত্র কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন।[৯২] হযরত উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতকালে রাষ্ট্রের বিখ্যাত মসজিদগুলোতে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করেন। কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি, গণিত, কাব্যচর্চা,

---

৯১. প্রাগুক্ত।

৯২. মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হতো। মদীনা মসজিদের সংস্কার ছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে মূলত শিক্ষার প্রসার ঘটান।[৯৩]

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর আমলে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মসজিদকেন্দ্রিক। শিক্ষা তখন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তিনি শিক্ষকগণকে বায়তুল মাল থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেন। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে তিনি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। মক্কা-মদীনা ছাড়াও কুফা, বসরা, দামেস্ক, ফুস্তাত প্রভৃতি শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি 'দারুল ফাতওয়া' চালু করেন। একজন প্রসিদ্ধ ফকিহ হিসেবে তিনি ফাতওয়া দিতেন। বিশেষত ফিকহ ও ইসলামী আইন-কানুন শেখানোর জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট ফকীহদের নিয়োগ দিতেন। শিশু শিক্ষার জন্য তিনি মক্তব ব্যবস্থা চালু করেন। পবিত্র কুরআনের হাফিজদের পুরস্কার ও ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও চিন্তায় ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি শহর ও গ্রাম তখন পঠন-পাঠনের জনপদে পরিণত হয়।[৯৪]

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ব্যাকরণ রচিত হয়। তাঁর আমলে কুফা নগর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। তিনি নিজেই সেখানে কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন। তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলী' আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল ইসলামী শিক্ষার স্বর্ণযুগ। উক্ত সময়কালে ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের সূত্রপাত হয়। আরবী ব্যাকরণ রচিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের চূড়ান্ত বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৯৫]

উমাইয়া আমল

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ১৪ জন উমাইয়া বংশের খলিফা শিক্ষা বিস্তারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। এ আমলের খলিফাদের মধ্যে খলিফা আব্দুল মালিক, প্রথম ওয়ালিদ, উমর বিন আব্দুল আজিজ-এর নাম শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৯৬] খলিফা আব্দুল মালিক আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করেন। আরবী সহজতর পঠন ও লিখনের জন্য তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আরবী বর্ণমালার হরকত ও নোকতা প্রবর্তন

---

৯৩. *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৯৪. মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

৯৫. প্রাগুক্ত।

৯৬. আব্দুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এর ফলে আরবী ভাষা ব্যপাকভাবে প্রসার লাভ করে। তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েবকে কুরআন মাজীদের তাফসীর করার জন্য নিয়োজিত করেন। তিনি সাহিত্যিক ও কবিদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর নির্দেশনায় হিশাম ইব্‌ন আব্দুল মালেক ফারসী ভাষায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করেন, যা জ্ঞানের রাজ্যে অনন্য সংযোজন বটে। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) শিক্ষার একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হাদীস সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা তাঁর শাসনামলের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল কীর্তি। এ যুগে সাম্রাজ্যের মসজিদগুলো ছিল শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র। তাঁর অনুপ্রেরণায় অনেক ধনী ব্যক্তিরা অসংখ্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য তাদের সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন। তাঁর শাসনামলে কুরআন-হাদীসের চর্চা ও গবেষণার জন্য মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা এবং মিশরে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।[৯৭]

আব্বাসীয় আমল

আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮) কালে মোট ৩৭ জন খলিফা ছিলেন। মুসলিম শাসনামলের মধ্যে আব্বাসীয় যুগেই জ্ঞানানুশীলন এবং শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সর্বাধিক হয়েছিল বিধায় ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে স্যভতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ হিসবে অভিহিত করেছেন। 'বায়তুল হিকমাহ' আব্বাসীয় আমলের অনন্য ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সৃষ্টি। আব্বাসীয় খলিফাগণ বিজয়াভিযান পরিত্যাগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বেশী আত্মনিয়োগ করেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠে। তাঁরা ধ্বংস ও বিলুপ্তপ্রায় ইরাক, মিশর, পারস্য ও গ্রীসের প্রাচীন সাহিত্য, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে শুধু রক্ষাই করেন নি; বরং তাতে জীবনীশক্তি দান করে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলেন। এ যুগের খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম পণ্ডিতগণ চিকিৎসা বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা চালিয়ে বহু নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্ঞানের রাজ্যে নবদিগন্তের সূচনা করেন।[৯৮]

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা

৭১২ খ্রি. মুহাম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়ে ধীরে ধীরে তা বিস্তৃত হতে থাকে। একই সাথে ইসলামী শিক্ষাও বিস্তার লাভ করে। অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দী ছিল মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

---

৯৭. *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতির সোনালী যুগ। ফলে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রছায়ায় সযত্নে লালিত ও বিকশিত হয়েছে ইসলামের ঐতিহ্যময় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা। ইসলামী আদর্শের প্রচারে মুবাল্লিগ ও মুসলিম বণিকদের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা এসেছিলেন আরব, ইরান, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া থেকে এবং এ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তারা এ দেশে গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য শিক্ষা কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান।[৯৯] উক্ত সময়ে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পুনর্গঠনে ও প্রতিষ্ঠায়নে সাধারণ মুসলমানদের আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়টি ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অনেকেই এ শিক্ষার বিস্তারে তাঁদের সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দেন। এজন্য তখন দেশে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থারই প্রাধান্য ছিল। এ ব্যাপারে জনাব মোহাম্মাদ আব্দুল হাই বলেন, "প্রাচীন ভারতবর্ষ এমনকি মধ্যযুগের মুসলিম ভারতও ধর্মপ্রবণ ছিল। তাই দেখা যায়, মুসলিম ভারতের শিক্ষা প্রণালী মূলত ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল। শিক্ষানুশীলনকারী ছাত্রদের মানসিক বৃদ্ধি ও শারীরিক শক্তি যাতে সংহত হয়, চরিত্র গঠনের দ্বারা নৈতিক এবং আর্থিক জীবনের যাতে উন্নতি হয়, মুসলিম ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে সেই দৃষ্টিই সক্রিয় ছিলো। ইসলামের আদর্শের সাথে মুসলিম ভারতের শিক্ষা প্রণালীরও যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিলো।"[১০০]

সুলতান মাহমুদ (১০০১-১০৩০) সতেরো বার ভারত বিজয় করে পুরো ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার দ্বারও উন্মুক্ত করেন। তিনি গজনীকে তদানীন্তন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি তখনকার জগদ্বিখ্যাত চারশতের অধিক কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিককে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন।[১০১] প্রখ্যাত কবি ফেরদৌসী (৯৪০-১০২০), আলবেরুনী (৯৭৩-১০৫০) প্রমুখ ছিলেন তাঁর দরবারের অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

সুলতান শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬) শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রখেন। আজমিরী মসজিদ, দিল্লীর কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদসহ তিনি অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কৃতদাস শিক্ষা প্রকল্পের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। মুহাম্মদ ঘোরী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এস. এম জাফর বলেন, "ভারতীয় রাজা-বাদশাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ঘোরী ছিলেন সর্বপ্রথম শাসক যিনি শিক্ষা বিস্তারকে নিজ দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাই ভারতে ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ

---

৯৯. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *ঐতিহ্যের সোনালী অধ্যায়* (সিলেট : জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৮৭

১০০. মোহাম্মদ আব্দুল হাই, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ১৭৪

১০১. ড. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনে মুহাম্মদ ঘোরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।"[১০২] অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০) মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, মক্তব, খানকা পরিচালনা, কুরআন-হাদীস, ফিকহ, উসূল প্রভৃতি শিক্ষাদানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিজয়ের পর বাংলায় ব্যাপকহারে মসজিদ-মাদরাসা নির্মিত হয় এবং ইসলামী শিক্ষার নবদিগন্তের সূচনা হয়। সুলতান ইলতুত মিশ (১২১১-১২৩৬) বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষানুরাগী ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তাঁর শাসনামলে বহু মক্তব-মাদরাসা, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁর কন্যা সুলতানা রাজিয়া ও কনিষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬) পিতার মত শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। মুসলিম ভারতের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।[১০৩] সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৬) খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দিন খিলজী (১২০৯-১২৯৬), সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬), তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াস উদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫), সুলতার মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১), ফিরুজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮) প্রমুখের আমলেও এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। কুরআন-হাদীস ছাড়াও তর্কশাস্ত্র, গ্রিক ও মুসলিম দর্শন, শরীর বিদ্যা, ভেষজ শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও তারা ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করায় উপরোক্ত শিক্ষারও ব্যাপক অগ্রগতি পরিলক্ষিতি হয়।

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদী ও শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তা একবাক্যে স্বীকার করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ যুগকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে বাংলা প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। প্রতিটি মসজিদে বাধ্যতামূলক মক্তব চালু করা হয়। গৌড়, পাণ্ডুয়া, মহীসর, সোনারগাঁও নামর, মান্দারল, বাঘা, রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে। তাদের আমলেই সামরিক শিক্ষা সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় এবং টোল প্রথা চালুর মাধ্যমে হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

মোগল শাসনামল ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রত্যেক মোগল শাসকই ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১), সম্রাট নাসির উদ্দিন হুমায়ুন (১৫৩১-১৫৪০), সুরি বংশে প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫) প্রমুখ প্রত্যেকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাস্তাঘাট নির্মাণের পাশাপাশি

১০২. প্রাগুক্ত।

১০৩. মোহাম্মদ আব্দুল হাই, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, টোল পাঠশালা নির্মাণ করে সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে তারা শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। মোগল সাম্রাজ্যের তিন শ্রেষ্ঠ শাসক সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৫), সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮), সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) নিজেরা যেমন উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিত ছিলেন তেমনি তাদের আমলে মসজিদ-মাদরাসার ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয় এবং ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গবেষণার জন্যও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। বিশেষত সম্রাট আওরঙ্গজেব (আলমগীর) ইসলামী শিক্ষা তথা ইসলামী আইন ও ফিকহ শাস্ত্রের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত 'ফতোয়ায়ে আলমগীরী' মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে আজও সমাদৃত।[১০৪] কয়েক শতাব্দীকাল জুড়ে পরিব্যাপ্ত মোগল শাসনামলে এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। মুসলিম শাসক, আলেম-উলামা ও দ্বীনদার লোকদের প্রচেষ্টায় গোটা ভারতবর্ষে অগণিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যপক বিস্তার ঘটে। তাঁরা শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বরাদ্দ করেন।[১০৫] সে সময় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তব, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ফারসী মাদরাসা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য আরবী মাদরাসা ছিল। সুলতান মাহমুদ গজনীর শাসনকাল থেকে কোম্পানির শাসনকাল পর্যন্ত ফারসী ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা।[১০৬] মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে শুধু দিল্লীতেই এক হাজার মাদরাসা ছিল। ম্যাক্সমুলারের দাবি মতে, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই আশি হাজার বিদ্যালয় ছিল। স্যার জন এডামের রিপোর্ট অনুযায়ী তখন বংলা ও বিহারে এক লক্ষ স্কুল ছিল। প্রতি ৪০০ জনের জন্য গড়ে একটি ও প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় ছিল।[১০৭]

উপরোক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি অসংখ্য গুণী মনীষি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখছেন যা গবেষণার দাবী রাখে।

---

১০৪. প্রাগুক্ত।

১০৫. ড. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

১০৬. মোহাম্মদ আব্দুল হাই, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন আমলে সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ

সংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি : উৎপত্তি, স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কৃত (সম+কৃ+ত) বা (সম-কৃ+ক্তিন) থেকে উদ্ভব হয়েছে। সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কৃত শব্দের বিশেষ্য আর সংস্কৃত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংস্কার, উন্নয়ন, নির্মলকরণ, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ, বিচার-বুদ্ধি সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, সাধনা ও প্রতিষ্ঠা বুঝায়। সংস্কৃতিবান মানুষ মাত্রই সুনাগরিক, সুপ্রতিবেশী, দায়িত্বশীল, সহিষ্ণু, কল্যাণকামী ও হিতবাদী সজ্জন। এক কথায়, যা কিছু ন্যায়, বিশুদ্ধ, শ্রীমান, উপকারী ও নির্দোষ তাই সংস্কৃতির পরিচায়ক ও উপকরণ। মানুষের মনের, আত্মার ও জীবনাচারের সৌন্দর্য বর্ধক ও প্রকাশক যা কিছু তা-ই সংস্কৃতি। অনুভবে, কথায়, কাজে ও আচরণে অভিব্যক্ত সৌজন্যই সংস্কৃতি।[১০৮] মুহাম্মদ বাসিরউদ্দিন আখন্দ বলেন, "সংস্কৃতি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে সংস্কার বা মার্জনা দ্বারা প্রাপ্ত (সম-কৃ ধাতু+ক্তিন)। আর কৃষ্টি শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ যা কর্ষণের দ্বারা লব্ধ (কৃষ-ধাতু+ক্তিন)। সুতরাং দেখা যায় বুৎপত্তিগত দিক থেকে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলতে বুঝায় অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ মানব মনের মার্জিত ও উন্নত অবস্থা, রুচি ও আচরণের উৎকর্ষ এবং বুদ্ধিভিত্তিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিণত অবস্থা।"[১০৯]

সংস্কৃতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো culture। এ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ CALTURE থেকে গৃহীত। এর অর্থ হল কৃষিকার্য বা চাষাবাদ। তার মানে জমিতে উপযুক্তভাবে বীজবপন ও পানি সিঞ্চন করা, বীজের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও বিকাশ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। বিশেষজ্ঞরা culture শব্দের অনেকগুলো অর্থ উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু এ শব্দকে সাধারণত উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং ভদ্রজনোচিত আচার-ব্যবহার ও আচরণ অর্থেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ললিত কলাকেও culture বলে অভিহিত করা হয়। অশিক্ষিত ও অমার্জিত স্বভাবের লোকদের uncultured এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, সুরুচিসম্পন্ন ও ভদ্র আচরণ বিশিষ্ট মানুষকে cultured বলা হয়। আবার culture বলতে একদিকে মানুষের জাগতিক, বৈষয়িক ও তামাদ্দুনিক উন্নতি বুঝায় আর অপরদিকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়।[১১০]

---

১০৮. ড. আহমদ শরীফ, *শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতি* (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৭৬

১০৯. মুহাম্মদ বাসিরউদ্দীন আখন্দ, *মরো মুসলিম শিল্প সংস্কৃতি* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১

১১০. *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০-২৫১

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি শব্দটির ব্যবহার কখন থেকে শুরু হয়েছে তার নির্দিষ্ট কোন তারিখ বা সময় কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে এর ইংরেজি প্রতিশব্দ culture-এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। Arnold তার Culture and Anarchy গ্রন্থে culture শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।[১১১] কৃষ্টি শব্দটাকে অনেকে Culture-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পছন্দের কারণে Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলাতে 'সংস্কৃতি' আর 'সভ্যতা' শব্দ দু'টির অর্থ খুব বেশী সুনির্দিষ্ট নয়। কারো মতে, যা মনের সুখ বিধান করে তা সংস্কৃতি, আর যা দেহের সুখ বিধান করে তা হলো সভ্যতা। অনেকে বলেন, সংস্কৃতি হলো তাই যা মানুষ তার আপন প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতি হলো মানুষের তৈরি পরিবেশ।[১১২]

বিভিন্ন মনীষিগণ সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন, ড. নূরুল আলম বলেন, "মানুষ তার কৃত যে আচরণটিকে সুশীল, সুবোধ, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন, সুফলদার ও সুন্দর বলে মনে করে এবং পরিণামে যে তার সে আচরণটিকে মনেপ্রাণে ও অভ্যাসে সযত্নে লালন করে, ধারণ করে এবং পৌণপুণিক করার জন্য অভ্যাসে পরিণত করে এ ধরনের যে কোন আচরণ বা ক্রিয়া-কর্ম, অভ্যাস, চাল-চলন বা প্রথাই সংস্কৃতি।"[১১৩] ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন, "সংস্কৃতিকে অর্থের দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করতে পারি। যথা ১. সংস্কৃত জীবন, ২. বস্তু সংলগ্ন, ৩. মানব সম্ভূত। প্রথমত, সংস্কৃতি জীবনযাত্রার নিয়ম-পদ্ধতি যথা আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়া-কলাপ, শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু ও উপকরণ তথা ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র-অংলকার ইত্যাদি। তৃতীয়ত, মানস ফসল, যথা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এসব কিছুর সমন্বিত ফল সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়।"[১১৪] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের দৃষ্টিতে, "সংস্কৃতি হলো মানুষের অন্তরের জিনিস। এর পরিচয় প্রধানত ফুটে উঠে মানুষের ধর্মবিশ্বাস সামাজিক নীতি, আইন-কানুন, শিল্পকলা, সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে।"[১১৫] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "নির্মিত সামগ্রীতে শ্রী, যন্ত্র উৎকর্ষ, চিন্তায় শ্রেয়োবুদ্ধির দীপ্তি, কর্মে কল্যাণ চেতনার ব্যঞ্জনা, আচরণে সৌজন্যের আভা, সজ্জায়

---

১১১. ড. এ. কে. এম নূরুল আলম, *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য* (কুষ্টিয়া : ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১৮

১১২. ড. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া* (ঢাকা : মজিদ পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৩

১১৩. ড. এ. কে. এম নূরুল আলম, *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

১১৪. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোক-সংস্কৃতি* (ঢাকা : গতিধারা, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৪

১১৫. ড. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্য, কথায় মাধুর্য, চোখে প্রীতির প্রভা এবং জীবনাচারে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের আগ্রহ আর সুরুচির ও সৌজন্যের সামগ্রিক লাবণ্যই সংস্কৃতি।"[১১৬]

ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী বলেন, "সংস্কৃতি বলতে ব্যাপকভাবে মানুষের জীবন যাত্রার ধারা, ধর্ম, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং তার বাঁচার ও জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় উপকরণ ও দ্রব্যকে বুঝায়।"[১১৭] প্রখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক Will Darun এক নিবন্ধে culture বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : "সংস্কৃতি সভ্যতার অভ্যন্তর ও অন্তঃস্থল থেকে আপনা থেকে উপচে ওঠে। যেমন, ফুলবনে ফুল আপনা থেকেই ফুটে বের হয়ে আসে। তার মতে সংস্কৃতিতে Regimentation বা কঠোর বিধিবদ্ধতা চলে না। জাতীয় সভ্যতার প্রভাব যেসব আদত-অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র আপনা থেকে গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তাই সংস্কৃতি।"[১১৮] প্রখ্যাত দার্শনিক কবি T. S. Eliot সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন, "সংস্কৃতির দু'টি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ– একটি ভাবগত ঐক্য আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোন রূপ বা দিক। তাঁর মতে সংস্কৃতি ও ধর্ম সমার্থবোধক না হলেও ধর্ম সংস্কৃতিরই উৎস। সংস্কৃতি রাষ্ট্র-শাসন পদ্ধতি, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দর্শনমূলক আন্দোলন-অভিযানেও প্রভাবিত হতে পারে।"[১১৯] সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী গোল্ড স্মীথ বলেন :

"Culture is the patterned whole of responses the more or less consistent unity that links the divers elements of living into a way of life."

অর্থাৎ জীবন যাপনে বিভিন্ন উপাদানকে এক সাথে গ্রথিত করে যে জীবনধারা গড়ে উঠে তারই নাম সংস্কৃতি।[১২০]

E. B. Teylor এর মতে :

"Culture is the complex whole which includes knowledge, belife, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society."

---

১১৬. ড. আহমদ শরীফ, শিক্ষা, *সংস্কৃতি ও প্রগতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

১১৭. ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৪০

১১৮. *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

১২০. মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার, *আমাদের সংস্কৃতি : বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ* (ঢাকা : BIIT, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন, প্রথা, শিল্পকলা এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও অভ্যাস অর্জন করে সংস্কৃতি হলো তারই সামগ্রিক রূপ।"[১২১]

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা একই কথা।"[১২২] বিশিষ্ট কথাশিল্পী শাহেদ আলীর মতে, "মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে সেগুলোর ফলিত রূপই হচ্ছে সংস্কৃতি।"[১২৩] সৈয়দ মোস্তফা কামাল বলেন, "মানব জীবনের অসদাচারণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডকে বাদ দিলে মানুষের জীবন যাপন সুন্দর হয়ে উঠে। তাই বলা যায়, মানুষের পরিশীলিত জীবনধারাই সংস্কৃতি।"[১২৪]

ইংরেজি Culture শব্দটি বুৎপত্তিগত অর্থ ছাড়িয়ে ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ জন্য প্রিমিটিভ কালচার ও ফোক কালাচার উভয়ই স্বীকৃত ও আলোচিত হয়েছে। পরিশীলন অর্থে যদি সংস্কৃতি ধরা হয়, তবে তা হবে পরিমার্জিত একটি বিশেষ রূপ। শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ সবকিছুকে নিয়ে সংস্কৃতির সমগ্র পরিচয়। সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, "Culture is a conscious striving toward progress and perfection." অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো, প্রগতি ও পূর্ণতা লাভের একটি সচেতন কর্মপ্রয়াস।[১২৫] হুমায়ন কবির সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করছেন এভাবে, তিনি সভ্যতাকে বলেছেন Organization of life এবং সংস্কৃতিকে বলেছেন Expression of life। সভ্যতার সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, Culture is the essence of civilization.[১২৬] সাধারণ বিশ্বাস শিক্ষা ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ হয় না। একথা স্বীকার করলে বলতে হয়, সংস্কৃতি কেবল শিক্ষিত সমাজের আছে, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নেই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। জীবন মানের পার্থক্য থাকলেও শিক্ষার আলোপ্রাপ্ত সমাজ ও অজ্ঞাতায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ উভয়েরই সংস্কৃতি স্বীকৃত হয়েছে। সংস্কৃতির একটি আন্তঃপ্রকৃতি যেমন আছে তেমনি একটি বহিঃপ্রকৃতিও আছে। সংস্কৃতির সত্যিকার রূপ বলতে যা বুঝায় সেটা তার বহিঃপ্রকৃতিতে নেই, আছে তার অন্তঃপ্রকৃতিতে। যেমন পোশাকের সংস্কৃতিতে যে মানুষটি তৈরি হয় সেটি বাহিরের মানুষ। সত্যিকারের মানুষ বলতে আমরা

---

১২১. E. B. Tylor, *Primitive Culture* (London: 1873), P. 9; আলমগীর মুহাম্মদ ইউসুফ, *শিক্ষা ও সংস্কৃতি সেমিনার স্মারক* (ঢাকা : ডন প্রিন্টিং প্রেস, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২০৩

১২২. মোহাম্মদ সা'দত আলী, *মুসলিম সংস্কৃতি* (ঢাকা : রূপ প্রকাশন, ২০১৪ খ্রি,), পৃ. ৪৮-৪৯

১২৩. শাহেদ আলী, *ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা* (ঢাকা : ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৯

১২৪. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *প্রসঙ্গ বিচিত্রা সিলেট বিভাগের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবন বিবিধ* (সিলেট : ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৯৬

১২৫. E. B. Tylor, *Primitive Culture*, Ibid, P. 9.

১২৬. Humayan Kabir, *The Heritage* (Bombay: 1962), P. 37.

Dhaka University Institutional Repository

ভিতরের মানুষটিকে বুঝি। মানব সংস্কৃতির গূঢ় বক্তব্য এ কথার মধ্যে নিহিত আছে। আবুল হাশিম বলেন :

"Culture is the development of the faculties of man both external and internal and is its mainfestation in his dimidiate material environments."

অর্থাৎ মানুষের দৈহিক ও মানসিক বুদ্ধিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে তার ফলিত রূপকে সংস্কৃতি বলা হয়।[১২৭]

আরিফুল হক বর্ণনা করেন, "মানুষের মধ্যে পশুত্ব এবং মনুষ্যত্ব দুই পাশাপাশি বাস করে। বহুদিনের কুসংস্কার, কুশিক্ষা এবং ষড়রিপুর তাড়নায় মনুষ্যত্বের আয়না যখন ধুম্রশীল হয়ে পড়ে তখনি তার মধ্যে পশুত্ব প্রাধান্য পায়। মানুষ হয়ে উঠে পশু। পশু হয়ে না জন্মালেও কালের আবর্তে তাদের বিবেক, মনুষ্যত্ব এমনভাবে চাপা পড়ে যায় যে, তারা মানুষেরর আকৃতি নিয়ে জন্মালেও পশুর মত আচরণ করতে থাকে। এ সব চাপা পড়া অনাবাদী ধুম্রশীল মনুষ্যত্বের সংস্কার এবং উৎকর্ষ সাধনই হলো সংস্কৃতি।"[১২৮] আবু জাফর বলেন, "সংস্কৃতি হলো কোন জাতির এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী ও দীর্ঘ লালিত অভিজ্ঞান যার মধ্যে বিশ্বাস, বিবেক, ন্যায় ও সৌন্দর্যবোধ আঁকড়ে থাকার মত জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য এবং দর্শনের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ সংস্কৃতির দৃশ্যমান রূপ থেকে একটি জাতির দর্শন ও জীবন দর্শনকে চিনে নেয়া যায়।"[১২৯] মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সংস্কৃতি হলো সমাজ থেকে অর্জিত আচার-ব্যবহার। সমাজে একত্রে বসবাস করার ফলে মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়, তাদের একে অপরের উপর নির্ভরশীলতায় গড়ে উঠে একটি সমাজ ব্যবস্থা। উৎপাদন যন্ত্র ও কৌশল, বণ্টন বিধি, ভোগ-বিলাস এবং জীবন ধারার প্রক্রিয়াই সংস্কৃতি।"[১৩০]

পরিভাষায় বিশ্বাসলব্ধ মূল্যবোধে উদ্ভাসিত, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত মন-মানসিকতাকেই সংস্কৃতি বলা হয়। মানব জীবনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিমার্জিত রূপ হচ্ছে সংস্কৃতি। কোন জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা, মনের উৎকর্ষ ও অনুশীলনকে সাধরণ অর্থে সংস্কৃতি বলে। কোন জাতীয় বৈশিষ্ট্যমূলক শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস ও সমাজনীতিই হলো সে জাতির সংস্কৃতি। একটি জাতির আচার-আচরণ, কার্যকলাপ, জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সে জাতির সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতি কোন জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, আচার-পদ্ধতির বিকাশ ও উৎকর্ষের পরিচায়ক। সংস্কৃতি যখন বাস্তবে রূপায়িত

---

১২৭. শাহাবুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদের সংস্কৃতি, *অগ্রপথিক*, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ৮২

১২৮. আরিফুল হক, বাংলাদেশের সংস্কৃতি কোন পথে, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৮

১২৯. আবু জাফর, সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৮

১৩০. মোঃ আব্দুল লতিফ, ইসলামী সংস্কৃতি : একটি সমীক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৫, পৃ. ৭৭

হয় তখন তাকে সভ্যতা বলে। প্রত্যেক জাতির পৃথক পৃথক সংস্কৃতি বা কৃষ্টি রয়েছে। আর সংস্কৃতি ভাষা, পেশা, জীবনযাত্রা, ধর্ম, ভৌগোলিক সীমারেখা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। হিন্দুদের জন্য হিন্দু সংস্কৃতি, খ্রিষ্টানদের জন্য খ্রিষ্টান সংস্কৃতি, আরবদের জন্য আরবী এবং পারসিকদের জন্য যেমন পারসিক সংস্কৃতি রয়েছে ঠিক তেমনি মুসলমানদের জন্য রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জীবন পদ্ধতি আর ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য শাশ্বত জীবনাদর্শ। তাই এর অনুসারীদের রয়েছে একটি আদর্শ সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি উৎসারিত ও লালিত হয়, তাই ইসলামী জীবন দর্শন। আর ইসলামী জীবন দর্শন অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশ যে সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয় তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিশ্ব সৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ ও উন্নতি এবং পুত-পবিত্র সংস্কৃতির উদ্ভব ইসলামের দ্বারাই সূচিত হয়েছে। ইসলামের শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ থেকে সুস্থ সাংস্কৃতিক যাত্রা শুরু হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত। যারা আল্লাহর নিদের্শনাসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।"[১৩১] সুতরাং এ জীবন ব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি 'কালেমা তাইয়েবা'। এ কালেমার সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা, জীবনাচার এ সবের সামষ্টিক কার্যক্রমই ইসলামী সংস্কৃতি।[১৩২] ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলাম ধর্ম নির্দেশিত মুসলিম মিল্লাতের জীবন পদ্ধতি ও জীবনাচার হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতি অন্যান্য সকল সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী সংস্কৃতি ঈমানভিত্তিক স্রষ্টার প্রতি আস্থাশীল, মার্জিত, রুচিশীল, পরিশীলিত, উন্নত ধ্যান-ধারণা সংবলিত মানসিকতা, জীবনবোধ ও শালীন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে অরুচিকর, বেহায়া, বেমানান ও অশালীন

১৩১. আল-কুরআন, ৩:১৯

১৩২. মোহাম্মদ সা'দত আলী, *মুসলিম সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়াদি বর্জন করে গড়ে উঠে এবং তা অধিকরত ব্যাপক ও সার্বজনীন। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি বলতে মূলত বুঝায় :

১. উন্নততর চিন্তার মান যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য।

৩. মুসলিম জাতির জীবনধারা, ধর্মীয় কাজ-কর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম-প্রথার বিশেষ সংযোজন।[১৩৩]

বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায় :

১. কুরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।[১৩৪]

২. ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংস্কৃতি হলো ইসলামী সংস্কৃতি।[১৩৫]

৩. ইসলামী শরীয়া অনুমোদিত সকল কর্মকাণ্ড, ইসলামী মূল্যবোধের নিরিখে সর্বোত্তমরূপে সম্পাদনের নাম ইহসান। এ ইহসান হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।[১৩৬]

৪. ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে পরিগঠিত যে সংস্কৃতি মূলত সেটাই ইসলামী সংস্কৃতি।[১৩৭]

৫. সংস্কৃতিতে মানুষের মানবিক অবস্থা প্রকাশ করে, প্রকাশ করে তার অভ্যন্তরীণ ভাবধারাগত অবস্থা। তাই ইসলাম মানুষের মধ্যে যে মানসিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারা সৃষ্টি করে তারই প্রেক্ষিতে ব্যক্তি যে আচরণ করে তাই ইসলামী সংস্কৃতি।[১৩৮]

৬. ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে, ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশের নাম। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধসমূহ সক্রিয় থাকবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি ইসলামী ভাবধারার পরিচায়ক হবে। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়ামাবলি, বিধি-ব্যবস্থা পালনীয় এগুলোই ইসলামী সংস্কৃতি– যাকে দ্বীন বলা যায়। এ দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের পরিপূর্ণ রূপায়নে যে আচরিত রূপ তাই ইসলামী সংস্কৃতি।[১৩৯]

---

১৩৩. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

১৩৪. অধ্যাপক হাসান আইয়ুব, *ইসলামী দর্শন, সংস্কৃতি* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৯

১৩৫. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, *ইসলামী সংস্কৃতি* (ঢাকা : জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৪৯

১৩৬. এ. কে. এম নাসির আহমেদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৪

১৩৭. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

১৩৮. আব্দুস শহীদ নাসিম, *শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৯

১৩৯. আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি* (ঢাকা : প্রীতি প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫৫

শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়কে সাধারণত সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও আসলে এগুলো ঠিক সংস্কৃতি নয়; বরং সংস্কৃতির বাহনমাত্র। মানবমনের অন্তর্নিহিত শক্তি, কৌতুহল ও প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতি সমাজ দেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়; বরং তার সমগ্র রূপ। এজন্যই সংস্কৃতির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। খণ্ড বা আংশিক কর্মকাণ্ড কখনও মানুষকে তার মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করতে পারে না। প্রতিটি সমাজের সংস্কৃতির ভিত হচ্ছে তার বিশ্বাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সৌন্দর্য জ্ঞান। সংস্কৃতি কখনো মানুষের ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং ধর্মই পরিচালিত করে সংস্কৃতিকে। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে আরবভূমিতে। তাই বলে ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আরবের মানুষের জীবনাচরণকে বুঝায় না; বরং একজন মুসলিম সে যে অঞ্চলে বসবাস করুক না কেন তার রুচিবোধ, বাকভঙ্গি, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ আঞ্চলিক হলেও তার সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মীয় মূল্যবোধ তথা তাওহীদী বিশ্বাস।[১৪০]

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা ও ক্রমবৃদ্ধির জন্য তার দেহ ও প্রাণ বা আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষ একান্তই জরুরী। এ যেমন সত্য তেমনি একটি জাতির উন্নতি তখনি সম্ভব যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে। কেননা, সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে দেহ। মানব জীবন দু'টি দিক সমন্বিত : একটি বস্তুনির্ভর, অপরটি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক। এ দু'টিরই রয়েছে বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও দাবি দাওয়া। সে চাহিদা পরিপূরণে মানুষ প্রতিমুহূর্ত থাকে গভীরভাবে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত। একদিকে যদি দৈহিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাকে টানে এবং জীবিকার সন্ধানে সে হয় নির্লিপ্ত তাহলে তার আত্মার দাবি পরিপূরণ ও চরিতার্থতার জন্যে তার মন ও মগজ হয় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাই মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তার সহায়তা করে। আর ধর্মবিশ্বাস, শিল্পকলা, সৌন্দর্যবোধ ও দর্শন নিবৃত্ত করে তার আত্মার পিপাসা।[১৪১] অন্য কথায় ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম ও সুকোমল আবেগ-অনুভূতি এবং হৃদয় ও আত্মার দাবি ও প্রবণতা পূর্ণ করে যে সব উপাত্ত ও উপকরণ তাই হচ্ছে সংস্কৃতি। সঙ্গীত, কবিতা, ছবি অংকন, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতি এক একটা জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ মাধ্যম এবং দর্পণ। কোন বাহ্যিক ও বৈষয়িক উদ্দেশ্য লাভের জন্য এসব তৎপরতা সংঘটিত হয় না। আত্মিক চাহিদা পূরণই এগুলোর আসল লক্ষ্য। এসব সৃজনশীল কাজেই অর্জিত হয় মন ও হৃদয়ের সুখানুভূতি, আনন্দ ও উৎফুল্লতা। একজন দার্শনিকের চিন্তা ও মতাদর্শ, কবির কাব্য ও কবিতা, সুরকার ও বাদ্যকারের সুর ঝংকার– এ সবই

---

১৪০. মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার, *আমাদের সংস্কৃতি : বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

১৪১. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির হৃদয়-বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। এসবের মাধ্যমেই তার মন ও আত্মা সুখ, আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। এসব মূল্যমান, মূল্যবোধ, হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকেই হয় সংস্কৃতির রূপায়ন। কিন্তু সভ্যতার রূপ এ থেকে ভিন্নতর। নিম্নে সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা তুলনামূলক পরিচয় দেবার প্রয়াস পাবো।

১. বস্তুনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজন পূরণ ও সাবলীলতা বিধানে যা কিছু সাহায্যকারী তা সভ্যতা নামে অভিহিত।

কিন্তু মন-মানস ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সুখ, আবেগ-অনুভূতির চরিতার্থতার উপায়-উপকরণকেই বলা হয় সংস্কৃতি।

২. বস্তুনিষ্ঠ জীবনের রূঢ় বাস্তব ও প্রকৃত উন্নতির স্তর ও পর্যায় সমষ্টি হচ্ছে সভ্যতা। বিশেষ-নির্বিশেষ সকলের পক্ষেই তার মূল্য ও মান হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ও সম্ভব।

কিন্তু সংস্কৃতি অদৃশ্য ধারণা ও মূল্যমান সমষ্টি, তার মূল্যায়ন অতীব দুরূহ কাজ।

৩. সভ্যতা ক্রম-বিকাশমান, প্রতি মুহূর্ত উন্নতিশীল। প্রাচীন মতাদর্শের সাথে তার দূরত্ব ক্রম-বর্ধমান। তা নিত্য-নতুন দিগন্তের সন্ধানী।

কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থী। প্রাচীনতম দৃষ্টিকোণ ও মতাদর্শ থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়া তার পক্ষে কঠিন।

৪. সভ্যতা দেশের সীমা-বন্ধন মুক্ত– বিশ্বজনীন ভাবধারাসম্পন্ন। প্রায় সব চিন্তা-বিশ্বাসের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু সংস্কৃতির উপর পরিবেশ ও ভৌগোলিক বিশেষত্বের ব্যাপক প্রভাব প্রবর্তিত হয়।

৫. সভ্যতা স্থিতিশীল ও দৃঢ়তাপ্রবণ। তার প্রভাব সহজে নিশ্চিহ্ন হবার নয়; কিন্তু সংস্কৃতি প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্তই অস্থায়িত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরতার ঝুঁকির সম্মুখীন।

৬. সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলিই তার লীলাক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী ও বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানাদি এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে চলে যেতে পারে। স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্য তার পথে বাধা হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে। তার কল্যাণ লাভে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। বাছাই প্রক্রিয়াও এখানে অচল।

কিন্তু সংস্কৃতি সাধারণত এক বংশ থেকে তারই অধঃস্তন বংশে উত্তরিত হয়, তা সম্যকভাবে অর্জিত হয় না। বাছাই প্রক্রিয়া এখানে পুরোপুরি কার্যকর। কেবলমাত্র বিশেষ পরিমণ্ডলের লোকদের পক্ষেই তার কল্যাণ লাভ সম্ভব। দার্শনিকসুলভ চিন্তা-গবেষণা ও কবিসুলভ উচ্চ মার্গতার অনুভূতি যার তার পক্ষে আয়ত্তযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. সভ্যতা অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। সেখানে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আপন করে নিয়েছে; কিন্তু এ কার্যক্রমের ফলে তার সাংস্কৃতিক কাঠামো খুব শীগগীর প্রভাবিত হতে পারেনি। উপমহাদেশের জনগণের উপর ইংরেজের শাসনকার্যের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে এখানকার সভ্যতা উপকৃত হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার সংস্কৃতি তার আসল চরিত্র বা রূপরেখা হারায়নি।

কেননা, সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ জীবনকেন্দ্রিক। অন্তর্নিহিত জীবনই সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র। এই জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের মাধ্যম হচ্ছে সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে মন ও মগজকেন্দ্রিক আবর্তন-বির্তনের স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশ। এই কারণে সংস্কৃতি স্বাধীন-মুক্ত সমাজ পরিবেশেই যথার্থ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।[১৪২]

সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঢালাওভাবে এটা ঠিক নয়। তবে এ দু'টির মাঝে মূল্যমানের সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। মোটরগাড়ি সভ্যতার উৎপাদন। সংস্কৃতি তাতে সৌন্দর্য, শোভনতা ও চিত্ত বিনোদনমূলক কারুকাজ ও সূক্ষ্ম উপকরণাদি বৃদ্ধি করেছে। সভ্যতা আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, সংস্কৃতি সে প্রাসাদকে সুদৃশ্য, মহিমান্বিত এবং বিস্ময়কর প্যাটার্নে সুশোভিত করে দিয়েছে। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দু'টিই মানব জীবনের মৌল প্রয়োজন। যে জাতির জীবনে এক সাথে এ দু'টির সমন্বয় ঘটেনি তার উন্নতি অসম্ভব। সভ্যতা একটা জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিতে মহিমাময় করে আর সংস্কৃতি তাকে গতিবান করে নির্ভুল পথে। মানব সভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে এ দু'টির মাঝে গভীর একাত্মতা প্রকট। তাই সভ্যতার অর্থে সংস্কৃতি বা সংস্কৃতির অর্থে সভ্যতাকে গ্রহণ করা কিছুমাত্র অশোভন নয়।

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। ইসলামী জীবন দর্শন অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধসমূহ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ ও উন্নতি এবং পুত-পবিত্র সংস্কৃতির উদ্ভব ইসলামের দ্বারাই সূচিত হয়েছে। আর ইসলামের শ্রেষ্ঠনবী রাসূলে কারীম (সা.) থেকেই সুস্থ সংস্কৃতির ধারা নতুন করে শুরু হয়। তাই এ সংস্কৃতি নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

---

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

১. **কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক :** ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত, এটি মানব রচিত নয়। এর প্রবর্তক ও নিয়ন্ত্রক স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ। আর রাসূল (সা.) তা বাস্তবে রূপায়ণ করে দেখিয়েছেন। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন : اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَآءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ "তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে শুধু তারই আনুগত্য কর এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন পৃষ্ঠপোষকদের আনুগত্য করো না।"[১৪৩]

২. **পরিপূর্ণ তাওহীদভিত্তিক :** ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা হলো, এ কথা স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ গোটা বিশ্বের এক ও একক স্রষ্টা; তিনিই একমাত্র সার্বভৌম প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম, হেদায়াতের সর্বশেষ বিধান। ইসলামী মতাদর্শে তাওহীদ বিশ্বাস হলো সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক মৌলিক বিষয়। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই" এই ঘোষণাটি হচ্ছে তাওহীদের সার নির্যাস। আল্লাহ নিজেই বলেন, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ - اللهُ الصَّمَدُ "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।"[১৪৪] আল্লাহকে এক ও লা-শরীক সার্বভৌম বলে স্বীকার করা এবং সকল মানুষকে মূলগতভাবে সমান অধিকারসম্পন্ন মেনে নেয়া এবং বাস্তবক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন পরিচালিত করাই হলো ইসলামী সংস্কৃতির মর্মবাণী।

৩. **আদর্শ ভিত্তিক :** ইসলামী সংস্কৃতি যেমনি ব্যাপক তেমনি আদর্শভিত্তিক। এ আদর্শ বিশ্ব মানবতার জীবনাদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"[১৪৫]

৪. **বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন :** ইসলামী সংস্কৃতি একটি বিশ্বজনীন মানবীয় সংস্কৃতি। এটি দেশ, কাল, পাত্র, জাতি ও ভাষায় সীমাবদ্ধ নয়। তাওহীদের বিশ্বাসী হয়ে যে কোন দেশ, জাতি ও কালের যে কেউ এ সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন : يٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا "হে মানবসকল! তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে তোমাদের কাছে শাশ্বত চিরন্তন প্রমাণ এসেছে আর তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা প্রেরণ করেছি।"[১৪৬]

---

১৪৩. আল-কুরআন, ৭:৩

১৪৪. আল-কুরআন, ১১২:১-২

১৪৫. আল-কুরআন, ৩৩:২১

১৪৬. আল-কুরআন, ৪:১৭৪

৫. **পারস্পারিক কল্যাণকামী :** ইসলামী সংস্কৃতি মার্জিত, মানবতাবদী এবং একে অপরের কল্যাণকামী। মুসলমানরা তাদের একে অপরের কল্যাণকামী সহযোগী ও উপদেশ দানকারী। ইসলামে পুরো দ্বীনকে নসীহত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন : وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ "শপথ যুগের! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং উপদেশ দেয় সবরের।"[১৪৭]

৬. **কল্যাণকর ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর :** এ সংস্কৃতি সর্বোতভাবে কল্যাণকর। মানবতার কল্যাণই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যই এর সকল কর্মতৎপরতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ "তোমরা উত্তম জাতি। মানবতার কল্যাণেই তোমাদের উত্থান।"[১৪৮]

৭. **পবিত্রতা ও নৈতিকতাবোধ :** ইসলামী সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো পুত-পবিত্রতা ও নৈতিকতাবোধ। এক আল্লাহমুখী হওয়ার কারণে ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করে, যা সব ধরনের কলুষতা, আবিলতা, পংকিলতা, সংকীর্ণতা, হঠকারিতা, কপটতা, ধোঁকা, প্রতারণা, বকধার্মিকতা, অশ্লীলতা, উলংগতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পাপাচার ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে তিন ধরনের পুত-পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে : ক. মনকে পবিত্র করে, খ. চরিত্র, আচার-আচরণ ও কথাবার্তাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে, গ. দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল করে।[১৪৯]

৮. **বিশ্বমানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠা :** এ কথা স্বীকৃত যে, মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে মানুষের পারস্পারিক ঐক্য অপরিহার্য। ঐক্য ছাড়া মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ধারণা করা যায় না। বিশ্ব মানবের পরস্পরের পরিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করতে হলে চিন্তার ঐক্য বিধান সর্বপ্রথম কর্তব্য। তারপরই হলো কর্মের ঐক্য ও সামঞ্জস্য। মানব সমাজে সার্বিক ঐক্য তাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষের মনন-চিন্তা ও মানসিকতার ঐক্য ও সামঞ্জস্যই হচ্ছে বিশ্বমানবের কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের একমাত্র উপায়।[১৫০]

---

১৪৭. আল-কুরআন, ১০৩:১-৩
১৪৮. আল-কুরআন, ৩:১১০
১৪৯. আব্দুস শহীদ নাসিম, *শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১৫০. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৯. **কর্তব্য ও দায়িত্বানুভূতি :** ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন তার নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয় তেমনি সমষ্টির প্রতিও দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাকে সচেতন হতে হবে। একজন অনুগত সন্তান স্নেহময় পিতা, সহৃদয় ভাই-বোন, বিশ্বাসী স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই অধিকার এখানে সুনির্ধারিত। অধিকার হরণ বা লঙ্ঘন তার কাছে চিরন্তন আযাবের কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ জন্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সে বদ্ধ পরিকর। এতে করে অর্থনৈতিক শোষণ ও লুণ্ঠন আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য। তার ফলে এ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না। ফলে সমাজের সকল জনগোষ্ঠী স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবে নিঃসন্দেহে।

১০. **শাশ্বত ও চিরন্তন :** ইসলামী জীবন বিধান যেমন চিরস্থায়ী ও জীবন্ত, ইসলামী সংস্কৃতিও তেমনি চিরস্থায়ী ও জীবন্ত। এ সংস্কৃতি চিরন্তন, শাশ্বত, প্রগতিশীল ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত। এভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন সংস্কৃতি। এটি অনন্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ আব্দুস শহীদ নাসিম ইসলামী সংস্কৃতির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন যা নিম্নরূপ :

ক. আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও এক আল্লাহমুখীতা; খ. আল্লাহপ্রেম, আল্লাহভীতি, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের প্রেরণা; গ. আখিরাত বা পরকালের চিন্তা; ঘ. আত্মশুদ্ধি, আত্মার প্রশান্তি; ঙ. নৈতিক মূল্যবোধ; চ. চিন্তা, চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা; ছ. অনাবিলতা ও পরিচ্ছন্নতাবোধ; জ. সৌন্দর্যবোধ; ঝ. দায়িত্বানুভূতি; ঞ. উদারতা ও মনের বিশালতা; ট. মানবতাবোধ; ঠ. আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তি স্বতন্ত্রবোধ; ড. মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান; ঢ আত্মীয়তাবোধ; ণ. সামাজিকতাবোধ; ত. নির্লোভ ও নিরহংকার মানস; থ. দয়া, মায়া, ক্ষমতা, কোমলতা ও ভালোবাসা; দ. নেতৃত্ববোধ; ধ. বিনয়, আনুগত্য ও শৃঙ্খলতাবোধ; ন. আদর্শবোধ, রিসালাতের অনুবর্তন; প. মিশনারী মনোভাব; ফ. সুবিচার, ব. সহিষ্ণুতা; ভ. ভারসাম্যতা; ম. বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতা।[১৫১]

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ইসলামী সংস্কৃতির ১০টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো : ক. তাওহীদ; খ. মানবতার সম্মান; গ. মানবীয় ভ্রাতৃত্ব; ঘ. বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ; ঙ. বিশ্বব্যাপকতা বা সার্বজনীনতা; চ. বিশ্বমানবের ঐক্য; ছ. কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ; জ. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং পংকিলতা থেকে মুক্তি; ঝ. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা; ঞ. ভারসাম্য, সুষমতা ও সামঞ্জস্যতা।[১৫২]

---

১৫১. আব্দুস শহীদ নাসিম, *শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৫২. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে, তা ইসলামী সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতিতে এর কোন উপাদান ও ভাবধারার অভাব থাকবে তা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি হতে পারে না।

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ

ইসলামী সংস্কৃতির রূপকাঠামো দু'টি মৌলিক বিষয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। একটি বিশ্বাসমূলক অপরটি কর্মমূলক। কর্মমূলক অংশটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড অপরটি দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড। দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডের আবার তিনটি শাখা রয়েছে :

১. প্রচলিত কিন্তু ইসলামী আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন, অশ্লীলতা, অনৈতিকতা, শিরক, বিদআত ইত্যাদি।

২. প্রচলিত কিন্তু ইসলামী আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যেমন, অমুসলিমদের সাথে চলাফেরা, লেনদেন, জাতীয় ও গোষ্ঠীয় কর্মকাণ্ড। যেমন, নবান্ন, স্বাধীনতা উৎসব ইত্যাদি।

৩. সরাসরি ইসলামের নির্দেশের আলোকে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড। যেমন, হালাল উপার্জন, পরোপকার, আদল, ইহসান, সালাম আর্তমানবতা সেবা ইত্যাদি।[১৫৩]

এ সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীয় স্বার্থ সময় বা কালের পরিবর্তিত চাহিদা, কারো মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির ন্যূনতম হস্তক্ষেপর সুযোগ নেই। এতে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন বা সংশোধনেরও অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা : وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا "আল্লাহ তা'আলার নীতি পদ্ধতিতে কখনোই কোন পরিবর্তন পাবে না।"[১৫৪] কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কোন সংস্কৃতির স্থান ইসলামে নেই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা লক্ষ্য করা যায়। কারণ, একথা অনস্বীকার্য যে, বহুদিন এদেশ ভিনদেশী বিজাতীয় শাসেন ছিল। ফলে দীর্ঘদিনের শাসন-অপশাসনে নানা প্রকার প্রচলন ও সংস্কৃতি জেঁকে বসেছে স্থানীয় মানুষের মনে। কালক্রমে কিছু কিছু রীতি অন্য ধর্ম এবং অন্য জাতির আচার ও কৃষ্টি থেকে এসে জায়গা করে নিয়েছে মুসলিম আচার ও কর্মে। কিছু মানুষ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান অথবা অন্য ধর্ম, গোত্র, নৃ-গোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এসেছেন। এই জনগোষ্ঠী মুসলিম ধর্মাচারকে আলিঙ্গন করলেও প্রথম জেনারেশনে পুরনো সংস্কৃতি তাদের মনোজগত থেকে অতি সহজে মুছে ফেলতে পারেননি। বিভিন্ন

---

১৫৩. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, অপসংস্কৃতি, *ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রভাব*, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, মে ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১০৬

১৫৪. আল-কুরআন, ৩৩:৬২

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাবর্তে এক সময়ে সেসব অনুপ্রবেশ করেছে মুসলিম সংস্কৃতিতে। পি. কে. হিট্টি এ প্রসঙ্গে বলেন, "ইসলামী কৃষ্টিকে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন উপাদানের সুষ্ঠু ও নিপুণ সমন্বয় হিসেবেই চিহ্নিত করা হয় না; বরং এই কৃষ্টির স্থাপতিরা ছিলেন বহু জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদী, সেমেটিক, হেমেটিক এবং ইন্দো ইউরোপীয়। এ সমস্ত জাতি, গোষ্ঠী, বিভিন্ন ধর্ম এবং মতবাদ পুষ্ট এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে তারা বসবাসকারী।"[১৫৫] এ কারণে সংস্কৃতির নামে মুসলিম সমাজে নানা শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এটি সমাজ ও জাতির জন্য মারাত্মক ব্যাধি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দারুণভাবে এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। বিশেষত কবরপূজা, কবরস্থ ব্যক্তির কাছে নিজের ইচ্ছা পূরণের কিছু চাওয়া, সন্তান কামনা করা, কবরে সৌধ নির্মাণ করা, পীর-আউলিয়ার নামে মানত করা, শবে বরাতে হালুয়া রুটি খাওয়া, পটকা ফোটানো, তাজিয়া মিছিল, শরীরে আঘাত করা, মাতম করা, ওরশ করা, বিয়ের অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদ, কবরে ফুল দেয়া, মোমবাতি জ্বালানো, মঙ্গলশোভা যাত্রা, রাশিফলে বিশ্বাস করা, গণক বিশ্বাস করা প্রভৃতি। এ সবের মধ্যে অনেকটা বিদআত, কিছুটা শিরক এবং কিয়দংশ কুসংস্কার। শুভ-অশুভ আলামতের অন্তর্ভুক্ত সকল বিশ্বাসের রূপই এর পর্যায়ে পড়ে। স্থান ও কালভেদে এ বিশ্বাসগুলো বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করলেও তার মূল ভিত্তি শিরক।[১৫৬] মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীস দ্বারা এরূপ কর্মকাণ্ডকে পরিত্যাগ করার অসংখ্য নিদের্শনা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং একজন মুসলমান হিসেবে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। একজন মুসলমানের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথই প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা ও নিত্যদিনের পথ।[১৫৭] ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বনবী (সা.)-এর ওহীভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ আবশ্যক করে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"[১৫৮]

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা নিদের্শিত এবং বিশ্বনবী (সা.) কর্তৃক বাস্তবায়িত ইসলামী সংস্কৃতি মানব জাতি তথা মানবতার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতির রোল মডেল। এ সংস্কৃতিতে বিশ্ববাসীর নামায,

---

১৫৫. P. K. Hitti, Islam : A way of life, ভাষান্তর : ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলাম : একটি জীবন ব্যবস্থা* (ঢাকা : আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৫

১৫৬. ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, ভাষান্তর : ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ হাছান, *তাওহীদের মূল নীতিমালা* (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১০৪

১৫৭. মোহাম্মদ সা'দত আলী, *মুসলিম সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৫৮. আল-কুরআন, ৫৯:৭

Dhaka University Institutional Repository

রোযা, ক্রিয়া-কর্ম, জীবন-মরণ সব কিছুই আল্লাহর জন্য নিবেদিত। এ সংস্কৃতিতে কোন আরব-অনারব, শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায়, উচু-নীচু পার্থক্য নেই। সকল মানুষ এক আদম সন্তান। এ সংস্কৃতিতে ধনী, গরীব, নিঃস্ব, অসহায়, রাজা-বাদশাহ সবাই একাকার। সুতরাং মানবতার জন্য এর চেয়ে উত্তম সংস্কৃতি পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই।

সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পৃথিবীর সব জিনিসের মতো সংস্কৃতিরও একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। লক্ষ্যহীন সংস্কৃতি আদতেই সংস্কৃতি নামের যোগ্য নয়। তা নিতান্ত তামাসামাত্র ও ছেলেখেলা। যদিও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের মন-মগজ, রুচিবোধ, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবন চরিত্র। এ সমগ্র ক্ষেত্রব্যাপী মানুষের একক ও সামষ্টিক প্রচেষ্টাই সংস্কৃতির সাধনা, চাষীর শ্রম-মেহনত, চেষ্টা-সাধনা ও সর্তকতা উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না, তেমনি সংস্কৃতির সাধনাও কোন পর্যায়ে উদ্দেশ্যবিহীন হওয়া কাম্য নয়। চাষীর লক্ষ্য যেমন ক্ষেতভরা সোনার ফসল ফলানো, তেমনি সংস্কৃতি সাধনারও লক্ষ্য হচ্ছে পরিচ্ছন্ন, সুষ্থ, মার্জিত, ভদ্র এবং আদর্শবান, রচিশীল ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলা।[১৫৯]

বিষয়টিকে আমরা অন্যভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। সাধারণত আমরা পার্থিব জীবন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করি এবং দুনিয়ায় নিজেদের মর্যাদা ও নিজেদের জন্য দুনিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে যে মতবাদটি বিশ্বাস করি তা স্বাভাবিকভাবে জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয় এবং সে লক্ষ্য অর্জনের পথে আমাদের সকল শক্তি-ক্ষমতাকে নিয়োজিত করে দেয়। আমরা যদি দুনিয়াকে একটা চারণ ক্ষেত্র বলে মনে করি এবং জীবনটাকে শুধু পানাহর আর পার্থিব বিলাস বাসনে পরিতৃপ্তি লাভের একটা অবকাশ বলে ধারণা করি, তাহলে এ জৈবিক ধারণা নিঃসন্দেহে আমাদের শুধু ইন্দ্রিয়জ ভোগ উপকরণ সংগ্রহের জন্যেই চেষ্টা করতে থাকব। অপরদিকে আমরা যদি নিজেদেরকে অপরাধী, পাপী বলে বিবেচনা করি এবং আমাদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছে বলে মনে করি, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে এ বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে এবং এ কারণে আমরা মুক্তিকে আমাদের জীবনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করব।

দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা যদি চারণভূমি হয় আর বন্দিশালা থেকে উন্নততর হয় এবং মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের সাধারণ প্রাণী ও অপরাধীর চেয়ে উচ্চ মর্যাদবান বলে মনে করি তাহলে নিশ্চিতরূপে বৈষয়িক ভোগ উপকরণের সন্ধান ও পরিত্রাণ লাভ এ উভয় লক্ষ্যের চেয়ে উন্নত কোন লক্ষ্যেরই সন্ধান করব এবং তুচ্ছ বা নগণ্য বস্তুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না।

---

১৫৯. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মৌলিক ভাবধারাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে এ দু' ধারার সংস্কৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট কিছু পার্থক্য দৃশ্যমান হয়। যেমন,

এক. ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধসমূহ সক্রিয় থাকবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি ইসলামী ভাবধারার পরিচায়ক হবে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলি বিধি-ব্যবস্থা পালনীয় এগুলো ইসলামী সংস্কৃতি যাকে দ্বীন বলা হয়। এই দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের পরিপূর্ণ রূপায়নের যে আচরিত রূপ তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতির নাম আর যাই হোক না কেন সেটা ইসলামী সংস্কৃতি নয়।[১৬০]

দুই. ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ মানুষ মহান আল্লাহর খলিফা হিসেবে এ পৃথিবীতে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশানুযায়ী তার সকল কার্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এরই আলোকে মানবতার সার্বিক উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করে পরকালের মুক্তি অর্জন করবে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল দর্শন হলো, এ জীবন কয়েকটি মৌল উপাদানের উদ্দেশ্যহীন সংমিশ্রণের ফলে অস্তিত্ব লাভ করা। এর কোন লক্ষ্য নেই, নেই কোন পরিণতি। এসব মৌল উপাদানের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কিছুই নেই। এটিই এ সংস্কৃতির প্রকৃত দর্শন।

তিন. ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার একত্ব ও মিল্লাতের অভিন্নতার ভিত্তিতে এক ব্যাপকতর ঐক্য ও সম্মিলিত ভাবধারা গড়ে উঠে। ফলে মানব সমাজ থেকে সব রকমের জোর জবরদস্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম, শোষণ ও হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয় এবং পরস্পরের আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা সংস্কৃতি যেহেতু ব্যক্তি স্বার্থ ও সুবিধাবাদ দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠে বিধায় বিশ্বের ব্যক্তি ও বিভিন্ন জাতির মাঝে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, হিংসা-বিদ্বেষ, রক্তারক্তি ও কোন্দল-কোলাহল অনিবার্য হয়ে উঠে। ফলে চারদিকে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি বিরাজ করে। শাসক ও শাসিত এবং বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।[১৬১]

---

১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

১৬১. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, অপসংস্কৃতি, *ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

চার. ইসলামী সংস্কৃতিবান প্রতিটি ব্যক্তি অন্য মানুষের জন্যে বেঁচে থাকে। এ কারণে শ্রেণিভেদ নির্বিশেষে সমাজে প্রতিটি মানুষের জীবন জীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন আপনা থেকেই পূরণ হতে থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতি বিজিত জাতিগুলোকে প্রকৃতি জয়ের সব তত্ত্ব, তথ্য ও গোপন রহস্য থেকে সম্পূর্ণ গাফিল বানিয়ে রাখে। এ সংস্কৃতি সব কিছুকে নিজেদের একচেটিয়া ভোগ-দখলে রেখে দেয় এবং বিজয়ী জাতির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিতে সচেষ্ট হয়।[১৬২]

পাঁচ. ইসলামী সংস্কৃতিতে বেহায়াপনার কোন স্থান নেই। এতে লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এ সংস্কৃতির লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, মার্জিত, ভদ্র, আদর্শবান ও চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলা।[১৬৩] পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনে সংস্কৃতি নিছক চিত্ত বিনোদনের উপায় ও মাধ্যম বলে বিবেচিত। এ সংস্কৃতিতে নির্লজ্জতা ও নগ্নতা প্রদর্শন শিল্প-সৌন্দর্যেরই পরাকাষ্ঠা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও প্রগতিশীল শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী সংস্কৃতির রয়েছে বৈশিষ্ট্যময় স্বরূপ ও প্রকৃতি। এটা মানব রচিত নয়। যার প্রবর্তক স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ। আর তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.) তা বাস্তবে রূপায়িত করে দিয়েছেন। যা কুরআন ও হাদীসের ভিত্তি থেকে উৎসারিত। এটি বিশ্বজনীন মানবীয় সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামী জীবন চেতনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন সংস্কৃতি মুসলিম জাতীয় সংস্কৃতি হতে পারে না। তাই ইসলামী জীবন বিশ্বাসের বিপরীতে ভাবাদর্শের কোন আচার-আচরণ বা সংস্কৃতি সেগুলোকে বিদআত, কুসংস্কার বা বিজাতীয় সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহানবী (সা.) বিশেষভাবে বলেছেন, "কেউ অন্য কোন জাতির অনুসরণ করলে সে ঐ জাতির মধ্যে গণ্য হবে।"[১৬৪] তাই শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি ইসলামী ভাবধারার পরিচায়ক হতে হবে। নচেৎ তা ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ হতে পারে না। কাজেই যা কিছু বিশ্বাসের বিপরীত তা সবই অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার তথা বিদআত, তা বর্জন করা মুসলমানদের একান্তই কর্তব্য। কেননা, যে সব শিল্পকলা পৌত্তলিকতা, অশ্লীল ও কদর্য রুচির সাথে জড়িত তা মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক। ইসলাম তা অনুমোদন করে না।[১৬৫]

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ

আমরা বলতে পারি, মানব ইতিহাস যত দীর্ঘ সংস্কৃতির ইতিহাসও তত দীর্ঘ। জীবনের শুরু যেখান থেকে সংস্কৃতির সূচনাও সেখান থেকে হয়েছে। কেননা জীবনচর্চাই সংস্কৃতি। জীবন গতিশীল সংস্কৃতিও

---

১৬২. *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

১৬৩. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী সংস্কৃতি* (ঢাকা : জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৫৬

১৬৪. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবী দাউদ* (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, তা.বি.), হাদীস নং ৪০৩১

১৬৫. মোঃ হারুন অর রশীদ, মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস*, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি সব সময় গতিশীল। পৃথিবীর মানুষের প্রথম জীবন চর্চা মহান আল্লাহর হিদায়াত ও আনুগত্য দিয়েই শুরু। তাই এ প্রথম জীবনচর্চাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সুতিকাগার। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এ কথা বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.)-এর দ্বারাই ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে।[১৬৬] আল-কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে :

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ থেকে আমি তোমদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[১৬৭]

মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস তার সংস্কৃতির ইতিহাস। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ছিলেন একটি সুন্দর, রুচিশীল সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী। একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এর যাত্রা শুরু। মহান আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে : وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا "আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।"[১৬৮] এর অর্থ হচ্ছে সকল বস্তুর তাৎপর্য, ব্যবহারবিধি এবং অনুসঙ্গ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে শিখেছেন, যাকে পরিপূর্ণ জ্ঞান বলে তা আহরণ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ.)-কে জ্ঞান দান করে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে এর পরিচালনা উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যুগে যুগে দেশে দেশে তিনি এর প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে সবার মর্মমূলে এক অভিন্ন মৌল সংস্কৃতির কাঠামো লক্ষ্য করা যায়।[১৬৯]

মহান আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে হযরত আদম (আ.)-এর প্রধান দায়িত্ব ছিল এ পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত কায়েম করা এবং পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করে গড়ে তোলা। হযরত আদম (আ.)-এর পর হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামী সংস্কৃতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের অপরিচ্ছন্ন লোকদেরকে পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃতিবান করার নিমিত্তে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের উদাত্ত আহবান জানান :

---

১৬৬. মহানবী (সা.) বলেন : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "উন্নত সংস্কৃতি ও জীবন ধারাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি" (কানযুল উম্মাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮)।

১৬৭. আল-কুরআন, ৫:৩

১৬৮. আল-কুরআন, ২:৩১

১৬৯. আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্ক., ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ - أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ - يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى.

"তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সর্তককারী। এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন।"[১৭০]

মানুষ তখনো পার্থিব ঐশ্বর্যকে একমাত্র কাম্য মনে করত। তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন অনুশোচনাবোধ ছিল না। এক পর্যায়ে হযরত নূহ (আ.) তাদের ধ্বংস কামনা করেন।[১৭১] নূহ (আ.)-এর পরে উল্লেখযোগ্য নবী হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। সুস্পষ্ট দ্বীনের কার্যক্রমের গণনা আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকেই লাভ করে থাকি। ইবরাহীম (আ.) বহুবিধ জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করেন এবং বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। ইবরাহীম (আ.) এর পরে ইতিহাসের ক্রমধারায় আসেন হযরত মূসা (আ.)। হযরত মূসা (আ.)-কে ইহুদীরা তাদের আইন প্রণেতা মনে করে। তিনি পার্থিব জীবন ব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুশাসন প্রবর্তন করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ধীরে ধীরে ইসলামী আইন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে তখন অনেক অনুশাসনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) হযরত মূসা (আ.)-এর আইনকে অবলম্বন করতেন। বনী কুরায়যা যখন বিশ্বসঘাতকতা করে তখন তার শাস্তি দেয়া হয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-এর তাওরাতের আইনানুসারে।[১৭২]

তবে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণতা এসেছে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। ইসলাম যেমন সকল দ্বীনের সর্বশেষ সংস্করণ তেমনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ রাসূল। তাই দেখা যায়, ইসলামই একমাত্র দ্বীন যেখানে সকল দ্বীনের সুন্দর গুণগুলোর পূর্ণতা বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্যেও সকল নবী-রাসূলদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলির অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর মধ্যে আদম (আ.)-এর মহব্বত, নূহ (আ.)-এর প্রচার নিষ্ঠা, সালেহ (আ.)-এর বিনীত প্রার্থনা, ইবরাহীম (আ.)-এর একত্ববাদ, ইসমাঈল (আ.)-এর আত্মত্যাগ, মূসা (আ.)-এর পৌরুষ, হারুন (আ.)-এর কোমলতা, ইউসূফ (আ.)-এর সৌন্দর্য, ইয়াকুব (আ.)-এর ধৈর্য, আইউব (আ.)-এর সহনশীলতা, দাউদ (আ.)-এর সাহসিকতা, সুলায়মান (আ.)-এর বিচার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য, ইয়াহইয়া

১৭০. আল-কুরআন, ৭১:২-৪

১৭১. সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামে প্রারম্ভ ও ক্রমবিকাশ, *অগ্রপথিক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১০

১৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

(আ.)-এর সরলতা, ইউনুস (আ.)-এর অনুশোচনা, ঈসা (আ.)-এর অমায়িকতা ইত্যাদি সকল সুমহান গুণের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।[১৭৩] তাই রাসূল (সা.)-এর প্রচারিত দ্বীন যেমন সকল দ্বীনের সার সংস্কৃতি হয়ে বিকাশ লাভ করেছে তেমনি তাঁর জীবন বিকাশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠে সকল প্রেরিত রাসূল বা মহাপুরুষগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে। তাঁর প্রচারিত আদর্শই মানব জাতির পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।

মানব সভ্যতায় ইসলামী সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য অবদান

ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি যুগান্তকারী ও অপূর্ব সংস্কৃতি হিসেবে পরিপূর্ণভাবে মরু আরবের বুকে আবির্ভূত হয়। তখন গোটা বিশ্ব ছিল অজ্ঞতা ও মূর্খতার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিশেষ করে আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুতিকাগার হিসেবে পরিচিত গ্রীস ও রোমের সভ্যতার লীলাভূমি পুরো ইউরোপে তখন কুসংস্কার ও অজ্ঞতার চরম বিকাশ ঘটে। কোন শিক্ষিত লোক প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থ পাঠ করলে তাকে নির্যাতন করা হতো এবং রাজদ্রোহী বলে গণ্য করা হত। লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেয়া হতো। পৃথিবী গোলাকার বলায় জ্ঞান পিপাসু হিপাসিয়ার দেহকে গির্জায় খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়েছিল। জ্ঞানী গ্যালিলিওকে রোমের গীর্জায় আত্মহুতি দিতে হয়েছিল। পুরোহিতদের ধারণা-বিশ্বাসের পরিপন্থীদের তখন হত্যা করা হতো। বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করায় বিজ্ঞানী ভেনসিসের জিহ্বা কর্তন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।[১৭৪]

অন্যদিকে আজকের আত্মগর্বী ও উন্নত ইউরোপীয় দেশ ফ্রান্স, জার্মানী ও স্পেনও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছিলো অনগ্রসর ও অনুন্নত। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবির্ভাবের বহু পরে এসব দেশের জন্ম হয়।

ইসলাম তার বিপ্লবী সংস্কৃতির সাহায্যে শুধু মরু আরবের বুক জুড়ে জাহেলিয়াতের যে অন্ধকার অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ছিলো তা দূরীভূত করার চেষ্টা চালায় নি; বরং বিশ্বের যেখানে মানুষেরা জাহেলিয়াতের সংস্পর্শে সঠিক সত্যপথ হতে বঞ্চিত ও বিচ্যুত হয়ে আল্লাহর দেখানো হিদায়াতের সন্ধান পাননি সেই জনগোষ্ঠীর জীবনকে ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত করার মিশন নিয়ে পৃথিবীর সকল জনপদে ছড়িয়ে পড়ার কর্মসূচি গ্রহণ করে সেই সূচনালগ্ন থেকেই।

সুরুচিপূর্ণ, মার্জিত, পরিশীলিত এবং সংস্কৃতিবান জীবন গড়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুশিক্ষার। রাসূল কারীম (সা.) তাই শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক

---

১৭৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবদান, *ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) স্মরণিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১২২০ হি.), পৃ. ৫৬-৫৭

১৭৪. কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, তা.বি.), পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবীর উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষা প্রসারের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও তা একটি মাত্র আয়াত হয়।"[১৭৫] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ ধরে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"[১৭৬] ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"[১৭৭]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমেই ইসলামী সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হয়। হিজরতের পর তিনি মসজিদে নববীর একটি অংশকে শিক্ষায়তন হিসেবে নির্দিষ্ট করেন যা 'সুফ্‌ফা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসে যা প্রথম জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়।[১৭৮]

রাসূল আকরাম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে, বিশেষ করে হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ সাহাবাগণকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। যেমন, পবিত্র মদীনায় হযরত আয়েশা, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর, হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)। মক্কায় হযরত আব্দুল্লহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.), কুফায় আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.), বসরায় আবু মুসা আশআরী, আবু সাঈদ খুদরী (রা.), মিশরে আমর ইবনুল আস (রা.), দামেস্কে হযরত আবু দারদা (রা) প্রমুখ।

কুফায় হযরত আব্দল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের মসজিদভিত্তিক মাদরাসায় ৪০০০ ছাত্র এবং দামেস্কের মসজিদভিত্তিক মাদরাসায় ১৬০০ ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[১৭৯] এরই ধারাহাহিকতায় ইসলামী সংস্কৃতির পতাকাবাহীরা যে জনপদে গমন করেছেন সেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। যার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে শিক্ষার উপকরণ ছিল আল-কুরআন, হাদীস, কাব্যলংকার, নীতি শাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, ব্যাকরণ, সাঁতার, তীর-বর্শা নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি।[১৮০] অন্যদিকে উমাইয়া যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপকরণ ছিল কুরআন, হাদীস, ফিকহ, জ্যোতির্বিদ্যা, হস্তলিপি

---

১৭৫. *মেশকাত শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৭৬. আবু ঈসা মুহাম্মদ আত্-তিরমিযী, *আস-সুনান আত-তিরমিযী*, অনু. মাওলানা মোঃ মাযহারুল ইসলাম (ঢাকা : মীনা বুক হাউজ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৭৫৭

১৭৭. *মেশকাত শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৭৮. অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রব, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১৭৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীর, *ইসলামের আলোকে আমাদের শিক্ষা, ঐতিহ্য ও প্রকৃতি* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২৩

১৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যা, ইতিহাস বিদ্যা, কাব্য-সাহিত্য, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি।[১৮১] আব্বাসীয় যুগে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিলো এক যুগান্তকারী ঘটনা। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে আল-আযহারে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। খলিফা আব্দুল আজিজ উক্ত মসজিদে একটি লাইব্রেরি তৈরি করেন। সেই লাইব্রেরিই ক্রমান্বয়ে জামে আযহার রূপ লাভ করে জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[১৮২]

মুসলিম সংস্কৃতি শুধু আরব দেশের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার জন্য এক বিরাট অবদান রেখেছে যার দৃষ্টান্ত মেলে স্থাপত্য স্পেনের কর্ডোভা, আল-হামরা, তাজমহল, সাহিত্যে কবি মুতানব্বী, সাদী, রুমী, হাফিজ, খৈয়াম, ফেরদৌসী, আল্লামা ইকবাল, নজরুল, ফররুখ আহমদ প্রমুখ। আব্বাসীয় শাসনামলে মুসলমানরা পৃথিবীর সঙ্গীত জগতে অমর অবদান রখেছেন। ছন্দবিদ্যার প্রথম পুস্তক রচনা করেন খলিল। খলিফা আব্দুর রহমান কর্ডোভায় প্রথম সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আরব, ইরান ও পাকভারত উপমহাদেশের সুরের মিশ্রণে খেয়াল গানের উদ্ভাবন করেন আমীর খসরু। সেতার ও তবলা তিনিই উদ্ভাবন করেন। মিঞা তানসেন, আলাউদ্দিন, লালন, হাছন প্রমুখরা সঙ্গীত শিল্পে বিশ্বজনীন অবদান রেখে গেছেন। চিত্রশিল্পে মেসোপটেমিয়া, ইলখানী, তৈমুরী, সাফাভী, বুখারা এবং মোগল চিত্রকলাকে বাদ দিয়ে বিশ্বের চিত্রশিল্প অস্তিত্বহীন।[১৮৩]

এ দেশের শোভন সংস্কৃতির স্রষ্টা হলেন মুসলমানরা। চিন্তাবিদ, গবেষক সবাই এর স্বীকৃতি দেন। যেমন, প্রফেসর যতীন্দ্রনাথ সরকার বলেন, "মুসলমানরা এদেশে আসার আগে সংস্কৃতি এ দেশে ছিল না। শুধু যে বাংলাদেশেই সংস্কৃতির ভিত্তি ইসলাম তা নয়, সারা বিশ্বব্যাপী এর ভিত্তি। বিশ্বব্যাপী সংস্থাটির উপর ইসলামের প্রভাব রয়েছে। মুসলমানদের প্রবেশের পরে ইউরোপে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এসেছিল। তার আগে তারা বর্বরতার গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল।"[১৮৪]

---

১৮১. প্রাগুক্ত।

১৮২. অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রব, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১৮৩. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, *বাঙালী সাহিত্যের নতুন ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১২৮

১৮৪. মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার, *আমাদের সংস্কৃতি : বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম মনীষি পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুসলিম মনীষির পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলিম মনীষিগণের চিন্তাধারা ও সমাজ ব্যবস্থার রূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা প্রদান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সতর্কবাণী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় অভিভাবক

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম মনীষি পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুসলিম মনীষির পরিচয়

মনীষি বলতে কাদের বোঝায়? কে বা কারা আমাদের প্রকৃত মনীষি, মনীষিগণের প্রকৃত পরিচয় এবং তাদের চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মনীষি শব্দের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়– যিনি বুদ্ধিমান, বোদ্ধা কিংবা বিদ্বান বা পণ্ডিত, তিনিই মনীষি।[১] প্রকৃত অর্থে অনুসরণযোগ্য আদর্শের প্রচারক একজন মানুষ তখনই মনীষি হন, যখন তার আদর্শকে অনুসরণ করে কল্যাণকামিতা অর্জন করা যায়। গোটা একটি জাতি যখন কোন একজন মানুষের আদর্শকে অনুসরণ করে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসে; মূলত তখনই তিনি মনীষি হয়ে উঠেন। মুসলিম মনীষিরা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা, আদর্শের বাতিঘর। তাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও কর্মকাণ্ডও আমাদের জীবনের শিক্ষা। আমাদের পথচলার পাথেয়, কল্যাণকামী জীবনের সোপান।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, পরম সহনশীল মনোভাব ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন মুসলমানদের চরিত্রের অনুপম বৈশিষ্ট্য। তাই ইসলামে চরমপন্থা, ফেতনা-ফ্যাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা কোনভাবেই কাম্য নয়। এসব শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড ইসলাম কোনক্রমেই সমর্থন করে না। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।"[২]

শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম হচ্ছে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বা কুসুমাস্তীর্ণ পথ। এ পথের পথিকরা হচ্ছেন শান্তিকামী, কুরআন-হাদীসের জ্ঞানসম্পন্ন, সুস্থ-সুন্দর ও সহজ-সরল, শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী তথা মুসলিম মনীষিগণ। মানুষের প্রতি দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হওয়াই ইসলামের সুমহান শিক্ষা। মুসলিম মনীষিগণ তাদের জীবনে এ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ইসলাম প্রচারের নামে মানব সমাজে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা, বাড়াবাড়ি করা, কঠোরতা প্রদর্শন, চরমপন্থা অবলম্বন মূলত শয়তানের কারসাজি। বোমাবাজি বা আত্মঘাতী হামলা করে নিরপরাধ মানুষ হত্যার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম বা ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার অপচেষ্টা কোন পুণ্যকর্ম নয়; বরং যে ব্যক্তি, দল বা সংগঠন দ্বীন কায়েমের নামে একজন মানুষ হত্যা করবে তার

---

১. মুহাম্মদ সিদ্দীক আল-মিনশাভী, *দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী* (ঢাকা : রাহনুমা প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ভূমিকা।

২. আল-কুরআন, ২:২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

আমলনামায় সব মানুষ হত্যার গুনাহ বা পাপ লেখা হবে। মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

"নরহত্যা বা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো, আর কেউ যদি কারো প্রাণ রক্ষা করে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করলো। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।"[৩] মুসলিম মনীষিগণ পবিত্র কুরআনের এই অমীয় বাণী সমগ্র মানব সমাজে ছড়িয়ে দিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হলো মধ্যম পন্থার ধর্ম ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। চরম পন্থা অবলম্বন ইসলামী আকীদা, বিশ্বাস ও চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। হত্যা করে দেশময় বোমা-আতঙ্ক ও ভয়ভীতি সৃষ্টি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাঙ্ক্ষিত ও মনগড়া ব্যাখ্যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলামের অভ্যুদয় থেকে ১৪৫০ বছরের ইতিহাসে ইসলামের মূলধারায় কোন পরিবর্তন আসেনি; বরং ইসলামের আদর্শিক মহানুভবতা, ক্ষমা, উদরতা ও নৈতিক শক্তির মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। এই মানবীয় গুণাবলি শুধুমাত্র মুসলিম মনীষিগণই তাদের বুকে লালন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই মানবতার তরে নিজেদেরকে সপে দেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে কোমল ব্যবহারের দাবী রাখে। কঠোরতা ও জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণের প্রচেষ্টা দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করে দেয়। আংশিক বা খণ্ডিত ইসলাম এবং ইসলামের বিকৃত অপব্যাখ্যা থেকে মুসলিম মনীষিগণ মানবতাকে সজাগ ও সচেতন করে থাকেন। যে ব্যক্তি বা দল চরমপন্থা অবলম্বন করে, তারা কখনোই মুসলিম হিসেবে দাবী করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না।

ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। তাই সন্ত্রাস, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংঘাতমুক্ত পৃথিবীর প্রয়োজনে ইসলামের শান্তিপ্রিয় ও কল্যাণধর্মী জীবনাদর্শ এখন সময়ের দাবী। সময়ের এ দাবী পূরণের লক্ষ্যে মুসলিম মনীষিগণ যুগ যুগ ধরে তাদের একনিষ্ঠ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। তাঁরা শুধু সম্মুখে অগ্রসর হন, কখনো পিছপা হন না। কেননা, তাদের লক্ষ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এখন আলোচনার দাবী রাখে, প্রকৃতপক্ষে মুসলিম মনীষি কারা এবং তাদের ঐতিহাসিক চিন্তাধারা কি? নিম্নে এ ব্যাপারে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

৩. আল-কুরআন, ৫:৩২

Dhaka University Institutional Repository

জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কে যারা গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে তাদেরকে মনীষি বলা হয়ে থাকে। যেমন, সক্রেটিস, এ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখ। বর্তমান লেখক, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক কোন বিষয়ে তাদের উক্তি আনয়ন করলে তারা তাদেরকে মনীষি বলে সম্বোধন করে থাকেন। তবে সাধারণত যারা ইসলামিক বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে থাকেন তাদেরকে মুসলিম বলা হয়। যারা ইসলাম ধর্মকে গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সে অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জীবনাতিপাত করেন তারাই হচ্ছেন মুসলিম আর যারা ইসলাম থেকে নির্বাচিত কিছু বিষয় মানবজাতির কল্যাণের জন্য উক্তি করে গেছেন ও এক্ষেত্রে গবেষণামূলক পুস্তকাদি রচনা করে গেছেন, তাদেরকে মুসলিম মনীষি বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, ইমাম গাযালী, রূমী, জামী, ইবনে সীনা, খওয়ারজিমী, ইবনে হাইয়ান, ইবনে হিশাম, ইবনে খালদুন, ইবনে হাইছাম, শেখ সাদী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ। কারণ, তাঁরা সকলেই ইসলামের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'সিলমুন' শব্দটি থেকে ইসলাম শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো শান্তি। আর মুসলিম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী। মহান আল্লাহ মানবমণ্ডলীর শান্তি, উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ শঙ্কাহীন যে বিধানাবলি দান করেছেন এর সমষ্টির নাম হলো ইসলাম। এই বিধানাবলির নিকট যে মানুষ আত্মসমর্পণ করে বা নিঃস্বার্থভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়ে অনুসরণ করে, সেই হলো প্রকৃত মুসলমান। এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

"আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয়।"[৪]

একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা,) রাসূল (সা.)-এর নিকট আরয করেন, প্রকৃত আলিম বা মনীষি কারা? তিনি বলেন, "যারা ইল্ম অনুযায়ী আমল করেন।"[৫] সুতরাং আমলকারীগণই হচ্ছেন মুসলিম মনীষি। অতএব বলা যায় :

---

৪. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান (ভারত : দেওবন্দ, ১৯৮৫ খ্রি.), হাদীস নং ৯, পৃ. ১৫

৫. ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

The meaning of the term Islam is to pay allegiance to surrender, to move in the path of peach, in fact it is to pay complete allegiance Him. The person home other to the rules and norms of Blam are Muslims. Muslims are surrender to Allah having the most sincere faith in Him. Islam is to abide by the direction and restriction imposed by Allah without any hesitation and lead life according to the rules and norms laid down by scholars.

ইমাম বাগাভী (রহ.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সেই আলিম (মুসলিম মনীষি) যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।" এ থেকে জানা যায় যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আলিম হয় না, যে পর্যন্ত না সে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা না করে সে এবং অনুযায়ী আমল না করে।[৬]

মুসলিম মনীষি তাঁরাই, যারা সার্বক্ষণিক ইসলামের গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করে। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা সূফী নামেও অভিহিত। কারণ, সূফীগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী। ফকীর আব্দুর রশীদ বলেন, "যারা নিজের সাধনা বলে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করে পূর্ণতা লাভ করেন এবং যারা আল্লাহর জন্য সর্বাবস্থায় নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেন, তাঁরাই মুসলিম মনীষি।"[৭] শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন, "যারা আল্লাহর কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে তাঁরাই মুসলিম মনীষি।"[৮]

ইমাম গাজ্জালী[৯] (রহ.) বলেন, "কুরআন হাদীসের জ্ঞানতো থাকবেই বরং যাদের চরিত্র স্বচ্ছ ও নির্মল এবং যাদের দৃশ্য-অদৃশ্যসমূহ, আচার-ব্যবহার সরাসরি নববী সীনার আলোয় আলোকিত, নববী

---

৬. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন* (মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১০২৯

৭. ফকীর আব্দুর রশীদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৮৫-১৮৬

৮. ড. মালিক গোলাম মর্তুযা, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও তাসাউফ*, পৃ. ৪৯

৯. ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তুস জেলার তাহিরান নামক স্থানে ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ দেশে শায়খ আহমদ আল-রাযেকানীর নিকট থেকে শাফিঈ মাযহাবের ফিকহী মাসআলা সম্পর্কে বিশেষভাবে তালিম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি নিশাপুর গিয়ে শিক্ষা লাভ করে মুসলিম বিশ্বে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন। ৪৮৪ হিজরীতে তিনি বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তখন তিনি বাউল মতবাদের বিরুদ্ধে কিতাব রচনা করেন। তাঁর এ কিতাবের নাম ছিল 'মুস্তাযহারা'। ইমাম গাজ্জালী পরবর্তী জীবনে জ্ঞান লাভ ও জ্ঞান বিতরণ ও এর উৎকর্ষ সাধনে দুনিয়াব্যাপী প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। এক সময় তিনি নির্জনবাস ও ধ্যানে মগ্ন হন। ৪৯৯ হিজরীতে তিনি পুনর্বার দরস ও তাদরীস এবং সংস্কার ও ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টাকে নিম্নোক্তভাবে গ্রহণে করেন। (ক) ভ্রান্ত দর্শন ও বাতেনী মতবাদের মোকাবেলা করার জন্য ইসলামী উৎস মূলের সাহায্যে আঘাত হানা। (খ) ব্যক্তি ও সমাজ জীবন ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে এ নীতিমালার সুস্পষ্ট বাস্তবায়নের জন্য তিনি 'তাহফাতুল ফালাসিফা', 'আল-মুনকিয মিনাদ্দালাইল', 'জাওয়াহিরুল কুরআন', 'হুজ্জাতুল হক', 'কাসমুল বাতেনীয়া', 'ফাছাইহুল ইবাদিয়াহ' ও 'সাওয়াহিমুল বাতিনিয়্যাহ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি আকাইদ,

Dhaka University Institutional Repository

ধনে ধনবান, তারাই মুসলিম মনীষি।"[১০] এখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, যারা কুরআন-হাদীসে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে ও জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিয়ে যে কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে এবং নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের মহা মূল্যবান বাণী অপরের নিকট পৌঁছে দেয় এবং একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তারাই মুসলিম মনীষি। যারা সর্বদা পরহেযগারী অবলম্বন করেন। সমাজ সংস্কারের জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালান এবং মানুষকে বেলায়েত,[১১] কামালাত[১২] ও হাকীকতের[১৩] মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পথ দেখান। ইসলামের দৃষ্টিতে তারাই মুসলিম মনীষি।[১৪] মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ .

"তাঁর বন্ধু তো শুধুমাত্র খোদাভীরুরাই হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে না।"[১৫]

দর্শন ও হাকীকতে ইলমের উপর 'ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন' রচনা করেন। যা মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক অনবদ্য গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। উক্ত গ্রন্থখানিতে নসীহত, উৎসাহ প্রদান, সতর্কীকরণ, আখিরাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য, ঈমান ও সৎকর্মের আবশ্যকতা, আত্মার সংশোধন এবং অন্তরের ব্যাধি ও প্রবৃত্তির ক্ষতিকর বিষয়াবলির উপর আলোকপাত করেন। এমনিভাবে ইসলামী পুনর্জাগরণে অসামান্য অবদান রেখে ৫০৫ হিজরী সনে তিনি পরলোক গমন করেন।

১০. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া* (ঢাকা : এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ৫ম সংস্ক., ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৭

১১. বেলায়েত হলো অলী বা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তির সুলুকের পথ। ১. তাওবা (পাপ বিরতি), ২. ইনাবাত (আল্লাহর যিকরে নিমগ্ন থাকা), ৩. যুহদ (কামনা-বাসনা ত্যাগ), ৪. অরা (ধর্মভীরু), ৫. শুকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা), ৭. তাসলীম (আল্লাহ পাকের প্রতি আত্মসমর্পণ), ৮. রিদা (আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতে সন্তোষলাভ), ৯. সবর (চরম বিপদে ধৈর্যধারণ), ১০. কানাআত (অল্পে তুষ্টি)। এ ১০টি সিফাত বা গুণ অর্জিত হলে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ সম্ভব। উক্ত দশটি গুণ দশটি লতীফা যথা–কলব, রূহ, সির, খফী, আখফা, নফস, আগুন, মাটি, বাতাস ও পানির সাথে সম্পর্কযুক্ত। উক্ত লতীফাসমূহে আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীয়ে আফয়াল আসমা-সিফাত ও যাতের (ক. সরিষা ফুল বর্ণ, খ. লাল, গ. সাদা, ঘ. চমকদার কালো, ঙ. সবুজ, চ. বর্ণহীন) নূর পতিত হলে উক্ত গুণসমূহে গুণান্বিত হয়। অত্র সাথে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় বস্তু জ্ঞান ভুলে উল্লেখিত নূর দর্শনে বিলীন হয়ে দৈহিক ও আত্মিক উৎকর্ষ তথা ফানা (অস্তিত্ব জ্ঞানশূন্য) ও বাকা (পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে অস্তিত্ববান) হাসিল করলে বিলায়াত মাকামে পৌঁছা যায়। [মাহবুবুর রহমান অনূদিত, *মুজাদ্দিদে আলফিসানী (রহ.) মাদা অ মা'আদ* (খুলনা : মুজাদ্দিদীয়া প্রকাশনী, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭-৮]।

১২. কামালাত (পূর্ণতা) পাঁচ প্রকার। যথা ১. কামালাতে সুগরা, ২. কামালাতে কুবরা, ৩. কামালাতে নবুওয়াত, ৪. কামালাতে রিসালাত, ৫. কামালাতে উলুল আযম। এটা হাকীকী নায়িব-ই নবীর তত্ত্বাবধান ও তাওয়াজ্জুহ ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। (পূর্বোক্ত)

১৩. হাকীকাত (প্রকৃত মা'রিফাত) : কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত প্রত্যেকটি বিষয়ের দু'টি অবস্থা রয়েছে। যথা, সূরত (বাহ্যিক) বা প্রাথমিক অবস্থা এবং হাকীকাত (প্রকৃত অবস্থা) বা চূড়ান্ত অবস্থা। এখানে চূড়ান্ত অবস্থা ধর্তব্য। বিশেষ করে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) বর্ণিত হাকীকতসমূহ বুঝতে হবে। (পূর্বোক্ত)

১৪. ড. তাহের আল-কাদরী, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ অনূদিত, *তাসাউফের আসল রূপ* (চট্টগ্রাম : সানজরী পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১১১

১৫. আল-কুরআন, ৮:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আল্লাহর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর মাধ্যম হলো ৭টি। ঈমানে মুফাস্‌সালে বর্ণিত সাতটি বিষয়ের উপর অনায়াসে বিশ্বাস স্থাপন করার নামই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বলে ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতার প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং তাকদীরের প্রতি, সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুসলমান অর্থাৎ প্রকৃত মুসলিম মনীষি।" মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করছেন :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবনাদর্শ অনুসরণ করে তাহলে তা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৬]

যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করে, শান্তি, স্বস্তি ও সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে তার জন্য আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা অবশ্যই বাধ্যতামূলক। এ কাজ যারা করবে তারাই মুসলিম মনীষি। কারণ, তারা সর্বদা ইসলাম ও মুসলিম এ দু'টি শব্দকে বুকের ভেতর লালন করে থাকেন এবং গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি, অগ্রগতি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিভীষীকামুক্ত শঙ্কাহীন এক উন্নত জীবন যাপনের পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেন। প্রকৃতপক্ষে তারাই মুসলিম মনীষি হিসেবে খ্যাত।

যে আল্লাহ মানুষের নিরাপত্তার প্রতীক ও শান্তির নিশ্চয়তামূলক জীবনবিধান ইসলামকে মানুষের জন্য একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন সেই আল্লাহর নিরানব্বইটি গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি হলো সালাম বা শান্তিদাতা। অপরদিকে নবী করীম (সা.) সম্পর্কে সালাম নামের অধিকারী আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ "হে নবী! আপনাকে আমি সমগ্র জগতের জন্য করুণার প্রতীক হিসেবে প্রেরণ করেছি।"[১৭] মহান আল্লাহ বিশ্বনবী (সা.)-কে করুণার প্রতীক তথা নবীয়ে রহমত উপাধি দান করেছেন। সুতরাং এ কথার উপর যারা সর্বদা অটল ও অবিচল থাকবে, তারাই মুসলিম মনীষি বলে গণ্য।

যারা ইনসানে কামিলের সুমহান আদর্শের মানদণ্ডে মানব চরিত্র গঠনের স্থপতি হিসেবে ভূমিকা পালন করেন এবং জাতিসত্তার আদর্শিক দিকেও বিশেষভাবে পুনর্গঠনের আপোষহীন নেতৃত্ব প্রদান করেন তারাই মুসলিম মনীষি। যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর রঙে রঙিন করে সাজিয়ে তোলেন এবং সমাজকে সে অনুপাতে সাজানোর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এমতাবস্থায় তারাই প্রকৃত মুসলিম মনীষি হিসেবে আল্লাহর বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন। মহান আল্লাহ বলেন : صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ

---

১৬. আল-কুরআন, ৩:৮৫

১৭. আল-কুরআন, ২১:১০৭

Dhaka University Institutional Repository

صِبْغَةَ اللهِ "তোমরা আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গীন হও, কেননা আল্লাহর রঙ্গের চাইতে উত্তম রঙ্গ আর কারও আছে?"[১৮] যেমন, কবির ভাষায় :

মু'মিনের হাত যেন আল্লাহর হাত
তিনি বিজয়ী, চারিত্রিক মাধুর্যতায় রয়েছে তার সুখ্যাতি,
তিনি সাহসী, সুদক্ষ নির্মাতা ও সৃষ্টিকারী
মানুষ হয়েও ফেরেস্তা চরিত্রের অধিকারী
মহান প্রভুর গুণে গুণান্বিত।[১৯]

মুসলিম মনীষি বলতে ঐ সকল ইসলামী চিন্তাবিদগণকে বুঝায়, যারা কুরআনের আলোকে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে যাদের চিন্তা ও কাজের সাথে কুরআনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এমনকি কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যারা নিজ জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

"হে নবী! বলুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, সবকিছুই একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। যার কোন শরীক নেই। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজকে সর্বপ্রথম মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।"[২০]

সুতরাং যারা দ্বিধাহীন চিত্তে এ ঘোষণা প্রদান করতে পারে, তাঁরাই মুসলিম মনীষি। আল্লাহর যমীনে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই তারা সর্বদা প্রত্যাশা করেন। কেননা, মহান আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। এটিই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। বরং অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।"[২১]

এক কথায় যারা পবিত্র কুরআন-হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসকে শুধুমাত্র পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গভীর আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে এগুলোর নির্যাস থেকে নতুন তথ্য উদ্ভাবন করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে গোটা মানবতার কল্যাণে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন, তারাই মুসলিম মনীষি।

---

১৮. আল-কুরআন, ২:১৩৮
১৯. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দীকী, *আল্লামা ইকবাল* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৬
২০. আল-কুরআন, ৬:১৬২-১৬৩
২১. আল-কুরআন, ১২:৪০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম মনীষিগণের চিন্তাধারা ও সমাজ ব্যবস্থার রূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে বিশেষ একটি মিশন বা উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সর্বদা তাঁরই ইবাদত করুক, এটা মহান আল্লাহর ইচ্ছা। যেমন, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

"আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"[২২]

মুসলিম মনীষিগণই শুধুমাত্র আল্লাহর এ বাণীর উপর পরিপূর্ণ আমল করে থাকেন। আর আল্লাহর বিধি-বিধান মোতাবেক নিজেদেরকে এবং জনসাধারণকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মরিয়া হয়ে উঠেন। তাঁদের চিন্তাধারা শুধুমাত্র একটি সুন্দর, শান্তি ও সুখময় পৃথিবী গড়া।

সমাজ ব্যবস্থার রূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা

আলোচনার প্রারম্ভে স্পষ্ট হওয়া দরকার ইসলাম ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক কী? তাই প্রথমে ইসলামের অর্থ, মর্মার্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া দরকার। সুতরাং প্রথম প্রশ্ন হলো ইসলাম কী? শুধু শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাই শাব্দিক অর্থ তালাশের পথে না গিয়ে এটাই বুঝতে চেষ্টা করা– ইসলামের উৎস, তাৎপর্য ও লক্ষ্য কী?

ইসলামের আসল উৎস ওহী। সুতরাং ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম একটি শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, ইনসাফ, ন্যায়-নীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নাম। কাজেই অশান্তি, শত্রুতা, শ্রেণিভেদ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়-অবিচার পৃথিবীর মানব সমাজকে যখন গ্রাস করতে বসেছিল, তখন ইসলামের শাশ্বতবাণী পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল। ইসলামের বার্তাবাহক হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদসহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনে আল্লাহর প্রেরিত কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশাবলি মানুষের মধ্যে প্রচার করেন।[২৩] মালেক ইব্ন আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর প্রেরিত আল-কুরআন যখন কানায় কানায় পূর্ণ হলো তখন রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন : "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি

---

২২. আল-কুরআন, ৫১:৫৬

২৩. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

জিনিস রেখে যাচ্ছি, এই দু'টি অনুসরণ করতে থাকলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ (হাদীস)।"[২৪] রাসূল (সা.)-এর সকল সাহাবী তাঁর আত্মিক উত্তরাধিকারী হিসেবে ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে সফরে বের হন। কোন কোন সাহাবী কোন কোন এলাকায় দাওয়াত পৌঁছেতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। এলাকার প্রয়োজনে সেখানে থেকে গেছেন। কেউ কেউ কয়েক মাস ইসলামের প্রচার করে নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে ফিরেছেন। আবার কেউ কেউ কয়েক বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। এভাবে তাঁরা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। নবী-রাসূলগণ এবং সাহাবায়ে কিরামের আদর্শকে বুকে ধারণ করে যুগে যুগে মুসলিম মনীষিগণ সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। কেননা তাঁরা জানেন যে, মানুষ মানুষের গোলামী করতে পারে না। প্রত্যেকেই শুধুমাত্র এক আল্লাহর গোলামী করবে। আর সমাজ সংস্কার করতে হলে সর্বপ্রথম মানবজাতিকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী বানাতে হবে। উন্নত চরিত্র ছাড়া সমাজ গঠন বা সমাজ সংস্কার করা কখনই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা মানবজাতিকে মানবতা শিক্ষা দেয়ার কাজে এবং সাথে সাথে আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের চিন্তা যে, মুসলমানের ধর্ম ইসলাম এবং গোটা সমাজ হবে ইসলামী সমাজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ.

"নিশ্চয়ই ইসলাম আমার নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।"[২৫] যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের গুরুতত্ত্ব জানতে পারে আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমা ও অসীম ক্ষমতার সন্ধান লাভ করে, তাঁরাই মুসলিম মনীষি।[২৬] যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

مَا يُجَادِلُ فِيْ اٰيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ.

"আমি তাদেরকে বাহ্যিক জগতে এবং তাদের দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকি। ফলে সত্যের গুরুত্ব তাদের নিকট প্রকাশিত হয়।"[২৭]

ইসলামের তাৎপর্য আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বন্দেগীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। সে ধাঁচে জীবনকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থার উপর আমল করা। মুসলিম মনীষিগণের লক্ষ্য

---

২৪. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, *আল-মুওয়াত্তা* (মাকতাবা শামিলাহ, ১ম সংস্ক., ১৪২৫/২০০৪), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩২৩, হাদীস নং ৩৩৩৮

২৫. আল-কুরআন, ৩:১৯

২৬. আল-হাজ্জালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২৭. আল-কুরআন, ৪০:৪

Dhaka University Institutional Repository

ও উদ্দেশ্য হলো একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যার বিস্তার হবে বিশ্বব্যাপী জয় জয়কার। সে সমাজের লক্ষ্য ও ভিত্তি হবে :

১. সমগ্র মানবজাতির মাঝে ঐক্যের সমীকরণ।

২. সমাজের সদস্যরা হবে সাধক ও আধ্যাত্মিকতামনস্ক।

৩. ব্যক্তি ও সমাজ সব ধরনের ভয়-ভীতি, দুঃচিন্তা থেকে নিরাপদ থাকাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ইসলামের উল্লেখিত উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর বুকে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায় স্পষ্ট হয়েছে :

هُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

"তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আপন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহকারে, যেন এ দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীন থেকে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।"[২৮]

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলাম মানবতার ঐক্য-সম্প্রীতিতে সমৃদ্ধ সমাজ কেন চায়? বিশ্ব সম্প্রদায়ের ইতিহাস পঠন-পর্যালোচনার মাধ্যমে এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীতে যে কোন সমাজ তিন ধরনের বিশ্বস্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন :

১. ভৌগোলিক

২. বংশীয় ও ভাষাগত

৩. অর্থনৈতিক

এ তিনটি বিশ্বস্ততা হলো খুবই সীমাবদ্ধ। আর সীমাবদ্ধ বিশ্বস্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের কর্মনীতি অন্যদের তুলনায় হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক হয়ে থাকে। সুতরাং উল্লেখিত বিশ্বস্ততার সার্বজনীনতা ও সর্বব্যাপিতা অবিদ্যমান। তাই ইসলামী সমাজকে হিংসা-বিদ্বেষ ও সীমায়িত বিশ্বস্ততার শিকল থেকে চির মুক্ত করার জন্য মানবতার ঐক্য-সম্প্রীতির কর্মসূচি পেশ করেছে ইসলাম এবং সমগ্র মানবজাতিকে সেদিকে আহ্বান করেছে। এভাবে একটি সমাজে বিশ্বস্ততা হতে পারে বিশ্বব্যাপী ও স্রোতস্বিনী নদীর মত শতত প্রবাহমান। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা এ বাস্তবতাকে উজ্জ্বল করেছে। মহান আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ.

২৮. আল-কুরআন, ৯:৩৩

Dhaka University Institutional Repository

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[২৯] অপর আয়াতে বর্ণিত আছে :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[৩০]

ইসলামী সমাজ এমন হবে, যে সমাজের চরিত্র সাধনায় পরিশ্রমরত আধ্যাত্মিকতামনস্ক সদস্য বিশিষ্ট হবে। চরিত্র সাধনার উদ্দেশ্য হলো জীবনের একমাত্র চালিকাশক্তি হবে যাবতীয় কর্তব্যের পুরোপুরি বাস্তবায়ন। পৃথিবীতে অন্যান্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় পরস্পর অধিকারের দাবীর ভিত্তিতে। ফলে ব্যক্তিক ও সামাজিক অধিকার দাবীর ক্ষেত্রে দেখা দেয় এক অপ্রতিহত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। এখানে ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষণের জন্য সামাজিক স্বার্থকে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়। আর সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সামজ চায় সামগ্রিক অধিকার। ফলে ব্যক্তি অধিকার হয় অন্যায়ের শিকার। তাই অনৈসলামিক সমাজে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অধিকারের মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান থাকে এক জটিল দ্বন্দ্ব সংঘাত। উক্ত বিদ্যমান জটিলতা ও সংঘাতমুক্ত সমাজকে সংস্কারের মাধ্যমে খোদায়ী সমাজ গঠন করার দৃঢ় প্রত্যয়ী মুসলিম মনীষিগণ। পরোক্ষভাবে ইসলামী সমাজ অধিকারের দাবীর পরিবর্তে অধিকার প্রদানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিক ও সামষ্টিকভাবে ব্যক্তি জীবনে কর্তব্য পালনই কাজের চালিকাশক্তি। প্রত্যেকে যখন নিজের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে তখন কারো অধিকার হরণ সম্ভব হবে না। আর কর্তব্য হলো, অবশ্য পালনীয় বিধানের অনুভবের নাম। চারিত্রিক জীবন খুব সংকোচিত। সেখানে যে কোন কাজ আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। যে সব কার্যক্রম চারিত্রিক আদর্শের অনুসরণে হয়ে থাকে তাই সৎ ও মহৎ কর্ম। আর যে সব কাজ বিরোধিতার ইচ্ছায় করা হয় তাই অসৎ কর্ম নামে আখ্যায়িত। চরিত্র সংশোধনের শ্রম ও পরিশ্রম কর্তব্যবোধের মাধ্যমেই শুধু সম্ভব; কিন্তু সে কর্তব্য ও কর্তব্যবোধকে কার্যকর করার আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের মাধ্যমে। আল্লাহর উপর ঈমান স্থাপনকারীকে আধ্যাত্মিকতামনস্ক বা আধ্যাত্মবাদী আকীদায় ভূষিত করা হয়। সত্যিকার আধ্যাত্মবাদী হওয়ার জন্য শর্ত হলো আল্লাহ এবং পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আর মানুষের স্বভাবে গচ্ছিত খোদা তালাশের প্রেরণাকে সোচ্চারভাবে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে মুসলিম মনীষিগণের ঐতিহাসিক চিন্তাধরা।

২৯. আল-কুরআন, ৪:১
৩০. আল-কুরআন, ২:২১৩

Dhaka University Institutional Repository

যে সমাজের সদস্যদের পরিশ্রমের মূল লক্ষ্য হবে ব্যক্তি ও সমাজ সমভাবে সব ধরনের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ হয়ে যাওয়া। এটিই হলো প্রকৃত অর্থে ঐশী নির্দেশনার কাম্য বিষয়। স্বীকৃত সত্য যে, যতক্ষণ কোন মানুষ ভয়-ভীতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে না ততক্ষণ তার যথাযোগ্য লালন-পালন ও উন্নতি সাধন হতে পারে না। আর যে সমাজ নিজের জনগণকে শঙ্কা, সংশয়, ভীতি থেকে মুক্ত রাখতে এবং তাদের মাঝে শান্তি, স্বস্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার শীতল হাওয়া প্রবাহিত করতে সক্ষম হবে না, সে সমাজকে কোনভাবেই ইসলামী সমাজ উপাধিতে ভূষিত করা যায় না। কুরআন মাজীদে ইসলামী সমাজের সদস্যদেরকে ভয় ও শঙ্কামুক্ত হয়ে জীবন যাপন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ প্রকাশ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে তোমরাই সফলকাম হবে।"[৩১] অন্যত্র এসেছে :

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.

"আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব, তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর।"[৩২]

এ সমজেরে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গোড়া মজবুত যা সুউচ্চ প্রাসাদের ন্যায় দৃঢ়। মহানবী (সা.)-এর প্রতি এমন নিচ্ছিদ্র বিশ্বস্ততা থাকতে, হবে যাতে নবুওয়াতের অংশীদারীত্বের সন্দেহ থেকেও নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারে। ফলে সমাজ হয়ে উঠে বিশ্বস্ততার ভয়াবহ ভাঙ্গন থেকে নিরাপদ। সমাজ থেকে দূর হয় বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলার হিংস্র আগ্রাসন। রাসূল (সা.)-এর সাথে অটল বিশ্বস্ততা ছাড়া ঈমানের কথাবার্তা কিছুতেই সঙ্গত নয়। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

"আর আপনার পালনকর্তার শপথ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা না রেখে তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে।"[৩৩]

৩১. আল-কুরআন, ৩:১৩৯
৩২. আল-কুরআন, ৫:৩
৩৩. আল-কুরআন, ৪:৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) বলেন :

فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"আল্লাহর কসম! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ; তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তারা তাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় আমাকে অধিক পরিমাণে ভাল না বাসবে।"[৩৪]

এই ধরনের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসলামের কর্মনীতির কল্পনাও হতে পারে না। নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখিত মতকে আরো জোরালোভাবে উৎসাহ যোগায়।

১. হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন :

اِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِاطَاعَةٍ.

"সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন হয় না এবং আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব হয় না।"[৩৫]

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

"যখন তিনজন একত্রে কোথাও বের হবে অবশ্যই তাদের মাঝে একজন নেতা হবে।"[৩৬]

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِيْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِيْ فَقَدْ عَصَانِيْ.

"যে আমার আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমার আনুগত্য অস্বীকার করল সে আল্লাহর আনুগত্যকে অস্বীকার করল, যে নেতার আনুগত্য করল সে যেন প্রকৃতপক্ষে আমারই আনুগত্য করল এবং যে নেতার নাফরমানি করল সে যেন প্রকৃতপক্ষে আমারই নাফরমানি করল।"[৩৭]

---

৩৪. ইমাম বুখারী, আল-জামিউস সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩, হাদীস নং ১৩; *আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*, www.al-islam.com

৩৫. আদ-দারিমী, *সুনানুদ দারিমী* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪০৭ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১, হাদীস নং ২৫১

৩৬. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস, *সুনানু আবী দাঊদ* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০, হাদীস নং ২৬১১

৩৭. ইমাম বুখারী, *আল-জামিউস সহীহ*, *আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*, www.al-islam.com; ২৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩, হাদীস নং ৭১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন :

مَنْ خَرَجَ عَنْ اَلطَّاعَةِ وَفَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيْتَتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

"যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য অস্বীকারকরত জামাআত ত্যাগ করল এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহিলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল।"[৩৮]

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষিগণ হাদীসের ও নৈতিক শিক্ষাগুলো জনসাধারণকে প্রদান করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো, এ ধরনের আদর্শিক সমাজ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিভাবে স্থায়ী হতে পারে এবং কিভাবে তার উন্নতি সাধিত হতে পারে? এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। মুসলিম মনীষিগণ মনে করেন যে, সমাজ সংস্কার করতে ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি লাভের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ অপরিহার্য। যেমন :

১. ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রতিপালন

২. সামাজিক অবকাঠামো পরিপূর্ণ

৩. পরিবেশকে অধীকরণ।

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এমন কিছু দিক রয়েছে যার সঠিক ও সুষ্ঠু প্রতিপালন অতীব প্রয়োজন। যেমন :

ক. জৈবিক দিক : অর্থাৎ মানুষের জীবন রক্ষার দিক। এজন্য প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান।

ক. উন্নয়নমূলক দিক : মানবজাতির জন্য এ দিকের চাহিদা হলো চেতন-অচেতন উভয় অবস্থায় সংহত নিয়ন্ত্রণ। যদি এই দু' অবস্থার সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ না হয়ে পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে তাহলে মানসিক সুস্থতা ভেঙ্গে পড়বে।

গ. মনস্তাত্ত্বিক দিক : এ দিকটির চাহিদা হলো, এখানে ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভবের প্রতিফলন হবে সংগত ও সংযতভাবে।

ঘ. সচেতনমূলক দিক : এ দিকটির চাহিদা হলো, চেতন-অচেতন উভয় অবস্থায় সংহত নিয়ন্ত্রণ। যদি এ দু' অবস্থার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ না হয়ে পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে, তাহলে মানসিক সুস্থতা ভেঙ্গে পড়বে।

ঙ. আধ্যাত্মিক দিক : এ দিকটি চরিত্র, শিক্ষা এবং ধর্মের প্রতিপালন ও উন্নতি সাধনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়নমূলক অবকাঠামো পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। জীবনে সৃষ্টিধর্মী আদর্শ কর্মের সবুজ প্রান্তরে পৌঁছে এবং জীবনাচরণে মর্যাদাকে বাস্তবরূপে

---

৩৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আল-জামিউস সহীহ* (বৈরুত : দারুল জীল, তা.বি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০, হাদীস নং ৪৮৯২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রায়িত করার প্রয়োজনে শরয়ী আদেশ-নিষেধের অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সজ্জিত করা। পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্য তখনই সম্ভব যখন জনগণের ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে এমন কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে, যার সমূহ কার্যক্রম আদেশ-নিষেধ পালনের ভিত্তিতে আসল উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যমে পরিণত হয় উন্নয়নমূলক সামাজিক অবকাঠামো। এখানে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সরকারী ধনভাণ্ডার, নেতৃত্ব মোটকথা সংস্কৃতি ও অর্থনীতির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই পদ্ধতিতেই জনগণের সঠিক প্রতিপালন ও উন্নতি সাধন হতে পারে।[৩৯]

সমাজের অক্ষুণ্ন অস্তিত্ব ও উন্নতি তৃতীয় পরিবেশকে শাসন করা ও নিয়ন্ত্রণ করার উপর নির্ভরশীল। যেমন :

১. স্বাভাবিক পরিবেশ

২. মনুষ্য পরিবেশ।

স্বাভাবিক পরিবেশ বলতে সেখানে স্বভাবের দৃশ্যমান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। যার নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে সহজ ও সম্ভব। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের ধারণা কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা স্পষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً.

"তোমরা কি দেখ না! আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।"[৪০]

মানবীয় পরিবেশও দু'ভাগে বিভক্ত।

এক. যে পরিবেশ ইসলামী পরিবেশের সাথে সম্পর্কহীন তবে সংক্রামক কিংবা ক্ষতিকর নয়। এ ধরনের পরিবেশকেই ইসলামী সমাজ শুধু উপহার দিতে পারে।

দুই. ক্ষতিকর পরিবেশ। এই পরিবেশ ইসলামী সমাজকে সর্বদা শত্রুতার বিষদাঁত দিয়ে দংশন করে। এ ধরনের পরিবেশকে বসে আনার জন্য শক্তি-সামর্থ্যই একমাত্র চালিকাশক্তি। এ জন্যই আল-কুরআনে উত্তরোত্তর তাগিদ এসেছে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ.

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"[৪১]

---

৩৯. *তাসাউফের আসল রূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৪০. আল-কুরআন, ৩১:২০

৪১. আল-কুরআন, ৮:৩৯

Dhaka University Institutional Repository

এমন কিছু শর্ত যা একটি সুষ্ঠু-সবল ইসলামী সমাজের জন্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। যার মাধ্যমে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হাসিল এবং অপরাপর সমস্ত দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়।[৪২]

মুসলিম মনীষিগণের প্রত্যাশিত সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

আমরা জন্মগতভাবে মুসলমান। ইসলাম ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে মানার জন্য টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়নি এবং ছাড়তেও বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এদেশের সংবিধানে ইসলামী আইনের কোন বালাই নেই। সুতরাং ৯০ শতাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা ইসলামী দেশ হিসেবে পরিচতি লাভ করতে পারছি না এবং ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান অনেক নামধারী মুসলমান তাও জানে না।

এ কারণেই আমাদের দেশের মত সম্ভাবনাময়ী একটি দেশে পদে পদে দুর্নীতি। বিগত কয়েক বছর বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে দুর্নীতিতে প্রথম স্থানে রয়েছে। তাতেও জাতির বিবেকে কোন নাড়া দেয় না। দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ানশীপ অর্জনের পর নিজেদেরকে লজ্জিত ভাবা তো দূরের কথা; বরং নিজেদেরকে বিশ্বের বুকে গৌরবান্বিত জাতি হিসেবে মনে করা হয়। যে কোন একদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে, এ শ্লোগানকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে আমাদের তথা বাঙালি জাতির আজ করুণ পরিণতি। এ দুর্নীতি আমাদেরকে এমনভাবে আক্রমণ করছে যে, এখান থেকে বেরিয়ে আসা খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের শিক্ষা খাতে দুর্নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্নীতি, খাদ্যে দুর্নীতি, আইন-কানুনে দুর্নীতি, বিচারে দুর্নীতি, আদালতে দুর্নীতি, এক কথায় প্রত্যেকটি সেক্টরে দুর্নীতি। অর্থাৎ দুর্নীতি আমাদের জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহমান ধারা। এ দুর্নীতির কারণে কোন মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে না। দরিদ্র-অসহায় মানুষ পাচ্ছে না তাদের অধিকার, আসামী পাচ্ছে না সঠিক বিচার, সামান্য টাকার বিনিময়ে আইন উল্টিয়ে অন্য ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। দোষী বেকসুর খালাস ও নির্দোষ ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দেয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই অবস্থা। দুর্নীতির এই পৈশাচিক সীমা এক নব্য জাহিলিয়াতের সূচনা করেছে।

সুতরাং এ অবস্থা থেকে নিজে বেঁচে জাতিকে বাঁচাতে হলে নৈতিকতার কোন বিকল্প নেই। আর এ নৈতিকতা বোধটুকু শিক্ষা দেয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। কারণ ইসলামী সমাজ এমন এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যেখানে থাকবে না কোন অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, নিষ্পেষণ। হরণ করা হবে না করো মৌলিক অধিকার। দমিয়ে রাখা হবে না কারো কোন প্রতিভা। যে সমাজে নারী ফিরে

---

৪২. *তাসাউফের আসল রূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

পাবে তার অধিকার ও মর্যাদা। সকলে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দেশটাকে গড়ার জন্য তাদের দায়িত্বকে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও তা পালন করা ঈমানের দাবী বলে মনে করবে। যে সমাজে লোকজনের প্রকাশ্যে তো দূরের কথা পানির নিচেও দুর্নীতি করার সাহসে কুলাবে না। কারণ, তাদের সকলের মনে পরকালীন জবাবদিহির ভীতি কাজ করবে। সুতরাং দুর্নীতি করার সাথে সাথে তাদের বিবেকে বাধা আসবে, ফলে তারা উক্ত দুর্নীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিবে। ফলে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ গঠন করা সম্ভব হবে এবং সকলের মুখে হাসি থাকবে। এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা কিরাম এবং যুগে যুগে মুসলিম মনীষিগণ। তদানীন্তন আরবের জাহেলী যুগে নারীরা পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বাজারে বিক্রি হতো। নারী জাতিকে তারা ভোগ-বিলাসের পাত্রই মনে করত। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করলেন তখন মানব সমাজ এমনভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল যে, একদা ষোড়শী সুন্দরী এক মহিলা সারা শরীর স্বর্ণালংকারে সজ্জিত হয়ে অন্ধকার রাতে পথ চলছিল, তখন পুরুষের দল তার সাথে খারাপ আচরণ করা তো দূরের কথা উক্ত মহিলার দিকে তাকানোর সাহস তারা করেনি। কারণ, সকলেই ইসলামী বিধান সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ.

"নিশ্চয় যাদের মনে ভয় রয়েছে তাদের উপর যখন শয়তানের আক্রমণ আসে তখন তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তাদের বিবেচনাবোধ জাগ্রত হয়।"[৪৩]

এছাড়া সমাজ যদি ইসলামী সমাজ হয়, তাহলে সমাজে অবশ্যই ইসলামী বিধান চালু থাকবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে একই আইনের আওতায় চলে আসবে। যেমন কেউ যদি সমাজে চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা যাবে, এটা হবে রাষ্ট্রীয় আইন। কেননা মহান আল্লাহ বলেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا.

"চোর হোক অথবা চুরনি হোক যখন তারা চুরি করবে তখন তোমরা তাদের হাত কর্তন করে দাও।"[৪৪]

এ বিধান সমাজে চালু থাকলে সমাজে আর চুরি বলতে কি জিনিস সেটা মানুষের নিকট স্বপ্নের মত মনে হবে। কেউ কোনদিন চুরি করবে না। মানুষ নিঃশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। এমন সমাজ মুসলিম মনীষিগণ সর্বদা প্রত্যাশা করে থাকেন। এছাড়া সমাজে আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সকল মানুষের প্রতি সুবিচারের বিধান নিশ্চিত থাকবে,

---

৪৩. আল-কুরআন, ৭:২০১

৪৪. আল-কুরআন, ৫:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের মধ্যে সাম্যের বিধান নিশ্চিত থাকবে, ভাল কাজে আনুগত্য ও মন্দ কাজ বর্জনে নিশ্চয়তার বিধান থাকবে এবং মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা থাকবে। সমাজে বসবাসকারী মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিক তাদের মৌলিক অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হবেন। মৌলিক অধিকারগুলো হচ্ছে :

ক. জীবন সংরক্ষণ : মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ.

"যে জীবনকে আল্লাহ হারাম করেছেন, ন্যায়পন্থা ছাড়া তোমরা তাদেরকে হত্যা করো না।"[৪৫]

খ. মালিকানা অধিকার সংরক্ষণ : মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তাদের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।"[৪৬]

গ. সম্মান-সম্ভ্রম সংরক্ষণ : মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَآءٍ عَسٰى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"মু'মিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারীণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা কেউ একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এরূপ কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই যালিম।"[৪৭]

ঘ. অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ প্রসঙ্গে : যেমন, মহান আল্লাহর বাণী :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুমতি গ্রহণ না করে এবং গৃহবাসীকে সালাম না করে নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না।"[৪৮]

---

৪৫. আল-কুরআন, ১৭:৩৩
৪৬. আল-কুরআন, ৪:২৯
৪৭. আল-কুরআন, ৪৯:১১
৪৮. আল-কুরআন, ২৪:২৭

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. মন্দ কথা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ : মহান আল্লাহ বলেন :

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ.

"আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না, তবে যদি কারো প্রতি যুলুম হয়ে থাকে সে কথা আলাদা।"[৪৯]

চ. ন্যায়সঙ্গত কথা বলার অধিকার : মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।"[৫০]

ছ. প্রত্যেকে কেবল তার নিজের কাজের জন্য দায়ী এজন্য অন্যকে পাকড়াও করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

"আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে মন্দ কাজ করে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, কেউ অন্য কারোর বোঝা বহন করবে না।"[৫১]

কারও মাধ্যমে কোন সংবাদ জানতে পারলে তা অবশ্যই যাচাই-বাছাই করবে। কারণ, এটা মহান আল্লাহর নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ.

"কোন ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রমাণাদি সংগ্রহ করবে। এটাই তোমাদের উচিত হবে।"[৫২]

জ. অভাবী-বঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে তাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করা : যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ.

"তাদের সম্পদ থেকে সাদকাহ গ্রহণ করবে যাতে তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার। তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে।"[৫৩]

---

৪৯. আল-কুরআন, ৪:১৪৮
৫০. আল-কুরআন, ৩৩:৭০
৫১. আল-কুরআন, ৬:১৬৫
৫২. আল-কুরআন, ৪৯:৬
৫৩. আল-কুরআন, ৯:১০৩

Dhaka University Institutional Repository

এখানে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সুশীল সমাজে এক শ্রেণির লোক থাকবে তারা ধনবানদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় তাদের সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ সংগ্রহ করে গরীবদের মাঝে বিলি বণ্টন করবে। যদি সমাজে এমন নীতি চালু থাকে তাহলে সময়ের ব্যবধানে দরিদ্রমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব হবে। খলীফা ওমর ইব্‌ন আব্দুল আজিজের আমলে যাকাতের টাকা নিয়ে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি গরীব লোকদের খোঁজে বের হয়। বেশ কয়েকদিন হয়রান হওয়ার পর এক জায়গায় বিশ্রাম করছিল, এমন সময় এক লোক একটি বস্তা হাতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। লোকটির মনে বড় আনন্দের উদ্বেগ হলো। লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, ওহে পথচারী এদিকে এসো। লোকটি এগিয়ে আসলে সে বলল, আল্লাহ এবার মিলিয়ে দিয়েছেন, এই টাকাগুলো নিয়ে আমাকে মুক্ত করো। আগন্তুক বলল, আমি যাকাত নেই না বরং যাকাতের টাকা দেওয়ার জন্য আমি নিজেই এক সপ্তাহ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি; কিন্তু এমন কোন লোক পেলাম না, যে আমার এই উদ্বৃত্ত টাকাগুলো নিয়ে আমাকে মুক্ত করবে। এমনিভাবে এখনও যদি যাকাতের প্রকৃত বিধান চালু থাকে তাহলে আশা করা যায় সেই সোনালী দিন আবারও ফিরে আসতে বাধ্য এবং এর মাধ্যমে সমাজে প্রত্যেক নাগরিক মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী সমাজের শাসক গোষ্ঠীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

আল-কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক পরিচালিত আদর্শবাদী সমাজ ব্যবস্থাই ইসলামী সমাজ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান না হলেও এরূপ সমাজ হবে ইসলামী সমাজ। কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ হতে হলে দেশের সকল নাগরিককে সমাজতন্ত্রের অনুসারী হতে হবে তা ঠিক নয়; বরং ঐ সমাজ যদি সমাজতন্ত্রের নীতি নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাহলেই তা সমাজতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। ঠিক তেমনিভাবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়ও সকল নাগরিক মুসলমান হলেও ইসলামী সমাজ হবে না যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী সমাজ হয়।[৫৪] সেখানে সাম্য, সরল জীবনযাত্রা, পূর্ণ কর্মসংস্থান নীতি, ভূমি ব্যবস্থা, শিক্ষা অধিকার, সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা, যাকাত ব্যবস্থা, বাক স্বাধীনতা, ইসলামী শাসননীতি, জনগণের কথা কম কাজ বেশী, সকলের মধ্যে প্রতিপালনের ভূমিকা থাকা আবশ্যক হবে। আল-কুরআন কোন আংশিক জীবন ব্যবস্থা দেয়নি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রেখে কোনো মুসলমান একথা ভাবতেও পারে না। সুতরাং সংশয়-দ্বিধার মধ্যে না থেকে আল্লাহর মনোনীত ইসলামকে একমাত্র এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বিশ্বাস করে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শকে পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করে ইসলামী সমাজ গড়া।[৫৫]

---

৫৪. শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫৮
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাসেম ছিফাতুল্লাহ বলেন, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদে কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে যে সমাজের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলে এবং সেখানে সর্বদা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে তাই হচ্ছে ইসলামী সমাজ।[৫৬] সুতরাং সেখানে নিম্নোক্ত নীতিমালা বিদ্যমান থাকবে :

১. ইসলামী আইনের উৎস (কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের বিধান) প্রতিষ্ঠিত থাকা।

২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা।

৩. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকা।

৪. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকা।

৫. কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকা।

৬. বিভিন্ন বিভাগের কর্মসীমা নির্দিষ্ট থাকা।

৭. ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলিসমূহ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকা।

৮. মৌলিক প্রয়োজন ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত থাকা।

৯. অমুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকা।

১০. ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকা।

১১. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকা।

১২. সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আর্দশভিত্তিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত থাকা।

১৩. ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা।

১৪. আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকা

ইসলামী আর্দশবাদী নেতৃত্ব ব্যতীত কোনক্রমেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আর্দশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা প্রয়োজন, এর মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।[৫৭] মাওলানা আব্দুর রশীদ বলেন, ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য মূলত তিনটি :

১. তাওহীদ বা একত্ববাদ।

২. রিসালাত বা প্রেরিততত্ত্ব এবং

৩. আমল বা বাস্তব কর্ম।

এ তিনের সমন্বয়ে ইসলামী সমাজ গঠিত। সমাজ জীবনে মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী, কৃষিকাজ এবং গৃহকর্মের প্রতিটি

---

৫৬. আবুল কাসেম ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৪৩
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্র মুয়ামালাতের আওতাভুক্ত। মুয়ামালাতে জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, ধনী-দরিদ্র ও ইতর-ভদ্র ভেদাভেদ নেই। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠাই ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য।[৫৮] সুতরাং সমাজে ইসলামের রীতি-নীতি বিদ্যমান থাকলে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিম মনীষিগণই একমাত্র এমন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা চেষ্টা-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে থাকেন।

পর্দার বিধান চালু

সমাজে পর্দার বিধান চালু থাকবে। এমন বিধান চালু থাকলে বিনা প্রয়োজনে একজন অন্য একজন অপরিচিত মহিলার নিকট যাবে না বা তার সাথে কথা বলার চেষ্টাও করবে না। সুতরাং তখন কারো সাহস হবে না অপরিচিত মহিলা বা মেয়ে লোকের সাথে সাক্ষাৎ করা, কটু কথা বলা, ওতপেতে থাকা, ইভটিজিং করা, কারো মুখে এসিড মারা তো দূরের কথা নিকটবর্তী হওয়ারও দুঃসাহস করবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ اٰبَائِهِنَّ أَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"মু'মিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা নিহিত রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত আছেন। আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনা মুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণ না করে। মু'মিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৫৯]

---

৫৮. মাওলানা আব্দুর রশীদ, *ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২৭

৫৯. আল-কুরআন, ২৪:৩১-৩১

পিতা-মাতার অধিকার প্রদানের ব্যাপারে বিধান

রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন বিধান থাকবে কেউ তার পিতা-মাতার সাথে খারাপ বা রূঢ় আচরণ করতে পারবে না। যদি কেউ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কেননা, মহান আল্লাহ পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না ও তাদের ধমক দিও না এবং বল তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা।"[৬০]

মদ জুয়ার বিরুদ্ধে বিধান

সমাজে যদি মদ ও জুয়ার বিধান থাকে তাহলে কেউ এগুলোকে সেবন করতে পারবে না। কারণ, মদ হলো মস্তিষ্ক বিকৃতকারী বস্তু। এগুলো সেবন করলে শরীর স্বাভাবিকভাবেই গরম হয় এবং শয়তানী কাজে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য শয়তান বার বার প্রতারিত করতে থাকে। ফলে একসময় সে প্ররোচিত হয়ে অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে। এজন্য ইসলামী সমাজ এগুলোকে কখনও সমর্থন করে না। ফলে এগুলো সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ থাকবে এবং সমাজে অপকর্মও হবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর এগুলো শয়তানের অপিবত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৬১]

সুতরাং কুরআনের বিধান চালু থাকলে কেউ এগুলো করবে না। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের জন্য, স্ত্রী তার স্বামীর জন্য দুঃচিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

সমাজে যাকাতের বিধান চালু করা

সমাজে যাকাতের বধিান চালু থাকলে সম্পদশালীদের কাছ থেকে পরিমাণ মত সম্পদ নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে সেগুলোকে হিসেব করে দরিদ্র-অসহায়দের মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থা থাকবে। ফলে

৬০. আল-কুরআন, ১৭:২৩

৬১. আল-কুরআন, ৫:৯০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ থেকে দারিদ্রতা, অসহায়ত্ব ও বেকারত্ব খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে মোচন করা সম্ভব হবে এবং সমাজে শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বাইরে কাউকে দেখা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"আর তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[৬২]

জবাবদিহির ভয়

প্রত্যেকের জবাবদিহির ভয় থাকতে হবে। এ ভয় থাকলে কোন মানুষ কখনও অপকর্মে লিপ্ত হতে পারবে না। এখানে অপকর্ম বলতে শুধু অনর্থক কাজ তা নয়, বরং অপকর্ম হচ্ছে নিজ নিজ দায়িত্ব ফাঁকি দেয়া বা দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ধারিত বেতন থাকা সত্ত্বেও অন্যের টাকা বা অফিসের কোন খাতের টাকা ফাঁকি দিয়ে কুক্ষিগত করা। কারণ, তার ভয় থাকবে যে, মহান আল্লাহর দরবারে জবাব কি দিবে? এছাড়া ওজনে কম দেয়া, জমির আইল ঠেলা, মিথ্যা কসম খাওয়া, পরের হক নষ্ট করা, কটুকথা বলা, গীবত করা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ, কানাকানি, চোগলখোরী করা ইত্যাদি কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। ইসলামে যে বিষয়গুলোর কোন সমর্থন নেই এবং যেগুলো শুধু সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এমন বিষয় থেকে মানুষ যদি বিরত থাকার চেষ্টা করে তাহলে সমাজ এমনিতেই সুশৃংখল হয়ে যাবে এবং এসব ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে আইনের ব্যবস্থাও থাকবে। এ সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণীসমূহ আলোকপাত করা হলো :

১. **ওজনে কম দেয়া সম্পর্কে :** মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ.

"তোমরা ন্যায় সঙ্গত ওজন প্রদন করা এবং ওজনের ব্যাপারে কমবেশি করো না।"[৬৩]

২. **জমির আইল ঠেলার ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক বাণী :** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী,

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অপরের জমি এক বিঘত পরিমাণও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত স্তবক (স্তর) যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।"[৬৪]

---

৬২. আল-কুরআন, ৫১:১৯

৬৩. আল-কুরআন, ৫৫:৯

৬৪. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু বাদউল খালক, বাব : মা জায়া ফী সাবই আরদীন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১, হাদীস নং ২৯৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৩. **হিংসা সম্পর্কিত সতর্কবাণী :** মহানবী (সা,) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

"তোমরা হিংসা থেকে সাবধান! কেননা, হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের নেক আমলসমূহ এমনভাবে গ্রাস করে যেমনিভাবে আগুন লাকড়িকে গ্রাস করে।"[৬৫]

৪. **মিথ্যা পরিহার করার কথা বলা হয়েছে :** মিথ্যাই সকল পাপের মূল। কারণ একটি মিথ্যা থেকে হাজারো পাপের সূত্রপাত হয়। আর মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস একবার হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তির জন্য কোন অপরাধ করা সাধারণ ব্যাপার মনে হয়। কারণ, এক মিথ্যা দিয়ে অপকর্মটি সাধন করবে আর এটিকে ঢাকতে গিয়ে তার সমর্থনে হাজারো মিথ্যার স্তুপ যোগাড় করতে হয়। সুতরাং মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ অবশ্যই থাকবে। আর এগুলো মেনে চলা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

"তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো।"[৬৬]

৫. **গীবতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা :** ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত বা পরচর্চা ও পরনিন্দা করা জঘন্যতম অপরধ। অবশ্যই এহেন গর্হিত কাজ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই অধিকাংশ ধারণাই পাপাচার। আর গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না, আর তোমরা পরস্পর পরস্পরের গীবত করো না। তোমরা কি কেউ তোমাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করো? বস্তুত তোমরা তা অপছন্দ করবে। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরমদয়ালু।"[৬৭] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

---

৬৫. ইমাম আবু দাঊদ, *সুনানু আবী দাঊদ*, কিতাবুল আদব, বাবুল হাসাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৬, হাদীস নং ৪২৫৭

৬৬. আল-কুরআন, ৯:৭৭

৬৭. আল-কুরআন, ৪৯:১২

Dhaka University Institutional Repository

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ - الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ.

"ঐ ব্যক্তির জন্য অকল্যাণ, যে মানুষের সামনে ও পশ্চাতে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করে।"[৬৮]

৬. **কানাকানির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা :** মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিষয়েও নির্দেশাবলি নির্ধারিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কানাকানি কর তখন পাপাচার, সীমালংঘন এবং রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না, বরং তোমরা সৎ পরামর্শ দান ও খোদাভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে।"[৬৯]

৭. **যেনাকারী ও যেনাকারীণীর ব্যাপারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশনা :** এদেরেকে হদ্দ করার জন্য ইসলামী বিধান যদি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে সমাজ কখনও কলুষিত হবে না। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ.

"ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করো।"[৭০]

আইনটি ইসলামী সমাজে বলবৎ হলে কোন ব্যক্তি যেনা করাতো দূরের কথা যেনার কাছেও যেত না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا.

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"[৭১]

এমনিভাবে সমাজ ব্যবস্থা যদি পরিচালিত হয় তাহলে কোন ধরনের অপকর্ম, পাপাচার, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, যুলুম, নির্যাতন এমনকি অসামাজিক কার্যকলাপগুলো আর চোখে পড়বে না। সমাজ কলুষমুক্ত হবে ও সকলের দ্বারে সুখ বিরাজ করবে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একটি শিশুর জন্ম হলে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে একামতের ব্যবস্থা করা হয়। এমন পদ্ধতির কারণে ঐ শিশু ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে উঠলে শয়তান তাকে স্পর্শ করতে

৬৮. আল-কুরআন, ১০৪:১-২
৬৯. আল-কুরআন, ৫৮:৯
৭০. আল-কুরআন, ২৪:২
৭১. আল-কুরআন, ১৭:৩২

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। বিবাহের মাহফিলে কনেকে দেনমোহর বুঝিয়ে দেয়ারও বিধান সামাজিকভাবে চালু থাকবে। এ ব্যবস্থা থাকলে কনেপক্ষরা আর অবহেলিত অবস্থায় থাকবে না। এসিড নিক্ষেপের বিষয়টাও থাকবে না। গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার মত জঘন্য অপরাধ থেকে সমাজ মুক্তি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا.

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দেবে। অতঃপর তারা যদি সন্তুষ্টির সঙ্গে তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।"[৭২]

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে মিরাসী আইন যা বর্তমানে 'পারিবারিক আইন' নামে খ্যাত। পবিত্র কুরআনে উত্তরাধিকারী সূত্রে কে কতটুকু অংশ পাবে এর একটি পরিপূর্ণ হিসাব বিধিবদ্ধ আছে। অথচ এখনকার সমাজে সে এক করুণ চিত্র। মিরাসী বিধান বলতে কোন অস্তিত্ব নেই এমন ধারণা মানুষের মনের ভেতর জন্ম নিয়েছে। সুতরাং ব্যক্তির মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম বণ্টন পদ্ধতিটা নিয়ে এবং কে কতটুকু পেল এ বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরা আন-নিসায় অনেক স্থানে আলোকপাত করেছেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে কোন ধরনের ফেতনা-ফাসাদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। গোটা সমাজে শান্তি-সমৃদ্ধি, আনন্দ-উৎফুল্লতা বিরাজ করবে।

পরিশেষে আমরা এ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহর সমাজ ব্যবস্থা এবং এখানে শৃংখলা বজায় রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষের উপর অপরিহার্য। এ অপরিহার্য কর্তব্যকে ঈমানী দায়িত্ব মনে করে মুসলিম মনীষিগণ সর্বপ্রথম সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। আল্লাহর যমীনে যদি আল্লাহর হুকুমত প্রচলিত থাকে তাহলে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তায় অবস্থান করতে পারবে। সর্বোপরি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকলে নামাযের বিধান অবশ্যই থাকবে। কেননা, নামায আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরযকৃত একটি ইবাদত, এতে কোন প্রকার শিথিলতা নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ.

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ প্রদান করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ প্রদান করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত।"[৭৩]

---

৭২. আল-কুরআন, ৪:৪

৭৩. আল-কুরআন, ২২:৪১

Dhaka University Institutional Repository

নামায প্রতিষ্ঠা করার কারণ হচ্ছে, সমাজকে কলুষমুক্ত করা এবং মানুষের মনে খোদাভীতি জাগ্রত করা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

"তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, নিশ্চয়ই নামায বেহায়াপনা, অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।"[৭৪]

এতে বুঝা যায় সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর নামায প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে কোন প্রকার অপরাধ সংঘটিত হবে না। কারণ, এটা মহান আল্লাহর কুরআনিক চ্যালেঞ্জ।

সুতরাং মানুষ গঠনতান্ত্রিক ও সুশৃংখলাপূর্ণ জীবন যাপন করতে চাইলে অবশ্যই ইসলামী সমাজের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী সমাজ ছাড়া কোন মানুষ ইবাদত করেও শান্তি পাবে না এবং সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে জীবনযাপন করতে পারবে না। তাই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন গড়তে হলে ইসলামী সমাজের কোন বিকল্প নেই। কারণ, এতে সমাজ কলুষমুক্ত হবে ও মানুষ আল্লাহর রঙে রঙিন হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْنَ.

"তোমরা আল্লাহর রঙে রঙিন হও আর আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কি হতে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদাত করি।"[৭৫]

গাউসুল আজম বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী[৭৬] (র.) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "নিজের মধ্যে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যাবলি ও চরিত্র নির্মাণ করাই হলো বেলায়েত। যেমনিভাবে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

---

৭৪. আল-কুরআন, ২৯:৪৫

৭৫. আল-কুরআন, ২:১৩৮

৭৬. শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) ৪৭০ হিজরী সনে ইরানের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ 'জিলান' বা 'গিলান'-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর ১০ম অধঃস্তন পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৮৮ হি. সনে তিনি বাগদাদে আসেন। তিনি ইলমে মারিফাতে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। 'বড় পীর' হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি জাহেরী ও বাতেনী ইলমে পরিপূর্ণতা লাভের পর শিক্ষা, সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পঠন-পাঠন, ফতোয়া প্রদান, লোকের আকীদা শুদ্ধিকরণ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে সাহায্য ও সহানুভূতিতে তিনি কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আরবী ব্যাকরণ ও ইলমে তাজবীদ শিক্ষা দিতেন। তাঁর ওয়ায-নসীহতের প্রভাব শ্রোতাদের মনে খুবই দাগ কাটত। 'ফাতহুল গায়ব' ও 'ফাতহুর রাব্বানী' গ্রন্থ দু'টির বক্তব্য ও ইলমী আলোচনা ঠিক তেমনি আজও প্রত্যক্ষ ওয়ায ও নাসীহতের মতো মানুষের মনন জগতকে আলোড়িত করে যাচ্ছে। তিনি ৫৬১ হিজরীতে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।
[হাফিয ইসমাঈল ইবন কাছীর, আবুল ফিদা, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়হ* (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরছিল আরাবী, ১ম সং., ১৪১৭/১৯৯৭), ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪৯; ইবন খাল্লিকান আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ, *ওয়াফয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, তাহকীক : ড. ইহসান আব্বাস (বৈরূত : দারু সাদির, ১৩৯৭/১৯৭৭), ৩য় খণ্ড, তা.বি.), পৃ. ১১৯।]

Dhaka University Institutional Repository

'নিজের মধ্যে আল্লাহর চরিত্র তৈরি করো।' আর মানবীয় পোশাক ছেড়ে খোদায়ী পোশাক পরে নাও।"[৭৭] আর তা সৎসঙ্গের মাধ্যমেই সম্ভব। যেমন শেখ সাদী[৭৮] (র.) এমন উক্তি করে গেছেন, "ফুলের সংস্পর্শে এসে যেমন পচা কাদা সুগন্ধিযুক্ত হয়, ঠিক তেমনিভাবে ভাল মানুষের সংস্পর্শে আসলে খারাপ মানুষ ভাল মানুষে পরিণত হয়ে যায়।"

উদাহরণস্বরূপ জাহাঙ্গীরের দরবারে মাথা অবনত না করার কারণে হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী[৭৯] (র.)-কে (১৫৬১-১৬২৪ খ্রি.) কারাগারে বন্দি করে রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়। বেশ কিছু

---

৭৭. মুহাম্মদ আলী আস-সাবূনী, *সাফওয়াতুত তাফসীর* (কায়রো : দারুস সাবূনী, ১ম সংস্ক., ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩

৭৮. মহাকবি শেখ সাদী (র.)-এর প্রকৃত নাম শেখ মুসলিহ উদ্দীন। তিনি পারস্যের ফারেস এর অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ সিরাজ নগরে ১১৭৫ মতান্তরে ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজে জন্ম বলে তাঁর এক উপাধি সিরাজী। সাদীর জন্ম সময়ে ফারেসের শাসনকর্তা ছিলেন আতাবেক আবু বকর বিন সাদী জংগী। তাঁর পিতা এরই রাজ দরবারের চাকুরী করতেন। শৈশবেই সাদীর পিতৃবিয়োগ ঘটে। কবি শেখ সাদীর পরিণত বয়সে দীর্ঘকাল সভাস্থলে বৃত্তিভোগী রাজকবি ছিলেন। এজন্য তিনি সাদী খেতাবেই ভূষিত হন। অনেক ত্যাগ ও সাধনা বলে শেখ সাদী ত্রিশ বছর বয়সে বিখ্যাত নিযামিয়া মাদরাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'মাওলানা' উপাধি লাভ করেন। তদানীন্তন আধ্যাত্মিক বিখ্যাত ওলী ও সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা শেখ শাহবুদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দীর হাতে শেখ সাদী বায়আত হন। তাকওয়া ও পরহেযগারীর দিক থেকে তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের সাধক। তাঁর রচিত গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে তাঁর চব্বিশটি গ্রন্থ কালের আঘাত সয়েও টিকে আছে। মহাকবি শেখ সাদীর রচিত গুলিস্তা, বোস্তা ও কারীমা মূল্যবান উপদেশমালার একটি বিরাট ভাণ্ডার। শতাব্দীর পর শতাব্দী এগুলোর ছন্দ ও সুর মুসলিম হৃদয়কে আন্দোলিত ও আবেগ আপ্লুত করে আসছে এবং মাদরাসাসমূহে পঠিত হয়ে আসছে। জীবনে তিনি চৌদ্দবার হজ্জব্রত পালন করেছেন এবং এর অধিকাংশ বারই তিনি পদব্রজে মক্কায় পৌঁছেছেন। আজীবন লোকদের শিক্ষা ও বিপন্নের উপকার সাধন ছিল তাঁর প্রধান ব্রত। মহান মরমী কবি শেখ সাদী (র.) ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজ নগরে ১০২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। [মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৭২-৯২]।

৭৯. তাঁর পূর্ব নাম শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী। তিনি ছিলেন ইমামুত তরীকত, ইমামে রব্বানী, কাইয়ূমে আউয়াল, মুজতাহিদুল উম্মাহ এবং মুজাদ্দিদে আলফিসানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) প্রভৃতি মর্তবায় সমাসীন। তাঁর পিতার নাম শায়খ আব্দুল আহাদ (র.)। জন্ম ১৫৬১ খৃ. পাঞ্জাবের সিরাহিন্দী শরীফে এবং ওফাত ১৬২৪ খৃ.। তিনি দুই বাদশাহ সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালীন সময় দ্বীন-এ ইলাহীর বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে ইসলামকে হিফাযত করেন। তাঁর সংস্কার ও সংগ্রাম ছিল যালিম বাদশাহ, ভণ্ড ও গোমরাহ সূফী এবং অসৎ আলিমদের বিরুদ্ধে। এজন্য তিনি দীর্ঘদিন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ছিলেন। তিনি ছিলে উলুল আমর পয়গাম্বরের কামালাত (পূর্ণতা) সিফাত (গুণ) সম্পন্ন দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)। তাঁর তাজদীদের খাস ধারা তাঁর দ্বিতীয় সাহেবজাদা কাইয়ূমে ছানী খাজা মাসুম বিল্লাহ (র.)-এর সিলসিলায় কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ। তিনি সূফীদেরকে ওয়াহদাতুল অজুদ অন্য সব আল্লাহর মতবাদ থেকে উন্নীত করে ওয়াহদাতুশ শুহুদে (এক আল্লাহ মতবাদে) পৌছান। তিনি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও কাবরাবিয়াসহ অন্যান্য তরীকার মাধ্যমে বিলায়াতে সুগরা (দূরবর্তী নৈকট্য) এবং নকশবন্দিয়া সিলসিলায় বিলায়েতে কুবরা (মধ্যবর্তী) এবং মুজাদ্দিদে আলফিসানীর সম্মান স্বরূপ আল্লাহ পাক তাঁকে খাসভাবে আরো বিলায়াতে উলইয়া কামালাতে নবুওয়াতসহ অসংখ্য কামালাত, হাকীকাত ও তদোর্ধ্ব দায়রায় উন্নীত করান, যা মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলায় কিয়ামত পর্যন্ত বাস্তবিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবং পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তিনি রূহানী ক্ষমতা বলে রাজকর্মকর্তা, কর্মচারী ও সেনানীদেরকে পর্যায়ক্রমে আত্মশুদ্ধি করিয়ে তাদের সম্রাট জাহাঙ্গীরের

Dhaka University Institutional Repository

দিন কারাগারে বন্দি রাখার পর সম্রাট একদিন স্বপ্নে দেখেন এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ তার নিকট আসছেন। তিনি কাছে গেলে ঐ ব্যক্তি সরে যান। তখন সম্রাট বলেন, কে আপনি মহাপুরুষ, আপনার সাথে হাত মিলাতে চাইলাম আপনি সরে গেলেন এবং আপনাকে একটু সালাম করে ধন্য হতে চাইলাম তাও আপনি সুযোগ দিলেন না। বলুন, আপনি কে? তখন ঐ জ্যোতির্ময় পুরুষের উত্তর আমি সালাম নিতে আসিনি, এছাড়া আমাকে আপনি চিনবেন না, আমি হলাম মুহাম্মদ (সা.)। আমি আপনার কাছে এসেছি একথা জানার জন্য যে, আপনি আর কতদিন আমার মুজাদ্দেদকে কারাগারে আটকিয়ে রাখবেন–বলে চলে গেলেন। ঠিক পরের দিন জেলারের পক্ষ থেকে একটি চিঠি আসে। চিঠির ভাষ্য : “জাহাপনা! মানুষ কারাগারে আটকিয়ে রাখে চোর, ডাকাত, বদমাশ প্রকৃতির লোকদেরকে আর আপনি এমন এক ব্যক্তিকে আটকিয়ে রেখেছেন, যার সংস্পর্শ পেয়ে কারাগারে সব চোর, ডাকাতসহ সকল কয়েদী নামাযীতে পরিণত হয়েছে।” একে বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। সুতরাং সমাজে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলে প্রত্যেকটি লোক সৎসঙ্গ পাবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলমুখী হবে। গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে অনৈসলামিক শক্তির অনুমতি সাপেক্ষে কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দেয়া যায় না; বরং আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের অবাধ স্বাধীনতাই ইসলামী সমাজের মূল লক্ষ্য। অতএব আল্লাহ ও রাসূলমুখী লোক তৈরি করতে হলে ইসলামী সমাজের কোন বিকল্প নেই।

ক্ষমতা হস্তচ্যুত করান এবং পুনরায় শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমতা অর্পণ করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে শাহজাহানও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমাত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সে সময় তাঁরা উভয়ই তাঁর খাস মুরীদ ও খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর সংস্কারমূলক প্রকাশ্য কার্যক্রমসমূহ ফারসী ও আরবী ভাষায় লিখিত ‘মাকতুবাত’ শরীফ ও রিসালাহ সমূহের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। আর বাতিনী কামালাত পাঁচ হাজার খালিফাদের মাধ্যমে জারী রাখেন যা কুরআন-সুন্নাহ পরবর্তী শরয়ী দলিল হিসেবে স্বীকৃত। [আবুল ফয়েজ কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইহসান, অনু. মাহবুবুর রহমান, *রওজাতুল কাইয়্যুমিয়্যাহ* (খুলনা : আলহাকীম প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৬৫,৭৯, ৯৬, ১০৪, ১১১, ১৮৯; মুজাদ্দিদে আলফিসানী, অনু. শাহ মুহাম্মদ মূতী আহমাদ আফতাবী, *মাকতুবাত শরীফ* (ঢাকা : আফতাবীয়া খানকা শরীফ, ৩য় সং., ১৪২০ হি.), পৃ. ভূমিকা ৭-১৭; ড. আ.ফ.ম আবু বরক সিদ্দিক, *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ* (ফরিদপুর : ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ এন্ড কালচার, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৪, ১৮, ৪৯, ৫৯, ১২৩, ১৩৭]।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা প্রদান

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম[৮০] (র.) বলেন, মানবজাতির প্রতিপালন ও উন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার মনস্তাত্ত্বিক, চেতনামূলক ও আধ্যাত্মিক দিক। মানুষের অনুভূতি মনোবৃত্তি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হওয়ার কারণেই চেতন-অচেতনের চাহিদা সবসময় সাংঘর্ষিক থাকে, দু'য়ের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টির দু'টি পথ আছে।

এক. অচেতনকে সচেতনতার অনুগত তথা সৎ কর্মোদ্দীপনাকে অসৎ কর্ম বাসনার অনুগত করে দেয়া। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে দুইয়ের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। তবে চেতনামূলক দিকটির প্রতিফলত ঘটবে অসৎ পথে। ফলে আধ্যাত্মিকতা মানবিক ও চরিত্র সাধনায় পরিশ্রমী ব্যক্তি তৈরি হওয়ার গতিপথ হবে বিঘ্নিত।

দুই. চেতনাকে অচেতনতার মাধ্যমে পরাজিত করা সম্ভব হবে তখন যখন মানুষের আত্মা হবে স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ। তাই মানবজাতির চেতনামূলক দিকটির সঠিক প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন চেতনা ও অচেতনতার মাঝে পূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্য। আর এ সামঞ্জস্যের প্রধান শর্ত হলো, আত্মশুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রম।[৮১]

---

৮০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.) ১৯১৮ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে বরিশাল জেলার (বর্তমান পিরোজপুর জেলার) কাউখালী থানার শিয়ালকাঠী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও বিদ্বান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের বাড়িতে সম্পন্ন হয়। ১৯৩৪ খ্রি. ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মাধ্যমিক আলিম ও ফাযিল ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি ১৯৩৯ খ্রি. উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৫২ খ্রি. কৃতিত্বের সাথে টাইটেল পাস করে 'মমতাজুল মোহাদ্দেসীন' ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৩ খ্রি. থেকে ১৯৪৫ খ্রি. পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় উচ্চতর গবেষণায় রত ছিলেন। ছাত্র জীবনে সাহিত্য চর্চা এবং লেখালেখিতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করেন। কালকাতা মাদরাসায় অধ্যয়নকালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত (পরে ঢাকাতে) মাসিক মুহাম্মদী গবেষণা পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঢাকা প্রকাশিত তৎকালীন বাংলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় এবং মাসিক ঢাকা ডাইজেস্ট, মদীনা, তাহজীব, সাপ্তাহিক জাহান ইত্যাদি গবেষণামূলক পত্রিকায় মূল্যবান বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি পঞ্চাশের দশকে দেশে ইসলামী সাতিহ্য ও গবেষণার নবদ্বার উন্মোচন করেন। বিরামহীন গতিতে এ সময় সাহিত্য ও গবেষণামূলক বইপত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা সমূহ : কালিমা তাইয়্যিবা, আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, সুন্নাত ও বিদআত, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইলম, মহাসত্যের সন্ধানে, আজকের চিন্তাধারা ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি অসংখ্য বিদেশী বই দেশী ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি ১ অক্টোবর ১৯৮৭ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। [মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.), *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ভূমিকা; দ্র. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, *বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা* (ঢাকা : ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৩৩]।

৮১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

মানবজাতির আত্মশুদ্ধি এ দিকটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন মুসলিম মনীষিগণ। মানবজাতির আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতিফলন শুধু ধর্ম ও চরিত্রের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ধর্ম ও চরিত্রের উন্নতি তখনই শুধু সম্ভব যখন মানুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা শুধু সৎকাজের প্রতিপালনে ব্যয়িত হয়। এসব সৎকাজের প্রতি মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করেন একমাত্র মুসলিম মনীষিগণ। তাই আমরা সোচ্চার কণ্ঠে বলতে পারি যে, ইসলামী সমাজ সামগ্রিকভাবে নিজের সদস্যদের কাছে চায় আত্মশুদ্ধির অভিযান।[৮২]

আত্মশুদ্ধির পর করণীয় সম্পর্কে বুযুর্গ আলিমগণ বলেন, তিনটি বস্তু রিপুকে দুর্বল করতে পারে :

এক. ইচ্ছার মুখে লাগাম দেয়া ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ না করা।

দুই. ইবাদতে আনুগত্যের বোঝা চাপিয়ে তাকে দুর্বল রাখা। গাধা, খচ্চর দুর্বল হলেও যখন ঘাড়ে বোঝা চাপানো হয় তখন অনুগত হয়ে চলে।

তিন. আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা। তাঁর কাছে কান্নাকাটি করে মুনাজাত করা। কারণ, তিনি ছাড়া এ থেকে মুক্তি দেয়ার আর কেউ নেই।[৮৩] যেমনিভাবে হযরত ইউসূফ (আ.) মহান আল্লাহর কাছে বলেছিলেন : إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ "নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ; কিন্তু সে নয়, আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন।"[৮৪]

সুতরাং উক্ত তিনটি বস্তু সর্বদা অনুসরণ করা চাই। তাহলেই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই উচ্ছৃঙ্খল জন্তুটি তোমার অনুগত হবে। তখন সুযোগ বুঝে তাকে আয়ত্তে রেখে লাগাম লাগিয়ে নিবে।[৮৫] অতঃপর সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিবে। কারণ, যারা পরিশুদ্ধ তারা একান্ত মুত্তাকী, মুহসীন, মু'মিন ও অলী আল্লাহ নামে অভিহিত। যাতে সে নিজেকে সোনালী সুতোয় গেঁথে রাখতে পারে। চরিত্র গঠন সাধনায় পরিশ্রমরত মুসলিম মনীষিগণ এ ব্যাপারে সার্বক্ষণিক চিন্তায় বিমগ্ন থাকেন। ইসলামী সমাজের সদস্যগণ যদি উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী না হন, তাহলে সে সমাজকে ইসলামী সমাজ বলা যায় কিভাবে? এক্ষেত্রে মুসলিম মনীষিগণই আত্মশুদ্ধির পথ প্রদর্শক। তাই আমাদের এ দাবি যথাযথভাবে সত্য যে, ভিত্তি, শক্তি, উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন মুসলিম মনীষিদের সংস্পর্শ। যার কোন বিকল্প নেই এবং তাঁদের মাধ্যমেই বিশেষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়।[৮৬]

---

৮২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র.), *তাফসীর মাআরিফুল ক্বোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩০

৮৩. আল-গাজ্জালী (র.), *মিনহাজুল আবেদীন*, অনু. অধ্যাপক আখতার ফারুক (ঢাকা : এম. এম. এ রশীদ বুক হাউস, ১০ম সংস্ক., ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯৫

৮৪. আল-কুরআন, ১২:৫৩

৮৫. আল-গাজ্জালী (র.), *মিনহাজুল আবেদীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৮৬. *তাসাউফের আসল রূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সতর্কবাণী

মহান আল্লাহ মানবজাতির হিদায়াতর জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী-রাসূল দুনিয়ায় আসবেন না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অমীয় বাণী অনুযায়ী এও জানতে পেরেছি যে, নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া আদর্শের প্রবাহমান ধারা আলিম-উলামাগণই জীবন্ত করে রাখবেন। এছাড়া পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ ভীতি প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। নবুওয়াতির দরজা বন্ধ তবে কেউ না কেউ অবশ্যই এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, তা না হলে জাতি গোমরাহ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ এজন্য একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে নবী-রাসূলদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালন করাবেন।। মহান আল্লাহ বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মানবজাতিকে সৎকাজের আদেশ প্রদান করবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"[৮৭]

এছাড়া কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ হওয়ার পর মহান আল্লাহ কর্তৃক দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতামণ্ডলী যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরকে গেটে আটকিয়ে জিজ্ঞাসা করবে দুনিয়ায় সতর্ককারী বা সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কোন আহ্বানকারী আহ্বান করেছিল কিনা? মহান আল্লাহ বলেন :

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ - قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ.

"যখন তাদেরকে তথায় (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত করা হবে তখন দাররক্ষী জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল; কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করেছিলাম।"[৮৮]

সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, আজ থেকে ১৫শত বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইনতিকালের মাধ্যমে নবুওয়াতের ইমারত পূর্ণতা লাভ করেছে এবং মহান আল্লাহ উক্ত ইমারত নির্মাণ করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী-রাসূলের এ পৃথিবীতে

---

৮৭. আল-কুরআন, ৩:১১০

৮৮. আল-কুরআন, ৬৭:৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

আগমন বন্ধ ঘোষণা করেছেন। তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব কে পালন করবেন? এ প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ "নিশ্চয় আলিমগণই নবীগণের উত্তরসূরি।"[৮৯] কাজেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তরসূরি হিসেবে আলিম-উলামা তথা মুসলিম মনীষিগণ এ দায়িত্ব পালন করবেন।

তাই তো আমরা লক্ষ্য করি আলিম তথা মুসলিম মনীষিগণ যুগের পর যুগ নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া দায়িত্ব তথা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিশ্বব্যাপী অসামান্য অবদান রেখে আসছেন। এমনিভাবে মুসলিম মনীষিগণ ওয়ায মাহফিল, জনসভা, জুমার খুতবাহ, তালিম, তাবলীগ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও লেখনীর মাধ্যমে সমাজকে গোমরাহীর পথ থেকে বের করে আলোর পথ দেখিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখাবেন। এছাড়া একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন ধারার মান কেমন হবে সে সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, "শিষ্টাচার ও সুষ্ঠ আচরণ, মহাত্ম্য ও ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা, সদ্বিবেচনা ও উত্তম নির্বাচন, সুবিন্যস্ত ও শৃংখলা, অনুভূতির মাধুর্যতা ও রুচির সৌন্দর্যতা নিয়ে গঠিত হয়। আর দুনিয়ার পরের জীবনের যে সব বস্তু অর্জিত হয় যা এক সফল ও কামিয়াব জীবনের জন্য প্রয়োজন।[৯০] আর প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে মুসলিম মনীষিগণই একমাত্র ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। এজন্য মুসলিম মনীষিগণ ব্যতীত সুন্দর সুশৃংখল সমাজ গঠন কল্পনা করা অসম্ভব।

---

৮৯. আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং ২৬০৬

৯০. মুহাম্মদ ইউসুফ, *ইসলাহীর ভাষণ*, রামপুর, ভারত, ৩০ আগস্ট, ১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ধর্মীয় অভিভাবক

ধর্মীয় অভিভাবক হিসেবে মুসলিম মনীষিগণ সাধারণ জনতাকে সতর্ক করে থাকেন। ফলে অর্জিত হয় ঈমানের পরে দৃঢ় বিশ্বাসের স্তর। জনাব বোরহান আহমদ ফারুকী বলেন, “মানবজাতির ব্যক্তিত্ব সুন্দর ও সুশৃংখল হওয়ার জন্য অন্য ধর্মকর্ম এবং শিক্ষা ব্যবস্থা এক ও একমুখী হওয়া অপরিহার্য।” এজন্য Sir Stanly Hull বলেন,

“If you teach your children the three R’s Reading, Writing and Arithmatic and leave the fourth ‘R’ (Religious) then you will get a fifth ‘R’ (of Rascality).”

জীবনে যদি জ্ঞান আর বিশ্বাস এক না হয় তাহলে আমল বা কর্ম বিশ্বাসের সহযোগী থাকে না; বরং ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ে নেষ্টির শিকার। আর আনুগত্যের বদলে অবাধ্যতার প্রবণতায় তার হৃদয় হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ। তাই মানবজাতির চরিত্রকে সুন্দর ও সুশৃংখল করার লক্ষ্যে জীবন এবং কর্মনীতিকে এক ও অভিন্ন করা অপরিহার্য। একথা আমরা প্রতিদিনের দেখাশোনা এবং অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি। আমরা মুসলমান হিসেবে অদৃশ্য জগতের সবকিছুর উপর বিশ্বাস রাখি। তবে আমাদের ঈমান প্রাসাদের খুঁটি অত্যন্ত টলটলায়মান। আমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দরিয়ায় নিমজ্জিমান। আমরা যদি বাস্তবপ্রিয় মন-মস্তিষ্ক দিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে নিশ্চয়ই এ দাবির সমর্থনে স্বতঃস্ফূর্ত শব্দ শুনতে পাবো নিজের মধ্যে। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষিত যুবক শ্রেণি মানসিকভাবে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত, আর এ অবস্থায়ই তাদের মধ্যে অনাস্থা দৈন্য এবং মানসিক নৈরাজ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার কেন এ অবস্থার সৃষ্টি হলো? এ বিশৃংখলা ও দৈন্যদশার কারণ কী? আমাদের বিশ্বাস আর কর্মনীতির মধ্যে একতা আর বন্ধুত্ব নেই কেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি এই যে, এসব নৈরাজ্যগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে কাফিরই বলে দিলাম? না কখনও হতে পারে না। এর সঠিক উত্তর বা সরল সমাধান কি? এর সঠিক সমাধান পেতে হলে অবশ্যই কুরআন-হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ মুসলিম মনীষিগণের শরণাপন্ন হতে হবে, মুসলিম মনীষিগণ এ সবের সঠিক সমাধান দিতে পারেন।[৯১]

বাস্তবতা হচ্ছে এ যুগ হলো বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ। এ যুগে মস্তিষ্ক প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শনের ভিত্তিতে মানিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় সদা ব্যস্ত। এদিকে বিজ্ঞানীরা যা দাবি করেছেন তা বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষিত নিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সঠিক প্রমাণ করে যাচ্ছেন। বিবেক স্বভাবিকভাবে সেই বিজ্ঞান গবেষকদের দাবির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অথচ এ ধারার চিন্তাধারা আধ্যাত্মিকতার অস্বীকার এবং

---

৯১. *তাসাউফের আসল রূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবাদিতাকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে যেসব ব্যক্তি বস্তুকে শুরু-শেষ তথা সবকিছুর মূল ভাবে এবং রূহানী জগত ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বিশ্বাস পোষণ করে না। এই ধরনের যুক্তিপ্রিয় শ্রেণির মাঝে বস্তুবাদী চিন্তাধারা সমাদৃত হয়ে উঠেছে। ফলে ঈমানের পূর্ণ সমর্থন ও প্রত্যয়ন করতে পারে না আমাদের জ্ঞান। জ্ঞান আর বিশ্বাসের মাঝে যদি সঙ্গতি না থাকে তহালে কার্য কখনও বিশ্বাসের সঙ্গ দিবে না। এ কারণেই আজ মুসলমানদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে, ঈমানের স্থিরতা, পূর্ণতা ও দৃঢ়তা কিভাবে অর্জন করা যায়? বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রবণতা মানুষের স্বভাবে গেঁথে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا.

"নিশ্চয়ই আমি হিদায়াতের পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, ইচ্ছা করলে কেউ গ্রহণ করতে পারে, নাও পারে।"[৯২]

আর এ হিদায়াতের দিকে বিশ্বমানবতাকে আহ্বান করে একমাত্র মুসলিম মনীষিগণ। মুসলিম মনীষিগণ মানুষের মন-মগজ থেকে সমস্ত জটিলতা ও বস্তুবাদী ধারার অবসান ঘটিয়ে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে সঠিক চিন্তা-চেতনার উদ্ভব করতে চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ গড়তে দারুণভাবে সহায়তা করে। সমাজ তথা ইসলামী সমাজকে চাষাবাদ করতে হলে মুসলিম মনীষিগণের বিকল্প নেই। সুতরাং সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ গঠনে মুসলিম মনীষিগণের অবদান বরাবরই বিদ্যমান।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন, সেসব লোক আমাদের (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের) দলভূক্ত নয় যারা আল্লাহর কিতাব নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেনি এবং নবী (সা.)-এর হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেনি। যারা এমন আলিমগণের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়েছে যারা সূফী তথা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যাদের রয়েছে কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান তারা আমাদের ধর্মের দলভূক্ত নয়। যারা এমন আলিমগণের দলভূক্ত নয়, যারা এমন মুহাদ্দিসগণের সান্নিধ্যেও কোন দিন বসেনি, যারা ফিকাহবিদও বটে এমন ফিকাহবিদগণের সহচর্য অর্জন করেনি যারা একই সঙ্গে হাদীস বিশারদ।[৯৩]

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন, সূফীগণই একমাত্র আল্লাহকে চেনার পথে চলমান কাফেলা। তাঁদের জীবনাচরণ অন্য সকলের জীবনাচরণের চেয়ে উত্তম। তাঁদের নীতি সব নীতির চেয়ে

৯২. আল-কুরআন, ৭৬:৩

৯৩. হাফেজ মাওলানা নেছারউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী* (ঢাকা : শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইসলামিক সেন্টার, স্মরণিকা ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধ। তাঁদের চরিত্র সবার চরিত্র চেয়ে স্বচ্ছ-নির্মল শুধু তাই নয়; বরং বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি, প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানীদের জ্ঞান ও জ্ঞানের গুপ্ত তথ্যাবলিকে যদি নিংড়ে নেয়া হয় তবুও সূফীগণের জীবনাচরণ ও চরিত্রের চেয়ে উত্তম হতে পারবে না। কারণ, তাঁদের দৃশ্য অদৃশ্যসমূহ আচার-ব্যবহার সরাসরি নববী সীনার আলোয় আলোকিত, নববী ধনে ধনবান আর এই পৃথিবীতে নবী নূরকে ছাড়িয়ে কোন আলো নেই।[৯৪] এ মানবজাতির অন্তর্নিহিত জ্ঞান যার সঠিক লালন-পালন ও উন্নতি সাধন একমাত্র আলিম-ওলামার আধ্যাত্মিক তালিমের মাধ্যমেই সম্ভব। যখন কোন আলিম আত্মার সাধনা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বেলায়েতের আকাশ সীমায় পৌঁছে যান তার কাশফ ওহীর উদ্দেশ্য ও চাহিদার সঙ্গে সর্বাঙ্গীনভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়। হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) বলেন, "তুমি যদি হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহকে খোঁজ করো তাহলে আল্লাহ এমন এক আয়না দান করবেন যাতে তুমি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের বিস্ময়কর বস্তু দেখতে পাবে।"[৯৫]

যে সব কাজ আদেশ-নিষেধকে অবশ্য করণীয় বা বর্জনীয় মনে করে তার অনুসরণ করা হয় তাকে চারিত্রিক গুণাবলি বলা হয়। আর যে সব কাজ আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণে করা হয় সেগুলোকে চারিত্রিক দোষ বলা হয়। কারণ, কুরআনের হুকুম বা আদেশ হলো মাপকাঠি। চারিত্রিক গুণাবলি ধর্মীয় অলৌকিক অভিজ্ঞতার পর্যায়ে তখনই পৌঁছাতে পারে যখন সেই গুণাবলি আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের ফলে অনিশ্চয়তায় সম্পন্ন হবে এবং কোন প্রকার ইচ্ছা ছাড়াই আদেশকৃত কাজ পালিত হবে, নিষিদ্ধ কাজ বর্জিত হবে। এ জন্যেই শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ ওলিদের থেকে প্রকাশ পায় না; বরং ওলীগণ তথা মুসলিম মনীষিগণ শরীয়তের পথে নিজেদেরকে অটল রেখে জনসাধারণকে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার জন্য আহ্বান করে থাকেন।

কারণ, মুসলিম মনীষিগণ সর্বদা আল্লাহর ভীতি স্থাপন করেন এবং নিজের চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহর চাওয়া-পাওয়াতে পরিণত করে দেন। এ কারণে তাঁরা সত্য মিথ্যা, হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রভেদ করে চলতে পারেন এবং সে অনুযায়ী সাধারণ জনগণকেও পথনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

---

৯৪. আল-গাযযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ, *আল-মুনকিয মিনাদ দালাল*, পৃ. ৫; আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, http://www.alwaraq.com

৯৫. ইমাম গাযযালী, *গুনিয়াতুত তালিবীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৭

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী জ্ঞান দান করবেন এবং তোমাদের মন্দ কর্মসমূহকে গোপন রাখবেন ও তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।"[৯৬]

আর শয়তানী ছোঁয়া সহজেই তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ.

"নিশ্চয়ই যারা খোদাভীতি রাখে, তাদের উপর যে কোন দিক থেকে শয়তানী আক্রমণ আসার সাথে সাথে তারা সতর্ক হয়ে যায়। অতঃপর তাদের বিবেচনাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠে।[৯৭]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ যে গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রত্যেকটি মুসলিম মনীষিগণের জীবনের বাস্তব চিত্র লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের লালিত চরিত্র আদর্শ অনুযায়ী মানব সমাজকে পরিবর্তনের সাথে সাথে সমগ্র পৃথিবীকে তাঁরা খোদায়ী রঙে পরিচালিত করতে চান এবং প্রত্যাশা নিয়ে সাধিত হয় তাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম। এ ঝঞ্জা বিক্ষুদ্ধ পৃথিবী থেকে অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, নিগৃহন, যেনা-ব্যভিচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, অপহরণ, অপসংস্কৃতি, দুর্নীতি ও সমস্ত অসামাজিকতার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নতি, অগ্রগতি, স্বস্তি ও নিরপত্তা বিধান নিশ্চিতকল্পে একটি সুন্দর সুশীল সমাজ উপহার দেয়াই মুসলিম মনীষিগণের চিরন্তন প্রত্যাশা। যেখানে সর্বসাধারণ তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহযোগিতা নিতে পারে। যে সমাজে খোদায়ী বিধান সর্বত্র জারী থাকবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকার, সে সমাজ অবশ্যই একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজ হবে। এক কথায় তাঁদের প্রত্যাশা থাকবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

---

৯৬. আল-কুরআন, ৮:২৯

৯৭. আল-কুরআন, ৭:২০১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জ জেলার মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুগে যুগে বৃহত্তর সিলেট তথা সুনামগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিবেশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জের স্বনামধন্য মনীষিগণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত আলিম-ওলামাগণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায়, পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় মুসলিম মনীষিগণের অবদান

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : এক নজরে থানাভিত্তিক সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জ জেলার মুসলিম মনীষিদের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ
যুগে যুগে বৃহত্তর সিলেট তথা সুনামগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিবেশ

সুনামগঞ্জ জেলার প্রাচীন ইতিহাসের সাথে তার শিক্ষার ইতিহাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ অঞ্চলের প্রাচীন শিক্ষিত মনীষিগণ বাংলাদেশের ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছেন। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় যে টোল প্রথা ছিল তা সুনামগঞ্জেও বিদ্যমান ছিল। টোল-চতুষ্পাঠী ছাত্ররা গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা লাভ করত। পণ্ডিতরা ছাত্রের ভরণপোষণের জন্য লাভ করত নিষ্কর জমি ও পারিতোষক।[১] উপমহাদেশে প্রাচীনকালে যে কয়টি স্থানে শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম পাদভূমি গড়ে উঠেছিল সুনামগঞ্জ তার অন্যতম।

গুরুগৃহে অবস্থান করে বিদ্যার্জনের আশ্রমিক যুগের অবসান হলেও তার রেশটুকু অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কোথাও কোথাও অবশিষ্ট ছিল। সেই ঐতিহ্যর শেষ রশ্মির অনুজ্জ্বল ক্ষীণলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে টোল-চতুষ্পাঠী মক্তবগুলোর মাধ্যমে। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাথে নীতি শিক্ষাও সেখানে সমান গুরুত্ব লাভ করতো। অতঃপর নতুন যুগ এলো নতুন দিনের নবতর বাণী নিয়ে। বিদ্যা শুধু জ্ঞানার্জনের জন্যে নয়, বিত্তার্জনের বাহনও হয়ে উঠলো। সেদিন থেকে টোল-চতুষ্পাঠী মক্তবকে ক্রমান্বয়ে পথ ছেড়ে দিতে হলো পাঠশালা স্কুলের জন্য। অবশ্য দীর্ঘদিন প্রাচীন এই ঐতিহ্য সুনামগঞ্জে বর্তমান ছিল। সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি বক্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিলেট থেকে প্রকাশিত 'কাফেলা'র প্রথম বার্ষিক সংখ্যা পড়ে ১৩ই মে, ১৯৬৭ খৃ. সনে তিনি সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লিখেন :

"সিলেটে সাহিত্য তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ইহকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ছান্দসিক শ্রীযূত প্রবোধ সেন একদা আমাকে বলেন, স্বরাজ লাভের পূর্বে পাকভারতে জেলা অনুযায়ী সিলেটে ছিল সবচেয়ে বেশী মক্তব-মাদরাসা এবং টোল চতুষ্পাঠী। পরলোকগত রামানন্দ ও প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন, 'প্রবাসী' ও 'সবুজ পত্রে'র গ্রাহক সংখ্যায় কলিকাতার পরেই ছিল শ্রীহট্ট জেলার স্থান। আমি ভরসা রাখি ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট তাহার ঐতিহ্য বজায় রাখিবে ও আপনারা সেই কর্মে নিশানদার হইবেন।"

---

১. *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে পাঠশালায় পাঠ্যদানের রীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা মাটিতে খড়ি দিয়ে বর্ণপরিচয় শিখতো। তারপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ শিখতো। বহু সাধনার পর কলম স্পর্শ করার অনুমতি পাওয়া যেতো। আর হস্তলিপির ব্যাপারে পণ্ডিত মৌলভীরা ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। শিক্ষাদানের মহত্তম মাধ্যম 'বেত' তাদের হস্তে সগৌরবে ছিল বিরাজমান। বিংশ শতাব্দীতেও প্রারম্ভিক শিক্ষার এ ঐতিহ্য সুনামগঞ্জসহ গোটা সিলেটাঞ্চলে ছিলো সুপরিচিত। সুনামগঞ্জ জেলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং এর প্রবর্তক ছিলেন মিশনারী রেভারেন্ড ডব্লিউ প্রাইজ।[২] কিন্তু তখন সমাজে ফার্সীর দাপট ছিলো অপ্রতিহত। কেননা, নবাবী আমলে ফার্সীই ছিল রাজভাষা এবং তার প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যহ্ন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। রাজ সরকারে চাকুরী প্রত্যাশী মাত্রই ফার্সী শিখতেন সযত্নে। প্রত্যেক গ্রামে টোল এবং আরবী ও ফার্সী পড়ার জন্য মক্তব ছিলো। সাধারণত মসজিদ কিংবা মসজিদসংলগ্ন ঘরে মক্তব বসতো। মসজিদের ইমাম কিংবা অন্য কোন মৌলভী সাহেব তাতে শিক্ষাদান করতেন। 'Indian Education Policy' নামক গ্রন্থে মুসলিম আমলে মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার নিম্নরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে :

School were attached to Masques and shrines and supported by state grants in cash or land or by private liberality. The course of study in a Mohammadan place of learning included grammar, logic, literature, juriprudence and science. Both systems the Mohammadan no less tham the Hindu, assigned a disproportionate importance to the training of memory and Sougth to develop the critical faculties of the mind, mainly by exercising their pupils in metaphysical refinements and in fine spun commentaries on the meaning of the text which they had learnt by heart. [৩]

তখন দেশে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু ছিল। এ ব্যাপারে জনাব আব্দুল হাই বলেন : "প্রাচীন ভারতবর্ষ এমনকি মধ্যযুগের মুসলিম ভারত ধর্মপ্রবণ ছিল। তাই দেখা যায় মুসলিম ভারতের শিক্ষা প্রণালীও মূলত ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছিল। শিক্ষানুশীলনকারী ছাত্রদের মানসিক বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি যাহাতে সংযত হয় এবং চরিত্র গঠনের দ্বারা নৈতিক ও আর্থিক জীবনের উন্নতি হয় মুসলিম ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে সেই দৃষ্টিই সক্রিয় ছিল। ইসলামী আদর্শের সঙ্গে মুসলিম ভারতের শিক্ষা প্রণালীরও যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিল।"[৪]

ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সাহায্যে সাধারণত প্রাচীন টোল, মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতো। জমিদার বা সমাজপতিরাই সাধারণত এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

---

২. *সিলেটে ইসলাম*, পৃ. ১৩০

৩. The Government of India, *Indian Education Policy,* 1904, P. 2

৪. মোহাম্মাদ আব্দুল হাই, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ১৯৬৫, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সামষ্টিক সাহায্য-সহযোগিতা থেকেও এ সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্র বঞ্চিত হতো না। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অনুসঙ্গী অলী-আউলিয়াগণ যেখানে গিয়েছেন সেখানেই খানকা গড়ে উঠেছে। এ খানকাগুলোর মধ্যে কয়েকটিতে কালে মাদরাসা গড়ে উঠে। তরফ বিজয়ী সৈয়দ নাসির উদ্দীন (রহ.)-এর বংশধররা তরফের নানা স্থানে খানকা তথা মাদরাসা গড়ে তোলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সুব্যবস্থা করেন।[৫] এগুলো কোন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এগুলো ছিল খারেজী বা স্বনির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হাদীস, ফিকহ, তাফসীর প্রভৃতি নানা বিষয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হতো। সুনামগঞ্জের সুসন্তান দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : "হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেটে আগমনের পরপরই এ জেলায় ইসলামী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। এ শিক্ষা প্রসারের প্রথম উদ্যোগ সূচিত হয়েছিল জগন্নাথপুর থানা সৈয়দপুর গ্রামে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট বিজয়ের পরপরই এ গ্রামে একটি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। কুরআন-হাদীসসহ ইসলামী বিভিন্ন শিক্ষা এ প্রতিষ্ঠানে দেয়া হতো। পরে এটি খারেজী মাদরাসা এবং পরবর্তীতে এটি জুনিয়র মাদরাসা এবং বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ সিনিয়র মাদরাসায় পরিণত হয়েছে। সে হিসেবে এটি জেলার প্রাচীনতম মাদরাসা।"[৬]

এ সকল স্থান ব্যতীত দিনারপুর, কানিহাটী ও ফুলবাড়িতে ইসলামী রীতি-নীতি, আদব ও আখলাক শিক্ষা দেয়া হতো। ফুলবাড়িতে বর্তমানে যে মাদরাসা রয়েছে তার বুনিয়াদ পাঠান আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুলবাড়ির জমিদার আজির উদ্দীন চৌধুরী এ মাদরাসাতে কোলকাতা আলীয়া মাদরাসার সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যসূচী প্রবর্তণ করেন এবং তার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে নিজে গ্রহণ করেন। অনুরূপ সিলেট শহরের দরগাহ মহল্লার মুফতী পরিবারের মাওলানা জিয়া উদ্দীন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় দরগাহ মহল্লায় একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। ইংরেজ আমলে ফার্সীর স্থলে বাংলা ভাষা আদালত ব্যবহার্য ভাষার স্থান দখল না করা পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এই মাদরাসা বিদ্যমান ছিল। এই মাদরাসা ফার্সী ভাষা শিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এ স্থানে ফার্সী শিক্ষা করত।[৭] অনুরূপ সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানেও অনেক মাদরাসা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ টাউন মাদরাসা, জয়কলস মাদরাসা, চরমহল্লা মাদরাসা প্রভৃতি অন্যতম।[৮]

মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষর পাশাপাশি এতদাঞ্চলে হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ছিল টোল। ছাতক থানা লাকেশ্বর ও দোয়ারাবাজার থানার দোহালিয়ায় শতাধিক বৎসর আগেও টোল ছিল। ১৯১৩

---

৫. *সিলেটে ইসলাম*, পৃ. ১১০

৬. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২৬২

৭. *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, উত্তরাংশ, ৩য় ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭

৮. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

সাল পর্যন্ত দোহালিয়া গ্রামের টোলটি চালু ছিল।[৯] এ টোলের সর্বশেষ পণ্ডিত ছিলেন চণ্ডিচরণ ন্যায়রত্ন। তিনি 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভের জন্য পায়ে হেঁটে নবদ্বীপে যান ও কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করতে সক্ষম হন।[১০] তৎকালে ঐ উপাধি বিশেষ সম্মানের গুরুত্ব বহন করত।

মাদরাসা ছাড়া মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষার জন্য ছিল মক্তব। শহরের আরপিননগর তালুকদার বাড়ীতে এ ধরনের একটি প্রাচীন মক্তব ছিল। সুনামগঞ্জ মিউনিসিপলিটির আজীবন সদস্য জনাব কাদির বখশ-এর নামানুসারে এটি কে. বি মিয়া মক্তব নামে পরিচিত। বর্তমানে এটি একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি অত্র এলাকার প্রাচীনতম মক্তব যা ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] টোল, মাদরাসা ও মক্তব ছাড়াও এতদাঞ্চলে শিক্ষার আরেকটি সোপান ছিল পাঠশালা। ইংরেজি প্রসারের আগে এ অঞ্চলে মধ্যযুগে পাঠশালা নামে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছিল তাতে বাংলা, অংক ইত্যাদি পড়ানো হত। মধ্যযুগে পাঠশালার ছাত্ররা বাংলা ও অংকে তুখোড় হতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সুনামগঞ্জ শহরের রাজগোবিন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রথমে একটি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় ছিল।[১২] এ ছাড়া জেলার অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচিতে এগুলোর বেশিরভাগই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

এ ধরনের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের পরাধীনতার গ্লানি মোচনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সরকারের সঙ্গে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্কই থাকতো না। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিজেরা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন পদ্ধতি নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতেন।[১৩]

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সিলেটের শাসনভার গ্রহণ করে। এ সময়ে টোল এবং মক্তব-মাদরাসাই ছিল স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তখন ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই প্রচলিত ছিল। ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের শিক্ষা কর্মসূচীতে প্রথম হাত দেয়। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এ দেশে বছরে একলাখ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনের পোশাকী নাম হলো 'চার্টার এ্যাকট অব ১৮১৩'। এ উদ্দেশ্যে ১৮১৭ সালে কলকাতায় 'স্কুল বই সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্কুলের সকল ক্লাসের উপযোগী বই সস্তায় মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ। ১৮২৩ সালে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' গঠিত হয় এবং

---

৯. *অতীত জীবনের স্মৃতি*, পৃ. ৯১

১০. প্রাগুক্ত।

১১. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২৬২

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

১৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন তাদের হাতে ন্যস্ত হয়। ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা সংক্রান্ত ফরমানে স্বাক্ষর করেন।[১৪] তাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের প্রথমাবস্থায় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বৃহত্তর সিলেটেও মুসলমান সমাজে এর প্রসার ছিল অত্যন্ত মন্থর। আর্থিক অসঙ্গতির সঙ্গে ইংরেজ ও ইংরেজি বিদ্বেষও তাদের মনে দানা বেঁধেছিল। মাতৃভাষা সম্পর্কেও বিভ্রান্তি মুক্ত হতে তারা যথেষ্ট সময় অপচয় করেন। তদুপরি তারা বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিকতার ভাষা বলে মনে করে সে ভাষাকে দীর্ঘদিন ঘৃণার চোখেই দেখেছে।[১৫] তাদের বিবেচনায় "বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় এমন কোন গ্রন্থ নেই যাহা পাঠ করে মুসলিম হৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত হতে পারে। বরং তা পাঠ করলে তদ্বিপরীতভাবেই হৃদয় কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা।"[১৬] বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও এ কুপমণ্ডুকতা মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। তাদের প্রচারণায় অভিব্যক্ত "যে সকল অভিভাবক স্ব স্ব সন্তানদিগকে প্রথমেই ইংরেজি বা বাংলা শিক্ষা করতে দেন তারা নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করেন।"[১৭]

অবশ্য এ সময়ে উক্ত মানসিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় মুসলমান সমাজেও আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে এবং কয়েকটি পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ইমদাদুল হক তাঁর ধর্ম ও শিক্ষায় লিখেছেন : "শিক্ষার বিস্তার করিতে ইহলে এক্ষণি ইংরেজি শিক্ষার বহুল প্রচলন আবশ্যক। যাহারা কাফেরী ভাষা বলিয়া ইংরেজি শিক্ষার এবং এলমে বেদ্বীন বলিয়া বিজ্ঞানের বিরোধী, তাহারা অজ্ঞান, তাহারা মূর্খ, তাহারা দয়ার পাত্র।"[১৮]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার ফলে মুসলিম জীবনে যে চরম নিরাশাবাদের সৃষ্টি হয় তার ফলে সিপাহী বিপ্লবের সময় একতাবদ্ধ মুসলিম সমাজের আলিমদের মধ্যে আবার বিভাজন সৃষ্টি হয়। আলিমদের মধ্যে একদল পূর্বাপর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। অপরদল ইংরেজদের সঙ্গে রফা করে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। এ ধরনের লোকদের বলা হত তাইয়্যুনী[১৯] (Balanced)। এ দলের

---

১৪. *সিলেটের মাটি ও সিলেটের মানুষ*, পৃ. ১৫৭

১৫. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, পৃ. ২১

১৬. *ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন ১২৯৮ বাংলা, পৃ. ১৯

১৭. মুস্তফা নূরুল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৪

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১৯. *সিলেটে ইসলাম*, পৃ. ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

নেতা ছিলেন মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী। তাঁর সাথে যোগ দিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফ মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'Mohamedan Literary Society'-এর পত্তন করেন।[২০] সিলেটে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজের কতিপয় লোকেরা এক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে সিলেট সরকারী বিদ্যালয় স্থাপতি হওয়ার অব্যবহিত পরে স্থানীয় মুফতী পরিবারের জনাব নূর উদ্দীন ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি 'মুফতী স্কুল' নামে একটি মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২১] মুফতী নূর উদ্দীনের এ স্কুল স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম সমাজের লোকদের মানসে ইসলামী ভাবধারার সঞ্চার। অন্য একটি সূত্রে তারও পূর্বে সুনামগঞ্জের ছাতকে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার তথ্য পাওয়া যায়। হ্যারি ইংলিশ নামক জনৈক ইংরেজ ছাতকে চুনার ব্যবসা করে বিশাল সম্পত্তি ও অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি জানা লোকের প্রয়োজন হওয়ায় ১৮৫৩ সালে ছাতকে মধ্য ইংরেজি বা 'Middle English School' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন।[২২] এটিই সুনামগঞ্জ জেলার প্রথম মাইনর স্কুল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সিলেট জেলাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হলে তৎকালীন বিভিন্ন মহকুমায় ইংরেজি স্কুল গড়ে উঠে। তবে তার পূর্বেও কোন কোন স্থানে ইংরেজি স্কুল গড়ে উঠেছিল। ছাতকে ১৮৫৫ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ ইংলিশ স্কুল এবং দুহালিয়ায় ১৮৭৪ সালে মধ্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ সালে সুনামগঞ্জ শহরের পত্তন হওয়ার অব্যবহিত পরে মরমী কবি হাছন রাজা সুনামগঞ্জে 'হাছন এম ই স্কুল' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[২৩] এভাবে জেলার অন্যান্য স্থানেও এম ই স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব স্কুল কালক্রমে হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে। আবার অনেকগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এভাবে জেলার নানা স্থানে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হলেও মুসলিম মানসে ইসলামী ভাবধারার বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা সমীক্ষায় বৃহত্তর সিলেট জেলার বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যার নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় :[২৪]

---

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
২১. নূরুর রহমান খান, *সৈয়দ মুজতবা আলী জীবন কথা* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশে, ১৯৯০), পৃ. ১৮
২২. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২৬২
২৩. *সিলেটে ইসলাম*, পৃ. ১৩০
২৪. *A Statistical Account of Assam,* Vol. 2, P. 327

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবর্ষ	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	
		হিন্দু	মুসলমান
১৮৫৬-৫৭	৩	২৪৮	১৯
১৮৬০-৬১	৫	২৯৬	৭৬
১৮৭০-৭১	১৫	৮০৫	৭০

উপরোক্ত পরিসংখ্যানুযায়ী ১৮৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষের তুলনায় ১৮৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হার কিঞ্চিত অধিক হলেও উক্ত সময়ে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু ১৮৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা পূর্বের শিক্ষাবর্ষের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও একই সময়ে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সম্ভবত সামর্থ্যের অভাবই এর কারণ। তখনো বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার প্রচলন হয়নি।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'History of Dacca Division' নামক গ্রন্থে বৃহত্তর সিলেটের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

"There are three schools for boys in the town of sylhet and 23 others in the district level. More than 1000 boys are receiving education in these schools and there is every reason to expeot the number will increase. There are only two females schools denominated 'lower class'. The school at sylhet is an Anglo-vernacular one and there are ten pupils. That at chattak is a vernacular one, with eleven pupils."[২৫]

অর্থাৎ বৃহত্তর সিলেট জেলায় মোট ২৬টি ছেলেদের স্কুল ছিল তন্মধ্যে ৩টি সিলেট শহরে এবং বাকী ২৩ টি লস্করপুর, বুরুঙ্গা, ইলাশপুর, জালালপুর, ইছাকলস, ছাতক, ভাটপাড়া, জলঢুপ, ঘিলাছড়া, আখালিয়া, কেশবপুর, ভাটেরা, বরমচাল প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন সিলেট শহরে ১টি ও ছাতকে ১টি মোট এ দু'টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল বলে এতে উল্লিখিত আছে। মেট্রিক পর্যন্ত কেবলমাত্র সিলেট শহরের শেখঘাট মিশন স্কুলই ছিল। তখন বৃহত্তর সিলেটে মোট ১৪টি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। অন্যান্য জায়গার স্কুলগুলো ছিল নিম্নপর্যায়ের বা নিম্ন মাধ্যমিক। সরকারী, মিশন, জনগণ বা জমিদারদের দ্বারা এসব স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০৫ সনে বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন স্থানে মোট ৫৯টি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। তন্মধ্যে সিলেট মহাকুমায় ১৩টি, সুনামগঞ্জ মহাকুমায় ৯টি, হবিগঞ্জে ১৮টি, মৌলভীবাজারে ৯টি ও তৎকালীন করিমগঞ্জ মহাকুমায় ১০টি মাধ্যমিক স্কুল ছিল।[২৬] কিন্তু এসব স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ফলে বহু ঐতিহাসিক সত্য তাতে যেমন উল্লিখিত হয়নি তেমনি বহু প্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব সেখানে নেই।

২৫. W. W. Hunter, *History of Dacca Division,* 1873, P. 8

২৬. *ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার সিলেট*, ১৯০৫, পৃ. ৩০১; এম. এন. এইচ রিজভী সম্পাদিত।

Dhaka University Institutional Repository

ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার (১৯০৫) এ উল্লিখিত নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান হতে বৃহত্তর সিলেটের তৎকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থা সমন্ধে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

সন	সেকেন্ডারী স্কুল	প্রাইমারী স্কুল
১৮৭৪-৭৫	২৭	১৯৫
১৮৮০-৮১	৩১	২৮৫
১৮৯০-৯১	৪৪	৬৯৫
১৯০০-০১	৬৮	১০১৭

সিলেটে ১৯০০-০১ সনে কলেজ ১টি, হাইস্কুল ৭টি, মধ্য ইংরেজি স্কুল ৪৬টি, মধ্য বঙ্গ স্কুল ১৫টি, ৪৭টি উচ্চ প্রাইমারী ও ৮৩৩টি নিম্ন প্রাইমারী বালক স্কুল এবং ১৩৭টি বালিকা প্রাইমারী স্কুল ছিলো বলে উপরোক্ত ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হয়েছে। এতে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিম্নরূপ বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে :

The Murari Chand secondary gard unaidad college in sylhet town was founded by Raja Girish Chandra Roy in 1892 and is supported by that gentleman. There is a govt. high school at Sylhet, aided high schools at Habigang, Sunamgong, Moulvi Bazar and Karimgong. There are also one govt. 40 aided and 4 unaided Middle English schools.[২৭]

অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা গিরিশ চন্দ্র রায় মুবারী চাঁদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এটা একটি দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজ ছিল। ঐ সময় কলেজটি সরকারী কোন সাহায্য পেত না। প্রত্যেক মহকুমা সদরে একটি করে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাইস্কুল ছিল। তন্মধ্যে সিলেট শহরে স্থাপিত স্কুলটি সরকারী স্কুল ছিল। এছাড়া সিলেট শহর ও বানিয়াচঙ্গেও হাইস্কুল ছিল। কিন্তু সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ছিল না। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মুরারী চাঁদ কলেজ ও সুনামগঞ্জ সহ প্রত্যেক মহকুমা সদরে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর দায়িত্বভার সরকার গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন স্থানে অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ ১৯৩২, মৌলভীবাজার কলেজ ১৯৫৬, মদনমোহন কলেজ ১৯৪০, সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ ১৯৩৯ এবং ১৯৪৪ সালে স্থাপিত হয় সুনামগঞ্জ কলেজ।[২৮] পরবর্তীতে সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক হাইস্কুল, মাদরাসা, কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, হোমিওপ্যাথিক কলেজসহ আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সুনামগঞ্জবাসীর বহুদিনের লালিত স্বপ্ন সুনামগঞ্জে একটি

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
২৮. *জালালাবাদের কথা*, পৃ. ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বর্তমানে বাস্তবায়নের পথে। একাদশ জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনে সুনামগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি অনুমোদন লাভ করে।

বিংশ শতকের ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশরাজ কায়েম ছিল। এই ৪৭ বছরের মধ্যে চারটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, যার প্রভাব শিক্ষাঙ্গনে প্রতিফলিত হয়। '১৯০৫-১৯১১ খ্রিস্টাব্দ' এ সময়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাবলির পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময়ে অসংখ্য স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আব্দুল লতিফ, মৌলভী আব্দুল করিম প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হন। এ সময়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ফলে অনেক মুসলমান সরকারী চাকুরী ও সম্মানজনক জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেন। '১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকার সাম্রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারের ভূমিকা ছিল প্রায় শূন্য। তবে উপরোক্ত সময়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেক স্কুল কলেজ স্থাপিত হয়। '১৯১৯-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ' খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের এ সময়টা ছিল ইংরেজি শিক্ষার একটি ক্লাইমেক্সের যুগ। ইংরেজি শিক্ষা বর্জন ও বৃটিশের চাকুরী ত্যাগ ছিল এ আন্দোলনের ঘোষিত নীতি। ফলে দলে দলে যুবকগণ স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে। '১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বৃটিশ সরকারকে পাততাড়ি গুটাতে হয়। এ সময়ে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব, ভারতীয় কংগ্রেসের কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, আসামে জাপানী আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনার দরুন বৃটিশ সরকার শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেনি। তবে উপরোক্ত সময়েও প্রাইভেট সেক্টরে স্কুল-কলেজ স্থাপন ও ইংরেজি শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। সুনামগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। উপরোক্ত সময়ে শিক্ষার সম্প্রসারণে সুনামগঞ্জের অনেক মুসলিম মনীষি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হন। যার বিস্তৃত বিবরণ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জের স্বনামধন্য মনীষিগণ

বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্প্রসারণে সূফী সম্প্রদায়ের অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক। তের শতক থেকে পনের শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে অগণিত সূফী, পীর-দরবেশ, মুবাল্লিগ, মুজাহিদ, সাধু-সন্ত আগমন করেন। পনের শতকে এ দেশে এরূপ ব্যক্তির আগমনের চিত্র জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শাহের নিকট বাংলাদেশের একজন সূফীর চিঠি থেকে অনুমান করা যায়। চিঠির বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ :

"বাংলাদেশ ধন্য, এখানে বিদেশ হইতে বহু আগত ফকির দরবেশ আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। বাংলার এমন কোন শহর বা গ্রাম নাই যেখানে মুসলমান সাধুরা ছাউনি গড়েন নাই। সোহরাওয়ার্দী সম্প্রদায়ভুক্ত সূফী সাধুরা অনেকেই মরিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া আছেন তাহাদের সংখ্যাও কম নয়।"[২৯]

ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগকারী বিদ্বান ব্যক্তিগণ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শীতার প্রমাণ রেখেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা মক্তবে ইসলাম ধর্ম পালনরীতি যেমন, নামাজ রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করার ব্যবস্থা করেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় এমন সকল বিষয় যেমন, নীতিশাস্ত্র, আইন, গণিত, কৃষি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও পাঠদানের ব্যাপারে তারা সচেতনতার পরিচয় দেন। এ সময় ধর্ম প্রচারকদের খানকাহ ছিল জ্ঞান বিতরণের প্রাণকেন্দ্র। সুনামগঞ্জ জেলাও এ ধরনের সূফী পীর-দরবেশের আগমনে ধন্য হয়েছে। তাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় মানুষ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছে। এক্ষেত্রে হযরত আলাউদ্দীন বাগদাদী, হযরত শাহ কামাল, হযরত শেখ কালু, হযরত দাওর বকস, হযরত ইউসুফ ইরাকী, হযরত শাহ সৈয়দ শামছুদ্দিন প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য।[৩০] এছাড়া অনেক রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী নিজেদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা ও জনমনে প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করে গেছেন। তারা জনহিতকর কার্যাবলির সাথে সাথে মসজিদ-মাদরাসা, ইয়াতিমখানা, স্কুল-কলেজ নির্মাণসহ এতদাঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এছাড়াও এতদাঞ্চলে অনেক কবি, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। যারা জাতীয় পর্যায়ে নানা অবদান রাখার পাশাপাশি অবহেলিত এ জনপদের লোককে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

---

২৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *কমলা বক্তৃতামালা* (কলিকাতা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২১

৩০. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সুনামগঞ্জের অধিবাসীদের বিদ্যানুরাগ বরাবরই প্রবল ছিল। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সুদূর অতীত থেকে ইংরেজ কাল এবং বর্তমান পর্যন্ত এ অঞ্চলের মানুষের জ্ঞান চর্চায় বা বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতায় ভাটা পড়েনি। সর্বাবস্থায় তারা জ্ঞানর্চচা অব্যাহত রখেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রকোপে এককালে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমনগণ যেমন তাদের নিভৃত কক্ষে নীরব জ্ঞান সাধনায় মগ্ন ছিলেন, তেমনি চরম দারিদ্র্য ও নিদারুণ অশান্তির মধ্যেও ইংরেজ প্রাক্কালে কিংবা ইংরেজকালে এ অঞ্চলের মানুষ বিদ্যা চর্চায় কোন অবহেলা প্রদর্শন করেননি। শিক্ষা-দীক্ষায় এরূপ অসামান্য ঐতিহ্যের ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে যুগে যুগে বহু মনীষি আবির্ভূত হয়েছেন। জ্ঞানচর্চার এমন অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্য এতদাঞ্চলের এক পরম সম্পদ। শিক্ষার সম্প্রসারণে এরূপ উল্লেখযোগ্য কতিপয় স্বনামধন্য মনীষির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

শামসুল উলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে কয়জন মুসলিম শিক্ষাবিদ ও সমাজ হিতৈষী মনীষি শিক্ষা-দীক্ষায় ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ও পাশ্চাত্য ধারার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শামসুল উলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাও সমানভাবে চলতে পারে এবং তাতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের কোন ক্ষতি সাধিত হয় না, শিক্ষা সংক্রান্ত এ নতুন দিকদর্শনের স্বার্থক রূপকার হচ্ছেন আবু নসর ওহীদ। শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি 'রিফর্মড মাদরাসাস্কীম' (Reformed Madrasah Scheme) বা নিউস্কীম (New Scheme) পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই তা সফলভাবে বাস্তবায়িত করে বিশেষত বংগ দেশে আরবী সাহিত্য চর্চার এবং ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে নবদিগন্তের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে গেছেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, রিফর্মড মাদরাসা স্কীম কেবল আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সামগ্রিকভাবে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে অতি অল্প সময়ে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল, তা ছিল এক কথায় অতুলনীয়।

বস্তুত নিউস্কীম পদ্ধতি এবং আবু নসর ওহীদ দুটো নাম শিক্ষার ইতিহাসে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু দুঃখের বিষয় নিউস্কীম সম্পর্কে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কিছুটা অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও আবু নসর ওহীদ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। অথচ বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় তাদের শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে যে কয়জন মনীষির কাছে বিশেষভাবে ঋণী, যাঁদের স্মৃতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

Dhaka University Institutional Repository

করা তাদের জাতীয় নৈতিক দায়িত্ব, আবু নসর ওহীদ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ পর্যায়ে সুনামগঞ্জের কীর্তিমান এ মহান মনীষির কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁর অবদান অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

জন্ম ও পারিবারিক ঐতিহ্য

আবু নসর ওহীদ ১৮৭২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সিলেটের হাওয়াপাড়া মহল্লায় মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩১] জন্ম সিলেট শহরে হলেও তাঁর পৈত্রিক নিবাস হলো সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার হাসনাবাদ গ্রামে। ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে এ পরিবারের সুখ্যাতি যেমন ছিল, আভিজাত্যের বিচারেও তেমনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। ওহীদের পিতা মুহাম্মদ জাভীদ বখত একজন সুযোগ্য আলিম ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। 'ক্বারী' হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত লাভ করেন।[৩২] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ক্বারী জাভীদ 'শামসুল উলামা' উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন।[৩৩] যদিও আব্দুল্লাহর বর্ণনার সমর্থনে অন্য কোন প্রামাণ্য সূত্রের সমর্থন নেই। তবু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্বারী জাভীদ একজন উচ্চমানের আলিম ছিলেন। ওয়াকিল আহমদ নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী (শ্রীহট্ট প্রতিভা ১৯৬১ পৃ. ২৪১-৪২) বরাতে জানিয়েছেন যে, আবু নসর ওহীদের পিতা জাভীদ বখত ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কবি হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।[৩৪] নরেন্দ্রগুপ্ত সম্ভবত ক্বারীকেই 'কবি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপর একটি সূত্রে ক্বারী জাভীদ-এর নামের সাথে বখত-এর পরিবর্তে বখশ উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৫] যাই হোক ক্বারী জাভীদ একজন উঁচুমানসম্পন্ন আলিম ও বিশিষ্ট ধর্মীয় প্রবক্তা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর এ প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল, তিনি ছিলেন মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (১৮০০-১৮৭৩) একনিষ্ঠ ভক্ত ও খলিফা।[৩৬] তৎকালীন সময়ে

---

৩১. কোন কোন সূত্র ওহীদের জন্ম সাল ১৮৭৪ সাল দাবী করলেও তাঁর পারিবারিক ও আত্মীয়তার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত সূত্র থেকে তাঁর জন্ম সাল ১৮৭২ খ্রি. বলেই নিশ্চিত করা হয়েছে। দেখুন, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : এ.বি. বুক ষ্টোর, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১৩৫।

৩২. আবদুল বাতেন, *সীরাত-ই মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী* (এলাহাবাদ : আসরার ই করীম প্রেস, ১৯৪৮ খ্রি.), পৃ. ১৫২

৩৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (১৮০০-১৯৭১), (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২১৪

৩৪. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯

৩৫. আবদুল জলীল বিসমিল, *সিলেট মে উর্দু* (করাচী : আঞ্জুমান ই তরাক্কী এ উর্দু, ১৯৮০-৮১), পৃ. ১৮৪

৩৬. আবদুল বাতেন কর্তৃক কারামত আলী জৌনপুরীর খলিফাদের যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে (মোট সংখ্যা ৬৯) তাতে ক্বারী জাভীদ এর নাম ১৪ নম্বরে স্থান পেয়েছে। আবদুল বাতেন, *সীরাত-ই মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

কারামত আলী জৌনপুরীর খিলাফত লাভ করা ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকে দুর্লভ সম্মান ও খ্যাতির বিষয়। এমন একজন প্রখ্যাত বুযুর্গের আশীর্বাদপুষ্ট ওহীদ জীবনে কখনই ধর্মীয় অনুশাসন ও আধ্যাত্মিকতার পথ থেকে বিস্মৃত হননি।

প্রাথমিক শিক্ষা

তৎকালীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের প্রথা বা ঐতিহ্যানুসারে আবু নসর তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে। এ সময় তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ, নামাযের সূরা-কিরাআত, দোয়া মাসআলা-মাসায়িল শিক্ষার পাশাপাশি আরবী-ফার্সী, উর্দু, ইংরেজি ও মাতৃভাষা বাংলার প্রাথমিক পাঠও গ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই আবু নসর অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।[৩৭] অতি অল্প বয়সেই তিনি ঐ সমস্ত বিষয়ে নিজের মধ্যে একটি শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ার ফলে তাঁকে বহু কষ্টে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হয়। এ সময় আবু নসরের শিক্ষাগুরু অভিভাবক বা পথপ্রদর্শক ছিলেন তাঁর ভগ্নিপতি বিশিষ্ট আলিম, শিক্ষাবিদ ও ধর্মপ্রচারক শামসুল উলমা মাওলানা আবু আলী আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৮৫০-১৯২২)। জন্মসূত্রে তিনি পাকিস্তানের অধিবাসী হলেও তিনি সিলেটে এসেছিলেন ওয়ায-নসীহত ও দ্বীনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। অতঃপর আর দেশে ফিরে যাননি; বরং আবু নসরের জ্যেষ্ঠা ভগ্নি মরিয়ম বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস শুরু করেন। পেশা হিসেবে তিনি সিলেটস্থ সায়্যিদিয়াহ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে নিয়োজিত থেকে ওয়ায-নসীহত ও পীর-মুরীদীর কাজও সমভাবে চালিয়ে গেছেন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন।[৩৮] আবু নসর শৈশবে তাঁর সুযোগ্য ভগ্নিপতির সাহচার্য, অভিভাবকত্ব ও শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। যা কেবল তাঁর শৈশবের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; বরং তাঁর পরবর্তী জীবনের দিক নিদের্শনার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। আব্দুল ওহাবের নিকট আবু নসর আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন[৩৯] সত্য বটে। কিন্তু তারচেয়ে বড় কথা তিনি আব্দুল ওহাবের কাছ থেকে এসব বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করেছিলেন, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজির পাশাপাশি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় যে দক্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন তা এক কথায়

---

৩৭. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : এ.বি. বুক স্টোর, ১৯৭৬), পৃ. ১৩৫।

৩৮. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *আমদের কালের কথা* (চট্টগ্রাম : বইঘর, ১১০-২৮৬, বিপনি বিতান, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১০৪-১০৫।

৩৯. আবদুল জলীল বিসমিল, *সিলেট মে উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিরল। বিশেষ করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি যে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন তা মাদরাসার উচ্চ ডিগ্রীধারী কোন ছাত্রের পক্ষেও কদাচিৎ সম্ভব হয়।[৪০] বস্তুত এই ব্যতিক্রমধর্মী সফলতার মূলে ছিল আব্দুল ওহাবের প্রেরণা ও উপযুক্ত দিকনির্দেশনা। শ্যালক ওহীদের মধ্যে যে মেধার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তা সঠিক পথে প্রবাহিত করার জন্য সুবিবেচনাপ্রসূত যথার্থ পথনির্দেশনাও প্রদান করেছিলেন–এটাই ছিল আবু নসরেরর জীবনের সঠিক সফলতার মূল চাবিকাঠি। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আবু নসরের শিক্ষা ও সফলতার পেছনে আব্দুল ওহাবের অবদান ও প্রভাব ছিল অপরিসীম।

ম্যধমিক ও উচ্চ ম্যধমিক শিক্ষা

১৮৮৪ সালে আবু নসরকে সিলেট সরকারী হাই স্কুলে (স্থাপতি ১৮৬৯) ভর্তি করা হয়। এ স্কুল থেকেই তিনি ১৮৯২ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি ঐ স্কুলে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন এবং ঐ সময়ে তাঁর বয়স ছিল বার-তের বছর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ঐ বয়সটি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পক্ষে একটু অধিক বলেই মনে হয়। কিন্তু তখনকার দিনে মুসলিম পরিবারের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার এটিই ছিল স্বাভাবিক বয়স।[৪১] এন্ট্রান্স পাশ করে ওহীদ সিলেট শহরস্থ মুরারীচাঁদ (এম.সি) কলেজে[৪২] (স্থাপিত ১৮৯২) ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৮৯৫ সালে এফ.এ (First Arts) পরীক্ষা পাশ করেন। এফ. এ বর্তমানে এইচ.এস.সি বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ভূক্ত। তবে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যেমন কলা, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ বিদ্যমান আবু নসরের সময়ে এফ.এ পরীক্ষায় এ ধরনের বিভাজন ছিল না। সেকালে অংক ও পদার্থবিদ্যা এফ.এ তে অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো।[৪৩] মুসলমানদের মধ্যে ওহীদই সর্বপ্রথম এম.সি কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করেন। অবশ্য আরো এক বছর আগে তাঁর এফ. এ পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল; কিন্তু প্লুরিসি (plaurisy) রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে ফলে পরের বছর তাকে পরীক্ষা দিতে হয়।

উচ্চ শিক্ষা

এফ.এ পাশ করার পর ওহীদ কলিকাতা গমন করেন এবং উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সেখানকার প্রেসিডেন্সী কলেজে (স্থাপিত ১৮৬৯) ভর্তি হন। ১৮৯৭ সালে ওহীদ শামসুল উলামা

---

৪০. খান বাহাদুর আব্দুর রহমান খা, *আমার জীবন* (ঢাকা : প্রভিন্শিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৬৪), পৃ. ১৯০

৪১. কারণ বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বেই শিশুকে পারিবারিক পরিবেশে অথবা মক্তবে ধর্মীয় তথা আরবী ফার্সীর প্রাথমিক জ্ঞান দান করা ছিল একটি বাধ্যতামূলক প্রচলিত রীতি।

৪২. এ কলেজটি ছিল আসাম প্রদেশের সর্বপ্রথম কলেজ। মাত্র আঠারজন ছাত্র নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়। আবু নসর এ কলেজের প্রথম ব্যাচের উক্ত আঠারজন ছাত্রের অন্যতম। সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৪৩. *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদ গিলানীর তত্ত্বাবধানে উক্ত কলেজ থেকে আরবীতে অনার্সসহ বি.এ এবং ঐ বছরই আরবীতে এম.এ পাশ করেন। আরবী বিষয়ে একমাত্র পরীক্ষার্থী ছিলেন তিনি। উভয় পরীক্ষাতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণি প্রাপ্ত হন। তখনকার দিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ পাশ করার ছয়মাস পরেই এম.এ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ ছিল।[৪৪] এমনকি একই সাথে একাধিক বিষয়ে অনার্স নেয়ার বিধানও তখন প্রচলিত ছিল।[৪৫] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'The Calendar for the year 1929, part 11, Vol. 1 (Calcutta, 1932 AD) গ্রন্থের সহায়তায় ওয়াকিল আহমদ কর্তৃক সংকলিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়কালের মুসলিম গ্রাজুয়েটদের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে দেখা যায় ১৮৯৭ সালে মোট চারজন মুসলমান বি.এ পাশ করেন, ওহীদ তাদের মধ্যে একজন। তা ছাড়া ঐ তালিকায় ১৮৯৭ সালে যে তিনজন মুসলিম এম.এ পাশ করেন তন্মধ্যে ওহীদকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪৬] যা হোক সিলেটবাসীদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, ওহীদের পূর্বে কোন বাঙালি মুসলমান আরবীতে বি.এ অনার্স কিংবা এম.এ পাশ করেননি।[৪৭]

খিতাবপ্রাপ্তি

ওহীদ কখনো কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসায় আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াশোনা করেননি। সুতরাং এ দিক থেকে বিচার করলে তিনি 'মাওলানা' ছিলেন না। কারণ, প্রচলিত অর্থে মাদরাসার উচ্চতর ডিগ্রীধারী ব্যক্তিকেই মাওলানা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ওহীদের নামের পূর্বে প্রায়শই মাওলানা শব্দের ব্যবহার তাঁর প্রতি জনগণের আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ধর্ম বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি বৈ অন্য কিছু নয়। অপর দিকে তাঁর শিক্ষা প্রচেষ্টা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে ১৯০৯ সালের ২৫ জুন 'শামসুল উলামা' (আলিমকুলের রবি) খিতাবে ভূষিত করে।[৪৮] কর্ম জীবনে ওহীদ ছিলেন মূলত একজন আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষকতাই ছিল তাঁর পেশা ও নেশা। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সফল শিক্ষা গবেষক ও শিক্ষা সংস্কারক। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন সে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ভারত সরকার

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. ওহীদের সমসাময়িক এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬১) প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে অনার্সসহ ১৮৯৪ সালে বি.এ পাশ করেন।

৪৬. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট-১, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৪৭. *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৪৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক ১৯২১ সালে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে উন্নীত হন। তখনকার দিনে কোন মুসলিম শিক্ষাবিদের জন্য এটি ছিল নিঃসন্দেহেই দুর্লভ গৌরবের একটি বিষয়।

কর্মজীবন

কর্মজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওহীদ শিক্ষকতাই করে গেছেন। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তিনি বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। কারণ, সুদীর্ঘ পেশাগত জীবনে তিনি স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছেন, যা খুব কমসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। ওহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট, একাডেমিক কাউন্সিল ও একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ফেলো এবং কিছুকাল আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য ছিলেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সময় (১৯১৪-১৫) তিনি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পরিকল্পনা প্রস্তুতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।[৪৯] এম.এ পাশ করার পূর্বেই তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এ সময় সাময়িকভাবে কয়েক মাস সিলেট সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। এম.এ পাশ করার পর ওহীদ বি.এল পরীক্ষা দিয়ে স্বাধীনভাবে ওকালতি করে যশস্বী হতে চেয়েছিলেন। তাই ভাল কোন চাকুরীর সন্ধান না করে কলিকাতাস্থ ল কলেজে ভর্তি হয়ে যান এবং নিজের খরচ মিটানোর লক্ষ্যে কলিকাতা মাদরাসায় শিক্ষকতার চাকুরীও গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইন পড়া কিংবা মাদরাসার চাকুরী কোনটাই বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। পরবর্তীতে আসামের প্রাদেশিক সরকারের আহ্বানে নব প্রতিষ্ঠিত গৌহাটি কলেজ (স্থাপিত ১৯০১) যা পরে 'কটন কলেজ' নামে পরিচিতি লাভ করে, আরবী ও ফার্সীর অধ্যাপক পদে যোগদানের জন্য ওহীদ গৌহাটিতে চলে আসেন এবং ১৯০১ সালের ১লা জুন কাজে যোগদান করেন।[৫০] আরবী ও ফার্সী ছাড়াও ইংরেজি ও যুক্তিবিদ্যার ক্লাসও নিতেন।[৫১] গৌহাটিতে ওহীদ চার বছরের অধিক সময় ধরে শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে অধ্যাপনা করে স্বীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন।

এরপর সংঘটিত হয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বহুল আলোচিত ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন তথা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১)। পূর্ববংগ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত প্রচারিত

৪৯. সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯

৫০. কলেজের চাকুরীর জন্য তাঁকে কোন দরখাস্ত করতে হয়নি; বরং সরকারের পক্ষ থেকেই তাঁকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটিও তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতারই বিশেষ স্বীকৃতি। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৫১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার সাথে সাথে এ অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়।[৫২] নতুন প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ অন্যান্য সমস্যার মধ্যে সর্বাগ্রে শিক্ষা সমস্যা সমাধানের প্রতি যত্নবান হন। এ সময় ঢাকা মাদরাসার[৫৩] তদানীন্তর সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আব্দুল মুনইম যওকীকে[৫৪] হুগলী কলেজে বদলী করা হয়। এমতাবস্থায় নতুন প্রাদেশিক সরকার নওয়াব সলীমুল্লাহর অনুরোধে আবু নসর ওহীদকে ঢাকা মাদরাসার সুপার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। প্রথমত কটন কলেজের চাকরী ছেড়ে ঢাকায় আসতে ইতস্ততঃ করলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা পরিত্যাগ করে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকা মাদরাসার সুপার পদে যোগদান করেন।[৫৫] চাকুরীর ব্যাপারে এরপর তাঁকে আর ঢাকার বাইরে অন্য কোথাও স্থান বদল করতে হয়নি। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা মাদরাসার সুপারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯১৯ সালে এ মাদরাসাটি রিফর্মড মাদরাসা স্কীমের আওতায় 'ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' হিসেবে উন্নীত হলে ওহীদ সে কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অবসর গ্রহণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি উক্ত কলেজের (বর্তমান কবি নজরুল সরকারী কলেজ) অধ্যক্ষ পদে বহাল ছিলেন।[৫৬] ইতোমধ্যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ওহীদ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক ও হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট নিযুক্ত হন।[৫৭] বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটনের প্রথম দিন অর্থাৎ ১৯২১ সালের ১ জুলাই থেকে তিনি এ বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং দুবছর দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে বিভাগটিকে সত্যিকার অর্থে অর্থবহ ও বলিষ্ঠ বিভাগ হিসেবে গড়ে তোলেন। বস্তুত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটি উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ নতুন

---

৫২. বঙ্গবিভাগ ছিল পূর্ববঙ্গের বঞ্চিত ও তমাশাচ্ছন্ন মুসলিম সম্প্রাদায়ের জন্য আশা ও অগ্রগতির এক আলোকবর্তিকা।

৫৩. বৃটিশ আমলে মুসলমানদের জন্য বর্তমান বাংলাদশের সর্বপ্রথম সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা (মুহাসিনিয়া) মাদরাসা ১৮৭৪ সালে স্থাপিত হয়। ঢাকা মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় খাজা আব্দুল গনীর (১৮১৩-১৮৯৬) সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৮৭১ সালে ঢাকার কমিশনারের এক রির্পোটে প্রতিপন্ন হয় যে, নওয়াব আব্দুল গণী ও ঢাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মুসলমানদের ইংরেজি ও আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশনারের কাছে একটি এ্যাংলো এ্যারাবিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য আবেদন করেছিলেন। তদানুসারে ১৮৭৩ সালের মার্চে হাজী মুহসিন ফান্ডের অর্থানুকূল্যে ঢাকা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদরাসার ভূমি ক্রয়ের জন্য নওয়াব আব্দুল গণী পাঁচ হাজার পাঁচশ টাকা দান করেন। দেখুন, আব্দুর রউফ, মুসলমান-ই বাংগালা কী তালীম ও তারবিয়াত (কলিতাকা : ১৮৮৩, পৃ. ২৩; ঢাকা প্রকাশ ৩০ আগস্ট, ১৮৯৬)।

৫৪. যওকী তার ছন্দনাম বা উপাধি। তার জন্ম ১৮৭৬ এবং মৃত্যু ১৯৪৬ সালে। তার পিতা খান বাহাদুর আব্দুল জব্বার (১৮৩৭-১৯১৮) ১৮৫৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত মোট তিনবার বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত হন।

৫৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৫৬. প্রাগুক্ত।

৫৭. সিকান্দার আলী ইব্রাহিম, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা : ১৯৯১), পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজন, যা ছিল তাঁরই উদ্ভাবিত নিউস্কীম এবং সর্বোচ্চ স্তর। সুতরাং এ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের পদটির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। প্রসংগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার পি. জে হার্টস (মেয়াদ কাল ১৯২০-২৫)-এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। ওহীদের দায়িত্বভার গ্রহণ প্রসংগে তিনি বলেন :

Islamic Studies were to from one of the corner-stone of the University, We have so far failed to find in India any scholar able to satisfy the serve theological and Literary requirments of Eastern Bengal ..... The Professor of Arabic should be an Indian Musalman, trained in Western methods and not a European As origianally proposed by the Calcutta University commission In the meantime Shamsul Ulama Abu Nasr Waheed. Head of the Dacca Senior Madrashah, who intiated the idea of the Dacca Department of Islamic Studies, has most kindly consented to act temporarily as its Head while retaining the headship of the Madrashah whice forums the pivot of his scheme.[৫৮]

আবু নসর ওহীদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠকর্ম তথা জাতির জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করেছেন ঢাকা মাদরাসার সুপার থাকাকালীন সময়ে। সে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল রিফর্মড মাদরাসা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে এর প্রশাসনিক ও একাডেমিক বিন্যাস এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, ঢাকা মাদরাসায় ১৯১৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা মাদরাসার ন্যায় আরবী (মাদরাসা) এবং এ্যাংলো-পার্সিয়ান (হাইস্কুল) নামে দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির বিভাগ বিদ্যমান ছিল। এতে নানাবিধ সমস্যার প্রেক্ষিতে ১৯১৬ সালে আবু নসর ওহীদের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী নির্দেশে এ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগটি ঢাকা মাদরাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল নামে স্বতন্ত্র একটি হাইস্কুল রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৫৯] এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, ওহীদ ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ও প্রাচীন মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়ের প্রাথমিক চিন্তাসূত্র লাভ করেছিলেন ঢাকা মাদরাসার চাকুরীর বদৌলতেই। ঢাকা মাদরাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সুবাদেই তিনি এ মহতী চিন্তা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা ও প্রয়াস চালিয়েছিলেন।[৬০] নতুন প্রাদেশিক সরকার তাঁকে মাদরাসা সংস্কারের কাজে সহায়তা করার

---

৫৮. Vice Chancellor's address at the first meeting of the court 17 August, 1921.

৫৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯১ সংখ্যা।

৬০. ঢাকা মাদরাসায় যোগদান করার অল্প কিছুদিন পর ওহীদ পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের (১৮৫৪-১৯৩৫) সাথে দেখা করে মাদরাসা কারিকুলাম সংস্কারের বিষয়ে মত বিনিময় করলে ফুলার তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন এবং প্রয়োজনে বিদেশ সফরের মাধ্যমে এ ব্যাপরে অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা বলেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে সাময়িকভাবে ঢাকা মাদরাসার প্রধান পদ থেকে সরিয়ে ও.এস.ডি (Officer on special duty) করেছিলেন। এ ব্যাপারে ১৯০৯ সালের ৪ঠা মার্চ ৫৩৭ নং সরকারী গেজেটে নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়।[৬১] ফলে ঐ কাজে তিনি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান।

রিফর্মড মাদরাসা স্কীম ও এর উৎকর্ষ সাধনে মাওলানা ওহীদ

রিফর্মড মাদরাসা স্কীম এর ইতিহাস ঘটনাবহুল ইতিহাস। ঢাকা মাদরাসায় যোগদানের পরপরই সম্ভবত ওহীদের মাথায় মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের চিন্তা সক্রিয় হয়ে উঠে। অতঃপর ওহীদ তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে স্যার সলীমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫), সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৯), স্যার সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২) প্রমুখকে উৎসাহিত করে তোলেন। এরা ইতোমধ্যে মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধানের পন্থা উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এরপর ১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল ঐতিহাসিক 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর পূর্ববংগ ও আসাম শাখার প্রথম অধিবেশন বসে ঢাকার শাহবাগে। এ সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে ওহীদকে সেক্রেটারী করে ছয় সদস্য বিশিষ্ট 'মাদরাসা রিফর্মড কমিটি'[৬২] গঠিত হওয়ার পর থেকে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি প্রাদেশিক ইস্যু হিসেবে আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব লাভ করে। তখন থেকে ১৯১৪ সালের ৩১ জুলাই সরকার কর্তৃক রিফর্মড মাদরাসা স্কীম অনুমোদিত ও গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়টি প্রাদেশিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। এ কমিটির অধীনেই মূলত ওহীদ মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রস্তুত করেন এবং প্রথম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মোট আঠার বছর ব্যাপী স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচী তৈরি করেন। পরে অবশ্য এ প্রকল্পটি আরও দু'টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি যথাক্রমে শার্প কমিটি (১৯১০) ও নাথান কমিটি (১৯১২)-এর বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। কিন্তু তাতে মূল পরিকল্পনার বিশেষ কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি।[৬৩] কারণ, ঐ দু'টি কমিটিতেও ওহীদ সক্রিয় সদস্য হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

এ প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ফার্সী ভাষার বর্জন, বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ইংরেজি অন্তর্ভুক্তি এবং মাদরাসার পাঠ্যসুচির আধুনিকায়ন। আসলে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টির সাথে মুসলমানদের সার্বিক শিক্ষা সমস্যার সমাধান তথা তাদের সার্বিক উন্নতির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এ ব্যাপারটি বংগ সরকার, ভারত সরকার এবং শাসকশ্রেণি উত্তমরূপেই জানতেন। ১৯০৬ সালে বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত মাদরাসা রিফর্মড কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট পরীক্ষা-

৬১. Report of the Moslem Education Advisory Committee 1931, P. 31.
৬২. Proceedding of the first provincial Mohamadan Education Committee of Eastern Bengal and Assam, 1906.
৬৩. Momen Committee Report, P. 144-147.

Dhaka University Institutional Repository

নিরীক্ষা করে শাসক শ্রেণি যথার্থই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, আঠারো বছর ব্যাপী স্বয়ংসম্পূর্ণ এ শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করতে হলে এর সর্বোচ্চ স্তরে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বা 'ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং' প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।[৬৪] কিন্তু সরকার সে সময়ে মুসলমানদের শিক্ষান্নোয়নের জন্য এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত ছিল না। আকস্মিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রচারিত হলে তারই অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ নামে একটি অনুষদের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়। অর্থাৎ সরকার একটি অনুষদের মাধ্যমে মুসলমানদের কাঙ্ক্ষিত মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ যৌক্তিক দাবী মিটোনোর কৌশল অবলম্বন করল যদিও তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য বঙ্গবিভাগ রহিতকরণের রাজকীয় ক্ষতিপূরণ বলেই চালানোর চেষ্টা করেছেন।[৬৫]

মাদরাসা স্কীমের মূল প্রস্তাব থেকে নাথান কমিটি (মক্তবের দু'বছর ছাড়া) দশ বছরের উপযোগী পাঠ্যসূচি হাই মাদরাসার অন্তর্ভুক্ত রেখে উচ্চ পর্যায়ের অংশটুকু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারণ করে দেয়। শুধু তাই নয়, নাথান কমিটি স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত ধাপের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সমান্তরাল ও বিকল্প একটি শিক্ষাধারা হিসেবে এটিকে চিহ্নিত করে (জুনিয়র মাদরাসা, হাই মাদরাসা, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ) অবিলম্বে তা বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গ সরকারের নিকট জোর সুপারিশ করলে সরকার তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়। এভাবে ১৯১৫ সাল থেকে সরকারী উদ্যোগে রিফর্মড মাদরাসা স্কীমের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৬৬] পর্যায়ক্রমে ১৯১৯ সালে 'ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' এবং ১৯২১ সালে ইসলামিক স্টাডিজসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর রিফর্মড মাদরাসা স্কীমের বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণায় ইসলামিক স্টাডিজ নামে স্বতন্ত্র একটি অনুষদের কথা থাকলেও নাথান কমিটি এটিকে কলা অনুষদের অধীন একটি বিভাগে পরিণত করে। ওহীদসহ কমিটির অন্যান্য মুসলিম সদস্য এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েও ব্যর্থ হন।[৬৭] যাই হোক, তখনকার পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে ধারণ করার প্রয়োজন ছিল অন্যতম প্রধান কারণ।[৬৮] ঢাকা

৬৪. সিকান্দার আলী ইব্রাহিম, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : অতীত ও বর্তমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৬৫. Chancellor's address, Dacca University Annual Convocation for conferement Degrees, 22 Feb, 1923.

৬৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

৬৭. Report of the Dacca University Committee, 1922, P. 157

৬৮. Report of the Islamic Arabic University Commission, 1963-69. P. 183

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে ওহীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও গৌরবোজ্জ্বল অবদানের বিষয়টি ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

১৯০৫-১৯১৫ উক্ত সময়টি ছিল বিশেষত বংগীয় মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থবিরতার যুগ। প্রথমত, জ্ঞাত্যভিমান, দ্বিতীয়ত দারিদ্র এবং সর্বোপরি ধর্মহীনতার কারণে মুসলিম অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে আদৌ ইচ্ছুক কিংবা সমর্থ ছিলো না। অপর দিকে ধর্মীয় শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তাদের সন্তানরা মূর্খই থেকে যাচ্ছিল। ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও অবনতি ঘটছিল দ্রুতলয়ে। এ অবস্থা থেকে মুসলিম সমাজকে উদ্ধার করার মোক্ষম ও কার্যকর উপায় হিসেবে নতুন ধরনের সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে নিউস্কীম পদ্ধতির সূচনা হয়, যা ছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজের একান্ত দাবী।

ওহীদ সময়ের সে দাবী সফলতার সাথে পূরণ করতে পেরেছিলেন। এ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটির সচিব বা সদস্য হিসেবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তা ছাড়া নিজ ব্যয়ে দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সফর করেছেন। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপদ্ধতি, কারিকুলাম ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করেছেন, সর্বোপরি প্রস্তাবিত নিউস্কীম সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের মতামত সংগ্রহ করেছেন। শুধু তাই নয় এ স্কীমের উপযোগী বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক রচনায় তিনি নিজে যেমন উদ্যোগ নিয়েছেন অন্যান্যদেরকেও তেমনি উৎসাহী করে তুলেছেন। এসব বিচারে নিউস্কীমের উদ্ভাবন, রূপায়ণ ও প্রবর্তনের সার্বিক কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ওহীদেরই প্রাপ্য। দেশের শিক্ষা বিস্তারে তিনি এক আলোর দিশারী।

শিক্ষাবিস্তারে অবদান

আধুনিক এবং ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে নিউস্কীম পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বাঙালি মুসলমানগণ আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। গবেষক ড. আব্দুল্লাহ আল মাসুম লিখেছেন : "সরকার সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা চালু না করলেও মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনীকিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা আমরা দেখতে পাই ১৯১৪ সালে 'নিউস্কীম মাদরাসা কোর্স' প্রবর্তনের মাধ্যমে। এতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপশি ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে এ শিক্ষা পদ্ধতি মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে।"[৬৯] অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "বস্তুত নিউস্কীম পদ্ধতি ছিল ইসলামভিত্তিক একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষা ও লোকায়ত শিক্ষা সমন্বয়ে

৬৯. মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭), পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

রচিত। এ স্কীমের পাঠ্যসূচি মুসলিম অভিভাবকদের পুলকিত করেছিল। এর ফলে মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার যে অগ্রগতি ঘটে বিগত এক শতাব্দীর পরিসংখ্যানেও তার প্রমাণ মেলে না। এই শিক্ষার মাধ্যমে মাদরাসাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অঙ্গীভূত হয়। বলা যায় মুসলিম সমাজে উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে ওহীদ প্রবর্তিত মাদরাসা সংস্কার পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।"[৭০] এই শিক্ষাব্যবস্থা এত দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল তার প্রমাণ নিউস্কীমের প্রথম পাঁচ বছরেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঢামাঢোল, যুদ্ধোত্তর খিলাফত-অসহযোগের মত রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সরকারী-বেসরকারী সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি মাধ্যমিক পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে স্কুলগামী ছাত্র সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছে তখনও নিউস্কীমের ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি ধীর গতিতে হলেও অব্যাহত রয়েছে।[৭১]

নিউস্কীম পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে আবু নসর ওহীদ বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে যে অবদান রেখেছেন তা চিরদিন অবিস্মণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রস্তাবিত ও প্রবর্তিত এ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমেই আধুনিক শিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলমানদের অনাগ্রহ ও বিদ্বেষীমনোভাব দূরীভূত হয়। খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "১৯২৩ সালের কথা। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা তখন লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন কিছু কিছু উপলব্ধি করাও শুরু করেছেন। দুনিয়া আখিরাত উভয় লোকের সমস্যার সমাধান নিউস্কীম মাদরাসা। এটি কৃষক সমাজকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। আজ যখন সেদিনের কথা ভাবি তখন মনে হয়, আবু নসর ওহীদ নিউস্কীম মাদরাসা সিস্টেম প্রবর্তন করে তৎকালীন মুসলিম সমাজের যথেষ্ট উপকার করেছিলেন। যা মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করে। নিউস্কীম মাদরাসার ছেলেদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী জীবনে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি দুইই অর্জন করেছিলেন। পরলোকগত ড. আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাই প্রমুখ ছিলেন নিউস্কীম হাই মাদরাসা পাস।"[৭২]

নিউস্কীমের অভূতপূর্ব সাফল্য ও জনপ্রিয়তা প্রাপ্তির কারণ হিসেবে আকরাম খান কমিটি (১৯৪৫-১৯৫২) মনে করে, এ স্কীম অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশে নজিরবিহীন শিক্ষা সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলার অনেক অবহেলিত অঞ্চল জেগে উঠেছিল। যেসব এলাকা হয়তো নিউস্কীমের জন্ম না হলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিতই থেকে যেত। এর ফলে প্রদেশের সর্বত্র বহুসংখ্যক জুনিয়র ও সিনিয়র মাদরাসা সম্পূর্ণ প্রাইভেট বা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

৭১. Report of the Public Instruction in Bengal, 1920-21, PP 228

৭২. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড সংস্করণ* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ৫৪ ও ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কারণে নিউস্কীম পদ্ধতি বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। এর আয়ুকাল ছিল প্রায় অর্ধ শতাব্দী (১৯১৫-১৯৬৪)। এই সময়কালেও এ পদ্ধতি জাতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করে তার সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছে। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিসহ যে কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, তার পেছনে নিউস্কীম পদ্ধতি তথা আবু নসর ওহীদের অবদানের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আবু যোহা নূর আহমদ তাই যর্থাথ বলেছেন : "সত্যিকারভাবে শামসুল উলামা এই দেশের মুসলমানদের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তিনি জীবনের সুদীর্ঘকাল মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কারের বিষয় চিন্তা করিয়া এই দেশে নব প্রবর্তিত নিউস্কীম মাদরাসা শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পার্থিব শিক্ষার সহিত ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে শামসুল উলামা নব প্রবর্তিত মাদরাসাসমূহের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের উন্নতির এক স্বর্ণদ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।"[৭৩]

অন্যান্য অবদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আবু নসর ওহীদের অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিম শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল কমিটির সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক তহবিল গঠন করেন এবং বিশেষত মুশুরীখোলার তৎকালীন পীর শাহ আহসান উল্লাহর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করে ফান্ডে জমা দেন।[৭৪] তিনি আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ, উর্দু ও ফার্সী বিভাগসমূহের সিলেবাস প্রণয়ন, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যসূচী তৈরি, নিউস্কীম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সংকলনের পাশাপশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক গ্রন্থ ও কাব্যও রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে বাকারাতুল আদব, মিরকাতুল আদব, সালসিল কিরাআত, নুখবাতুল উলুম, মাদারিজুল কিরাআত অন্যতম।[৭৫] অবসর গ্রহণের পর তিনি রাজনীতি ও সমাজসেবামূলক কাজেও অংশ নিয়েছেন। ১৯৩৭ সালে আসাম প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর ৯ মাস আসামের প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

---

৭৩. আবু যোহা নূর আহমদ, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন* (ঢাকা : ১৯৭৫), পৃ. ৫২৩

৭৪. দেওয়ান নরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৩৯৭

৭৫. মোহাম্মদ আবু সাঈদ, *কীর্তিমান শিক্ষাবিদ আবু নসর ওহীদ*, সহিত্য সওগাত, জানুয়ারি ২৫, ১৯৯১, সাহিত্য পাতা।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক জীবন ও মৃত্যু

তিনি হবিগঞ্জের সুলতানসীর সৈয়দ পরিবারে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হলে ঐ পরিবারের সৈয়দ আব্দুল জব্বারের কনিষ্ঠা কন্যা আম্মাতুল বতুলকে বিবাহ করেন। উভয় পক্ষে তাঁর ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা । তিনি ১৯৫৩ সালের ৩১ মে ৮১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

উপমহাদেশের মুসলিম জাতিসত্তা বিশেষ করে বঙ্গদেশীয় মুসলিম সমাজ তাদের শিক্ষান্নোতির পেছনে আবু নসর ওহীদের অমূল্য অবদানের কথা কোনদিন ভুলতে পারবে না। মাদরাসা শিক্ষায় নিউস্কীম প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা সংকট দূরীকরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা বিভাগের উৎকর্ষতা এবং ঢাবির প্রতি বাঙালি মুসলমানদের আকৃষ্টতা সৃজনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আমরণ যে মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি নিরলস গতিতে কাজ করে গেছেন তা বর্তমান সময়ের শিক্ষাবিদদের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে নিঃসন্দেহে। বাংলায় শিক্ষা সম্প্রাসরণে একজন কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি আমাদের সকলের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয়।

মৌলভী মুনাওর আলী (১৮৮৬-১৯৫১)

জন্ম ও পরিচিতি

মৌলভী মুনাওর আলীকে সুনামগঞ্জের রাজনীতির প্রবাদ পুরুষ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি ছিলেন সুনামগঞ্জ বারের প্রথম মুসলিম আইনজীবী। সুনামগঞ্জের প্রথম মন্ত্রীও ছিলেন তিনি। তাঁর বাড়িটি আজও মিনিস্টার বাড়ি হিসেবে পরিচিতি। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য সুনামগঞ্জবাসীর নিকট তিনি চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

মৌলভী মুনাওর আলী ১৮৮৬ সালে সুনামগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৬] তাঁর পিতার নাম মুশাররফ আলী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। পিতার আদি নিবাস ছিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত শাহবাজপুর মৌজায়। মুশাররফ আলী ছিলেন মোক্তারী পেশায় নিয়োজিত। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় তিনি এ পেশায় বেশ সুনাম অর্জন করেন। তখন সুনামগঞ্জে কোন মুসলমান মোক্তার না থাকায় তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকের বিশেষ অনুরোধে তিনি সুনামগঞ্জ এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।[৭৭] ৭ ছেলে ও ৩ মেয়ের মধ্যে মুনাওর আলী তাঁর পিতা-মাতার ৬ষ্ঠ পুত্র। অল্প বয়সেই মুনাওর আলী তাঁর পিতাকে হারান। তখন তাঁর জৈষ্ঠভ্রাতা মাহফুজ আলী সংসারের হাল ধরেন। মাহফুজ আলী ছিলেন সুনামগঞ্জ শহরের অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। মোক্তার হিসেবে তাঁর সুনাম ও আয় ছিল যথেষ্ট। তিনি তাঁর

---

৭৬. *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৪৯০

৭৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মৌলভী মুনাওর আলী, *দৈনিক সংবাদ*, ১ মে, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

তিন ভাই যথাক্রমে মুজাহিদ আলী, মছদ্দর আলী ও মুনাওর আলীকে তাঁর নিজ খরচে মোহামেডান এ্যাংলো অরিয়েন্টাল কলেজে (Aligar) লেখাপড়া শিখান। এই তিন ভাইকে সে সময়ে বলা হত 'Ali Brothers of Sunamgonj'।[৭৮] মুজাহিদ আলী বি.এ পাশ করে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। বাংলায় তাঁর দু'টি বই 'ঈদুল আযহা' ও 'ঝঙ্কার' প্রকাশিত হয়।[৭৯] তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ও নওবেলাল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ আলী তাঁর সুযোগ্য পুত্র। মছদ্দর আলীও EAC হয়েছিলেন। চাকুরিরত অবস্থায় তিনিও অল্প বয়সে মারা যান। মুনাওর আলী কখনো মাদরাসায় অধ্যয়ন করেননি; কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য, ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুনের আলোকে বাস্তব জীবনাচার এবং পোশাক-পরিচ্ছদেও শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হওয়ার কারণে সর্বমহলে তিনি মৌলভী মুনাওর আলী নামে পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

পারিবারিক পরিমণ্ডলে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯০৬ সালে সুনামগঞ্জ জুবিলী হাইস্কুল থেকে মুনাওর আলী প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মীরাট কলেজ থেকে তিনি কৃতিত্বের সালে বি.এ পাশ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি মোহামেডান এ্যাংলো অরিয়েন্টাল কলেজে থেকে এল.এল.বি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে দেশে ফিরে আসেন।[৮০]

কর্মজীবন

কর্মজীবনের শুরুতে মুনাওর আলী কিছুদিন সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। উপরোক্ত সময়ে তাঁকে বৃটিশ সরকার এক্সট্রা এসিস্টেন্ট কমিশনার পদে বন বিভাগে নিয়োগ দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৮১] বৃটিশ বিরোধী মনোভাব, জাতীয়তাবাদী চেতনা ও দেশপ্রেমের কারণেই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯১৭ সালে মুনাওর আলী সিলেট বারে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২০ সালে তাঁর বড় ভাই মুজাহিদ আলী অকস্মাৎ মারা গেলে তিনি সুনামগঞ্জে চলে আসেন এবং তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধুকে বিবাহ করে সুনামগঞ্জ বারে প্রথম মুসলিম আইনজীবী হিসেবে প্রাকটিস শুরু করেন।[৮২] অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বড় দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে তখন সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপরে বর্তায়।

---

৭৮. *সিলেটের আরও একশ একজন*, পৃ. ১৮৮

৭৯. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, পৃ. ৩৪৯

৮০. প্রাগুক্ত

৮১. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ১৫২

৮২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি

সুনামগঞ্জ বারে যোগদানের পর তিনি আইন ব্যবসার চেয়ে রাজনীতিতেই বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি সুনামগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার ও লোকাল বোর্ডের মেম্বার নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে তিনি সুনামগঞ্জ লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একই বছরে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন।[৮৩] দীর্ঘদিন এ পদে তিনি মর্যাদার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯২১-২৩ সাল সময়ে মুনাওর আলী আসামের এম.এল.সি ও ১৯২৩-৪৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আসামের এম.এল.সি ও এম.এল.এ পদে আসীন ছিলেন।[৮৪] বিশ-এর দশকে তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পুনরায় এম.এল.এ নির্বাচিত হন এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। সুনামগঞ্জের জননেতা মুনাওর আলী ১৯৪৭-এর পূর্ব পর্যন্ত আসামের স্যার সৈদয় সাদ উল্লাহ মন্ত্রী সভায় দু'বার শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।[৮৫] সুনামগঞ্জের প্রথম মন্ত্রী হিসেবে আজও তিনি ইতিহাসের অংশ হয়ে আছেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও পূর্ববংগ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ পদাধিকার বলে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে গণ্য হন। পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হলে জনাব মুনাওর আলী সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে এর প্রথম স্পীকার নিযুক্ত হন ও সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।[৮৬] পরে স্বাস্থ্যগত কারণে আর বেশিদিন তিনি এ পরিষদে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি।

মুনাওর আলীর জনদরদী মনোভাব, সৌজন্যতা ও বিশাল হৃদয়ের কথা আজো লোক মুখে প্রবাদের মত ছড়িয়ে আছে। তিনি আসামের লাইন ও মহাজনী প্রথা রোধ আইন প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আসামে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় তিনি ছিলেন সর্বদা সোচ্চার। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'From British Raj to Swaraj' পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৮৭]

---

৮৩. *সিলেটের আরও একশ একজন*, পৃ. ১৮৯

৮৪. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত

৮৫. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, প্রসঙ্গ বিচিত্র (সিলেট : হৃদয় প্রিন্টার্স, ফেব্রু, ২০১০), পৃ. ১৩৫

৮৬. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত

৮৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু

১৯৪৮ সাল থেকেই মুনাওর আলীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে ১৯৫১ সালের ১১ ডিসেম্বর কীর্তিমান এ পুরুষ ইন্তেকাল করেন।[৮৮] তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানেই দাফন করা হয়।

শিক্ষা সেবা ও সাহিত্যকর্ম

জনাব মুনাওর আলী ও তাঁর দুই ভ্রাতা তথা আলী ব্রাদার্সগণের তখনকার সময়ে বিদেশে অবস্থান করে গ্রেজুয়েশন ডিগ্রী লাভের ঘটনা সুনামগঞ্জ তথা বৃহত্তর সিলেটে অন্যদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল। সুনামগঞ্জ পৌরসভা ও লোকাল বোর্ডের দায়িত্বপালনকালীন সময়ে এলাকার ছেলে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করতে তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষত প্রাথমিক ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। এলাকার এম.এল.এ হিসেবে জনগণের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ জনপদের লোকজনদের শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করতে তিনি প্রায়ই তৎকালীন সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনে যেতেন এবং শিক্ষার প্রতি সকলকে উৎসাহিত করে তুলতেন।[৮৯] সরকারী বাজেট থেকে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও সঠিক দিকনির্দেশনায় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।[৯০] ১৯৪১ সালে শিক্ষামন্ত্রী থাকাবস্থায় তিনি সিলেটে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫ সালের ২৯ জুলাই আসাম প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কমিটির সভায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।[৯১] জনাব মুনাওর আলীর এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় অনেক দেরীতে হলেও সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে জনাব মুনাওর আলী সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ইসলামী মূল্যবোধের যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

রাজনীতি ও সমাজসেবার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চায়ও তিনি সমান অবদান রেখে গেছেন। তিনি যে একজন সচ্চরিত্রবান রাজনীতিবিদ ছিলেন সে সবের নিদর্শন তাঁর সাহিত্যকর্মের ভেতরই বর্তমান রয়েছে। আসাম সরকারের মন্ত্রী থাকাকালে তাঁর কবিতাপুস্তক 'জ্বিলওয়া' প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের রূপরেখা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি 'An Outline of Pakistan Constitution' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রকাশ করেন। আমপারার বঙ্গানুবাদ

---

৮৮. প্রাগুক্ত

৮৯. শামসুল আলম, সিলেটের গর্ব মুনাওর আলী, মাসিক আল-ইসলাহ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৮, পৃ. ২৬

৯০. মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, সিলেট বিভাগের সাতজন বরেণ্য শিক্ষামন্ত্রী, ঢাকা, *জালালাবাদ বার্ষিকী*, ১৯৯৫, পৃ. ৪১-৪২

৯১. *প্রসঙ্গ বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করা ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ স্বপ্ন সাধ। শেষ জীবনে আমপারার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে সে স্বপ্ন পূরণ করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন।[৯২] তাঁর 'জ্বিলওয়া' কাব্যগ্রন্থের কোন কোন কবিতায় সূফী-সাধকের ন্যায় ধ্বনিত হয়েছে চিরন্তন মরমী মারেফতী সুর। যেমন এক কবিতায় তিনি লিখেছেন :

কায়ার লাগি মায়া কেনরে
ও মন আমার চেতন হইবে কবে
কায়াছাড়ি যাইতে হবে
শমন আসবে যবে।[৯৩]

অন্যএকটি কবিতায় তিনি লিখেছেন :

ভবঘুরে ঘোরে যে জন
ভাবুক যদি হয়রে সে জন
তারে বলবে পাগল কোন জন,
যার অন্তরে আছে নিরঞ্জন
সে যে হয়রে মানুষ রতন
তারে করো সবে বরণ।[৯৪]

অনুরূপ তাঁর প্রতিটি কবিতাই আল্লাহ প্রেম, আধ্যাত্মিকতা, পরকালের পাথেয় সংগ্রহে তাগিদ প্রদান প্রভৃতি শিক্ষায় পরিপূর্ণ। তিনি আমপারার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আল-কুরআনের শিক্ষা ও সম্প্রচারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বহুমাত্রিক জীবন ও বর্ণাঢ্য কর্ম তৎপরতা আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

শেখ আবদুর রশিদ (১৮৯৩-১৯৫৬)

জন্ম ও পরিচিতি

শেখ আবদুর রশিদ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার আউদত গ্রামে ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৯৫] তাঁর পিতার নাম শেখ মোহাম্মদ রাজি। শেখ আবদুর রশিদের পূর্বপুরুষ শেখ মোহাম্মদ সালেহ মোগল আমলে ১৮ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে আসেন এবং রত্না নদীর তীরে

৯২. মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, সিলেট ধন্য যাঁদের গুণে (সিলেট : তাইয়্যীবা প্রকাশিনী, ১ লা এপ্রিল ২০০২), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২
৯৩. মুনাওর আলী, *জ্বিলওয়া*, শিলং, আগস্ট ১৯৪২, পৃ. ১৫
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৯৫. *সিলেটের আরও একশ একজন*, পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

গোদরাইল নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৯২ সালে শেখ আবদুর রশিদের পিতা শেখ মোহাম্মদ রাজি বংশবৃদ্ধির কারণে গোদরাইল থেকে সপরিবারে জগন্নাথপুর থানার আউদত গ্রামে চলে আসেন। এর পরের বছরই জন্ম হয় শেখ আবদুর রশিদের।

শিক্ষা জীবন

সে সময়ে জগন্নাথপুর অঞ্চল শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ছিল। শেখ মোহাম্মদ রাজি এলাকার ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার মানসে প্রথমে আউদত গ্রামে একটি মক্তব স্থাপন করেন এবং নিজেই মক্তবের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।[৯৬] ফলে এলাকার শিশু-কিশোররা দ্বীনী তালিম অর্জনের সুযোগ লাভ করে।

শেখ আবদুর রশিদের প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি তাঁর পিতা শেখ মোহাম্মদ রাজির নিকট। এরপর তিনি বাবার প্রতিষ্ঠিত মক্তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি ভর্তি হন মনুমুখ জুনিয়র মাদরাসায়। উক্ত মাদরাসা থেকে তিনি জুনিয়র মাদরাসা ফাইনাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ সালে সৈয়দ আব্দুল মজিদ কাপ্তান মিয়ার (১৮৭২-১৯২২) উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সিলেট আলীয়া মাদরাসা স্থাপিত হলে শেখ আবদুর রশিদ সিলেট আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯১৮ সালে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এফ.এম ডিগ্রী অর্জন করেন।[৯৭]

খেলাফত আন্দোলন

১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে তুরস্কের সুলতানের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। উপমহাদেশের আলিম সম্প্রদায় তুরস্কের খেলাফতের অবসানের জন্য বৃটিশ সরকারকে দায়ী করেন এবং বৃটিশদের সাথে 'তর্কে মোয়াল্লাত' নীতিতে খেলাফত আন্দোলনের ডাক দেন। উক্ত আন্দোলনের জোয়ার তখন সিলেটে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। মওলানা মোক্তারপুরী, মওলানা ইবরাহীম চতুলী, ডা. মোর্তজা চৌধুরী, মওলানা ইবরাহীম তশনা, মওলানা সখাওতুল আম্বিয়া প্রমুখের সাথে শেখ আবদুর রশিদও খেলাফত আন্দোলনে অংশ নেন এবং সর্ব সাধারণকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। শেখ আবদুর রশিদ ছিলেন কবিত্ব শক্তির অধিকারী। তিনি বৃটিশ বিরোধী প্রচুর কবিতা রচনা করে এবং তা আবৃত্তির মাধ্যমে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। শেষ জীবনে তিনি উর্দু ভাষায় প্রচুর মরমী কাসিদাও লিখেছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাসিদার কিয়দংশ–

৯৬. বেগম হেনা মমতাজ চৌধুরী সম্পাদিত, *আলোকিত সুনামগঞ্জ*, ২৮ মে ১৯৯২, পৃ. ৩
৯৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"দুনিয়া কি হাজত পুরি হও গিয়া
আপনা লিয়ে আবতক কুচ নেহি কিয়া
আয় খোদাকে বন্দে, খোদাকু না পাহচানা
ছব কুই দুশমন, সিরিফ খোদা তেরী আপনা।"[৯৮]

কর্মজীবন ও শিক্ষা বিস্তার

পাইলগাও এর জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর (১৮৮২-১৯৭২) উদ্যোগে ১৯২৬ সালে পাইলগাও ব্রজনাথ হাইস্কুল স্থাপিত হলে ১৯৩১ সালে শেখ আবদুর রশিদ উক্ত স্কুলের হেড মৌলভী হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন।[৯৯] এই স্কুলে একটানা ২০ বছর মহান শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থেকে তিনি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষায়ও উদ্ভাসিত করে তুলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির বিকল্প নেই। তাই তিনি আজীবন শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় তিলক হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[১০০] আজীবন তিনি এই স্কুলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে বিজড়িত রেখেছিলেন। তিনি মণ্ডলীভোগ ডাকঘরও প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে বহু বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা করেছেন। নিরীহ জনগণকে মামলাবাজি থেকে রক্ষা করে সমাজে মিলেমিশে থাকার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শেখ আবদুর রশিদ।[১০১] তিনি নিজ বাড়িতে অনেক গরীব ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের লেখাপড়ার পথ সুগম করে দেন।[১০২] তাঁর নিজ নামে প্রসিদ্ধ 'মৌলবী বাড়ি' ছিল তৎকালীন সময়ে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক অনন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে স্বীকৃত।

ব্যক্তিজীবন ও শেষ বিদায়

ব্যক্তিগত জীবনে শেখ আবদুর রশিদ ছিলেন সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী, পরোপকারী ও ধর্মানুরাগী এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল, সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আগাগোড়া সমগ্র জীবনভর তিনি মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বদা দৃঢ়চেতা ও সত্য প্রকাশে অকুণ্ঠ। এ সব গুণাবলি নিজে ধারণের পাশাপাশি অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

---

৯৮. *সিলেটের কাব্য সাধনা*, পৃ. ১৮৬
৯৯. *সিলেটের আরও একশ একজন*, পৃ. ১৮৬
১০০. শাহাব উদ্দীন আফীন্দি সম্পাদিত, *হিজল করচ*, সুনামগঞ্জ, ১লা জুন, ১৯৮৭
১০১. প্রাগুক্ত
১০২. কামরুজ্জামান চৌধুরী সম্পাদিত, *সুনামগঞ্জ বার্তা*, ১৭ আগস্ট ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬৩ বাংলার ১৬ শ্রাবণ ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন শেখ আবদুর রশিদ।[১০৩] মৃত্যুকালে স্ত্রী, একপুত্র এবং কন্যা, বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তাঁকে নিজ গ্রামে সমাধিস্থ করা হয়।

ফজলুল হক সেলবর্ষী (১৮৯৩-১৯৬৮)

জন্ম, বংশ ও প্রথম জীবন

যুক্তবাংলার খ্যাতিমান সাংবাদিক ও কৃতি পুরুষ ফজলুল হক সেলবর্ষী নতুন প্রজন্মের কাছে প্রায় অপরিচিত এক নাম। কারণ, তাঁর সময় ও কাল বহু পেছনে চলে গেছে। তাছাড়া তিনি ছিলেন অকৃতদার। তাঁর বংশ বুনিয়াদও নেই। ফলে শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতার সাথে রক্তের উত্তরাধিকার না থাকায় তাঁকে স্মৃতির অতলে সহজে হারিয়ে যেতে হয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লেখায় বিমুগ্ধ হয়ে তাকে 'ফজলুল তুমি জগলুল সম' লিখে উৎসাহিত অভিনন্দিত করেছিলেন।[১০৪] তিনি ছিলেন তেজস্বী, স্বাধীনচেতা, ত্যাগী, বাগ্মী, অমায়িক ও খাঁটি মর্দে মুজাহিদ। এহেন বহু গুণে গুণান্বিত মনীষি ১৮৯৩ সালে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলাধীন সেলবরষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১০৫] তাঁর পিতা আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি হাফিজ মোহাম্মাদ জাহান আলী যুক্ত প্রদেশ থেকে এসে সেলবরষ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিদুষী মহিলা লেবাসুন্নেসাকে বিয়ে করে সেলবরষের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তিনি ছিলেন মসজিদের ইমাম ও মক্তবের শিক্ষক। ফজলুল হক বাল্যকাল থেকেই প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। পিতার কাছেই তিনি মক্তব শিক্ষা ও পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন শেষ করেন। গ্রামেই পারিবারিক পরিবেশে তিনি ইংরেজি, আরবী, ফার্সী শিক্ষা লাভ করেন। স্থানীয় সিংবা মাইনর স্কুল থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করলে তাকে সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলি হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়।[১০৬] ছাত্র হিসেবে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চরিত্রবান ও বিনয়ী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্কুলের সব পরীক্ষায়ই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে এক আকস্মিক ঘটনায় তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। স্কুলে ডি.এল রায়ের নাটক 'শাহজাহান' মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত হয়। ফজলুল হক এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি।[১০৭] তাঁর মতে এই নাটকে মুসলিম বিরোধী উক্তি রয়েছে যা মুসলমান ছাত্রদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এই মতবিরোধের ফলে তাঁকে

---

১০৩. *সিলেটের আরও একশ একজন*, পৃ. ১৮৭

১০৪. হারুন আকবার, *ফজলুল হক সেলবর্ষী : খ্যাত কীর্ত সাংবাদিক*, সিলেট, জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, ১৩ মার্চ, ২০১৩

১০৫. ফজলুর রহমান, সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ (সিলেট : এপ্রিল ১৯৯১), পৃ. ২৮৬

১০৬. Ntps./bn.banglapedia.org সেলবর্ষী ফজলুল হক

১০৭. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়। জীবনের ঊষালগ্নেই ফজলুল হকের সংগ্রামের সাথে পরিচয় ঘটে। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন অন্যায়-অবিচার ও অধর্মের সাথে। সে সংগ্রামের শিক্ষাই তিনি আজীবন প্রচার করেছেন তাঁর ক্ষুরধার অসির সাহায্যে।

কলিকাতা গমন ও বিপ্লবী জীবন

সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলি হাইস্কুলে ১৯১৫ সালে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ফজলুল হক কলকাতায় চলে যান। সেখানে ১৯১৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি বিপন কলেজে এফ.এ ক্লাশে ভর্তি হন।[১০৮] ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন বিপ্লবী চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁকে স্বজাতির কল্যাণ চিন্তায় অনুপ্রাণিত করে। এমতাবস্থায় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিত্যাগ করে সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। ছাত্র জীবনে তাঁর অনেক লেখা 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে ইংরেজদের উৎখাত করতে হবে, খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে, এটাই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র।[১০৯] মুফতি আবদুহ ও জামাল উদ্দিন আফগানীর প্যান ইসলামী আদর্শে তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে বিশ্বাসী। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার মানসে ১৯১৫ সালে কলকাতা গমনের পর লেখালেখির সূত্র ধরে বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মাওলানা আকরম খাঁর সাথে তিনি পরিচিত হন এবং ১৯১৭ সালে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

জীবিকার জন্য করেন সাংবাদিকতা; কিন্তু আড়ালে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী'র মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই সময়ে তিনি আনোয়ার পাশা ছাত্র সমিতি গঠন করেন। তুর্কী বীর কামাল পাশা ও তাঁর সহকর্মী আনোয়ার পাশার কর্মতৎপরতা ফজলুল হকের জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আনোয়ার পাশা ছাত্র সমিতি এক বৈপ্লবিক সংগঠন। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী এর সম্পাদক।[১১০] মুসলিম যুব মানসে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলা ছিল এর উদ্দেশ্য। সে সময় কলকাতায় হিন্দুদের অনেক সংগঠন থাকলেও মুসলমানদের তেমন কিছুই ছিল না। তাই ফজলুল হক গঠন করেন 'জিহাদ পার্টি' নামে একটি গোপন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান।[১১১] আনোয়ার পাশা ছাত্র সমিতির

১০৮. *banglapedia,* Ibid

১০৯. সাইফ উল্লাহ, *বৃটিশ আন্দোলনের নেতা প্রখ্যাত সাংবাদিক ও চিরকুমার ফজলুল হক সেলবর্ষী*, bdtoday 24.com

১১০. সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

১১১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাছাই করা তরুণরাই জিহাদ পার্টির সদস্য হতে পারত। খিদিরপুরের ষোল হাজারী মসজিদ ছিল এর কেন্দ্র। এক হাতে কুরআন ও অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে সদস্যগণকে শপথ নিতে হত। ইংরেজ তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন না করা পর্যন্ত কেউ বিয়ে করতে পারবে না এটাও ছিল এর সদস্য হওয়ার একটি শর্ত। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হলেও ফজলুল হক জীবনে আর কোনদিন বিয়ে করেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালে সাংবাদিকতায় উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিলেত যাওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি বোম্বে গিয়ে মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। জিন্নাহ তাঁর আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করলেও যুদ্ধের ডামাঢোলে বিলেত যেতে নিষেধ করেন। সেলবরষী পরে সাংবাদিকতা ও রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলে বিলেত যাওয়ার বাসনা তিনি ত্যাগ করেন। বোম্বে অবস্থানকালীন সময়ে কিছুদিন তিনি 'বোম্বে ক্রনিকেল'-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন পর আবার কলকাতা ফিরে আসেন।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

দেশে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন দুর্বার গতিতে শুরু হলে সেলবরষী বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন খুব ভাল বক্তা। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করে তেজস্বী বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি জনমনে বৃটিশবিরোধী মনোভাব প্রচার করতে থাকেন। তাঁর বক্তৃতা অনেক সময় বিভিন্ন পত্রিকায় এ. কে ফজলুল হকের নামে ছাপা হয়ে যেত। এ বিভ্রাট থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এ. কে ফজলুল হকের পরামর্শক্রমে নামের সাথে 'সেলবর্ষী' লেখা শুরু করেন। পরবর্তীতে শুধু সেলবর্ষী নামেই সর্বত্র পরিচয় লাভ করে জনমানসে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেন। পরে এ. কে ফজলুল হক 'শেরে বাংলা' উপাধি প্রাপ্ত হলে এ ভ্রান্তি একেবারে দূরীভূত হয়। ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবলমাত্র সংবাদপত্রে লিখে এ নিদ্রিত জাতিকে জাগানো যাবে না, তাই খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বাংলা, বিহার, আসাম, পাটনাসহ বহুস্থানে বক্তৃতা করেছেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক। বৃটিশদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বিশেষণই তিনি প্রয়োগ করতেন। সুনামগঞ্জে এরূপ এক জনসভায় সরকার বিরোধী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করলে উপস্থিত জনতা রোষানলে ফেটে পড়ে। রাজদ্রোহীতার অভিযোগে জনসভা শেষ হওয়া মাত্রই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দুহালিয়ার জমিদার দেওয়ান আহবাব চৌধুরী পাঁচ হাজার টাকা জামানত দিয়ে এ দফা তাঁকে মুক্ত করেন।[১১২] এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তিনি একাধিকবার গ্রেফতার হন।

এক পর্যায়ে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কিছুটা স্তমিত হয়ে গেলে মাতৃভূমিকে উদ্ধারের জন্য বৃহত্তর কিছু করার লক্ষ্যে সহকর্মী মাওলানা আবুল কালাম আজাদের প্রণোদনায় তাঁর কল্প জগতের গুরু আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গোপনে ছদ্মবেশে তুরস্কের পথে রওয়ানা দেন। পরে এক

---

১১২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সময় আফগানিস্তান থেকে পেশোয়ার যাওয়ার পথে পেশোয়ার সীমান্তের শবকদর নামক স্থানে এক সেতুর উপর থেকে তিনি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন।[১১৩] পেশোয়ার সেনানিবাসে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাঁকে ৪৮দিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে আদালতে বিচারের জন্য তাঁকে সিলেট আনা হয়। সিলেট কোর্টে তিন মাস যাবৎ বিচার কার্যক্রম চলে। বিচারের দিন হাতকড়া পরিয়ে তাঁকে কোর্টে হাজির করা হত। মামলা শুনার জন্য আদালত প্রাঙ্গনে হাজার হাজার লোকের সমাগম হত। বিনা ফিতে হিন্দু মুসলিম উকিল ব্যরিস্টার সেলবর্ষীকে সমর্থন করেন। সেলবর্ষীকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনানো হলে তিনি আদালতে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, বিদেশী সরকারের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা কোন অপরাধ নয়।[১১৪] অবশেষে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯২৪ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি পুনরায় কলকাতায় ফিরে যান ও সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেন।

সাংবাদিকতা

'অসির চেয়ে মসি অধিক কার্যকর' এ ছিল ফজলুল হকের বিশ্বাস। মুক্ত হয়ে তিনি কলকাতা গিয়ে ১৯২৯ সালে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী'তে সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। এ পত্রিকায় দীর্ঘ বারো বছর তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় নিবন্ধ বাংলার মুসলিম জনজীবনে জাগরণ সৃষ্টি করে। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে সরকার বিরোধী সম্পাদকীয় লেখার কারণে তাঁর ছয় মাসের জেল ও পাঁচশত টাকা জরিমানা হয়।[১১৫] ১৯২০ সালে তিনি নবযুগ পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। তখন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোজাফফর আহম্মদ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ নবযুগের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন। সেলবর্ষী 'ধূমকেতু' ছন্দনামে উক্ত পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি দৈনিক সুলতান-এর সম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করেন। ১৯২৯ সালে নিজ মালিকানায় 'সাপ্তাহিক মুসলিম' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। প্রায় তিন বৎসরকাল পত্রিকাটি চালু ছিল। খ্যাতনামা মনীষি ও দার্শনিক জামাল উদ্দীন আফগানীর দর্শন চিন্তা প্রসূত 'প্যান ইসলামিজম'-এর বাণী প্রকাশই ছিল আল-মুসলিমের প্রধান লক্ষ্য। পত্রিকার শিরোনামে আল-কুরআন, তরবারী, চাঁদ-তারা প্রতীক চিহ্ন শোভিত থাকতো। অর্থাভাবে আল-মুসলিম বন্ধ হয়ে গেলে সেলবর্ষী 'নয়া বাংলা' নামে অন্য একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। এরপর ১৯৩৬ সালে তিনি 'তকবীর' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ছয়মাস নিয়মিত চলার পর বন্ধ হয়ে যায়

---

১১৩. *banglapedia,* Ibid
১১৪. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
১১৫. হারুন আকবার, *ফজলুল হক সেলবর্ষী : খ্যাত কীর্ত সাংবাদিক*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তকবীর। তারপর তিনি ১৯৪০ সালে রহুল আমীন প্রবর্তিত 'সাপ্তাহিক মোসলেম' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রায় দুই বৎসর উক্ত পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত থাকার পর ১৯৪২ সালে তিনি সিলেটে চলে আসেন এবং 'সাপ্তাহিক যুগভেরী' পত্রিকায় যোগদান করেন। প্রায় বৎসরাধিকাল এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার পর তিনি পুনরায় ১৯৪৪ সালে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কলকাতায় চলে যান। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর পুত্র খায়রুল আনাম খাঁ 'অর্ধ সাপ্তাহিক পয়গাম' প্রকাশ করলে সেলবর্ষী পায়গামের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত হন। উভয় পত্রিকায় তিনি সাড়ে সাত বৎসর কাজ করেন। ১৯৫২ সালে সেলবর্ষী ঢাকায় চলে আসেন এবং দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি দৈনিক নাজাত, দৈনিক বুনিয়াদ, সাপ্তাহিক চাষী, মাসিক তরজুমানুল হাদীস পত্রিকার সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[১১৬]

সাহিত্যকর্ম

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অনলবর্ষী বক্তা, স্বাধীনতা সৈনিক ও সুনামগঞ্জের গৌরব সেলবর্ষী কবিতা রচনায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন তবে তাঁর কোন সাহিত্যকর্ম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর রচিত 'ওকবা' একটি বিখ্যাত কবিতা। সেলবর্ষী রচিত 'সেন্ট হেলেনা' কবিতাটি ১৯২৭ সালে মাসিক মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হলে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে কবিতাটি ফারসী ভাষায়ও অনূদিত হয়। রেজাউল করিম ও আব্দুল কাদির সম্পাদিত কাব্য মালঞ্চে এ কবিতাটি স্থান পায়। কবিতার কিয়দংশ :

> "ঋতুরাজ বিনে আধারকুঞ্জ, প্রকৃতি ধরেছে রুক্ষ বেশ
> হায় নেপোলিয়া! কাদে ফরাসীরা, দুষমন মার টানিছে কেশ
> মহিমায় যার সাজালে শীর্ষ, পতাকা উর্ধে ধরিতো যার
> হের আজকে ফেরুপাল আসি বুকের বসন ছিড়েছে তা'র
> ওঠ ওঠ বীর, খোল তরবার এ জগত নহে ধ্যানের ঠাই
> মায়ের শিকল কাটিবে ফরাসী, জননী তোমার ডেকেছে তাই।"[১১৭]

অনুবাদ কর্মেও ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। ইকবালের 'তারানা-ই মিল্লী'র তিনি অনুবাদ করেন। ইকবালের 'চীন ও আরব হামারা' কবিতার স্বার্থক অনুবাদক সেলবর্ষী। অনুবাদের কিয়দংশ :

> আরব আমার, ভারত আমার, চীনও আমার নহে গো পর
> জাহান জোড়া মুসলিম আমি, সারাটি বিশ্বে বেঁধেছি ঘর

---

১১৬. প্রাগুক্ত।

১১৭. ফজলুর রহমান, *সিলেটের কাব্য সাধনা* (সিলেট : এপ্রিল ১৯৯৩), পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

আন্দালুসের কুসুম কাননে

সজীবে জ্ঞানের হরিষ আননে

বাধিয়াছিনু গো আমারি ঘর

আজি নীরব সমাধি মথিয়া পবনে উঠিছে কার আকুল স্বর

আরব আমার ভারত আমার চীনও আমার নহে গো পর।[১১৮]

মুসলিম ভারত, আল-ইসলাম, সওগাত, নূর, সাম্যবাদী, মাসিক মোহাম্মদী, সোনার বাংলা, ইসলাম দর্শন, তাজ, দিশারী, মাহে নও প্রভৃতি সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে তাঁর বহু সংখ্যক প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর বৈপ্লবিক রচনাবলির অধিকাংশই প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' পত্রিকায়।[১১৯] 'শহীদে আজম' নামে তাঁর একখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল বলে জানা যায়; কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধানের পরও তাঁর হদিস পাওয়া যায়নি। তিনি আমৃত্যু পাকিস্তান সাহিত্য মজলিসের সভাপতি ছিলেন। জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর বিপ্লবী মানস গঠনে নজরুলের প্রভাব ও ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শেষজীবন

এ জ্ঞানতাপস ও সংগ্রামী পুরুষ জীবনের শেষ সময়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অভাব-অনটন ছিল চিরসাথী। অকৃতদার হওয়ায় শেষ জীবনে একেবারে নিঃসঙ্গ হওয়ায় তাঁর একমাত্র বোনের নিকট নেত্রকোনার রামারবাড়ি গ্রামে চলে যান। কিন্তু নিজ পিতৃভিটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অভিপ্রায়ে কিছুদিন পর ফিরে আসেন নিজ গ্রাম সেলবর্ষে। তাঁর অসহায় শেষ জীবনে অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ, কবি বেনজীর আহমদ, কবি মাহমুদ লস্কর, এম. এস আলী প্রমুখ সুহৃদ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মাসিক ১৫০ টাকা ও পূর্ব-পাকিস্তান সরকার থেকে ৫০ টাকা হিসেবে ভাতা পেতেন। ভাতার টাকাই ছিল তাঁর চলার পাথেয়। শের আলী তালুকদার নামক তাঁর এক দুঃসম্পর্কের ভাতিজা তাঁকে দেখাশুনা করতেন।[১২০] আমাদের দুর্ভাগ্য এমন গুণী ও ত্যাগী ব্যক্তির মর্যাদা জাতি দিতে পারেনি। দীর্ঘ জীবনে ১৯৪৩ সালে সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে। আবার ১৯৬৭ সালে তৎকালীন সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক এ. জেড. এম শামসুল আলমের উদ্যোগে সুনামগঞ্জ সাহিত্য মজলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সমগ্র জীবনে এটুকুই ছিল তাঁর স্বীকৃতি। নানা দুঃখ-কষ্টের সাথে

---

১১৮. প্রাগুক্ত।

১১৯. হারুন আকবর, *ফজলুল হক সেলবর্ষী : খ্যাত কীর্ত সাংবাদিক*, প্রাগুক্ত।

১২০. সাইফ উল্লাহ, *বৃটিশ আন্দোলনের নেতা প্রখ্যাত সাংবাদিক ও চিরকুমার ফজলুল হক সেলবর্ষী*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম করে বিনা চিকিৎসায় অবশেষে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ ফজলুল হক সেলবর্ষী ১৯৬৮ সালের ৮ নভেম্বর ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১২১] পার্শ্ববর্তী সৈয়দ বাড়ির পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ও মানুষ সেলবর্ষী

সেলবর্ষী ব্যক্তি জীবনে ছিলেন অতিশয় ভদ্র, বিনয়ী ও দৃঢ়চেতা। অন্যায়ের সাথে কখনো তিনি আপোষ করেননি। তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। নিজের জন্য কখনও ভাবেননি। দেশ ছিল তাঁর একমাত্র ভাবনা, দেশ ছিল তাঁর মাতা, কন্যা ও জীবনসঙ্গী। দেশ উদ্ধারের চিন্তায় তিনি এত মগ্ন ছিলেন যে, ঘর বাঁধারও সময় পাননি। একজন খাঁটি মুসলিম, তেজস্বী, ঈমানদার ব্যক্তি হিসেবে তাঁর পরিচয় ছিল সর্বজনবিদিত। রাজনৈতিক বিপ্লবের সাথে সামাজিক বিপ্লব হোক, ইসলামী আদর্শে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠুক–এটাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। যা বাস্তবায়নের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং জাতিকে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দীক্ষা প্রদান করেছেন। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠান তিনি নির্মাণ করেন নি বটে; কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন এক প্রতিষ্ঠান সমতুল্য যে প্রতিষ্ঠান থেকে জাতি দেশপ্রেম, অন্যায় অবচার ও অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শিক্ষা অনায়াসেই লাভ করতে পারে।

মকবুল হোসেন চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৫৭)

মকবুল হোসেন চৌধুরী বৃহত্তর সিলেট তথা সুনামগঞ্জের একজন প্রখ্যাত মনীষি। আসাম-বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। সাংবাদিকতার মাধ্যমে এই উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের এক অনুপম শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপনে স্বার্থকভাবে সফল হয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী সমাজকর্মী, সুলেখক এবং অনলবর্ষী বক্তা। পিছিয়ে থাকা মুসলিম সমাজকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য যে ক'জন মানুষ নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তিনি তাদের একজন। উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ তাড়ানো তথা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী ও প্রথম কাতারের নেতা। মুসলিম সাংবাদিকতার প্রবাদ পুরুষ মকবুল হোসেন চৌধুরী ছিলেন এক বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী। বিচিত্র ও বৈচিত্রপূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। তিনি জীবনে কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি এবং আমৃত্যু তাঁর কলম দ্বারা এ অপরিহার্য শিক্ষা দেশ ও সমাজে প্রতিষ্ঠায় রত ছিলেন। সারা জীবন গণমুখী শিক্ষা ও আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে তিনি নিজেকে সমাজের এক অপরিহার্য স্তম্ভ হিসেবে দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছেন।

---

১২১. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ও শিক্ষা

বৃহত্তর সিলেটের প্রথম মুসলিম সাংবাদিক ও সম্পাদক মকবুল হোসেন চৌধুরী ১৮৯৮ সালে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানার বিন্নাকুলী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১২২] তাঁর পিতার নাম আবুল হোসেন চৌধুরী ও মাতার নাম আজিজুন্নেসা। তিনি বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন প্রথমে শাহপুর স্কুলে ও পরে দোহালিয়া স্কুলে। পরবর্তীতে তিনি সুনামগঞ্জ জুবিলী হাইস্কুলে ভর্তি হন ও উক্ত স্কুল থেকে ১৯১৯ সালে কৃতিত্বের সাথে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বছরে তিনি সিলেটের বিখ্যাত মুরারীচাঁদ (এম.সি) কলেজে ১ম বর্ষে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি হন।[১২৩] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে তখন সারাদেশ অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে কম্পিত-প্রকম্পিত। সর্বত্র ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজ দ্রব্যাদি বর্জনের আহ্বান। সে সময়ের শিক্ষিত যুব সমাজ নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে এবং ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাব না করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে দ্বিধা করেনি। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের ঢেউ তখন সিলেটে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। মকবুল হোসেন চৌধুরী ও তখন শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে বৃটিশ বিরোধী খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

রাজনীতি

১৯২০ সালের পূর্বে এ দেশের রাজনীতির ধারা ছিল বৃটিশ তোষণ, অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহ লাভ করা। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগপন্থী উভয় ধারার রাজনীতিবিদের সুর ছিল একই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের বিপর্যয়ের জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ বৃটিশ সরকারকে দায়ী করে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের ডাক দেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সর্বপ্রথম বৃটিশ রাজের সাথে 'তরকে মোয়াল্লাত'-এর ঘোষণা দেন। তাঁর সাথে যোগ দেন ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। হিন্দু-মুসলিম মিলেমিশে হলেও ভারত থেকে বৃটিশদের তাড়ানোর লক্ষ্যে তারা ছিলেন অঙ্গীকারাবদ্ধ। ছাত্রজীবন থেকেই মকবুল হোসেন চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও সুবক্তা। তাই খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতা হিসেবে তদানীন্তন সিলেটের মূল নেতৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ডা. মোর্তাজা চৌধুরী, দেওয়ান আসফ, মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, মাওলানা ইবরাহীম চতুলী, মাওলানা ইবরাহীম তসনা, ফজলুর হক সেলবর্ষী, মৌলভী আব্দুল হামিদ, আব্দুল মতিন চৌধুরী, সৈয়দ জামিরুল হক প্রমুখ খেলাফত আন্দোলনের শীর্ষ

---

১২২. ফজলুর রহমান, *সিলেটের একশত একজন* (সিলেট : এপ্রিল ১৯৯৪), পৃ. ২৫৬

১২৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের কাছে মকবুল হোসেন চৌধুরী শীঘ্রই হয়ে উঠেন একান্ত প্রিয়পাত্র।[১২৪] ১৯২০ সালের ২২ ডিসেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেসে ও খেলাফত কনফারেন্সের নাগপুর অধিবেশনে তিনি সিলেটের একজন প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মহত্মাগান্ধী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, সি. আর দাস, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ নেতার সান্নিধ্য লাভ করেন। খেলাফত আন্দোলন ও বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তিনি ১৯২২ সালে গ্রেফতার হন।[১২৫] প্রায় তিন বছর তিনি কারাগারে দুঃখ-দুর্দশা ও নির্যাতন সহ্য করে ১৯২৪ সালে মুক্তি লাভ করেন। এরপর থেকে মসীকেই অসি হিসেবে বেছে নেন–সাংবাদিকতাই হয় তাঁর জীবনের ব্রত।

সাংবাদিকতা

কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করলে সুনামগঞ্জবাসী তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করে। এর কিছুদিন পরই তিনি সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন। ১৯২৪ সালে সিলেট থেকে 'কমলা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কমলা ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। মকবুল হোসেন চৌধুরী প্রথমেই 'কমলা' পত্রিকায় কাজ শুরু করেন।[১২৬] 'কমলা'য় তাঁর সুন্দর সুন্দর শিক্ষণীয় ও তেজোদ্দীপ্ত সন্দর্ভ বের হতো। এগুলোর ভাষা ছিল সরল, সহজ ও প্রাণস্পর্শী। এর পরের বছর ১৯২৫ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'যুগবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। তদানীন্তন আসামে কোন মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকা 'যুগবাণী'ই প্রথম। 'যুগবাণী' মফস্বলের একটি সংবাদপত্র হলেও মকবুল হোসেনের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সম্পাদনার কারণে তা বিদগ্ধ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে সাংবাদিক শামসুর রহমান লিখেছেন : "যদিও 'যুগবানী' ছিল মফস্বলেরই কাগজ তথাপি সম্পাদনার দিক দিয়ে তা ছিল কলকাতার যে কোন উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিকের সমতুল্য। সমাজের দাবী-দাওয়া, শিক্ষা আর অধিকারের কথা নিয়ে যেসব গরম গরম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তখন 'যুগবাণী'তে প্রকাশিত হতো কোলকাতায় বসে সেগুলো পাঠ করে আমরা সম্পাদকের কলমের জোরের তারিফ না করে পারতাম না।"[১২৭] 'যুগবাণী' তখনকার দিনের প্রথম শ্রেণির পত্রিকা বলে গণ্য হতো। মকবুল হোসেন অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে দুঃখ-কষ্টের সাথে সংগ্রাম করে পাঁচ বছর পত্রিকাটি টিকিয়ে রাখেন। পরে প্রধানত অর্থাভাবেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

---

১২৪. ফজলুল হক সেলবর্ষী, মকবুল হোসেন, *দৈনিক আজাদ*, সাহিত্য মজলিশ, ২০ মার্চ ১৯৫৮

১২৫. *সিলেটের আকাশে দশটি উজ্জ্বল তারকা*, পৃ. ১০

১২৬. *সিলেটের একশত একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

১২৭. চৌধুরী শামসুর রহমান, সাংবাদিক মকবুল হোসেন চৌধুরী, *মাহে নও*, ফাল্গুন ১৩৬৪ বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

'যুগবাণী'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে মকবুল হোসেন কিছুদিন বাড়িতে কাটান। এ সময় কলকাতা থেকে 'দৈনিক ছোলতান' নামে একটি পত্রিকা বের হতো। পত্রিকাটির তৎকালীন সম্পাদক চট্টগ্রামের প্রখ্যাত সাংবাদিক মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আকস্মিকভাবে অব্যাহতি গ্রহণ করলে ১৯৩১ সালে কর্তৃপক্ষ মকবুল হোসেন চৌধুরীকে 'ছোলতান'-এর সম্পাদক নিযুক্ত করেন।[১২৮] 'যুগবানী'র সম্পাদক হিসেবে মকবুল হোসেন চৌধুরী মধ্যে যে সাহস ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল 'দৈনিক ছোলতান' সম্পাদনায়ও তাঁর মধ্যে তেমনি সাহস ও দক্ষতা পরিস্ফুটিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত দার্শনিক দেওয়ান আজরফ বলেন : "পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন তা তখনকার মুসলিম সমাজের জাগরণের জন্য ছিল আবে হায়াতের মত।"[১২৯] তখনকার সময়ে দৈনিক 'ছোলতান' ও মাসিক 'সওগাত'-কে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম তরুণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি মঈনুদ্দীন, হাবিবুল্লাহ বাহার, নলিনী সরকার, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখদের যে মিলনমেলা বসতো মকবুল হোসেন চৌধুরী ছিলেন তার মধ্যমণি।[১৩০] মকবুল হোসেন অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পত্রিকার আর্থিক অবস্থা এবং মালিক পক্ষের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

সিলেটে তখন মুসলমানদের কোন পত্রিকা ছিল না। 'ছোলতান' বন্ধ হয়ে গেলে সিলেটের প্রখ্যাত জননেতা আব্দুল মতিন চৌধুরী ও আব্দুর রশীদ চৌধুরী সিলেট থেকে উচ্চাঙ্গের একটি পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায়ে মকবুল হোসেন চৌধুরীকে আহ্বান জানালে তিনি সিলেটে ফিরে আসেন। ১৯৩২ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'যুগভেরী'। দীর্ঘ সাত বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে 'যুগভেরী' সম্পাদনা করেন। তিনি বঙ্গাল খেদা, কুখ্যাত লাইন প্রথা এবং সিলেট তথা তদানীন্তন আসামের মুসলমানদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সিলেটের 'আল-ইসলাহ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল হক তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, "মকবুল হোসেন চৌধুরীর সম্পাদনার সময়টাই ছিল 'যুগভেরী'র স্বর্ণযুগ।"[১৩১] 'যুগভেরী'ই ছিল সে সময়কার নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের একমাত্র মুখপাত্র। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, মকবুল হোসেন চৌধুর সম্পাদিত 'যুগবাণী' ও 'যুগভেরী' মুসলিম জাতীয়তা ও ইসলামী চেতনাবোধ সঞ্চার, ইসলামী সংস্কৃতির সম্প্রচার তথা মুসলমানদের জাগরণে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। পরবর্তীতে তিনি নিজ এলাকা থেকে

---

১২৮. *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, পৃ. ১৮৭

১২৯. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত দিনের স্মৃতি* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাবমহল, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮), পৃ. ১২৯

১৩০. *সিলেটের আকাশে দশটি উজ্জ্বল তারকা*, পৃ. ১১

১৩১. মুহম্মদ নূরুল হক, সংবাদপত্রে সিলেটের মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

এম.এল.এ নির্বাচিত হলে পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। দেশের প্রাচীনতম এ পত্রিকাটি বর্তমানে একটি জনপ্রিয় দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা আফতাব আলী 'সিলেট পত্রিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে মকবুল হোসেন চৌধুরীকে এর সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করেন। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়; কিন্তু ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে মকবুল হোসেন চৌধুরীর মৃত্যু হলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[১৩২]

১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও আসাম পরিষদ

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মকবুল হোসেন চৌধুরী ধর্মপাশা-শাল্লা নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটে এম.এল.এ নির্বাচিত হয়ে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[১৩৩] তাঁর এম.এল.এ থাকাকালীন সময়ে তিনি এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণসহ প্রভূত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তিনি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করেন। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সর্বদা সোচ্চার। একজন সুবক্তা হিসেবে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীলভাবে তিনি জনগণের অভাব-অভিযোগের কথা আসাম প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করে একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সুনামগঞ্জ মহকুমা লোকেল বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন।

জমিদারদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে কৃষক প্রজার মুক্তির আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মকবুল হোসেন চৌধুরী। অধিকার বঞ্চিত কৃষককুলের জোত স্বত্ব আদায়ের আন্দোলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীতে ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের আইন পাশ হলে তাঁকে সুনামগঞ্জ মহকুমা ঋণ সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।[১৩৪] বোর্ডের যোগ্যতম চেয়ারম্যান হিসেবে কৃষক প্রজার স্বার্থ রক্ষা করায় তিনি সারা মহকুমায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৪৬ সালের ৫ ও ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত সিলেটের পাকিস্তানভুক্তির ঐতিহাসিক গণভোটেও মকবুল হোসেন চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তা ছাড়া তিনি সুনামগঞ্জ জেলা মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে অবদান

ঐতিহাসিক মহান ভাষা আন্দোলনে সুনামগঞ্জের অবদান অত্যন্ত গৌরবদীপ্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। উর্দূকে রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্যোগ প্রতিহত করার

---

১৩২. *সিলেটের আকাশে দশটি উজ্জ্বল তারকা*, পৃ. ১৩
১৩৩. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪
১৩৪. *সিলেটের আকাশে দশটি উজ্জ্বল তারকা*, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে সারা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ সুনামগঞ্জও এ আন্দোলনে এগিয়ে আসে। মকবুল হোসেন চৌধুরী ছিলেন তখন সুনামগঞ্জ জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি। মুসলিম লীগ কর্তৃক বাংলা ভাষার বিরোধিতা করায় এবং আন্দোলনে নেতা-কর্মীদের উপর অত্যচার ও জুলুমের প্রতিবাদে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে স্থানীয়ভাবে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে আয়োজিত প্রথম জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব এবং জ্বালাময়ী ভাষণে জনগণকে ভাষা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর সুনিপুণ নেতৃত্বে সুনামগঞ্জে ভাষা আন্দোলন অত্যন্ত বেগবান ও অপ্রতিরোধ্য রূপ লাভ করে।[১৩৫]

সাহিত্যকর্ম

মকবুল হোসেন চৌধুরীর খ্যাতি কেবলমাত্র সাংবাদিক হিসেবেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি সুধীমণ্ডলীর প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল প্রাঞ্জল ও বেগবান। তাঁর অনেক সন্দর্ভ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো সংকলিত ও প্রকাশিত হলে তা হবে মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। তিনি যে সাতটি পুস্তক রচনা করেছিলেন সেগুলো হলো :

১. খেলাফায়ে রাশেদীন

২. কোরআন পরিচয়

৩. শেখ আব্দুল কাদির জিলানী

৪. মুজাদ্দিদ আলফে সানি

৫. কোরআন শরীফের ইতিহাস

৬. জ্ঞান বাণী

৭. ইসলামী জীবনাদর্শ

তা ছাড়া তিনি মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর 'আসরে মাল্টা'-এর বঙ্গানুবাদ করে এর নাম দিয়েছিলেন 'মাল্টার বন্দী'। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি বইগুলো প্রকাশ করতে পারেননি। অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন বলেন : "লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব ইকবাল হোসেন চৌধুরীর সৌজন্যে মরহুমের লিখিত সমস্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। মরহুম চৌধুরীর লিখিত গদ্য সহজ এবং প্রাঞ্জল তাহা বুদ্ধিদীপ্ত বিষয়বস্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। প্রকাশভঙ্গী অত্যন্ত বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এ জন্যই 'যুগবানী' ও 'দৈনিক ছোলতান' দেশের পাঠকমণ্ডলীর নিকট এমন আকর্ষণীয়

১৩৫. মুজিবর রহমান মুজিব ও ফয়জুল করিম ময়ুন সম্পাদিত, *দর্পণ*, মৌলভীবাজার, ২৬ মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

হইয়াছিল। সত্য কথা বলতে কি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মকবুল হোসেন চৌধুরী যে এত নাম করিয়াছিলেন তাহার যথার্থ কারণ– অনেক গুরুতর ও জটিল বিষয়ও সহজভাবে তিনি প্রকাশ করিয়া পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করিতে পারিতেন। লিখিবার ও বলিবার ধরণটাই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই লেখার গুণেই তিনি পাঠকমণ্ডলীর নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন।"[১৩৬] একই নিবন্ধে তিনি অন্যত্র লিখেছেন : "মরহুম মকবুল হোসেন চৌধুরী সাংবাদিক ছিলেন, ছিলেন সাহিত্যিক; কিন্তু সাহিত্যিক- সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া লাভ করিয়াছিলেন সমালোচকের তীক্ষ্ম দৃষ্টি। তাঁহার লেখাগুলি পড়িলে এ কথা বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, তিনি ইসলামী শিক্ষা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এবং তত্ত্ব কথা সম্বন্ধে খুব বেশি পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তিনি শক্তিমান লেখক ছিলেন, সাংবাদিক হিসেবেও তিনি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।"[১৩৭]

মানুষ মকবুল হোসেন

অত্যন্ত সদালাপী, সুরসিক ও বন্ধু বৎসল মকবুল হোসেন চৌধুরী ছিলেন নির্ভিক সমালোচক ও শক্তিশালী বক্তা। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে ছিল তাঁর গভীর সখ্যতা ও বন্ধুত্ব। ১৯২৮ সালে সিলেট মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ঐতিহাসিক সম্মেলনে তাঁর আমন্ত্রণে জাতীয় কবি সিলেটে আসেন এবং তাঁর বাসায় কিছুদিন অবস্থান করেন। কবি নজরুলের সিলেট অবস্থানে অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামী সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। ইসলামের প্রতি ছিল তাঁর অসীম দরদ, অনুরাগ ও নিষ্ঠা। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, সদালাপী ও বন্ধু বৎসল। রসিকতা ও সদালাপের জন্য বন্ধু মহলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ সম্পর্কে ফজলুল হক সেলবর্ষী বলেন : "মকবুল হোসেন ছিলেন সদাহাস্য প্রাণচঞ্চলতার প্রতীক স্বরূপ। কোনরূপ বিমর্ষতা তাকে স্পর্শ করেনি কোন দিন। এক কথায় তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর মজলিশী লোক।"[১৩৮] ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে মকবুল হোসেন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও কোরআন তিলাওয়াত করতেন।

আসলে মকবুল হোসেন চৌধুরী এক আদর্শের নাম, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে আদর্শ অনুকরণীয়। সে আদর্শের শিক্ষা সর্বজনবিদিত। সাবেক স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এক স্মৃতিচারণে বলেন : "একজন মকবুল হোসেনের ছবি আঁকুন লেখায়, বলায়। মুসলিম সমাজ যখন ঘরে বন্দী, কোণঠাসা নানা কারণে তখন মকবুল হোসেন সাহেব কলম ধরেছেন। লক্ষ্য ছিল তখন একটিই, আর

---

১৩৬. অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন, সাংবাদিক মকবুল হোসেন চৌধুরী, *মাসিক মোহাম্মদী*, ভাদ্র ১৩৬৫ বাংলা, পৃ. ৪২

১৩৭. প্রাগুক্ত

১৩৮. ফজলুল হক সেলবর্ষী, মকবুল হোসেন, *দৈনিক আজাদ*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পিছিয়ে থাকা নয় এবার সামনে এগুতে হবে, প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।"[১৩৯] স্বজাতির চেতনাবোধ জাগ্রতকরণে তিনি ছিলেন এক অগ্রসেনানী। তাঁর আরেকটি বড় সাফল্য হচ্ছে তিনি নিজের রক্তধারায় তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তাঁর দুই সন্তান হোসেন তওফিক চৌধুরী ও হাসান শাহরিয়ার চৌধুরী সাংবাদিকতায় এসে বাংলা সাংবাদিকতার প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। হাসান শাহরিয়ার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক। তিনি দৈনিক ইত্তেফাক-এর বিশেষ প্রতিনিধি এবং বিশ্বখ্যাত নিউজ ম্যাগাজিন 'নিউজ উইক'-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি। এ ছাড়া তিনি বিদেশী দৈনিক ডন, মর্নিং নিউজ, ইভনিং স্টার, খালিজ টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপেস ও এশিয়ান এজ-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের ও বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতি 'ওকাব' এর সাবেক সভাপতি। তা ছাড়া তিনি দক্ষিণ এশীয় প্রেসক্লাব সমিতি (সাপকা) ও কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের (সিজেএ) বাংলাদেশ শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।[১৪০]

ইন্তেকাল

মকবুল হোসেন চৌধুরীর কর্মময় জীবনের শুরু এবং শেষ সিলেটে। ১৯৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর 'সিলেট পত্রিকা'র সম্পাদক থাকাকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৪১] হযরত শাহজালাল (র.)-এর দরগাহ গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি চলে গেছেন ঠিকই; কিন্তু রেখে গেছেন অসংখ্য গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী ও একটি জীবন্ত কিংবন্তীতুল্য আদর্শ।

শিক্ষা বিস্তারে অবদান

সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণে যার অনস্বীকার্য অবদান সর্বজনবিদিত। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মকবুল হোসেন চৌধুরী। ১৯৩৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জনাব এ. জেড. এম আব্দুল্লাহর দরগাহ মহল্লাস্থ বাসভবনে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মুহাম্মদ নরুল হক, শেখ সিকন্দর আলী, কবি আব্দুর রাজ্জাক, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, আশরাফ উদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী প্রমুখের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরীকে সভাপতি ও মকবুল হোসেন চৌধুরীকে সহ-সভাপতি এবং এ. জেড. এম আব্দুল্লাহকে সম্পাদক করে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪২] এ মহতী প্রতিষ্ঠানটি আজও সগৌরবে ইসলামী শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে নিরলস ভূমিকা পালন করছে। মকবুল হোসেন চৌধুরী প্রতিষ্ঠানটির সাথে অমলিন হয়ে বেঁচে আছেন।

---

১৩৯. মতিউর রহমান চৌধুরী, সাংবাদিকতায় একটি অনন্য নাম, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ ডিসেম্বর ২০১৬

১৪০. প্রাগুক্ত

১৪১. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

১৪২. *মাসিক আল-ইসলাহ ষাট বছর পূর্তি সংখ্যা*, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকাকালে পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য মনোনীত হয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের নীতি নিধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৪৩]

নিজ জেলা সুনামগঞ্জে উচ্চশিক্ষার জন্য তখন কোন কলেজ ছিল না। সদরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মকবুল হোসেন চৌধুরীসহ অন্যান্যদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় অবশেষে ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সুনামগঞ্জ কলেজ। সুনামগঞ্জের এককালের স্বনামধন্য মহকুমা প্রশাসক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সৈয়দ মর্তুজা আলী লিখেছেন : "কলেজের জন্য চাঁদা সংগ্রহের লক্ষ্যে আমি গ্রামাঞ্চলে যাই। এ কাজে মরহুম আব্দুল বারী চৌধুরী, উকিল মফিজ চৌধুরী, আব্দুল খালেক আহমদ, মরহুম মকবুল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ জননেতারা এগিয়ে আসেন।"[১৪৪] ১৯৪৪ সালের শেষ ভাগে আসামের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদ উল্লাহ আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের দ্বার উদঘাটন করেন। বর্তমানে কলেজটি একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত হয়ে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

সুনামগঞ্জ শহরে এইচ.এম.পি. এম.ই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মকবুল হোসেন চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মূলত তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুনামগঞ্জ এইচ.এম.পি. এমই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর শ্বশুর তাহিরপুরের মোল্লাপাড়ার জমিদার হাজী মকবুল পুরকায়স্থ এর নামানুসারে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়।[১৪৫] বর্তমানে এটি জেলার একটি শীর্ষস্থানীয় হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়ে জেলার শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তা ছাড়া জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর কাজের সাথেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। সমগ্র জীবনভর তিনি ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর প্রতিটি কর্মই ছিল এ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। অন্যায়-অবিচার, অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করে ন্যায়-নীতি ও সুশিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার মানসে তিনি সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন। তাঁর মত মহান ব্যক্তির জীবনাদর্শ আমাদের সকলের কর্মপ্রেরণার উৎস।

দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭১)

সুনামগঞ্জ জেলায় যে সব স্মরণীয় আলোকিত কৃতি পুরুষের জন্ম হয়েছে তাঁদের মধ্যে দোয়ারা উপজেলার দোহালিয়া নিবাসী দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী অন্যতম। তিনি ছিলেন বৃহত্তর সিলেটের শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন পুরোধা। তিনিই সর্বপ্রথম প্রবন্ধ লিখে সিলেটে ভাষা আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেন। তিনি

---

১৪৩. রাগিব হোসেন চৌধুরী, মুসলিম সাংবাদিকতার প্রবাদপুরুষ, *দৈনিক জালালাবাদ*, সিলেট, ১৩ জুলাই ২০০১

১৪৪. সৈয়দ মর্তুজা আলী, *আমাদের কালের কথা* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৩৮

১৪৫. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁ ও জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা। বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে তিনি আজীবন কাজ করেছেন। তাঁর ক্ষুরধার লিখনীতে ফুটে উঠেছে জাতীয়তাবাদ, তমদ্দুন, দেশপ্রেম সর্বোপরি স্বাধিকার আন্দোলনের স্পৃহা। তিনি মুসলিম জাতির গৌরবময় ইতিহাস এবং ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে আজীবন সাধনা করেছেন। ঈমান, একতা ও শৃংখলার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ইংরেজ বানিয়া ও ব্রাহ্মণ্যবাদের খপ্পর থেকে এ দেশকে মুক্ত করার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তিনি। কবি আব্দুল গাফফার লিখেছেন,

> "তসবিহ ফেল দূরে, তলোয়ার হাতে নাও,
> আল্লাহর রাহে জান কোরবান দাও, দাও
> ইসলাম কহে নারে নিতে গৃহ কোন রে
> ইমানের ডাক এলো ঐ শোন-শোন রে।"[১৪৬]

সর্বোপরি উপরে উদ্ধৃত গানের বাণীতে যার জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত, তিনি মর্দে মুজাহিদ ও মুসলিম সংস্কৃতির পথিকৃৎ দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী।

পরিচিতি

দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী ১৮৯৮ সালের মে মাসে বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দোয়ারাবাজার উপজেলার দোহালিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪৭] তাঁর পিতার নাম দেওয়ান মোহাম্মদ আফতাব চৌধুরী। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে তাঁর পূর্বপুরুষ ভারতের রাঢ় অঞ্চল থেকে তৎকালীন সিলেট এর হবিগঞ্জ মহকুমার পুটিজুড়িতে জমিদারীপ্রাপ্ত হয়ে আগমন করেন। পরবর্তীতে এই বংশের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ প্রেম নারায়ণ রায় চৌধুরী ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক মোহাম্মদ ইসলাম খাঁ নাম ধারণ করে সুনামগঞ্জ জেলার দোহালিয়ায় চলে আসেন। দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী ইসলাম খাঁর ষষ্ঠ অধস্তন বংশধর। এই পরিবারের লোকেরা সুদূর অতীত থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ছিলেন। তাঁর চাচা দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ ছিলেন দোহালিয়ার বিখ্যাত জমিদার ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী। বাংলাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ও জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ চৌধুরী তাঁর আপন চাচাতো ভাই। বর্তমান সময় পর্যন্ত এ বংশের লোকজন শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজসেবা সর্বোপরি ইসলামী রেনেসাঁ ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের ধারক ও বাহক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন।

---

১৪৬. উদ্ধৃত, ফজলুর রহমান, *সিলেটের একশত একজন* (সিলেট : এপ্রিল ১৯৯৪), পৃ. ২৬২

১৪৭. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হেলালী, মুসলিম সংস্কৃতির পথিকৃৎ দেওয়ান মুহাম্মাদ আহবাব, *সুনামগঞ্জ শীর্ষবিন্দু*, https//shirshobindu.com/archives/162221

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা

শৈশবে দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী নানাবাড়ি পীরপুরে লালিত পালিত হন। পারিবারিক উস্তাদ মৌলভী সৈয়দ রশিদ আলীর নিকট কুরআন শিক্ষা সমাপনের পর সিলেটের তরফ নিবাসী আব্দুল আজিজ খাদিম-এর নিকট ইংরেজির প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি পারিবারিক দ্বীনি তালিম শেষে নিজ বাড়ির মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় তাঁরই পূর্বপুরুষ ছানাবর রাজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৪৮] এই স্কুলে অধ্যয়ন শেষে তিনি সুনামগঞ্জ জুবিলি হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে উক্ত স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি সিলেট এম.সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে উক্ত কলেজ থেকে আই.এ ও ১৯২০ সালে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[১৪৯]

সাহিত্য চর্চা

আহবাব চৌধুরী ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ক্লাস সেভেনে পড়াশুনা করার সময় থেকে তিনি সমাজ জীবনের গ্লানি দূর করতে কলম হাতে নেন। তিনি অবিরত লিখেছেন সমাজের যত সব অত্যাচার শাসন ও শোষণের কথা। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি অবিরাম কলম যুদ্ধ চালিয়েছেন। ১৯২২ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা একত্রে সন্নিবেশিত করে ১৯৩১ সালে 'বাঙ্গালা সাহিত্য প্রসঙ্গ' পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[১৫০] তিনি প্রবাসী বিচিত্রা, দৈনিক আজাদ, যুগভেরী, আল-ইসলাহ সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনাবোধ সৃষ্টি। এ সব লেখা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ চেতনার সাবলীল স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় স্বারস্বত সমাজ তাঁর সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বিদ্যাবিনোদ উপাধিতে ভূষিত করে।[১৫১] লেখক ও গবেষক দেওয়ান আব্দুল হামিদ এর মতে : "ব্রিটিশ আমলে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে যারা অনবরত লেখনি পরিচালনা করতেন আহবাব চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। আহবাব চৌধুরী মনে করতেন, বাংলা ভাষাকে ইসলামী ভাবধারায় সত্যিকারের বাহন হিসেবে তৈরি করে ইসলামী রূপ দেয়ার পরে যে সাহিত্য সৃষ্টি হবে তাই হবে বাংলাদেশী মুসলিমদের সত্যিকারের সাহিত্য। হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির ভাবধারার বাহক

---

১৪৮. হোসেন তওফিক চৌধুরী, দেওয়ান মুহাম্মাদ আহবাব চৌধুরী, *দৈনিক সিলেটের ডাক*, https//sylhterdak.com.bd

১৪৯. প্রাগুক্ত

১৫০. *সিলেটের একশত একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

১৫১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে সাহিত্য সৃষ্টি হলে দুই জাতির মিলনের পথ হবে প্রশস্ত।"[১৫২] সত্যিকার অর্থে দেওয়ান আহবাব চৌধুরী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের করুণ অবস্থা চিত্রিত করে তা থেকে উত্তরণের পন্থা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। আহবাব চৌধুরীর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবন্ধরাজি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ হতো–তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাজনীতি

আহবাব চৌধুরী ছিলেন একজন তুখোড় রাজনীতিক, তাহযিব-তামাদ্দুনের এক লড়াকু সৈনিক। রাজনীতি করতে গিয়েও তিনি ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের যে মনোভাব প্রদর্শন করেছেন ইতিহাসের পাতায় তা আজো স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। জাতির বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় নতুন প্রজন্মকে দিক নির্দেশনা দেবে। আহবাব চৌধুরী বি.এ পাশ করার পর খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একই সময়ে মৌলভী আব্দুল মতিন চৌধুরীর উদ্যোগে মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং আসাম মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি ছাতক থেকে আসাম লেজিসলেটিভ এসেমব্লির সদস্য (এম.এল.এ) নির্বাচিত হন।[১৫৩] তিনি আসাম পার্লামেন্টে জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে সংসদ চলাকালীন সময়ে নামাজের জন্য বিরতির বিধান চালু করেছিলেন। উল্লেখ্য, প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন নামাজের সময় হতেই সাংসদ আহবাব চৌধুরী তৎকালীন সংসদের স্পীকার বসন্ত কুমার দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নামাযের জন্য বিরতি দাবী করলে স্পিকার বলেন, সংসদীয় আইনে নামাজের জন্য বিরতির বিধান নেই। তখন আহবাব চৌধুরী স্পিকারের অনুমতি নিয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন : "নামায মুসলমানদের জন্য ফরয যা প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই পালন করতে হয়। আমরা আসামের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছি, আমাদের ধর্মীয় বিধান পালন করতে না দেয়া মানে সারা আসামের মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান পালন করতে না দেয়ার শামিল। আমি নিজেকে একজন সাচ্চা মুসলমান দাবী করি। ধর্মীয় বিধান আমাকে মানতেই হবে, আপনি নামাযের বিরতি দেন আর না দেন তাতে কিছু আসে যায় না।" তারপর দাঁড়িয়ে মর্দে মুজাহিদ আহবাব চৌধুরী সংসদের ভিতরেই আযান দেন এবং মুসলমান সংসদ সদস্যগণকে নামায আদায় করার জন্য আহ্বান জানান। সাথে সাথে স্পিকার সংসদ মুলতবী করে নামাযের অনুমিত দেন।[১৫৪] সে দিন থেকে আসাম সংসদে নামাযের জন্য বিরতি আইন পাশ হয়। এটা ছিল আহবাব

---

১৫২. দেওয়ান আব্দুল হামিদ, প্রবীন সাহিত্যিক দেওয়ান আহবাব চৌধুরী, *মোহাম্মদী মদীনা*, ১৯৬৯, পৃ. ১৩

১৫৩. হেসেন তওফিক চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

১৫৪. রুহুল ফারুক, *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (সিলেট : সিটি অফসেট প্রেস, ২০০৪), পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী বিরল সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৪২ সালে তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এলাহাবাদ অধিবেশনে যোগদান করেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৪১ সালে Special session of the Assam provincial Muslim youngmens conference-এ সভাপতিত্ব করেন।[১৫৫] রাজনীতিতে তিনি ছিলেন খুবই স্পষ্টবাদী, ন্যায়-নীতির প্রশ্নে ছিলেন সর্বদা আপোষহীন ও সংগ্রামী। সমাজের যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। মুসলমানদের উপর অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'খান বাহাদুর' উপাধি তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।[১৫৬] দেওয়ান তাওফিকের ভাষ্য মতে, "একবার আসামের গভর্নর ও তার পত্নী সুনামগঞ্জ সফরে এলে গভর্নর-পত্নী সকল নেতৃবৃন্দের সাথে করমর্দন করেন; কিন্তু দেওয়ান আহবাব চৌধুরী করমর্দন করতে অস্বীকৃতি জানান।" এ ক্ষেত্রেও তিনি ইসলামী শিক্ষার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১৫৭]

ওফাত

মর্দে মুজাহিদ আহবাব চৌধুরী ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ ৭৩ বছর বয়সে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। পারিবারিক কবরস্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি এক ছেলে ও চার মেয়ের জনক ছিলেন।

মানুষ হিসেবে আহবাব চৌধুরী ও তাঁর শিক্ষা সেবা

আহবাব চৌধুরী দেশ ও সমাজের জন্য আমৃত্যু কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। লেবাস ও আচার-আচরণে তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর আদর্শের প্রকৃত অনুসারী। ধর্মীয় বিধান পালনে তিনি ছিলেন সর্বদা জাগ্রত। আসাম প্রাদেশিক সংসদে আযান দিয়ে নামাযের জন্য বিরতি আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি নামায আদায়ে আপোষহীনতার যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন এক কথায় তা অনন্য, অতুলনীয়। যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্রকণ্ঠ। সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর ছিল হৃদয়ের বন্ধন। বৃটিশ 'খান বাহাদুর' উপাধি বর্জনের মাধ্যমে তিনি তোষামোদী নীতি বর্জনের যে সাহসী শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা সকলের জন্য অনুকরণীয়। ইসলামী মূল্যবোধে তিনি এতটাই পরিপূর্ণ ছিলেন যে, আদর্শের ব্যাপারে তিনি জীবনে কখনো আপোষ করেননি। ১৯১৯ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট সফরে এলে তিনি কবির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই সুবাদে কবিগুরুর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। জাতীয় কবির সাথে তাঁর প্রায়ই পত্রালাপ হতো।[১৫৮]

---

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

১৫৬. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হেলালী, *দোয়ারাবাজারের শেকড় ও স্বরূপ* (সিলেট : তা.বি.), পৃ. ১৮

১৫৭. হোসেন তওফিক চৌধুরী, প্রাগুক্ত

১৫৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বকবি ও জাতীয় কবির সাথে ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগ নিঃসন্দেহে তাঁর সুউচ্চ ব্যক্তি মানসের পরিচয় বহন করে। আহবাব চৌধুরী ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও পরোপকারী। দোহালিয়ার জমিদার থাকাবস্থায় তিনি এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। পানাইলের মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অনুদান প্রদান করেন। রাজদ্রোহীতার অভিযোগে জনাব ফজলুল হক সেলবর্ষী সুনামগঞ্জে গ্রেফতার হলে আহবাব চৌধুরী ব্যক্তিগত জিম্মায় পাঁচ হাজার টাকা জামানত দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসার মহান শিক্ষা স্থাপন করেন।[১৫৯] ১৯৪৪ সালে আহবাব চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন। সিনেট সদস্য থাকাকালে তাঁরই একক প্রচেষ্টায় ইসলামিক স্টাডিজকে সর্বপ্রথম এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৬০] এছাড়া তিনি Court of the University of Dacca এর সদস্য হিসেবে দেশের উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৬১]

দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে তৎকালীন আসামের প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলই ওয়ার্দ্ধা স্কিমের ব্যয় বরাদ্দ করলে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে তাঁর বিরোধিতা করেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা-ভাবনা জাতির সামনে উপস্থাপনে প্রয়াস পান। তাঁর মতে : "এই স্কিমে শিল্পশিক্ষা দেওয়া একটি মুখোশ মাত্র। তার আসল উদ্দেশ্য হল Basis education এর বাহানা করে মুসলিম ছাত্রদের মাঝে তথা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে Gandhism বা গান্ধীবাদ প্রচার করা। কংগ্রেস ভক্তরা একে Messenger of truth and Ahingshaa বললে কেউ বাধা দেবে না; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে মুসলিম ছাত্র সমাজে এই গান্ধী ধর্ম প্রচার করার কোন অধিকার কংগ্রেসের নেই। তা ফ্যাসিস্ট বা নাজি অত্যাচার থেকে আরও ভয়াবহ। এই গান্ধীবাদ হল সম্পূর্ণ শিরক। এখানেই হল ওয়ার্দ্ধা স্কিমের বিরোধিতার মূল কারণ। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বর্তমানে যে বিরোধ ইহা কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিরোধ নয়; ইহা ঈমান ও শিরকের চিরন্তন লড়াই। কংগ্রেসের হামলা হতে আমাদের ঈমান, মাযহাব ও শিক্ষাকে রক্ষা করা আমাদের সর্ব প্রধান কর্তব্য ও ফরযে আইন।"[১৬২] উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ও জাগ্রত করার জন্য তিনি তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক আজাদ ও সিলেটের খ্যাতনামা 'যুগভেরী' পত্রিকায় ওয়ার্দ্ধা স্কিমের গোড়ার কথা ও ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ

---

১৫৯. সিলেটের একশত একজন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

১৬০. মাসিক আল ইসলাহ-১৯৫২; হোসেন তওফিক চৌধুরী, প্রাগুক্ত

১৬১. ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

১৬২. মোহাম্মাদ আহবাব চৌধুরী, ওয়ার্দ্ধা শিক্ষার গোড়ার কথা, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, উদ্ধৃত ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

লিখে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন।[১৬৩] তৎপরবর্তীতে তিনি ওয়ার্দ্ধা শিক্ষার গোড়ার কথা নামক একটি পুস্তক রচনা করেন তাতে ৭টি অধ্যায় ছিল– ১. ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা, ২. ভারতে গান্ধীবাদ, ৩. অহিংসার তাৎপর্য, ৪. গান্ধীবাদের প্রতিক্রিয়া, ৫. ওয়ার্দ্ধা স্কিমের ইসলাম বিদ্বেষ, ৬. পাঠ্যপুস্তকে প্রোপাগাণ্ডা, ৭. ভারতীয় মুসলিমদের ভবিষ্যৎ।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বইটি প্রকাশিত হয়নি। অনেক অনুসন্ধানের পর পাণ্ডুলিপিটিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পরিশেষে বলা যায়, দেওয়ান আহবাব চৌধুরী ছিলেন বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাসে এক বিশাল বটবৃক্ষ। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনুকরণীয়। তিনি ছিলেন সুনামগঞ্জসহ সমগ্র সিলেটের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। তাই তাঁকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সময়ের দাবী।

আব্দুল বারী চৌধুরী (১৯০১-১৯৫০)

জন্ম ও পরিচিতি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিশিষ্ট আইনজীবী ও পার্লামেন্টারিয়ান আব্দুল বারী চৌধুরী ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সাহিত্যমনস্ক। জনমানুষের কল্যাণ কামনা ও সেবা করা ছিল তাঁর সারা জীবনের ব্রত। সুনামগঞ্জ শহরের তেঘরিয়া এলাকার প্রবেশ পয়েন্টে অবস্থিত 'বারী মঞ্জিল' নামক বাসভবনটি সুনামগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শহরের বিশিষ্টজনরা দলমত নির্বিশেষে একসময় এ ভবনে জড়ো হতেন। সুনামগঞ্জের রাজনীতি, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি সবই এ ভবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। ৮৫ বছর আগে নির্মিত এ ভবনটি সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের অনেকেই অবগত নন। প্রবীণদের অনেকেই এই ভবনের কীর্তিগাথা সম্পর্কে অবহিত হলেও তাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

১৯০১ সালে জগন্নাথপুর থানার আশারকান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আব্দুল বারী চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।[১৬৪] তাঁর পিতার নাম আব্দুল আজিজ চৌধুরী। পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট তিনি সূফী মিয়া নামে পরিচিত ছিলেন। ১৬১২ সালে খাজা ওসমান লোহানী দমদমা বিন্দাবনপুর যুদ্ধে মোগল সেনাপতি শুজাত খানের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। সিলেট অঞ্চলে তখন মোগল আধিপত্য স্থাপিত হয়। পরাজিত পাঠান সর্দারগণ তখন সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নেন। আব্দুল বারী চৌধুরীর

---

১৬৩. প্রাগুক্ত

১৬৪. আব্দুল বারী চৌধুরী, সুনামগঞ্জের স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্ব; http://sunamkantha.com

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বপুরুষ এমনি এক পাঠান সর্দার যিনি জগন্নাথপুরে আসেন এবং কান্দির মধ্যে আশা বা লাঠি পুঁতে নিজ বাসস্থান চিহ্নিত করেন। এজন্য উক্ত গ্রামের নাম হয় আশারকান্দি।[১৬৫]

শিক্ষাজীবন

ছোটবেলা থেকেই জনাব আব্দুল বারী চৌধুরী ছিলেন তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও মেধাবী। পারিবারিক পরিবেশে তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু হয়। তারপর তিনি আশারকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর প্রথমে তিনি নবীগঞ্জ মধ্য ইংরেজি স্কুলে এবং পরে সিলেট সরকারী হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯২২ সালে তিনি সিলেট সরকারী হাইস্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[১৬৬] উপরোক্ত সময়ে সারাদেশব্যাপী খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। চতুর্দিকে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগের হিড়িক পড়লেও জনাব আব্দুল বারী চৌধুরী মাথা ঠিক রেখে লেখাপড়ায় টিকে থাকেন। ১৯২৪ সালে তিনি সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯২৬ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেন। পরে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯২৯ সালে তিনি এম.এ ও বি.এল ডিগ্রী লাভ করেন।[১৬৭]

কর্মজীবন ও রাজনীতি

আব্দুল বারী চৌধুরী ১৯৩০ সালে কলকাতা আলীপুর কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। দীর্ঘ ৭ বৎসর সেখানে সুনামের সাথে ওকালতি করার পর তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনুরোধে তিনি সুনামগঞ্জে ফিরে আসেন এবং সুনামগঞ্জ আইনজীবী সমিতির সদস্য হয়ে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। ১৯৩৭ সালে নির্দলীয় ভিত্তিতে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধে জগন্নাথপুর-শাল্লা-দিরাই নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি প্রার্থী হন। কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীর সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি এম.এল.এ নির্বাচিত হন।[১৬৮] তখনকার দিনে প্রতিটি মহকুমায় স্থানীয় সরকারের পর্যায় হিসেবে 'লোকাল বোর্ড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৩৮ সালে আব্দুল বারী চৌধুরী জগন্নাথপুর থানা থেকে লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আসীন হন।[১৬৯] উল্লেখ্য, তিনিই সুনামগঞ্জ লোকাল

১৬৫. *সিলেটের একশত একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
১৬৬. প্রাগুক্ত
১৬৭. প্রাগুক্ত
১৬৮. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
১৬৯. বদিউর রহমান, আলোকিত পুরুষ আব্দুল বারী চৌধুরী, সুনামগঞ্জ দর্পণ, ২৬ জুন ১৯৯১, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ডের প্রথম মুসলিম চেয়ারম্যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি সুনামগঞ্জ মহকুমার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে একই আসন থেকে তিনি এম.এল.এ নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর আমৃত্যু তিনি পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে আব্দুল বারী চৌধুরী আসাম প্রাদেশিক পরিষদে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কুখ্যাত লাইন প্রথা ও বঙ্গাল খেদা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের নির্দেশে লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আসামে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং শিলচরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দশ মাসের জন্য কারাবরণ করেন।[১৭০]

১৯৪০ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগ গঠিত হলে আব্দুল বারী চৌধুরী এর সভাপতি নির্বাচিত হন। একই সাথে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি। মাওলানা ভাসানী কারবরণ করলে আব্দুল বারী চৌধুরী কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[১৭১] ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে তিনি ঐতিহাসিক নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। আব্দুল বারী চৌধুরীর মত ত্যাগী মহান রাজনীতিবিদদের কল্যাণেই সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তানের, অভ্যুদয় হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। সিলেট রেফারেন্ডামেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্য কর্ম

আব্দুল বারী চৌধুরী সমগ্র জীবনভর শিক্ষার আলো বিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাবস্থায় স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার-প্রসারে তিনি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন।[১৭২] ১৯৪৪ সালে সুনামগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। ১৯৩৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ও ফেলো নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ৫ বছর তিনি এ পদে বহাল থেকে উচ্চশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নীতি নির্ধারণী ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। ১৯৩৭ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘদিন এলাকার নির্বাচিত এম.এল.এ হিসেবে তিনি এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। সুনামগঞ্জ জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়,

---

১৭০. *সুনামগঞ্জের স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্ব*, প্রাগুক্ত।

১৭১. *সিলেটের একশত একজন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

১৭২. মোহাম্মদ হোসেন, সুনামগঞ্জের সুসন্তান আব্দুল বারী চৌধুরী, *সাপ্তাহিক স্বজন*, ২৬ আগস্ট ১৯৯১, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

খোদাবকস হাইস্কুল, সাতগাঁও হাইস্কুল, আব্দুর রশিদ হাইস্কুলসহ অসংখ্য স্কুলে সরকারী অনুদান প্রদানসহ ব্যক্তিগত আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় নিজ এলাকার শিক্ষা বিস্তারে তিনি নন্দিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[১৭৩] শিক্ষাব্রতী এ মহান পুরুষ শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত থাকাবস্থায় এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালের ২৫ জুন দিরাই অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনে যাওয়ার পথে এম.এল স্কাউট নামক স্টীম লঞ্চে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৭৪]

রাজনীতি ও সমাজ সেবা ছাড়াও তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন সফল নাট্যকার। তাঁর রচিত দু'টি নাটক গ্রন্থ 'গায়ের মায়া' এবং 'শাহজালাল' প্রকাশিত হয়েছে।[১৭৫] সামাজিক শিক্ষা নির্ভর দু'টি নাটক গ্রন্থ পাঠকমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। অতি অল্প বয়সে তিনি বিদায় না নিলে জাতিকে আরো সাহিত্য সম্পদ দান করতে পারতেন।

পারিবারিক জীবন ও মৃত্যু

আব্দুল বারী চৌধুরী ত্রিশের দশকে হবিগঞ্জের রামশ্রী জমিদার কন্যা সৈয়দা হাশমত আরা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখ ও আনন্দের। তিনি তিন সফল পুত্র সন্তানের জনক। ব্যক্তি জীবনে আব্দুল বারী চৌধুরী ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ, অমায়িক ও হাসি-খুশি স্বভাবের মানুষ। পরিবার-পরিজনের প্রতি তিনি ছিলেন সর্বদা স্নেহ পরায়ণ ও সদয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে সমগ্র জীবনভর তিনি সমাজ, মানুষ এবং সর্বোপরি মানবতার জন্য বিলিয়ে এক মহান ত্যাগী পুরুষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে গেছেন।

১৯৫০ সালের ২৫ জুন উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে আকস্মিকভাবে তাঁর নির্বাচনী এলাকা দিরাইয়ে স্কুল পরিদর্শনরত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৭৬] তাঁর লাশ নিজ গ্রামে নিয়ে আসা হয় এবং আশারকান্দি গ্রামের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান এসেমব্লির ১৫.০২.৫১ তারিখের অধিবেশনে স্পীকার কর্তৃক আব্দুল বারী চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।[১৭৭] আব্দুল বারী চৌধুরীর অবদান সুনামগঞ্জের ইতিহাসে এক আলোকিত অধ্যায়। তিনি তাঁর সুকর্মের মধ্যে জনচিত্তে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকবেন।

---

১৭৩. প্রাগুক্ত

১৭৪. *সিলেটের একশত একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১৭৫. *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন*, পৃ. ১৬

১৭৬. *সুনামগঞ্জের স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্ব*, প্রাগুক্ত

১৭৭. *সিলেটের একশত একজন*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯)

শুধু বাংলাদেশ নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণ ও দর্শনের ইতিহাসে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে এক স্মরণীয় নাম ও এক অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু একজন সফল শিক্ষাবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, উঁচুস্তরের সূফী সাধক, গণমুখী রাজনীতিক, কল্যাণধর্মী অর্থনীতিবিদ, মানব মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত সাংস্কৃতিক বলিষ্ঠ কণ্ঠ, সুনিপুণ বক্তা, যুক্তিবাদী আলোচক, সুলেখক, জীবন ঘনিষ্ঠ মানবতাবাদী দার্শনিক, সর্বোপরি বিরল ধী-শক্তি ও হৃদয়ানুভূতির অধিকারী একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ।[১৭৮] তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। দর্শনকে তিনি দেখেছেন জ্ঞান চর্চা ও প্রসারের এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হিসেবে। আর এ কারণেই জ্ঞানের প্রায় অধিকাংশ শাখাতেই তাঁর বিচরণ লক্ষণীয়। দর্শনের সাথে সাথে সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ধর্ম, নৈতিকতা, ললিতকলা, মরমীবাদ, ইতিহাস এবং সাহিত্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁর আলোচনা মৌলিকতার দাবী রাখে। বাংলা ছাড়াও তিনি আরবী, ফার্সী, ইংরেজি উর্দু ও সংস্কৃত ভাষায় ছিলেন সমান পারদর্শী।[১৭৯] ধর্মীয় গোড়ামীর উর্ধ্বে থেকে তিনি ছিলেন সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। তাঁর ধর্ম ও দর্শন সমৃদ্ধ বক্তৃতায় মানুষে মানুষে মহামিলনের চিরন্তন বাণী ও শিক্ষাই বিকশিত হয়েছে। নিম্নে এ মহা মনীষির সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, বর্ণাঢ্য শিক্ষকতাজীবন ও দর্শন চর্চার মাধ্যমে বিভিন্নধর্মী শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাবো।

জন্ম, নাম ও বংশ পরিচয়

বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯০৬ সালের ২৫ অক্টোবর (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৯ কার্তিক) শুক্রবার তৎকালীন সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) অন্তর্গত লক্ষনছিরি মৌজার তেঘরিয়া গ্রামে তাঁর নানা বিশ্ববরেণ্য মরমী কবি ও সাধক দেওয়ান হাছন রাজার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮০] তাঁর পৈত্রিক নির্বাস সুনামগঞ্জের অন্তর্গত দোহালিয়াতে। পিতা দেওয়ান আসফ[১৮১] ছিলেন দোহালিয়ার স্বনামধন্য জমিদার এবং বৃটিশ যুগের একজন জাতীয়তাবাদী

---

১৭৮. ড. আনিসুজ্জামান, দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ জাতীয় সম্বর্ধনা গ্রন্থ, সম্পাদনায়, অধ্যাপক শাহেদ আলী ঢাকা, ২৫ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৩১

১৭৯. মতিউর রহমান নীলু, আজরফ দর্শনে নৈতিকতা ও জ্ঞান প্রসঙ্গ, *মাসিক ঐতিহ্য*, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৯৮

১৮০. দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ, *অতীত জীবনের স্মৃতি* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭), পৃ. ৬

১৮১. দোহালিয়া জমিদার দেওয়ান মোহাম্মাদ আসফ ১২৬৮ বাংলার ৬ই আশ্বিন মোতাবেক ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পৈত্রিক নিবাস পানাইল মৌজায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেওয়ান মোহাম্মাদ আসগরের তিনি একমাত্র সন্তান। তাঁর মাতা খাদিজা বানু কানিহাটির জমিদার আব্দুল গফুর চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা। দেওয়ান মোহাম্মাদ

Dhaka University Institutional Repository

নেতা। মাতা ছিলেন হাছন রাজার জৈষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাৎ রওশন হুসন বানু। তিনি একজন বিদূষী মহিলা ছিলেন। দেওয়ান আজরফ তাঁর চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে পিতামাতার তৃতীয় সন্তান।[১৮২]

তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আজরফ এবং পূর্ণাঙ্গ নাম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ চৌধুরী। 'চৌধুরী'[১৮৩] ও 'দেওয়ান'[১৮৪] বংশগত উপাধি। শিশুসুলভ সরলতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। পারিবারিক

আসফ দোহালিয়ার মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তবে তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষিত মহলে ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করার প্রবল প্রবণতা দেখা দেয়ায় এবং পিতা-মাতার একমাত্র আদরের সন্তান হওয়াতে বঙ্গ পরীক্ষা পাশ করার পর তাঁর পিতা-মাতা তাকে আর ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য সিলেট বা ঢাকা পাঠাননি। তবে তিনি বাড়িতে অভিজ্ঞ এক মৌলভীর নিকট আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যে প্রভূত বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি সাদী, রুমী, জামী, ফেরদৌসী ও হাফিজের কাব্যের বিশেষ অনুরাগী পাঠক ও সমালোচক ছিলেন। হাফিজের রূপক প্রধান 'দিওয়ান' তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। শেখ সাদীর 'গুলিস্থা' ও 'বুস্তা'-কে তিনি নৈতিক জীবনের নির্দেশিকা বলে মান্য করতেন। মোহাম্মাদ আসফের পিতা তাঁকে মাত্র তের বৎসরের কিশোর রেখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বংশে আর কোন সন্তান না থাকায় কিশোর বয়সেই তিনি সংসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর চাচা মোহাম্মদ আফজালের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না বলে তিনি তাঁর পিতা ও চাচার সমুদয় সম্পত্তির মালিকা হয়ে দক্ষ জমিদারের মত সমুদয় সম্পত্তি পরিচালনা করেন। মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি আওরঙ্গপুর পরগনার জমিদার সৈয়দ ইসহাক বখত চৌধুরীর জৈষ্ঠা কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ পক্ষে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তবে তারা শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাদের আম্মাও তাদের অনুসরণ করেন। দীর্ঘদিন বিপত্নীক থাকার পর অবশেষে ৩৪ বছর বয়সে তিনি সিলেটের বিখ্যাত মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার জৈষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাত রওশন হুসন বানুকে বিবাহ করেন। এ পক্ষে তাঁর চার ছেলে ও তিন কন্যা। সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ তাঁর তৃতীয় পুত্র।

জমিদারী পরিচালনার পাশাপাশি দেওয়ান আসফ সমাজসেবা ও শিক্ষার পৃষ্ঠোপোষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে সরকার কর্তৃক লোকেল বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। পরে স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হলে তিনি তৎকালীন ছাতক থানা থেকে একটানা তেত্রিশ বৎসর লোকেল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। শুধু শিক্ষা বিস্তার নয়, চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতে মুসলিমদের আসন সংরক্ষণ আন্দোলনে গঠিত 'আঞ্জুমান-ই ইসলামিয়া' নামক সংগঠনের তিনি সুনামগঞ্জ মহকুমার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর চেষ্টা ও নেতৃত্বে তৎকালীন সময়ে অনেক শিক্ষিত মুসলমান শাসন বিভাগের উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় মরহুম আব্দুর রশিদ চৌধুরী (প্রয়াত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ন রশীদ চৌধুরীর পিতা) তখনকার দিনের সাব ডেপুটির পদ লাভ করেছিলেন। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে গঠিত খেলাফত কমিটির তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তেমনি সিলেটে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলে তিনি তাঁর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সমগ্র জীবনভর ইংরেজ শাসনের বিরোধিতাই করে গেছেন। তাঁর জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে নির্যাতন করতেও ত্রুটি করেননি। এ মহান ব্যক্তিত্ব অবশেষে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। (তথ্যসূত্র : দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফের লিখিত 'দেওয়ান মোহাম্মাদ আসফ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত)।

১৮২. ফজলুর রহমান, *সিলেটের আরও একশ একজন* (ঢাকা : এপ্রিল ২০০০), পৃ. ২৪৮

১৮৩. দিল্লীর সম্রাট আকবরের শাসনকালে (১৫৭৪-১৫৯৪ খ্রি.) সরকারকে সর্বোচ্চ রাজস্ব কর প্রদানের জন্য দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফের পূর্বপুরুষ পৃথ্বিধর রায় জমিদার ও 'চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৪. দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফের পূর্বপুরুষের অন্যতম ইসলাম খানের পুত্র মোহাম্মাদ মাসুম খান তৎকালীন সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের উন্নত পরিবেশে বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নৃপতি নবাব আলীবর্দী খাঁর পরিবারের সংশ্রবে থাকার সুযোগ লাভ করেন এবং নবাব আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হন। এরপর থেকে এ বংশের লোকেরা 'দেওয়ান' উপাধি ব্যবহার করে আসছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যগতভাবে জমিদার সন্তানসুলভ অহমিকা বা অত্যাচারী মানস ছিল না তাঁর; বরং নিজেকে সাধারণ মানুষের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম রাখা ও গণস্বার্থে জীবনাচরণ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি পদবী লেখা বর্জন করেছিলেন এবং তাঁর বহু রচনায় 'দেওয়ান' অভিধাও ব্যবহার করেননি।[১৮৫] বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি ছিলেন একাধিক কলেজের স্বনামধন্য এমনকি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর এ বিরল খ্যাতির কারণেই অধ্যক্ষ শব্দটি তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপান্তরিত হয়ে তিনি হয়েছিলেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক[১৮৬] হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ নামেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তবে বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও রচনায় এবং সর্বমহলে তিনি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মূলত যশোরের একটি উচ্চ বংশীয় হিন্দু পরিবারভুক্ত। যারা হোসেন শাহীর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রথমে হবিগঞ্জ এবং পরে সুনামগঞ্জের দোহালিয়াতে বসতি স্থাপন করে জমিদারী লাভ করেন। এ বংশেরই অধস্তন পুরুষ প্রেম নারায়ণ রায় চৌধুরী ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করে ইসলাম খাঁ নাম ধারণ করেন।[১৮৭] এ থেকে এ বংশের মুসলমানী ধারা সৃষ্টি হলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের হিন্দু ও মুসলমান ধারার মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এ বংশের লোকেরা সুদূর অতীত থেকে বিশেষ করে দেওয়ান মাসুম খানের আমল থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ছিলেন। যার স্রোতধারা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং তাঁর পরিবারের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে।

বাল্যকালও শিক্ষা জীবন

শৈশবকাল থেকেই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও শান্তশিষ্ট স্বভাবের। নানা মরমী কবি হাছন রাজার পরিবার ও বাবা মায়ের অপার স্নেহ লাভের পাশাপাশি তখনকার সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে অসংখ্য দাস-দাসী ও চাকর-চাকরাণীর সেবা-যত্নের মধ্য দিয়ে তিনি বড় হতে থাকেন। জন্ম লাভের পর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রথম তিন বৎসর তাঁর নানা বাড়িতে মায়ের কোলে লালিত

---

১৮৫. সাদিয়া চৌধুরী পরাগ ও মুহাম্মাদ আসাদ (সম্পা.), *প্রাচ্যপ্রভা অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ* (ঢাকা : ভাই-বোন প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৩০

১৮৬. রাষ্ট্রীয়ভাবে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৪ আক্টোবর ১৯৯৩ ইং থেকে বাংলাদেশ জাতীয় অধ্যাপক (নিয়োগ শর্তাবলি ও সুবিধাদি) সিদ্ধান্তমালা ১৯৮১ (সংশোধিত) এর ৩নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নং শা ১৫(১)/১০ এম-২১/৮৯/১৬০ তাং ১৪-১০-৯৩ইং।

১৮৭. ফজলুর রহমান, *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

পালিত হন।[১৮৮] অতঃপর তাঁর একটি ছোট বোনের জন্ম হলে তিনি মায়ের কোল থেকে ছিন্ন হয়ে দাদীর কোলে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পর তাঁর দাদী ইন্তিকাল করলে তিনি আবার ফিরে আসেন মাতুলালয়ে। এভাবে কখনও নানাবাড়ি আবার কখনও নিজ বড়িতে তাঁর শৈশব ও বাল্যকালের ছয়টি বছর অতিবাহিত হয়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের শৈশব জীবনের বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে মাতামহ হাছন রাজার কোলে পিঠে এবং একান্ত আদর যত্নে। আদুরী নাতী আজরফকে কোলে নিয়ে হাছন রাজা বহু মরমী গান রচনা করেছেন। তন্মধ্যে হাছন রাজার রচিত :

"লোকে বলে বলেরে ঘর বাড়ী ভালা নায় আমার
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যেরই মাযার ....
এই ভাবিয়া হাছন রাজা ঘর দুয়ার না বান্দে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।" শীর্ষক প্রসিদ্ধ গানটিও রয়েছে।[১৮৯]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মায়ের কাছ থেকে বর্ণ পরিচয়সহ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মাতা একজন সুগৃহিনী হলেও যথেষ্ট শিক্ষানুরাগী ও মরমী সাধনায় বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য লালনের উপর গুরুত্বারোপ করতেন। দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ তাঁর মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন : "আজ পরিণত বয়সে মনে হয় লেখাপড়া করেছি এবং যতটুকু মানুষ হয়েছি তা সম্পূর্ণ আম্মার কান মলারই ফলে। কোন মায়ের হাতে ছেলেমেয়েরা এত শাস্তি ভোগ করেছে কি না জানি না। তবে আমাদের কাছে তখনকার সময়ে জল্লাদের চেয়ে কঠিন এ মা আমাদের জীবনে নৈতিক শাসনগুলো এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বড় হয়ে যখন সেগুলো ভাঙতে যাবার জন্য চেষ্টা করেছি তখন রীতিমত আপন মানসের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে।"[১৯০]

এ থেকে যে কোন মানুষের প্রতিষ্ঠা লাভের পশ্চাতে মায়ের অপরিহার্য ভূমিকার শিক্ষাই প্রতিভাত হয়। মায়ের পাশাপাশি তিনি গৃহ শিক্ষকের কাছেও অ্যধয়ন করতে থাকেন। তাঁর পরিবারে শিশুর বয়স পাঁচ বছর হলে তাকে পারিবারিক নিয়মানুযায়ী হাতেখড়ি দেয়া হতো। এ হাতে খড়ি দেয়াকে বলা হতো 'তখতি'।[১৯১] তখতি হতো প্রথমে আরবী অক্ষর পরিচয়ের মাধ্যমে। আরবী আয়ত্ব করার পর বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা দেয়া হতো। তখতি দেয়ার দিন থেকেই নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামাত সহকারে

১৮৮. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আমার জীবনে মায়ের অবদান, *মাসিক অগ্রপথিক*, ১৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৬১

১৮৯. *মুসলিম মনীষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৯০. আমার জীবনে মায়ের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ফজরের নামায আদায় করতে হতো। ফজরের নামাযের সময় তাঁর চাচা দেওয়ান মোহাম্মদ আফতাব স্বয়ং আযান দিয়ে তাঁকে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে নিয়ে যেতেন। নামায শেষে পড়তে বসতেন মক্তবে। মক্তবে পাঠ দিতেন মৌলভী মুসাদ্দার আলী, বাংলা পড়াতেন পণ্ডিত ব্রজনাথ ভট্টাচার্য। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আরবী ও বাংলা উভয় ভাষার অক্ষর জ্ঞান লাভে সমর্থ হন।

বাড়িতে আরবী ও বাংলা অক্ষর জ্ঞান লাভের পর ১৯১৩ সালে দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ দোহালিয়াতে নিজেদের পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী মধ্য ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন।[১৯২] ১৯২১ সালে তাঁকে সিলেট সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়; তবে সিলেটে থাকার সুবন্দোবস্ত না হওয়ায় ভর্তি হওয়ার ৭/৮ দিনের মাথায় বাধ্য হয়েই তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ১৯২১ সালেই সুনামগঞ্জ জুবিলী হাইস্কুলে গিয়ে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন।[১৯৩] তিনি এ স্কুলের হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতেন। সুনামগঞ্জে প্রবেশিকা পরীক্ষার কোন কেন্দ্র না থাকায় ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে তিনি সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ফার্সীতে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[১৯৪] ১৯২৭ সালে সিলেটের বিখ্যাত এম. সি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগ লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে ডিস্টিংশনসহ বি.এ এবং ১৯৩২ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রী লাভের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাঁর শিক্ষা জীবন।[১৯৫] ১৯৫৭ সালে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের (জি. সি. দেব) তত্ত্বধানে পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তি হন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল "Access to Reality" (সত্তার মর্মবাণী)। উক্ত শিরোনামে তিনি অভিসন্দর্ভ রচনার কাজও সম্পন্ন করেন; কিন্তু তাঁর তত্ত্বাবধায়ক জি. সি. দেব প্রথমে আমেরিকায় ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে চলে যাওয়ায় এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার কারণে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে থিসিস জমা দেয়ার মনোভাব হারিয়ে ফেলেন।[১৯৬] পরবর্তীতে তিনি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ একাডেমিক ডিগ্রীর জন্য অন্য কোথাও উপস্থাপন করেননি। তাঁর এ মূল্যবান গবেষণা কর্মটি অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে।

---

১৯২. *অতীত জীবনের স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৯৪. *প্রাচ্যপ্রভা অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১৯৫. *অতীত জীবনের স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১৯৬. ড. আনিসুজ্জামান, দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জাতীয় সম্বর্ধনা গ্রন্থ, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন বৈচিত্রময় কর্মজীবনের অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গণমুখী রাজনীতিবিদ, একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবক, বিশিষ্ট দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ, সর্বোপরি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও জাতির অভিভাবক। তিনি তাঁর বৈচিত্রময় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতিকে অনুকরণীয় শিক্ষা ও দীক্ষা উপহার দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এ বহুমুখী কর্ম তৎপরতার জন্য তিনি জীবনে প্রচুর সম্মাননা-স্বীকৃতিও লাভ করেছেন। তাঁর কর্মজীবনকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় :

১. শিক্ষকতা জীবন ও শিক্ষার পৃষ্টপোষকতা
২. সাহিত্যকর্ম
৩. রাজনৈতিক জীবন
৪. সমাজসেবা ও সামাজিক কৃতিত্ব
৫. বাগ্মীতা ও জাতীয় অভিভাবকত্ব
৬. বিদেশ সফর ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারের মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ
৭. সম্মাননা ও স্বীকৃতি।

১. শিক্ষকতা জীবন ও শিক্ষার পৃষ্টপোষকতা

পারিবারিক জমিদারীর দিকে ছোটবেলা থেকেই খেয়াল ছিল না দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের। তাঁর মন অধ্যাপনার জন্যই ব্যাকুল ছিল। অধ্যাপনাই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ পেশা। তাঁর ভাষায় : "এতে পড়ানো যায়, পড়াশুনাও করা যায়, তাঁর পরে টাকা পয়সাও মোটের উপর মন্দ পাওয়া যায় না। উপরি পাওনা হিসেবে স্যার সম্বোধনও পাওয়া যায়।"[১৯৭] অবশেষে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয় ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে একইসঙ্গে সিলেটের গোপালগঞ্জস্থ মোহাম্মদ চৌধুরী একাডেমী (এম.সি একাডেমী)-এর হেডমাস্টার ও আজিজিয়া মাদরাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে। তখন তাঁর বেতন ছিল সর্বমোট পঁচাত্তর টাকা।[১৯৮] চার মাস দায়িত্ব পালনের পর একই সালের জুলাই মাসে তিনি সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজের (এম.সি কলেজ) 'টিউটর' নিযুক্ত হন।[১৯৯] ননগেজেটেড অধ্যাপক রূপে টিউটর নিয়োগের রেওয়াজ তখন আসাম সরকারে প্রচলিত ছিল।

---

১৯৭. *সেই সোনাঝরা দিনগুলো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
১৯৮. *অতীত জীবনের স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালের ২০ নভেম্বর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সুনামগঞ্জ কলেজে ইংরেজি, বাংলা ও তর্কশাস্ত্রের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে উক্ত কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, সুনামগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনায় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর অর্থদান করার পাশাপাশি দোয়ারা বাজার জমিদারী এস্টেট থেকেও এককালীন দুই হাজার টাকাসহ প্রচুল অর্থ প্রদান করেন।[২০০] তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত কলেজটি পরবর্তীতে প্রথম শ্রেণির ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নরসিংদী কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে ১৯৬৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কলেজটি একটি উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের মে পর্যন্ত তিনি চাঁদপুর মতলব কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকার মালিবাগে আবু জর গিফারী কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপালের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[২০১] তিনি এ কলেজটিকে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করণের ব্যাপরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সমাজে মহানবী (সা.)-এর সাম্যবাদী শিক্ষা সম্প্রসারণে ব্রতী হন। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে এ কলেজে তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

আবু জর গিফারী কলেজে থাকাকালীন সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি ১৯৭৩ সালে দর্শন বিভাগে এবং ১৯৮০ সালের মে মাসে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত উভয় বিভাগে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগেও কিছুদিন তিনি অধ্যাপনার কাজ করেন।[২০২] একই ব্যক্তির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়র মত প্রতিষ্ঠানে সমাজকল্যাণ, দর্শন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা নিশ্চয়ই অভিনবত্বের দাবীদার। এ অভিনবত্ব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের বহুমুখী মনীষারই প্রমাণ বহন করে।

এক কথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন একজন জাত শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকতা কখনই ক্লাসের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর ক্লাসের তো বটেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্লাসের বাইরে এমনকি তাঁর বাসভবনে শিক্ষা গ্রহণ করতে যেতো। সবচেয়ে শিক্ষণীয় ব্যাপার তাঁর অর্থনৈতিক

---

২০০. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জাতীয় সম্বর্ধনা গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

২০১. প্রাগুক্ত

২০২. অধ্যাপক আবদুল গফুর, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : বাংলাদেশের অনন্য মনীষী ব্যক্তি, *মাসিক ঐতিহ্য*, ১ম বর্ষ ৭-৯ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা আগাগোড়া অস্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রদের শিক্ষাদান করে টাকা নেয়ার কথা তিনি কখনও কল্পনাও করেননি।

২. সাহিত্যকর্ম

সাহিত্য ক্ষেত্রে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচিত্র শিক্ষণীয় উপাদান নিহিত রয়েছে। ধর্মদর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও জীবন অভিজ্ঞতার বিচিত্র নানামুখী শিক্ষণীয় বিষয় ছিল তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু। ১৯১৮ সালে তিনি প্রথম লেখালেখি শুরু করেন। এ হিসেবে তাঁর লেখার বয়স ৮০ বছর। সুদীর্ঘ লিখনী জীবনে তিনি জাতিকে ৩০ খানা প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা চল্লিশেরও অধিক। নীতির প্রশ্নে অবিচল থাকায় এবং বিশ্বাস ও আদর্শের পক্ষে তাঁর উচ্চারণ সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ থাকায় অনেক প্রকাশক তাঁর বই প্রকাশে আগ্রহ দেখাননি। বই প্রকাশে তাঁকে কিছুটা ছাড় দিতে বললে অনমনীয় ও সত্যের নিরত অনুগামী আজরফের বক্তব্য ছিল :

"আমার একটি বইও যদি প্রকাশিত না হয় তবু আমি আমার বিশ্বাসের প্রশ্নে কোন আপোস করবো না, আমি আর যাই হই অন্তত মুনাফিক নই। জীবন ও কর্মে বিশ্বাস ও চেতনায় মুনাফিকীতে আমি বিশ্বাস করি না, ঘৃণা করি ঘৃণা।"[২০৩]

অসংখ্য গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন স্মরণিকা সংকলনেও তাঁর অসংখ্য মৌলিক প্রবন্ধ, অনুবাদকর্ম, গল্প-উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। যাতে অসংখ্য শিক্ষণীয় উপাদান নিহিত আছে। সাহিত্য কর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

১৯১৮ সালে 'শিয়াল মামা' শীর্ষক একটি গল্পের মাধ্যমে প্রবেশ করেন সাহিত্যাঙ্গনে। প্রথম প্রকাশিত লেখা 'যাত্রী' নামে একটি কবিতা যা ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় মুরারীচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে।[২০৪] মানুষের সভ্যতা ও প্রগতির স্বার্থে দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ যে সব গ্রন্থাবলি রচনা করে গেছেন তা থেকে সমাজের সচেতন মানুষ নানামুখী শিক্ষা গ্রহণ করে মানবিক ঐশ্বর্যময় এক অলোকিত পৃথিবীর সন্ধান পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিম্নে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির একটি তালিকা প্রদত্ত হলো :

২০৩. রকিব আল হাফিজ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : সত্যান্বেষার বন্ধুর পথে বর্ণিল অভিযাত্রী, *আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা*, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ১৫৫

২০৪. আমিনুর রহমান, একান্ত সাক্ষাৎকারে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা*, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

১. তমদ্দুনের বিকাশ, ১ম সংস্করণ : ১৯৪৯, প্রকাশক, তমদ্দুন মজলিস, সিলেট

২. সত্যের সৈনিক আবু জর, ১ম সংস্করণ : ১৯৫১, প্রকাশক, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা

৩. ইতিহাসের ধারা, ১ম সংস্করণ : ১৯৫১, প্রকাশক, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা

৪. নূতন সূর্য, ১ম সংস্করণ : ১৯৫৯, প্রকাশক, পূর্বাচল প্রকাশনী, ঢাকা

৫. The Background of the Culture of Muslim Bengal, ১ম সংস্করণ : ১৯৬১, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, পরবর্তী সংস্করণ : ই. ফা. বা

৬. জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, ১ম সংস্করণ : ১৯৫৯, প্রকাশক, ইসলামিক একাডেমী ঢাকা, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ই. ফা. বা.

৭. Philosophy of History, ১ম সংস্করণ : ১৯৮২, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৮. Science and Revelation, ১ম সংস্করণ : ১৯৮০, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৯. ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে, ১ম সংস্করণ : ১৯৮০, ই. ফা. বা, ঢাকা

১০. Abu Dhar Ghifari, ১ম সংস্করণ : ১৯৮২, ই. ফা. বা, ঢাকা

১১. ইসলাম ও মানবতাবাদ, ১ম সংস্করণ : ১৯৮০, ই. ফা. বা, ঢাকা

১২. জীবন দর্শনের পুনর্গঠন, ১ম সংস্করণ : ১৯৮০, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

১৩. সন্ধানী দৃষ্টিতে ইসলাম, ১ম সংস্করণ : ১৯৮২, প্রকাশক, ই. ফা. বা, ঢাকা

১৪. দর্শনের নানা প্রসঙ্গ, ১ম সংস্করণ : ১৯৭৭ প্রকাশক, সূত্রধারা, ঢাকা

১৫. আমাদের আজাদী আন্দোলনের তিন অধ্যায়, ১ম সংস্করণ : ১৯৭১, প্রকাশক, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা

১৬. আমাদের জাতীয়তাবাদ, ১ম সংস্করণ : ১৯৮৬, প্রকাশক, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা

১৭. মরমী কবি হাসন রাজা, ১ম সংস্করণ : ১৩৬৬ বাং, প্রকাশক, মঞ্জিল প্রকাশনী, ঢাকা

১৮. ইতিহাসের উপেক্ষিত একটি চরিত্র, ১ম সংস্করণ : ১৩৭৫ বাং, প্রকাশক, আবু জর গিফারী সোসাইটি, ঢাকা

১৯. Islamic Movement, ১ম সংস্করণ : ১৯৫২, প্রকাশক, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা।

২০. ধর্ম ও দর্শন, ১ম সংস্করণ : ১৯৮৬, প্রকাশক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২১. নয়া জিন্দেগী, ১ম সংস্করণ : ১৯৮৭, প্রকাশক, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি., ঢাকা

২২. হাসন রাজা, ১ম সংস্করণ : ১৯৯০, প্রকাশক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ব্যক্তিত্বের বিকাশ (অনুবাদ), ১ম সংস্করণ : ১৯৬৫, প্রকাশক, মদীনা পাবলিকেসন্স, ঢাকা

২৪. অতীত জীবনের স্মৃতি, ১ম সংস্করণ : ১৯৮৭, প্রকাশক, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

২৫. সিলেটে ইসলাম, ১ম সংস্করণ : ১৯৯৫, প্রকাশক, ই. ফা. বা, ঢাকা

২৬. ইসলাম : মনীষার আলোকে, ১ম সংস্করণ : ১৯৭৮, প্রকাশক, ই. ফা. বা, ঢাকা

২৭. মুক্তির ডাক, ১ম সংস্করণ : ১৯৮০, প্রকাশক, ই. ফা. বা, ঢাকা

২৮. দর্শন (সম্পদনা), ১ম সংস্করণ : ১৯৮৩, প্রকাশক, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা

২৯. দুহালিয়া ধর্মপুরের পীর বংশের ইতিহাস, ১ম সংস্করণ : ১৯৯৬, সিলেট

৩০. বিশ্বসভ্যতায় আল্লামা ইকবালের অবদান, ১ম সংস্করণ : ২০০০, প্রকাশক, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা।

এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে : Access to Reality, Philosophy of Kant, সেই সোনাঝরা দিনগুলো, ছিন্ন মুকুল, ছন্দপতন, এই তো জীবন, নবী জীবনে তত্ত্বচিন্তা ও প্রত্যাদেশ, এ দুনিয়ার ধর্ম, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও হস্তরেখা বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা, রাজার সেরা রাজ শিকারী, কবুতর পালন, Metaphysics for the Beginner, আগামী পরশু (নাটিকা), গুণীজনের সান্নিধ্যে স্মৃতিকথা, আদি ও মধ্যযুগের দর্শনের ইতিহাস, Re-emergence of Islam and Islamic Culture, Hasan Raza : the Mystic, দেওয়ান বংশের ইতিহাস, ইসলামের ভাষ্যকার আবুল হাশিম, জীবন সাম্যের সমাধি, বেলা যে পড়ে গেলো (আত্মজীবনী), আমাদের সংস্কৃতির রূপান্তর, বেদানার মা'র আরজি (গল্প), অনিবার্য (গল্প), জীবনে ও মরণে (গল্প), মুসলিম দর্শন।

৩. রাজনৈতিক জীবন

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন একজন বিবেকবান রাজনীতিবিদ। রাজনীতিকে কখনও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন নি। রাজনীতি তাঁর কাছে বিশাল ক্ষমতার সিঁড়ি অতিক্রমের কৌশলের পরিবর্তে সমাজ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনেই নিয়োজিত ছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি আদর্শ ও নীতির শিক্ষাই সমাজকে প্রদান করেছেন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করে তিনি আসাম প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরই তিনি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আসাম প্রাদেশিক আইন পরিষদের আপার হাউজের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে আসাম সরকারের বঙ্গাল খেদা অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধমূলক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং শিলচরে ১৪৪ ধারা অমান্য করে কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে কলকাতায় সীমানা নির্ধারণ কমিশনে স্মারকলিপি প্রদানে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দেন ভাষা আন্দোলনে। ১৯৪৯ সালে যোগদান করেন ভাষা আন্দোলন ও ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিশে। সে সময় থেকে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব সক্রিয়ভাবে পালন করেছেন।[২০৫] আমাদের দেশের অনেক শিক্ষাবিদরা বর্তমান সময়ে শিক্ষা বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। আর দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ একজন সফল ও সার্থক রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতি ছেড়ে শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এটা তাঁর চরিত্রের অন্যতম একটা তাৎপর্যবহ অধ্যায়। তিনি যখন দেখলেন রাজনীতি করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সম্ভব নয়, তাই জ্ঞানের আলো সম্প্রসারণ করে জাতিকে আলোকিত করার মহান ব্রত নিয়ে তিনি শিক্ষকতাকে চিরস্থায়ী পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদ হিসেবেও সুনামগঞ্জের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৪. সমাজসেবা ও সামাজিক কৃতিত্ব

আজীবন মানব কল্যাণই ছিল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জীবনের লক্ষ্য। এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানকারদের[২০৬] সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর জমিদারীতে নানকারদের মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেন এবং নিজ জমিদারীতে প্রজাস্বত্ব স্বীকার করে এক সাথে এক হাজার নানকারদের খাজনা আদায়ের রশিদ প্রদান করেন।[২০৭] মানুষের অধিকার আদায়ের এ সুমহান সংগ্রামের আদর্শ দিয়েই তিনি সমাজ সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জীবন দর্শনের মূলে নিহিত ছিল মানব সেবার অমোঘ মন্ত্র, যা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি অনুসরণীয় শিক্ষা।

১৯৩৬ সালে মোহাম্মদ নূরুল হক ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় তিনি সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালে মুতাওয়াল্লীরূপে পৈতৃক ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[২০৮] ১৯৪৮ সালে সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান দর্শন সমিতির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে বাংলা

---

২০৫. মুহাম্মাদ আসাদ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ কর্ম ও জীবন, *আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা*, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ২২৬

২০৬. সিলেটে এক শ্রেণির দরিদ্র লোক ছিল যাদেরকে বলা হতো নানকার। সামাজিক দিক থেকে এদেরকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখত। জমিদারের সর্বপ্রকার হুকুম তামিল করাই ছিল এদের কাজ। তবুও জমিদাররা এদের প্রজা বলে স্বীকার করতো না। সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষ আভিজাত্যতা নষ্ট হওয়ার ভয়ে নানকারদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক তো গড়ে তুলতোই না এমনকি এক সাথে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত করত না।

২০৭. নূরুল ইসলাম মানিক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মৃত্যু : এক নক্ষত্রের পতন, *মাসিক অগ্রপথিক*, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৯১

২০৮. *অতীত জীবনের স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

একাডেমির কাউন্সিলর হন। ১৯৬২-৬৩ সালে বাংলা কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৬৬ সালে বিজাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৮ সালে অন্যান্যদের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন দারুল উলুম ইসলামিক একাডেমী। ১৯৬১ সালে এ প্রতিষ্ঠানটিকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ইসলামিক একাডেমী নামকরণ করে আবুল হাশিমকে এর পরিচালক নিযুক্ত করেন যা বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামে পরিচিত।[২০৯] ১৯৬৭ সালে অন্যান্যদের সহযোগিতায় ঢাকার মালিবাগে রাসূল (সা.)-এর বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবু জর গিফারী (রা.)-এর নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[২১০] মুসলিম তরুণদেরকে হযরত আবু জর (রা.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত করাই ছিল রাজধানীর বুকে এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। তিনি অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আজীবন সদস্যরূপে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, নজরুল ইনস্টিটিউট, নজরুল একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদ, আবু জর গিফারী সোসাইটি, Warm Heart Association প্রভৃতি।[২১১]

৫. বাগ্মীতা ও জাতীয় অভিভাবকত্ব

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী। কখনও আলোচক, কখনও সভাপতি আবার কখনও প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি দেশের সর্বত্র বিভিন্ন সভা সমিতিতে নিয়মিত যোগদান করে শিক্ষণীয় আলোচনা ও বক্তৃতা পেশ করতেন। কখনও কখনও এমনও হতো যে, প্রতিদিন তাঁকে একাধিক সভা সম্মেলনে যোগদান করতে হতো এবং এগুলো বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক হতো। সাধারণত তিনি শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন।[২১২] যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেও তিনি যোগদান করতেন এবং অনুষ্ঠান উপযোগী মূল্যবান ভাষণ পেশ করতেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এসব বক্তব্যের সারাংশ নিয়ে পৃথকভাবে গবেষণার কাজ হতে পারে। তাঁর মত জ্ঞানী, বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী, অসাধারণ প্রতিভাবান গুণী ব্যক্তির বক্তৃতা শ্রোতা সাধারণের মনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করত। এভাবে তিনি এক ব্যতিক্রমী চারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিলেন, যার শিক্ষক ছিলেন তিনি নিজে আর অধিতজন ছিল দেশ ও বিদেশের নানা

---

২০৯. মুহাম্মদ আসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

২১০. প্রাগুক্ত

২১১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জাতীয় সম্বর্ধনা গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

২১২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ কর্ম ও জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের শ্রোতামণ্ডলী। এদিক দিয়ে তাঁর জাতীয় অধ্যাপক পদবী আক্ষরিক অর্থেই ছিল যথার্থ। তিনি সম্পূর্ণ তাঁর পদের মর্যাদা রক্ষা করেছেন এবং জাতিও তাকে যথার্থই একজন শিক্ষকের মর্যাদা দিয়ে অন্তরের মনিকোঠায় পরম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। জাতীয় প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে তিনি এগিয়ে এসেছেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। সমাজের মানুষের কল্যাণে নিজের তহবিল থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন, শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে সমাজকে আলোকিত করতে চেয়েছেন। জাতির জন্য যার সমগ্র জীবনের এ প্রচেষ্টা তিনিই তো জাতির অভিভাবক। বাংলাদেশের দর্শন চর্চার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অভিভাবক।

৬. বিদেশ সফর ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনরের মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং একজন বিশিষ্ট দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বরেণ্য শিক্ষাবিদ হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান দর্শন সমিতির প্রতিনিধি হয়ে নিখিল ভারত দর্শন সমিতির আন্নামালই নগর অধিবেশনে যোগ দিয়ে 'The Philosophy of History' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং Process of Revolution বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান দর্শন সমিতির প্রতিনিধি হয়ে দিল্লীতে পাক-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং সেখানে Education of Morality বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১৯৬২ সালে ইরাক সরকারের আমন্ত্রণে বাগদাদ নগরীর সহস্র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যোগ দিয়ে আলকিন্দি দর্শনের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১৯৮১ সালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রব্বানী দর্শনের উপর বক্তৃতা করেন। ১৯৮৪ সালে শিউলে ধর্ম সম্মেলনে Faith and Reason বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ১৯৮৫ সালে রোমের ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে Holiness in Islam শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১৯৮৬ সালে ইরান সরকারের আমন্ত্রণে ইরানের বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগদান করে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একাধিক শিক্ষণীয় আলোচনায় অংশ নেন।[২১৩] পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে তিনি দর্শনসহ অন্যান্য বিষয়ক কমপক্ষে পাঁচ সহস্রাধিক[২১৪] সেমিনার-সেম্পোজিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষার আলো সম্প্রসারণে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। শিক্ষা সম্প্রসারণের ইতিহাসে যা চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

---

২১৩. মুহাম্মদ আসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

২১৪. মনির উদ্দীন চৌধুরী, সূফি ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সিলেট, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

সম্মাননা ও স্বীকৃতি

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে শিক্ষা বিস্তারসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার ও বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রচুর সম্মাননা, স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভে ধন্য হয়েছেন। যেমন,

১. ১৯৮১ - স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার।

২. ১৯৮৩ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।

৩. ১৯৮৪ - বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ফেলো নির্বাচিত।[২১৫]

৪. ১৯৮৪ - নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক।

৫. ১৯৮৫ - বাংলাদেশ মুসলিম ওয়েলফেয়ার মিশন পুরস্কার।

৬. ১৯৮৬ - আন্তর্জাতিক ধর্ম ও শান্তি পুরস্কার (মুসলিম সংহতি পুরস্কার)।

৭. ১৯৮৮ - অতীশ দীপংকর পুরস্কার।

৮. ১৯৮৮ - মাওলানা আকরাম খাঁ স্বর্ণপদক।

৯. ১৯৮৯ - ছাত্র যুব সম্মেলন সম্বর্ধনা।

১০. ১৯৮৯ - জাতীয় সাহিত্য সংসদ স্বর্ণপদক।

১১. ১৯৮৯ - জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্বর্ণপদক।

১২. ১৯৯০ - খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ স্বর্ণপদক।

১৩. ১৯৯০ - ন্যাটালোক সম্বর্ধনা, সিলেট।

১৪. ১৯৯০ - জালালাবাদ যুব ফোরাম পুরস্কার।

১৫. ১৯৯১ - ঢাকা রোটারী প্রাইজ।

১৬. ১৯৯১ - বাংলাদেশ সাহিত্য সংসদ পুরস্কার।

১৭. ১৯৯২ - মৌলভীবাজার পৌর সম্বর্ধনা।

১৮. ১৯৯২ - বিশ্বনাথ ছাত্র কল্যাণ সমিতি সম্বর্ধনা।

১৯. ১৯৯২ - একুশে পদক।

২০. ১৯৯২ - স্যার জগদীশ চন্দ্রবসু পুরস্কার।

২১. ১৯৯২ - ভোলা জাতীয় মঙ্গল সাহিত্য পুরস্কার।

২২. ১৯৯৩ - জাতীয় অধ্যাপক ঘোষণা।

---

২১৫. বাংলা একাডেমীর ফেলো নং ১৬২, বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ১৯৯৩ - শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বর্ণপদক।

২৪. ১৯৯৪ - জালালাবাদ এসোসিয়েশন স্বর্ণপদক।

২৫. ১৯৯৫ - সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ সম্বর্ধনা।

২৬. ১৯৯৬ - মানবাধিকার স্বর্ণপদক।

২৭. ১৯৯৮- রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার।

ইন্তেকাল ও দাফন

শতাব্দীর সাক্ষী এ মহান মনীষি ৯৩ বছর বয়সে ১ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রি. তারিখে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে ঢাকা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে নিজের গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জের দোহালিয়ায় তাঁর মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়।[২১৬]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের শিক্ষা দর্শন ও ভাবনা

দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ মূলত রব্বানী দর্শনের আলোকে তাঁর দর্শনকে সুসংগঠিত ও বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর শিক্ষা দর্শন ছিল কল্যাণমুখী। বৃটিশ আমলে শিক্ষার যে ত্রুটি ছিল তিনি তাই চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন খ্রিষ্টানদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশের মানুষের ধর্ম ও চরিত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বৈ কিছু নয়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি এমনভাবে প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা ও মৌলিকত্বের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

"বর্তমানকালের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করার ফলে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের মনে নৈতিক আলো প্রবেশ করার সুযোগ নেই। সমগ্র মধ্যযুগে মানুষের ধারণা ছিল ধর্ম ব্যতিরেকে নৈতিক জীবন যাপন করা সম্ভবপর নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে তত্ত্বজ্ঞানী ক্যান্ট নৈতিকতাকে ধর্মের প্রভাব থেকে পৃথক করার ধারণা প্রচার করার ফলে এখন নৈতিকতা অনেকটা ধর্মের প্রভাবের বাইরে। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের পর ধর্ম ক্রমেই রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নির্বাসিত হচ্ছে। তার ফলে রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ ধর্মীয় শিক্ষার স্থান নৈতিক শিক্ষা অধিকার করেনি। এতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা আর পূরণ হয়নি। ফলে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বালক-বালিকাদের নৈতিক জীবনের বিকল্প হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কৃতি ছাত্র বা ছাত্রীরা অনিবার্যভাবে সবচেয়ে মহৎ

২১৬. জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা*, আজরফ সংখ্যা, ডিসে. ২০০০, পৃ. ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের অধিকারী নাও হতে পারে। আমাদের ছোটবেলায় গৃহ শিক্ষকের ব্যবস্থা ছিল। ছেলেরা মা-বাবার কাছে ধর্মের নীতির মৌলিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে তার পরে স্কুলে যেতো। এর প্রভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও নীতিভ্রষ্ট হয়নি। বর্তমানে অতি শৈশবেই তাদের স্কুলে দেয়া হয় বলে তারা নৈতিক মূল্যমানমূলক শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে সমানতালে তাদের নৈতিক জীবন বিকশিত হচ্ছে না। এ জন্য আমাদের পাঠ্যসূচীতে নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশু প্রয়োজন রয়েছে।"[২১৭]

শিশুদের কোমল মনে নৈতিক শিক্ষা যাতে ভালোভাবে গ্রথিত হতে পারে সে জন্য ছোটদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে মায়েদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তিনি তাঁর সময়ে প্রাইমারী, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে শ্রীমতি সরযুবালা, স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতি কামিনী রায় প্রমুখ নারী লেখিকাদের নৈতিক শিক্ষায় উদ্দীপ্ত কবিতাগুলো পাঠের স্মৃতির উল্লেখ করে বলেন : "আজকাল দেশেই এ সত্যটি স্বীকৃতি লাভ করেছে, শিশুদের শিক্ষা মাতৃজাতির দ্বারা সবচেয়ে ভাল হয়। আজকাল মায়েরা বাবাদের মতই শিক্ষারও সুযোগ পাচ্ছেন। কলমের মাধ্যমে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক রচনাতেও তারা উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। তবে কোন সুরুচিসম্মত নৈতিক শিক্ষা সম্বলিত রচনা প্রস্তুত করছেন না। আজকাল কি আমদের মা-বোনেরা তাদের মাতৃধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন।"[২১৮] এ ব্যাপারে তিনি নারীদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে : "মানুষের স্বভাবে আল্লাহ অসীম ক্ষমতা রেখেছেন। এ সুপ্ত ক্ষমতার উন্মেষ ঘটাতে হয় কখনো প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তির সাথে লড়াই করে, কখনো বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বেড়াজাল অতিক্রমের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির ধর্ম ও নিয়ম জানার জন্য বিজ্ঞান শিখতে হবে, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্র খুঁজতে হবে। সামাজিক জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা কুড়ানো যাবে সেই পুঁজি লাগাতে হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অনাবিল শান্তিময় জীবন গড়ার কাজে। আজরফের মতে, ঐ কার্য সাধনের প্রক্রিয়া হলো এমন নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা ও মৌলিকত্ব সৃষ্টি হয়, তাদের চরিত্র পূত-পবিত্র হয়, তাদের মনে খোদাভীতি ও ধর্মীয় অনুভূতির সঞ্চার হয়।"[২১৯]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মনে করতেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবাধ ও অসংযত যুক্তি প্রয়োগ তাদের কর্ম জীবনে ভাল ফল বয়ে আনে না। এতে তাদের চিন্তার ভারসাম্য, স্থিরতা ও সংঘবদ্ধতা হ্রাস পায়। একই নীতি ও একই ধারায় অবিচল থাকার স্বভাব থাকে না, তাদের মধ্যে যথেচ্ছাচারিতার প্রবণতা জাগে। চিন্তার এই অসংঘবদ্ধতা ও অতি স্বাধীনতা কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে

২১৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জাতীয় সম্বর্ধনা গ্রন্থ*, পৃ. ১০১-১০২
২১৮. সেই সোনাঝরা দিনগুলো, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
২১৯. *মাসিক আল ইসলাহ*, সেপ্টেম্বর ৯২, সিলেট, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

সন্দিহান, অধীর ও প্রশ্নসর্বস্ব করে রাখে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষিতদের এরূপ অবিরাম অনিশ্চয়তায় ভোগা উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তিনি শিক্ষকদের দায়িত্বের উপরও আলোকপাত করেছেন। তিনি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আদর্শ নৈতিকতার গুরুত্বারোপ করে বলেন, আদর্শচ্যুত শিক্ষকগণ সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে না। বর্তমানে শিক্ষকগণ গতানুগতিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ, তারা গবেষণা ও পরিশ্রম করেন না। সত্য উদ্‌ঘাটনে তারা সচেষ্ট নন। তিনি তাঁর দর্শনে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মধুর সম্পর্কন্নোয়নের উপর জোর দেন।[২২০]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মতে, শিক্ষার নৈতিক উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে সত্যিকার অর্থে মানবাত্মা প্রতিষ্ঠা করা। যে শিক্ষাই মানুষ লাভ করুক না কেন বাধা নেই; কিন্তু শিক্ষায় এমন একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল চিন্তা, ভাল প্রেরণা তথা সত্যিকার মনুষ্যত্ব বরণের জন্য একটা আসন যুক্ত থাকে।[২২১] তাঁর মতে যার মধ্যে ধর্ম বিশ্বাস বা ঈমান একবার বদ্ধমূল হয় ইউরোপীয় শিক্ষা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, সে যে কোন দেশে শিক্ষা লাভ করতে পারে। তবে তাকে অবশ্যই স্বধর্মে ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে। তিনি বলেন, পুঁথিগত বিদ্যার কোন মূল্য নেই যদি তা বাস্তবরূপে রূপায়িত না করা হয়। ইসলামের শুধু জ্ঞান লাভ করাই যথেষ্ট নয়, লব্ধ জ্ঞানের উপর বিশ্বাসও স্থাপন করতে হবে, তা কাজেও লাগাতে হবে।

তিনি আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার কঠোর সমালোচনা করলেও মূলত ঐ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। তবে তিনি ঐ শিক্ষার ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বর্জিত চরিত্রের জন্য দুঃখবোধ করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বলেছেন, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা নিয়েই আধুনিক শিক্ষার কারবার। ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত অদৃশ্য শক্তি তথা খোদা ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধান এখানে মেলে না, এখানে ধর্মকে মনে করা হয় বাতুলতা। অথচ ধর্মই মানব জীবনের সকল বিপ্লব, বিবর্তন ও কর্মপ্রেরণার উৎস। চরিত্র সংশোধন ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।[২২২] বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের উচ্চআদর্শ থেকে সরিয়ে কেবল রুজি রোজগারের সন্ধানের পথ বাতলানো হয়। তবে শিক্ষার যথোচিত উদ্দেশ্য বজায় রেখে অর্থোপার্জন করা হলে তাতে কোন দোষ নেই। তিনি ধর্মসম্মত শিক্ষার সাথে শিল্প বাণিজ্যের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এরূপ শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন, প্রচলিত শিক্ষায় কেবল যে ধর্ম, চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা ও কর্মপ্রেরণা সৃষ্টির ব্যবস্থা নেই তা নয়, এতে অর্থোপার্জন ও অর্থকরী বিদ্যারও

---

২২০. নন্দলাল শর্মা, *আল ইসলাহ পত্রিকায় মুসলিম চিন্তা-চেতনা* (সিলেট : জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০১), পৃ. ৬১

২২১. প্রাগুক্ত

২২২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যথাযথ ব্যবস্থা নেই। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। এর পাশাপাশি তিনি আত্মশক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে বশীভূত করার সূত্র ও প্রক্রিয়া জানতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে নিহিত খোদা প্রদত্ত রহস্যরাজির উন্মোচন ঘটিয়ে আমাদের উপর আরোপিত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় অর্জিত বিজ্ঞানের শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে মানবতার সেবায়।[২২৩]

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের শিক্ষা দর্শন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনে স্বনির্ভরতার ব্যাপক প্রসার ঘটতে পারে এবং একটি আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তাঁর বিচিত্র ও নানামাত্রিক জীবনে সত্যিকার শিক্ষিত বিশ্বসমাজ নির্মাণের চেতনাসমৃদ্ধ শিক্ষাদর্শন ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত অবদান রেখেছেন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পাশাপশি তিনি শিক্ষকতাকে জীবনের একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সত্যিকার শিক্ষার আলো দিয়ে জাতিকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বা শিক্ষাঙ্গনে ধর্মীয় পরিবেশ ও ধর্মীয় চরিত্র সৃষ্টির যে পরামর্শ দিয়েছেন তা খুবই প্রশংসনীয় ও যুগোপযোগী। তবে এগুলো বাস্তবায়ন যে কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন পর্যায়ে বা কোন ধরনের শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তা আজরফ পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেননি। তাই বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট ভাবতে হবে। শিক্ষার চিন্তা নায়কগণ এবং এ ব্যাপারে গঠিত বর্তমান সরকারের শিক্ষা কমিশন সময়োপযোগী ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়।

বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী (১৯১০-১৯৭৪)

জন্ম ও পরিচিতি

বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী ছিলেন এক ক্ষণজন্মা রমণী। তিনি বৃহত্তর সিলেটের মহিলা আন্দোলনে আলোকবর্তিকা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সিলেট অঞ্চলের মুসলিম মহিলাদের পথিকৃৎ হিসেবে তখনকার সময়ে প্রতিটি নারী আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। বিশেষত ১৯৪০ সালে পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে সিলেট অঞ্চলের মুসলিম সচেতন মহিলাদের নেতৃত্বে তিনি হাল ধরেন। নারী জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে তিনি সর্বমহলে সমাদৃত। বৃহত্তর সিলেটের পুরুষ নেতারা অনেক ক্ষেত্রে যতটুকু করেননি বা করতে গড়িমসি, কুণ্ঠাবোধ, অলসতা প্রদর্শন করেছেন বা করতেন

২২৩. আবদুল ওয়াহীদ (সম্পা.), *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : ব্যক্তি ও জীবন* (ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

সে ক্ষেত্রে বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী ছিলেন সর্বদা সচলা, সক্রিয় ও কর্মমুখরা। অন্যরা সমর্থন করুক বা না করুক তিনি সর্বদা ন্যায় ও সত্যের দিশারী ছিলেন। তিনি শুধু নিজ সন্তানদেরই মা ছিলেন না, কার্যাচরণে তাঁকে জাতি, বর্ণ, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে অনেকেই মা বলে ডাকতেন। তাঁর অন্তর্নিহিত কলুষহীন মাতৃসুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশই তাঁকে সার্বজনীন মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

১৯১০ সালের ২৭ নভেম্বর ইটা পরগণার রাজনগর থানার 'বালিদিঘীর পার' গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন সিরাজুন্নেসা।[২২৪] তাঁর বাবা দেওয়ান আব্দুল করিম ছিলেন বিদ্যোৎসাহী জমিদার। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের কন্যা হিসেবে কোন বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাননি সিরাজুন্নেসা চৌধুরী। সেকালে স্ত্রী শিক্ষা পর্দানশীন মুসলিম পরিবারে অনেকটা সমাজদ্রোহী কাজ ছিল। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বাল্যকাল থেকেই সিরাজুন্নোর ছিল অসীম আগ্রহ। তাই দেওয়ান সাহেব নিজ কন্যাকে স্বগৃহে শিক্ষাদানে শিক্ষিত করে তুলেন। গৃহ শিক্ষার মাধ্যমেই তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি গার্হস্থ্য বিদ্যায়ও পারদর্শী হয়ে উঠেন।[২২৫] বনেদী জমিদার দুলালীর হাতে অবসর বিনোদনের যথেষ্ট সময় থাকলেও তিনি সে সময়টা হেলায়-খেলায় নষ্ট না করে নিজেকে রুটিন মাফিক ধর্ম-কর্ম ও পড়াশুনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনে ব্যয় করতেন। এতে তিনি নিজেকে বহু জ্ঞানে ও গুণে গুণান্বিত ও জ্ঞানান্বিত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁরই পরিবারের ভ্রাতুষ্পুত্র দেওয়ান আব্দুল বাছিত চৌধুরী ইংরেজ আমলে আসাম প্রাদেশিক পরিষদের এবং পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্রীত্বও লাভ করেছিলেন।

বিবাহ

সুনামগঞ্জের পাগলা দূর্গাপাশার কৃতি সন্তান জনাব আব্দুর রশিদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আব্দুর রশিদ ছিলেন তখন প্রশাসন বিভাগের একস্ট্রা এসিসট্যান্ট কমিশনার।[২২৬] পরবর্তীতে তিনি রাজনীতিতেও অংশ নেন এবং যুগভেরী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। সিরাজুন্নেসা স্বামীগৃহে জ্ঞানচর্চার প্রচুর সুযোগ-সুবিধা পান। ফলশ্রুতিতে তাঁর সুপ্ত জ্ঞানরাজির আরো বিকাশ ঘটে। বিবাহিত জীবনে তিনি পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন। একজন আদর্শ গৃহিণী ও জননী হিসেবে তিনি সন্তানদের সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁর সন্তানগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ও স্বার্থক।

---

২২৪. চৌধুরী গোলাম আকবর, *জালালাবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য* (সিলেট : জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮), পৃ. ১৮৩

২২৫. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

২২৬. *দৈনিক যুগভেরী*, সিলেট, ৩রা আগস্ট ১৯৭৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন ও রাজনীতি

১৯৪৪ সালের ২৭ আগস্ট স্বামীর মৃত্যুর পর সিরাজুন্নেসা চৌধুরীর দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। স্বামীর জমিদারী, চা বাগান প্রভৃতি পরিচালনার দায়িত্বভার তখন তিনি নিজ কাঁধে তুলে নেন। ঐ সময় হতে তিনি রশিদ এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ও হামদর্দ কোম্পানী লিমিটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রশিদাবাদ ও সিরাজনগর ওয়াক্ফ চা বাগানদ্বয়ের মোতাওয়াল্লি মনোনীত হয়ে আমরণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান ন্যাশনাল টি এসোসিয়েশনের নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি নিজ ব্যবসা বৃদ্ধিকল্পে স্বামীর নামে 'দি রশিদ কোল্ড স্টোরেজ' প্রতিষ্ঠা করে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন।[২২৭] ১৯৫০-৫১ সালে পাকিস্তান সরকার যখন 'ফসল ঋণদান' বন্ধ করে চা শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল তখন এই মহীয়সী মহিলাই তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করে 'পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা এবং চা শিল্পের জন্য সরকারী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে চা শিল্পকে ধ্বংসস্তূপ থেকে রক্ষা করেন।[২২৮]

তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও কম ছিল ন। বিবাহের পরই সিলেট মহিলা সংঘের সাথে সংযুক্ত হয়ে শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে কর্ম সীমাবদ্ধ না রেখে রাজনীতিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য গঠিত হয় 'পাকিস্তান উইমেন্স ন্যাশনাল গার্ড' ও 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'। ন্যাশনাল গার্ডের সিলেটের সভানেত্রী হিসেবে বেগম সিরাজুন্নেসা প্রতিদিন ভোরে ৬০-৭০ জনের মহিলা দলকে রাইফেল ট্রেনিং দিতেন।[২২৯] এ ছাড়া তিনি মহিলাদেরকে টেলিফোন অপারেটর, প্রেসের কম্পোজসহ নন কমিশন অফিসার্স ট্রেনিং দিতেন। তিনি ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবীদের অন্যতম আশ্রয়। রশীদ মঞ্জিল ছিল স্বাধীনতাকামীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। তিনি ছিলেন সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত কমিশনার। তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বদাই সরব ও উজ্জ্বল। তিনি জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন, আলোচনায় অংশগ্রহণ, সংশোধন ইত্যাদিতে ছিলেন সতত সোচ্চার। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[২৩০] ১৯৭১ সালের মুক্তি-সংগ্রামেও তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নির্দেশে তাঁর জৈষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী পাক রাষ্ট্রদূত সংস্থা পরিত্যাগ করেন। যুদ্ধচলাকালীন

---

২২৭. *সিলেটের একশত একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

২২৮. *জালালাবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

২২৯. *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৩১

২৩০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজনগর চা বাগানে বহু নিপীড়িত লোককে তিনি আশ্রয় দিয়ে পাক সেনাদের মৃত্যু ছোবল থেকে রক্ষা করেছেন। পাঁচগাও শ্রীমঙ্গলের গণহত্যাসহ পাকিস্তানীদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সর্বদা সোচ্চার।

শিক্ষা বিস্তার ও মানবসেবা

বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী স্বীয় পারিবারিক উন্নতি চিন্তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে নারী কল্যাণে ও মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। বৃহত্তর সিলেটের শিক্ষার উন্নয়ন-উন্নতিতে তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের অবদান অনস্বীকার্য। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে সিলেটের একমাত্র মহিলা কলেজটির এফিলিয়েশন বাতিল হয়ে যায় এবং সরকারী সমর্থন প্রত্যাহার করা হয়। তখন বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী কলেজটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী যোগাড় করেন এবং নিজস্ব উদ্যোগে অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে কলেজের কার্যক্রম অব্যহত রাখেন এবং পাশাপাশি কলেজটি সরকারীকরণের জন্য সর্ব সাধারণকে নিয়ে জোর আন্দোলন চালিয়ে যান।[২৩১] স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়ে তিনি কাজী জালাল উদ্দীন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২৩২] শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তীতুল্য। তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দূর্গাপাশা আব্দুর রশীদ হাইস্কুলের সেক্রেটারী হিসেবে তিনি স্কুলটিকে জেলার একটি শ্রেষ্ঠ স্কুলে রূপান্তরের প্রয়াস পান। এ ছাড়া তিনি সিলেট মহিলা কলেজ, মদনমোহন কলেজ, ব্লুবার্ড হাইস্কুল, কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন।[২৩৩] আর্থিক সাহায্য ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে তাঁর জীবনের অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকারী 'রশীদ ফাউন্ডেশন' নামক প্রতিষ্ঠান তাঁরই সুচিন্তার বাস্তব রূপায়ণ।[২৩৪] নিজ এলাকার এবং সিলেটের বহু মেধাবী শিক্ষার্থী এ সংস্থার সাহয্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে তাদের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ ফাউন্ডেশন শিক্ষার বিস্তারে এক অমূল্য সংযোজন। সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলনেও বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরীর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে তাঁর একটি মূল্যবান বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য যা থেকে তাঁর শিক্ষা-ভাবনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন :

---

২৩১. প্রাগুক্ত।

২৩২. *জালালাবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

২৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

২৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

"শিশুদের জীবনের উন্নতি বিধান আমার কাম্য। এক্ষণে আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে। আমি আরও চাই মেয়েরা যাতে তাঁদের স্বভাবে অনুকূল শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করে পূর্ণজ্ঞানী হতে পারে। আমি চাই মেয়েদের জীবনে আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তোলা। তারা যাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে সেই রূপ পরিবেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। আমাদের সমাজে যাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কেউই যেন পরমুখাপেক্ষী না হয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই যেন কোন না কোনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে পরিবেশ সৃষ্টি করাই আমার কর্তব্য বলে মনে করি।"[২৩৫]

বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী বরাবরই সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজ উন্নয়নকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করা ছিল তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পূর্ব পাকিস্তান যক্ষ্মা সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির সাথে সক্রিয়ভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদ গঠন ও তৎপরবর্তী প্রতিটি কার্যক্রমে তিনি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৩১ সালে সিলেটের মুখপাত্র 'যুগভেরী' পত্রিকা ও মিনার প্রিটিং এন্ড পাবলিকেশন প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষত ১৯৬০ সালে যুগভেরীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসার পিছনে তিনি একক কৃতিত্বের দাবীদার।[২৩৬] তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভনিতাশূন্য এক মহীয়সী নারী। স্তাবকতা ও পরশ্রীকাতরতাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন তাঁর অধীনস্থ সকল কর্মচারীদের আশ্রয়স্থল। তাঁর ব্যবহারে কেউ কোনদিন কষ্ট পেয়েছে বলে শোনা যায়নি।

মৃত্যু

বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী ১৯৭৪ সালের ২৪ জুন সিলেট শহরস্থ নিজ বাসভবন রশিদ মঞ্জিলে উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৬৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।[২৩৭] তাঁকে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার সংলগ্ন গোরস্থানে দাফন করা হয়।

বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী ছিলেন বিচক্ষণ, কর্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমতি। তাঁর জীবন ছিল কর্মমুখর ও পরিপূর্ণ। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। সন্তান লালন-পালন, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা, শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা সর্বোপরি জনহিতকর কর্মকাণ্ডে তাঁর অসামন্য অবদানের জন্য তিনি আজো চিরস্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন।

---

২৩৫. মতিয়ার রহমান, নারী জাগরণ ও সিরাজুন্নেসা, *সুনামগঞ্জ দর্পণ*, ২৫ জুন ১৯৭৮।

২৩৬. প্রাগুক্ত।

২৩৭. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী (১৯১১-১৯৯৪)

সুনামগঞ্জের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে যাদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় তাদের মধ্যে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী অন্যতম। এই ত্যাগী পুরুষটির জীবন ও কর্ম বৈচিত্র্যের বর্ণালীতে ভরপুর। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাসৈনিক। শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে তিনি আজীবন ব্রতী ছিলেন। শিক্ষাসেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে তিনি অমর হয়ে আছেন এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আমাদের জাতি সত্তার বিকাশ ও বিনির্মাণে তাঁর ত্যাগ ও কর্ম চিরস্মরণীয়।

জন্ম ও পরিচিতি

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার অন্তর্গত ছৈলা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[২৩৮] তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ মোবারক চৌধুরী ও মাতার নাম মোছাম্মৎ খাতেমুন্নেছা চৌধুরী। তাঁর বড় ভাই মরহুম মোহাম্মদ মফিজ চৌধুরী একজন বিশিষ্ট আইনজীবি ও রাজনীতিবিদ ছিলেন।[২৩৯]

শিক্ষাজীবন

সাত বছর বয়সে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী সিলেট শহরের দুর্গাকুমার পাঠশালায় ভর্তি হন। উক্ত পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে তিনি সিলেট সরকারী হাইস্কুলে ভর্তি হন। এবং উক্ত স্কুল থেকে ১৯২৭ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এম.সি কলেজে ভর্তি হন। এম.সি কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ এবং ১৯৩১ সালে ১ম শ্রেণিতে ইতিহাস বিষয়ে বি.এ অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।[২৪০]

কর্মজীবন ও শিক্ষা সম্প্রাসরণ

শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই ছিল মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী জীবনের ব্রত। শিক্ষার সেবাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং একজন শিক্ষক সভ্যতার ধারক ও বাহক।"[২৪১] এ মন্ত্রকে ধারণ করে তাঁর মেধা ও মনকে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে লাগাতে ১৯৩২ সালে তিনি সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।[২৪২]

---

২৩৮. ড. মোহাম্মদ মুমিনুল হক, *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : গতিধারা, ডিসেম্বর ২০০৬), পৃ. ৪৯৪

২৩৯. নাছির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, সিলেট, *মাসিক আল-ইসলাহ*, ৬৩তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৩১

২৪০. প্রাগুক্ত

২৪১. মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, *ঐতিহ্যের বিবেকীয় কণ্ঠ* (সিলেট : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ১১২

২৪২. *সিলেটের আকাশে দশটি উজ্জ্বল তারকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার হাইস্কুলে এবং কিছুদিন সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এর মধ্যেই তিনি বি.টি ডিগ্রীও অর্জন করেন।[২৪৩] শিক্ষক হিসেবে তিনি একজন দক্ষ ও আদর্শ শিক্ষকের সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হন। তারপর ১৯৩৫ সালে শিক্ষা বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।[২৪৪] শিক্ষা প্রশাসনে যুক্ত হয়েই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা দূরীকরণে এবং বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের মান উন্নয়নের ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালে সাব ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদে পদোন্নতি লাভ করে জকিগঞ্জে পোস্টিং পান। এস.ডি.আই স্কুল পদে বিভিন্ন মহকুমায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনা করেন।[২৪৫] ১৯৬০ সালে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ডি.আই অব স্কুল পদে তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, সিলেটে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি জন্মস্থান তৎকালীন সুনামগঞ্জ মহকুমার স্কুলগুলোর সার্বিক মান উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা চালান।[২৪৬] ১৯৬৯ সালে তিনি বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করে রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালন করে অবশেষে ১৯৭০ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।[২৪৭] ১৯৫৭ সালে শিক্ষাবিদ হিসেবে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ইউনেস্কো ফেলোশীপ লাভ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভারত, বার্মা ভ্রমণ করেন। একজন শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে দেখা সে সময়ের ঐসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা ও তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ তিনি তাঁর 'নানা দেশ নানা মানুষ' গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন।[২৪৮] এ ছাড়া ১৯৫৯ সালে টেক্সটবুক বোর্ডের ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও একজন সফল শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে তাঁর ব্যাপক অবদানের জন্য তিনি আমাদের কাছে আজও চিরনন্দিত ও চিরস্মরণীয়।

---

২৪৩. প্রাগুক্ত

২৪৪. *ঐতিহ্যের বিবেকীয় কণ্ঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

২৪৫. *শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২৪৬. প্রাগুক্ত

২৪৭. নন্দলাল শর্মা, *সুনামগঞ্জের সাহিত্যঙ্গন* (সিলেট : জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, ডিসেম্বর ১৯৯৫), পৃ. ৫১

২৪৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী মুসলিম চৌধুরী

মুসলিম চৌধুরীই রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সর্বপ্রথম কলম ধরেন এবং প্রবন্ধ রচনা করেন। দেশ বিভাগের মাত্র দু'মাসের মাথায় ১৯৪৭ সালের ৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাহিত্য সভায় "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেন।[২৪৯] বুদ্ধিজীবীমহলে এটি ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষার দাবীতে ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। তখন তমদ্দুন মজলিশ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শিরোনামে একটি পুস্তিকা বের করে।[২৫০] এই হিসেবে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীই ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সর্বপ্রথম প্রবন্ধ রচিয়তা ও পাঠক মুসলিম চৌধুরী তখন রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা। সরকারী চাকুরীর তোয়াক্কা না করে বাংলা ভাষার পক্ষে সেদিন তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকা একান্ত অপরিহার্য।

মুসলিম চৌধুরী দীর্ঘ দশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে সে দিন অনেক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রবন্ধটির উপসংহারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি লিখেছিলেন : "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হইবে বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানে কোন ভাষা গৃহীত হইবে এই নিয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা আমাদের নাই। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হইতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদি যথেষ্ট পরিমাণে অনূদিত ও রচিত না হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি এই দুই ভাষায়ই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রের কাজ চলিবে। প্রতিভাশালী লেখক ও আরবী, ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ বাংলার আলিমগণকে কালবিলম্ব না করিয়া প্রয়োজনীয় বাংলা গ্রন্থ রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।"[২৫১]

১৯৪৭ সালের ৩০ নাভেম্বর মুসলিম সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে স্থানীয় সরকারী মাদরাসা হলে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু হওয়া উচিত' শিরোনামে আরেকটি সভা সাহিত্যিক মতিনউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। দেড় হাজারের মত লেখক সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে মুসলিম চৌধুরী সেদিন বাংলার পক্ষে আরো জোরালো বক্তব্য রাখেন। ২৮ ডিসেম্বর সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে

---

২৪৯. শামসুল করিম কয়েস, *বাংলা সাহিত্যে সিলেট*, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৭

২৫০. সাঈদ চৌধুরী, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক, ekhonsylhet.com

২৫১. মুসলিম চৌধুরী, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সিলেট, *মাসিক আল-ইসলাহ*, ১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৫ বাংলা, নভে, ১৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষা নিয়ে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২৫২] মুসলিম চৌধুরী উক্ত সভায়ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। এ ধারাবাহিকতায় ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে মুসলিম চৌধুরী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সর্বদাই অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করেন।

সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষা বিস্তার

একজন দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্য চর্চা ও লেখক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা বিস্তার। বিভিন্ন শিক্ষণীয় উপাদান এবং অন্যদের শিক্ষা উপযোগী বিষয়বস্তু চয়ন করে তিনি তাঁর সাহিত্যকর্ম পরিচালনা করেন। ত্রৈমাসিক সাহিত্য সেবক কাফেলা (শিলচর থেকে প্রকাশিত) মাসিক মোহাম্মদী (কলকাতা থেকে প্রকাশিত) মুসলিম সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক আল-ইসলাহ এবং দৈনিক আজাদ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[২৫৩] সিলেট ও সুনামগঞ্জে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভা, আলোচনা সভা ও জাতীয় অনুষ্ঠানসহ যে কোন অনুষ্ঠান মুসলিম চৌধুরীর উপস্থিতি ছাড়া অনেকটা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

১৯৬৫ সালের মে মাসে সিলেটে অনুষ্ঠিত লোকসাহিত্য বিষয়ক এক সেমিনারে তিনি 'লোকসাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা' শীর্ষক এক মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধে লেখক লোক-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও সংগ্রহের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং আধুনিক সাহিত্যে লোক সংস্কৃতি প্রতিফলিত হলে আমরা নির্লজ্জ পরনির্ভরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করব বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।[২৫৪]

১৯৫৭ সালে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণ থেকে আহরিত শিক্ষাকে উপজীব্য করে তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ 'নানা দেশ নানা মানুষ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে।[২৫৫] ঢাকার মদিনা পাবলিকেশন্স গ্রন্থটি প্রকাশ করে। লেখক উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের রসগ্রাহী বর্ণনার পাশাপাশি ইতিহাসের ছাত্রের দৃষ্টিতে দেখা দিল্লী-আগ্রা, একজন শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে দেখা বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিংবা নেহাৎ একজন পর্যটকের দৃষ্টিতে দেখা প্যারিস সাধারণ পাঠকদের কাছে শিক্ষণীয় করে কৌতুহলোদ্দীপকভাবে স্বার্থক উপস্থাপনে সমর্থ হয়েছেন। লন্ডনে প্রথম প্রজন্ম সিলেটীদের সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ সামাজিক গবেষকদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

---

২৫২. সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত

২৫৩. *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২৫৪. নন্দলাল শর্মা, *ফোকলোর চর্চায় সিলেট* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৫৮

২৫৫. নাছির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, *শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর লেখা অপর গ্রন্থ 'প্রসঙ্গ বিচিত্রা' মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়।[২৫৬] এ গ্রন্থটি লেখকের নয়টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে মরমী কবি হাছন রাজা, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজির স্থান, বয়স্কদের শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভূমিকা, লোকসাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা, নজরুল প্রসঙ্গ, রবীন্দনাথ কাব্যে ব্যক্তিগত প্রেয়সী, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ব সংস্কৃতি ও ক্রীতদাসের হাসি।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর লেখা 'ইতিহাস শিক্ষা প্রণালী' একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বি.এড পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত এ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল ১৯৭০ সাল।[২৫৭] উচ্চতর শ্রেণিগুলোতে পাঠোপযোগী শিক্ষা 'মনোবিজ্ঞান' নামক তাঁর লেখা একখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে। বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় স্কুলের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য উপযোগী বেশ কটি বই তিনি রচনা করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু এ সকল বইয়ের বিস্তারিত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায়নি। শিশু-কিশোরদের পাঠোপযোগী ইতিহাস ও জীবনীভিত্তিক দু'টি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেন মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী। প্রথমটি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পুণ্য জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ 'উজ্জ্বল এক পায়রা'। অপর গ্রন্থটি সিলেটের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দানবীর আব্দুল করিম এর জীবনীভিত্তিক লেখা 'আরেক মহসীন'। ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তাঁর দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।[২৫৮]

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ লেখা ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় লেখা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে শিক্ষার আলো প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক মীর্জা নাথানের ফার্সী ভাষায় লেখা 'বাহার ই স্থানে গায়েবী' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও আল্লামা আবুল হাশিমের ইংরেজি ভাষায় লেখা 'The Creed of Islam' গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। 'ইসলামের মর্মকথা' শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থটি ১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।[২৫৯] সমাজ ও সংস্কৃতি চেতনাই মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীকে সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে। সাহিত্য, দর্শন, সমাজ- সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর নিরন্তর প্রয়াস বাংলা ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছে তেমনি শিক্ষা জগতকে করেছে আলোয় উদ্ভাসিত।

---

২৫৬. নন্দলাল শর্মা, *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২৫৭. প্রাগুক্ত

২৫৮. প্রাগুক্ত

২৫৯. *সিলেটের আকাশে দশটি উজ্জ্বল তারকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক কৃতিত্ব ও গুণাবলি

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে তিনি সর্বদা ছিলেন আপোষহীন। স্বজনপ্রীতি ও তোষামোদ তিনি পছন্দ করতেন না। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও অটুট মনোবল ছিল তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। তিনি ছিলেন সর্বদা আত্মপ্রচার বিমুখ এক মহান ব্যক্তিত্ব। সুন্দর ও সত্যের প্রতি তিনি ছিলেন সর্বদা নিষ্ঠাবান। তিনি সর্বদা জাগ্রত থেকে এ লক্ষ্যে প্রচুর কর্মতৎপরতা চালিয়েছেন। ১৯৬৩ সালে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় সিলেট সায়দা হলে খান বাহাদুর একলিমুর রাজা চৌধুরী কাব্য বিশারদের ৭৪তম বার্ষিকী অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে সিলেটে অনুষ্ঠিত লোক-সাহিত্য সম্মেলনে মুসলিম চৌধুরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে উভয় বাংলার সর্ববৃহৎ ও স্বার্থক নজরুল সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম চৌধুরী এ সম্মেলনে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[২৬০] ১৯৭০ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বৎসর মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন।[২৬১] তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকাস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশন এই মহান ব্যক্তিকে মরণোত্তর সম্মাননাও প্রদান করে।

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ছিলেন মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ঘোরবিরোধী। তিনি যেমন ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্মের প্রতি ছিলেন সমান শ্রদ্ধাশীল। ১৯৫০ সালে সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি জীবন বাজি রেখে দাঙ্গা প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অনেক নিরীহ মানুষকে প্রাণে রক্ষা করেন। দাঙ্গা প্রশমনে ব্যর্থ সিলেটের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার নোমানীকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলীর ব্যবস্থা করে সিলেটে দাঙ্গা প্রশমনে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন।[২৬২] তাঁর নিজ জন্মস্থান ছাতকে সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তিনি তাৎক্ষণিক ছাতকে ছুটে যান এবং বেশ কিছুদিন এলাকায় অবস্থান করে এলাকার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলেন। রক্ষা পায় এলাকার অসহায় নিরীহ মানুষের জীবন ও সম্পদ।[২৬৩] তাঁর এ সময়োপযোগী পদক্ষেপের জন্য এলাকার লোকজন আজও তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাঁর দেয়া এ শিক্ষা আজকের বাস্তবতায় আমাদের জন্য অনুকরণীয়ও বটে।

---

২৬০. প্রাগুক্ত

২৬১. কবির হোসাইন সিদ্দীকী, ভাষা সৈনিক মুসলিম চৌধুরী, www.dainikbayanno.com

২৬২. নাছির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, *শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২৬৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু ও দাফন

১৯৯৪ সালের ২৩ জুন ঢাকার একটি ক্লিনিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ইন্তেকাল করেন।[২৬৪] মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। তাঁর মরদেহ সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ইহজগতে নেই সত্যি; কিন্তু বৃহত্তর সিলেটের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে তাঁর অম্লান স্মৃতি ভাস্বর হয়ে থাকবে অনন্তকাল।

বঙ্গবীর জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী (১৯১৮-১৯৮৪)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মোঃ আতাউল গনি ওসমানী ১৯১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বৃহত্তর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমা সদরে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬৫] এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত শাহ জালাল (রহ)-এর সঙ্গে যে ৩৬০ জন আউলিয়া আগমন করেন তাঁদের একজন ছিলেন শাহ নিজামউদ্দীন ওসমানী। তিনি ছিলেন বঙ্গবীর ওসমানীর পূর্বপুরুষ। তাঁর নাম অনুসরণপূর্বকই বঙ্গবীর আতাউল গনির নামের সাথে ওসমানী শব্দটি সংযুক্ত হয়।[২৬৬] ওসমানীর পিতামহ মরহুম মৌলভী আব্দুস সোবহান ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস, ধর্মপ্রাণ জনদরদী ব্যক্তি। তার মাতামহ মরহুম মুহাম্মদ আকিল চৌধুরী ছিলেন একজন শিক্ষিত জমিদার ও জনদরদী ব্যক্তি। ওসমানীর পিতা মরহুম খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন উচ্চ শিক্ষিত। তিনি ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। সে আমলে তিনি চাকরিতে নিয়োগের সবচেয়ে বড় ও সম্মানীয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আই.সি.এস) পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্টেট এর চাকুরী নিয়ে আসামের জেলা প্রশাসক হয়েছিলেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের সময় তিনি ছিলেন আসামের ল্যান্ড রেকর্ডস-এর ডাইরেক্টর। এক সময় তিনি সিলেট জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন।[২৬৭] ১৯৫৬ সালে ওসমানীর পিতা পবিত্র হজ্জব্রত পালনাবস্থায় ইন্তিকাল করলে তাঁকে পবিত্র মক্কা শরীফের জাবালে রাহমাত নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। ওসমানীর মাতার নাম বেগম জোবেদা খাতুন। গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে নিজের বাড়ীতে বসেই তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। বাংলাার পাশাপাশি তিনি মুসলিম সমাজের মধ্যে অনুসরণযোগ্য

২৬৪. *সিলেটের আকাশে দশটি উজ্জ্বল তারকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২৬৫. মুস্তাফা মজিদ, বঙ্গবীর ওসমানী (ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৩ইং), পৃ. ৮

২৬৬. প্রাগুক্ত।

২৬৭. মোঃ জিয়ারত হোসেন খান, *বঙ্গবীর ওসমানী জীবন ও কর্ম*, বৈশাখী নিউজ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১৭, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা ছিলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষা ও চেতনায় শিক্ষিত না করলে চলবে না। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সজাগ ও সচেতন। মোট কথা ওসমানী ছিলেন উন্নত রক্তধারার অধিকারী জনদরদী, সমাজ হিতৈষী এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সন্তান। জেনারেল ওসমানীর একমাত্র বড় ভাই মুহাম্মদ নূরুল গনি ওসমানী ১৯২৩ সালে মেট্রিক, ১৯৩০ সালে সিলেট এম. সি. কলেজ থেকে বি.এস.সি এবং পরে আসামের গোহাটি কলেজ থেকে আইন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে সরকারের অধীনে ই.এ.সি ও অনেক বড় বড় প্রশাসনিকে পদে নিযুক্ত ছিলেন।[২৬৮]

তাঁর একমাত্র বড়বোন সদরুন্নেছা খাতুন মাত্র আঠার বছর বয়সে মারা যান। বড়বোনের অকাল মৃত্যু জেনারেল ওসমানীর মধ্যে এক বিশাল শূন্যতা ও ভাবের সঞ্চার করে।

শৈশব ও শিক্ষা জীবন

শৈশবে ওসমানীকে তাঁর মা আদর করে 'আতা' বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি সকলের কাছে আতা নামেই পরিচিতি পান। পিতার চাকুরীর সুবাদে সুনামগঞ্জ, সিলেট এবং আসামের বন-বনানী ও বন্য পশু-পাখির লীলাভূমি সবুজ শ্যামল পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক পরিবেশে ওসমানীর দুরন্ত শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। মায়ের কঠোর তত্ত্বাবধান এবং শৃংখলাবোধে আবর্তিত হয় তার শৈশবের দিনগুলো, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, পড়াশুনা, খেলাধুলা সবকিছুর সময় ও রুটিন করে দিতেন মা। কখনো বা রুটিনের ব্যত্যয় ঘটলে এতটুকু বয়সেই তাঁকে শাস্তি পেতে হত। ফলে ছোটবেলা থেকেই ওসমানী কঠোর অনুশীলন, আদব-কায়দা ও শৃংখলাবোধের শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। শৈশবে ওসমানীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় পরিবার থেকেই। কোন স্কুলে ভর্তি না হয়ে ঘরে বসেই তাঁর বিদূষী মায়ের অনুশাসন ও যোগ্য গৃহ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ও ফার্সি ভাষায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৯ সালে ১১ বছর বয়সে ওসমানীকে আসামের গৌহাটির কটনস স্কুলে ভর্তি করা হয়। এরপর মায়ের ইচ্ছায় তাকে ১৯৩২ সালে সিলেট সরকারী পাইলট স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। এই স্কুল থেকে ১৯৩৪ সালে তিনি প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন এবং ইংরেজিতে কৃতিত্বের জন্য 'প্রিটোরিয়া অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন।[২৬৯] ১৯৩৪ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেকালে আলীগড়ে অধ্যয়নের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মুসলিম ভারতের জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ ঘটতো আলীগড়ে। ১৯৩৮ সালে আলীগড় থেকে

---

২৬৮. *বঙ্গবীর ওসমানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

২৬৯. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বি.এ পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ভূগোল বিষয়ে এম.এ ক্লাশে ভর্তি হন। কিন্তু এম.এ ফাইনাল পরিক্ষার পূর্বেই সৈনিক জীবন তাকে হাতছানি দেয়।[২৭০]

ছাত্র হিসেবে সব সময়ই ওসমানী অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের স্ফূরণ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সমসাময়িক ছাত্র ও সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দের মনোযোগ, ভালোবাসা ও প্রীতিলাভে তিনি ধন্য হন। অল্প কদিনেই তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউওটিসির (ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর) সার্জেন্ট স্যার সৈয়দ আহমদ হলের অন্যতম উপদেষ্টা এবং পরপর দু বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পক্ষ থেকে শান্তি-শৃংখলার প্রধান 'প্রোক্টোরিয়াল মনিটর' নিযুক্ত হন।[২৭১] বলা যায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে নেতৃত্বদানের যে সকল পদ ছিল তার প্রায় সব কটি পদেই তিনি হয় নির্বাচিত হন, নয়তো মনোনয়ন লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম বঙ্গ ছাত্র সংসদের সভাপতি বা ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্মৌয়ে অনুষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেছিলেন তৎকালীন ভারতের দুই মহান নেতা জওহরলাল নেহেরু ও মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ। যাদের একজন ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও অন্যজন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল। সম্মেলনে আতাউল গনি ওসমানী আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়ে সম্মেলন নিয়ন্ত্রন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হন এবং সম্মেলন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ডক্টর হালিম সিতারা-ই ইমতিয়াজ সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[২৭২] নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত থেকে ছাত্রনেতৃত্ব প্রদানের ফলে ওসামানীর বিশ্ববিদ্যালয় জীবন হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল ও বর্ণিল।

ওসমানীর বর্ণাঢ্য কর্ম জীবন

আলীগড় মুসলিম বিশ্বদ্যিলয়ে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হবার পরে এই ফাঁকে তিনি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এম.এ শেষ পর্ব পড়ার সময় উক্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় তিনি তাতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ না দিয়ে ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে

---

২৭০. প্রাগুক্ত।

২৭১. *বঙ্গবীর ওসমানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

যোগদান করেন।[২৭৩] আসলে সেনাজীবনের প্রতি ওসমানীর আগ্রহ ছিল শৈশব থেকেই। মা'র কঠোর অনুশাসনে ওসমানী যেমন একটি সুশৃংখল জীবনাদর্শে গড়ে উঠেছিলেন তেমনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ইউওটিসি'র সার্জেন্ট থাকাকালে তাঁর উপর প্রভাব পড়েছিল ক্যাপ্টেন এফ.আর উইলিয়াম নামক একজন সেনা অফিসারের। সামরিক জীবনের সুশৃংখল নিয়মানুবর্তিতা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উইলিয়াম দম্পত্তির অশেষ উৎসাহ বঙ্গবীর ওসমানীকে সামরিক বাহিনীর দিকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনি ১৯৪০ সালের ৫ অক্টোবর দেরাদুন সামরিক একাডেমি হতে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে আর্মির কিং কমিশন প্রাপ্ত হন।[২৭৪] সে আমলে সারা ভারতে ৩০০ জন অফিসার নিয়োগের মধ্যে মাত্র ৩০ জন নেয়া হত ভারতবর্ষ হতে, বাকি অফিসারদের আনা হত সুদূর ইংল্যান্ড থেকে। সেই সুদূর আফগানিস্তান থেকে ব্রম্মদেশ (বর্তমান মায়ানমার) পর্যন্ত ছিল তখনকার ব্রিটিশ ভারত। এই বিশাল দেশের মধ্যে মাত্র ৩০ জনের কোটায় ওসমানী নির্বাচিত হন ও কমিশন লাভ করেন। শুধু তাই নয়, দেরাদুনে ভারতীয় মিলিটারী একাডেমিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদেশীদের সাথে সমানতালে পাল্লা দিয়ে একজন বাঙালির সন্তান হিসেবে তিনি সব সময়ই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছাত্র জীবনের মতো এখানেও তিনি তাঁর মেধা ও মননের পরিচয় রাখতে সক্ষম হন। তরুণ ওসমানী সামরিক বাহিনীতে দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন এবং ঠিক তার এক বৎসরের মাথায় ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর হন।[২৭৫] সামরিক প্রশাসনে পদোন্নতির এমন ঘটনা বিরল। মাত্র ২৩ বছর বয়সে একটি ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক হয়ে তিনি নজীরবিহীন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। সামরিক ইতিহাসে এত কম বয়সে একটি ব্যাটেলিয়ন পরিচালনা করার কোন দৃষ্টান্ত নেই। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান বঙ্গবীর ওসমানী। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীর একজন কমান্ডার হিসেবে ওসমানী একটি আলাদা ইউনিটের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ওই বাহিনীর মাধ্যমে তিনি যুদ্ধের বেশিরভাগ সময়েই বিভিন্ন যোদ্ধা সামরিক ফরমেশনের সাথে একটি স্বতন্ত্র যান্ত্রিক পরিবহন বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। তিনি বার্মা (বর্তমান মায়ানমানর) রণাঙ্গনে তাঁর বাহিনীকে ১৫ কোরের অধীনে সমাবেশও পরিচালনা করেন।[২৭৬] ১৯৪৫ সালে ওসমানী তাঁর পিতার ইচ্ছা পূরণে পুনরায় আই সি এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন এবং ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল

২৭৩. *সিলেট গাইড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
২৭৪. *বঙ্গবীর ওসমানী জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
২৭৫. প্রাগুক্ত
২৭৬. *বঙ্গবীর ওসমানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

সার্ভিসে সিলেকশন পান। কিন্তু ঐ সার্ভিসে যোগ না দিয়ে তিনি আর্মিতেই থেকে যান।[২৭৭] ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৪৭ সালে বৃটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করলে একই সালে ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বতন্ত্র দেশ বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয়। ১৯৪৭ সালের ৭ অক্টোবর ওসমানী লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৪৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে পি.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেন। ওসমানীকে ১৯৫৫ সালের ১২ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনা সদরের অপারেশন পরিদপ্তরে জেনারেল স্টাফ অফিসার নিয়োগ করা হয়। এখানে তাঁকে ১৯৫৬ সালের ১৬ মে কর্নেল পদে পদোন্নতি প্রদান করে ডেপুটি ডাইরেক্টর এর দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। এ সময় আন্তর্জাতিক সংস্থা 'সিয়াটো' ও 'সেন্টোতে' ওসমানী পাকিস্তান বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধে ওসমানী দক্ষতার সাথে ডেপুটি ডাইরেক্টর অব মিলিটারী অপারেশনের দায়িত্ব পালন করেন।[২৭৮] পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্নেল পদে কর্মরত থাকাকালীন ওসমানী একজন স্বাধীনচেতা বাঙালি সেনা কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনক

বঙ্গবীর ওসমানীর প্রস্তাবে এবং জেনারেল অকিনলেকের অনুরোধে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয় পূর্ববাংলায় পি.এন.জি গঠন স্থগিত করে 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট' প্রতিষ্ঠা করতে। ওসমানী নিজে প্রস্তাব করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং নিজেই উদ্যোগী হয়ে ১৯৫১ সালে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হয়ে পূর্ব বাংলায় এসে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল রেজিমেন্টর অধিনায়ক ও রেজিমেন্টাল সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি ছিল ওসমানীর গড়া বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এছাড়াও তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ঢাকা, খুলনা, যশোহর এবং চট্টগ্রামের স্টেশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অতিরিক্ত কমান্ড্যান্ট নিযুক্ত হয়ে ই.পি.আর বাহিনীতে বাঙালিদের কোঠা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ করেন এবং সর্বপ্রথম পার্বত্য উপজাতিদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি বাঙালি সেনাদের স্বার্থ রক্ষায় কখনো নিজের পদোন্নতির তোয়াক্কা করেননি। তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে দুই থেকে ছয় ব্যাটালিয়ানে উন্নীত, সেনাবাহিনীতে বাঙালি নিয়োগে শতকরা দুইভাগ থেকে দশভাগ বৃদ্ধি করে

২৭৭. ফজলুর রহমান, সিলেটের একশত একজন (সিলেট : এপ্রিল ১৯৯৪), পৃ. ৩৪৭
২৭৮. আব্দুল আহাদ খান, আমাদের ওসমানী আমাদের গর্ব, দৈনিক জালালাবাদ, সিলেট, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বাঙালি সেনারা ওসমানীকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন এবং তাকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনক হিসেবে গভীর সম্মান প্রদর্শন করতেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বঙ্গবীর ওসমানীর বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ করে। ওসমানী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজী নজরুল ইসলামের চল্ চল্ চল্ গানটিকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মার্চ সঙ্গীত মনোনীত করেন এবং সরকারীভাবে অনুমোদন করান। এছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ' গান দুইটির সুর পাকিস্তান সামরিক বাদ্যযন্ত্রে বাজানোর প্রচলন করেন।[২৭৯] পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সুদীর্ঘ ২০ বছর চাকুরী করে অবশেষে ১৯৬৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি পাকিস্তান আর্মি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পাক আর্মিতে তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তিতুল্য। বিশেষ করে তিনি টাইগার ওসমানী 'পাপা টাইগার', 'বঙ্গ শার্দুল' ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। যুদ্ধ পরিকল্পনায় ওসমানীর অভূতপূর্ব জ্ঞান, মেধা ও দক্ষতার জন্য তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন।

রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ

পাকিস্তান আর্মি থেকে ওসমানী অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬৭ সালে। আর্মির মটো ছিল 'ঈমান, ঐক্য ও শৃংখলা' সেখানে গণতন্ত্রের ঠাই ছিল না। ওসমানী মনে হয় আর্মির চাকরি জীবনেও গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন। তাই অবসর গ্রহণ করেও তিনি গণতন্ত্রকে ভুলতে পারলেন না। তিনি চাইলেন দেশে গণতন্ত্রের পূর্ণ চর্চা। এখানেই তিনি ব্যতিক্রমধর্মী। সেকালে তাঁর সহকর্মীগণ অবসর গ্রহণের পর হয়েছেন রাষ্ট্রদূত নয়ত কোন সংস্থার চেয়ারম্যান। তাদের ছিল আরাম-আয়েশের জীবন, সঙ্গে সঙ্গে লাভ করেছেন বিত্তের পাহাড়। কিন্তু স্বাধীনচেতা ওসমানী তার বিপরীতে ১৯৭০ সালে যোগ দিলেন আওয়ামীলীগে। গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য ছয়দফা বাস্তবায়নের জন্য। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসেবে সিলেট থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[২৮০] পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে নানা টালবাহানা শুরু করে। সারা বাংলায় শুরু হয় গোলযোগ, সংগ্রাম ও অসহযোগ আন্দোলন। পাকিস্তান সরকার তা স্তব্ধ করার শপথ নেয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের দমন করতে তারা পূর্ব বাংলায় চালাতে থাকে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ, শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর এ বর্বরোচিত

---

২৭৯. প্রাগুক্ত

২৮০. *সিলেটের একশত একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণের জবাবে কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত সকল অফিসার, ইপিআর বাহিনীর জোয়ানরা এবং পুলিশ বাহিনী সদস্যরা ২৫ মার্চের কালো রাত থেকেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে লাখো মানুষের শাহাদতের বিনিময়ে ওসমানী জাতিকে উপহার দিয়েছেন হাজার বছরের প্রত্যাশিত নতুন ভূখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটেও এ ক্ষণজন্মা মহামানব ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক

কর্নেল ওসমানীর ডাকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটগুলোর কমান্ডারগণ ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ ঐতিহাসিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবীর ওসমানী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লে. কর্নেল এম. এ রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, কর্নেল সালেহ উদ্দিন, মোহাম্মদ রেজা, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর মবিন চৌধুরী, ভারতীয় বি.এস.এফ প্রধান মি. রুস্তমজি ও ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে। এ ঐতিহাসিক বৈঠকেই সর্বসম্মতিক্রমে কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক মনোনীত করা হয়।[২৮১] ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিব নগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর ১২ এপ্রিল এক ঘোষণায় কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনী গঠন করা ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে একজন কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার পর তাঁকে কর্নেল পদ থেকে জেনারেল পদে উন্নীত করা হয় এবং ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[২৮২] জেনারেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করেন। গোটা মুক্তিবাহিনীকে তিনি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করেন। তার অসীম দক্ষতা, কৌশল ও সুনিপুণ দিক নিদের্শনা ও নেতৃত্ব অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। জাতির এ কাঙ্ক্ষিত বিজয়কে ত্বরান্বিত করায় বাংলাদেশ সরকার জেনারেল ওসমানকে বঙ্গবীর উপাধিতে ভূষিত করে।[২৮৩] সত্যিকার অর্থে জেনারেল ওসমানীই ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম প্রাণ পুরুষ।

---

২৮১. *বঙ্গবীর ওসমানী জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২৮২. ক্যাপ্টেন এম এ নূর, *জাতীয় বীর জেনারেল ওসমানী*, দৈনিক সিলেট কণ্ঠ, সিলেট, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ৩

২৮৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রীসভার সদস্য ও নতুন রাজনৈতিক দল গঠন

বঙ্গবীর জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের জাহাজ চলাচল অভ্যন্তরীণ নৌ ও বিমান মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বিকে শতকরা ৯৪% ভোটে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে মন্ত্রীপরিষদে পুনঃনিয়োগের পর পূর্বের মন্ত্রণালয়ের সাথে তাকে ডাক তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[২৮৪] ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি করে একদলীয় শাসন 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠা করা হলে ওসমানী তার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বিফল মনোরথ নিয়ে অবশেষে সংসদ সদস্য পদ, মন্ত্রীত্ব ও আওয়ামীলীগ থেকে পদত্যাগ করেন।[২৮৫] ১৯৭৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তার স্বপ্ন সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'জাতীয় জনতা পার্টি' নামে তিনি একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন তিনি 'গণনীতির রূপরেখা' নামে প্রণীত গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়াই ছিল তাঁর রাজনীতির অভিষ্ট লক্ষ্য। একজন সেনানায়ক হয়েও গণতন্ত্রের প্রতি তার এমন অবিচল আস্থা গোটা জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এবং অনেক রক্তের বিনিময়ে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা ওসমানীরই অবদান। দু'দফা নির্বাচনে হেরে গেলেও সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ছিল না; বরং এটা ছিল তাঁর রাজনৈতিক বিজয়।

ওসমানীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি

ওসমানীর জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর চরিত্রে দু'টি দিক ছিল। তিনি যেমন ছিলেন বজ্রের মত কঠিন তেমনি ছিলেন কুসুমের মত কোমল। পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন না। রাজনীতিতেও সিনিয়রদের শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর শিক্ষা জীবন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী রাজনৈতিক জীবনেও তিনি নীতি ও আদর্শের ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। ওসমানী ছিলেন খাঁটি দেশপ্রমিক এবং নির্লোভ রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার অধিকারী উচ্চ শিক্ষিত সৎ, মেধা ও প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল এক দূর্দমনীয় সমর ব্যক্তিত্ব, যিনি আপদমস্তক ছিলেন দূর্জয় সাহসের অধিকারী। আজীবন গণতন্ত্রমনা ওসমানী সহজ সরল

---

২৮৪. প্রাগুক্ত।

২৮৫. *আমাদের ওসমানী আমাদের গর্ব*, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

সত্যটি সর্বদা নির্ভয়ে বলে গেছেন সাহসের সাথে। অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ, মিথ্যাচারিতা, উচ্চাভিলাষী এবং ধুরন্ধর প্রকৃতির লোকেরা কোনকালেই তার কাছে প্রশ্রয় পায়নি। তিনি তাঁদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। কারো রক্তচক্ষুকে কখনো তিনি পরোয়া করেননি। তাঁর একটাই ছিল লক্ষ্য-গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। যে কারণে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছিলেন এবং যে কারণে জীবনের শেষদিন অবধি গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় নিজের সর্বস্ব তিনি উৎসর্গ করেছেন। বিত্তের নিকট কখনো আত্ম বিক্রয় করেননি। তিনি ছিলেন নিরহংকার, অপরের দুঃখ মোচনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। সময়ানুবর্তিতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর্মি জীবনের প্রথমদিকে কিছুটা বল্গাহীন থাকলেও তাঁর পিতার কবর যিয়ারতে মক্কা শরীফে যাওয়ার পর থেকে তাঁর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি হয়ে উঠেন আপদমস্তক একজন খাঁটি মুসলমান। আর্থিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অস্বচ্ছল। বিছানার চাদর, ঘরের পর্দা প্রায়ই থাকত না। তাঁর পেনশনও বন্ধ ছিল। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে আদালতের ডিগ্রী মারফত তিনি সরকারের নিকট থেকে পেনশন আদায় করেন।[২৮৬] এ পরিস্থিতিতে তাঁর আর্থিক চাহিদা মেটাতেন তাঁর আত্মীয় মশাহিদ আলী চৌধুরী (শাহী)। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি কখনো নীতিভ্রষ্ট হননি। তাঁর চারিত্রিক উজ্জ্বল্য আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।

মৃত্যু ও দাফন

শেষের দিকে ওসমানীর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। তিনি অনেকদিন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি লন্ডনে যান। কিন্তু তাঁর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। দিনে দিনে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় ১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪ টায় লন্ডনের সেন্টপল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৮৭] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৬ বছর। তাঁর লাশ নিয়ে ঢাকায় আসেন জনাব আব্দুল মতিন ও জনাব মশাহিদ আলী চৌধুরী (শাহী)। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় ১ম জানাজা ও সিলেট আলীয়া মাদরাসা মাঠে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে ২য় জানাজা শেষে তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী হযরত শাহজালালের দরগায় তাঁর মায়ের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। ওসমানীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা ঘটে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম বীরের বর্ণাঢ্য ও ঘটনা বৈচিত্রে ভরা একটি আলোকজ্জ্বল আদর্শজীবন ও অধ্যায়ের। তিনি ছিলেন নীতি, আদর্শ, দেশপ্রেম, সাহস আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের

---

২৮৬. মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান সম্পাদিত, *অনির্বাণ ওসমানী* (সিলেট : দেশকাল প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১৭

২৮৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এক মূর্ত প্রতীক। ওসমানী জীবনে অনেক ক্ষেত্রে অনেকের স্বীকৃতি না পেলেও মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে অনেক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ওসমানী স্মৃতি যাদুঘর; ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট; ওসমানী বিমান বন্দর, সিলেট; ওসমানী ফাউন্ডেশন, লন্ডন; ওসমানী উদ্যান, ঢাকা; ওসমানী মেমোরিয়াল জাতীয় মিলনায়তন, ঢাকা; ওসমানী শিশু উদ্যান, সিলেট; ওসমানী সেবাসদন, সিলেট; ওসমানী নগর, ওসমানী রোড, ছাতক ও সুনামগঞ্জ; ওসমানী সমাজসেবা গবেষণাকেন্দ্রসহ আরো অগণিত স্মৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান। আকৃতদার নিঃসন্তান ওসমানী বেঁচে থাকবেন স্মৃতির মণিকোঠায় জাতির ইতিহাসে।

শিক্ষা সম্প্রসারণে অবদান

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম বঙ্গবীর জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সিপাহসালার, মহাবীর, মহানায়ক। শুধু এক্ষেত্রেই নয় শিক্ষা জীবন, রাজনৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতিটি পদচারণায় লুকায়িত আছে অনুসন্ধিৎসুদের জন্য শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা। শিক্ষানুরাগী উচ্চশিক্ষিত ওসমানী গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে না পারলে জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব হবে না। তাই নিজ জন্মভূমি সুনামগঞ্জের ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার মানসে নিজ মাতৃভূমিতে একটি কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অবিচল। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে সুনামগঞ্জ ও ছাতকের মধ্যবর্তী গোবিন্দগঞ্জ পয়েন্টে কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এলাকার উদ্যোগী মানুষদের নিয়ে জেনারেল ওসমানীর সভাপতিত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন ও গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা তিনি প্রদান করেন। তাঁরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিমান ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রী জেনারেল ওসমানী ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[২৮৮] উল্লেখ্য, কলেজটি বঙ্গবীর ওসমানীর নামে নামকরণের ব্যাপারে এলাকার মানুষের আগ্রহ থাকলেও উপরোক্ত সময়ে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এলাকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এলাকার তৎকালীন এম.এল.এ জনাব আব্দুল হক মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অক্ষয় স্মৃতি ধরে রাখার লক্ষ্যে তাঁরই নামানুসারের কলেজটির নাম নামকরণ করা হয় 'আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ'। এ ক্ষেত্রে জেনারেল

২৮৮. শামসুন নাহার বেগম সম্পাদিত, দ্যুতিময় গাংচিল, কলেজ বার্ষিকী ২০১৬ (সিলেট : প্যারাডাইস অফসেট প্রেস, ফেব্রুয়ারি ২০১৬), পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

ওসমানীর ত্যাগ এবং একজন জনপ্রতিনিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা নিহিত রয়েছে। ওসমানী প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলার একটি শ্রেষ্ঠ কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে।

আজীবন শিক্ষানুরাগী জেনারেল ওসমানী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি 'তাঁর নিজের ও মায়ের যুক্তনামে করা' ওসমানী জোবেদা ট্রাস্টে ওয়াক্ফ করে দেন।[২৮৯] এই ট্রাস্টের আয় গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার খরচ ও বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে ব্যয় করা হয়। ছোটবেলা থেকেই ওসমানী ছিলেন বাবা-মায়ের একান্ত বাধ্য সন্তান। বিশেষত তাঁর জীবনের এ উন্নতির পেছনে ছিল তাঁর মায়ের সঠিক পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধান। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের অনুগত থাকা একান্ত অপরিহার্য–সকলকে তিনি এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। চাকুরী জীবনে ওসমানী সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা এবং অধীনস্থদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের শিক্ষা দিয়েছেন। রাজনীতি করতে গিয়ে জেনারেল ওসমানী সকলকে সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি মনে করতেন, সত্য ও ন্যায়ের অবস্থান সমাজে আর সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতি দ্বারা। তিনি লাইসেন্স পারমিটের রাজনীতি করেননি, তোষামোদী এবং স্বজনপ্রীতির রাজনীতি করেননি। তাঁর রাজনীতি ছিল সর্বদাই ইতিবাচক। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা আমাদের বর্তমান সমাজের রাজনীতিবিদদের জন্য অনুকরণীয় শিক্ষা। জেনারেল ওসমানী জীবনভর সকলকে সাহসী হবার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর এ সাহসের উৎস ছিল সম্পদে অনাসক্তি ও নির্ভেজাল দেশপ্রেম। এই সাহসের বলেই তিনি সংসদ সদস্য মন্ত্রীত্ব ও নিজের দলকে ছুড়ে ফেলতে দ্বিধা করেন নি। ওসমানী সমাজে ভদ্রতাজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করত। রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধেও তিনি কখনো অশালীন মন্তব্য করতেন না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যা একটি অপরিহার্য শিক্ষা। সময়জ্ঞান বা সময়ানুবর্তিতার শিক্ষাও ওসমানী দিয়ে গেছেন, যা পালন করা অপরিহার্য। ওসমানীর জীবন থেকে আমরা অলী-দরবেশদের নৈকট্য লাভের শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারি। তিনি ছিলেন হযরত মাওলানা শফিউল্লাহর ভক্ত। আবার তিনি প্রায়ই হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাযার জিয়ারত করতেন। আজকাল মানুষ মানুষের ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। সমাজের জন্য অপরিহার্য এ কৃতজ্ঞতাবোধের অমূল্য শিক্ষাটি ওসমানী তাঁর সমগ্র জীবনভর সমাজে সম্প্রচার করেছেন। তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ যে কি গভীর ছিল তা তাঁর জীবনের শেষ ভাষণই বলে দেয়। ১৯৮৩ সালে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যাবার প্রাক্কালে তাঁকে প্রদত্ত এক সংবর্ধনা সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন :

"এই শহরে, এই পরিবেশে, বহুদিন আগে–পঞ্চাশ বছর আগে গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকের কাছে, আমার মা-বাবার শক্ত হাতের নীচে আমি শিক্ষা লাভ করেছি। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্প্রসারিত

২৮৯. *সিলেটের মাটি ও সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

Dhaka University Institutional Repository

করে, কর্তব্যপরায়ণ করে। আপনারা যতটুকু বলেছেন, আমি ততটুকু করতে পারিনি। সব সময় নিজের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আজকে আপনারা যে সম্মান দিলেন এটা আমার চিকিৎসার জন্যও সহায়ক হবে। আপনাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেলেই, নিশ্চয়ই আমি আবার এখানে ফিরে আসব।"[২৯০]

এরপর তিনি আমদের মাঝে সুস্থদেহে আর ফিরে আসেন নি। তবে তাঁর জীবনের বিশাল কার্যাবলি ও অনুসরণীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতির হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন অনন্তকাল ধরে। নতুন প্রজন্ম তাঁর জীবন ও শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে স্মরণ করবে।

কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১)

আমাদের সমাজে এমন অনেক কৃতি সন্তান রয়েছেন যারা প্রচার বিমুখ হওয়ায় জীবদ্দশায় কেউ তাদের জানেন না বা চেনেন না। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান অধ্যাপক শাহেদ আলী। ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক ও বাংলা সাহিত্যের একজন অমর কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী। তিনি ছিলেন একাধারে জাতীয় বুদ্ধিজীবী, কলম যোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, সংগঠক, দার্শনিক, সম্পাদক, সাংবাদিক, অনুবাদক, গবেষক, বাগ্মী, সমাজসেবক, পার্লামেন্টারিয়ান, সংস্কৃতি কর্মী, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং জনদরদী রাজনীতিবিদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সফল পদচারণায় তিনি সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে সফল শিক্ষা উপহার দিয়েছেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে কয়জন ক্ষণজন্মা ছোট গল্পকার আমরা পেয়েছি তন্মধ্যে চল্লিশ দশকের শাহেদ আলী নানা দিক বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রকৃত অর্থে পূর্ব বাংলা মুসলিম জীবনের স্বার্থক রূপকার। তাঁর গল্পের ভেতর দিয়ে ভাটি বাংলার মুসলিম জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-যাপনের নানা প্রতিকূলতা ও সংগ্রামের শিক্ষা ও দীক্ষা খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষার একজন। আজীবন তিনি ছিলেন জ্ঞানের পূজারী। জ্ঞানের সাম্রাজ্য বিস্তারে তিনি ছিলেন সদা জাগ্রত। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর ছিল বিস্তর গবেষণা। দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা তাঁকে বিচলিত করত। ১৯৮০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে তিনি সারগর্ভ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইসলামীকরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ ড. সৈয়দ আলী আশরাফ ও বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ড. ইসমাঈল রাজি আল ফারুকী শাহেদ আলীর প্রস্তাবনার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন।[২৯১] তাঁর প্রস্তাবনায় ছিল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষার সকল স্তরে কুরআন, হাদীস,

২৯০. *বঙ্গবীর ওসমানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

২৯১. মাহমুদ ইউসূফ, কথাশিল্পী শাহেদ আলী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২৯ মে, ২০১১, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

মহানবীর জীবনাদর্শ, রাষ্ট্রনীতি, ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রভৃতি সিলেবাসভুক্তকরণ। ধর্মের সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, "জ্ঞান-জ্ঞিানের সকল শাখা-প্রশাখা এবং মানুষের সকল ক্রিয়া কলাপই ইসলামের বৃত্তের মধ্যে পড়ে। এ কারণে ইসলাম বিজ্ঞান ও গবেষণাকে মানবিক মূল্যবোধ ও উচ্চতর আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন মনে করে না; বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল সাধনাকে ইসলামী জীবনদৃষ্টি কেবল প্রভাবিত করে না, নিয়ন্ত্রণও করে। এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা কখনো মহৎ লক্ষ্য বর্জিত হয় না।"[২৯২] একাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অধ্যাপক শাহেদ আলীর চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন ঘটলে বর্তমানে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ দুরবস্থা তৈরি হতো না।

জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন

অধ্যাপক শাহেদ আলী ১৯২৫ সালের ২৬ মে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের মাহমুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২৯৩] তাঁর পিতার নাম মৌলভী ইসমাঈল আলী ও মাতার নাম আয়েশা বেগম। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষায় হাতেখড়ি। অতঃপর ১৯৪৩ সালে সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। সিলেটের এম.সি কলেজ থেকে ১৯৪৫ সালে আই.এ এবং ১৯৪৭ সালে ডিস্টিংশনসহ বি.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হয়।[২৯৪]

১৯৫১ সালে বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন। পর্যায়ক্রমে রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ও ঢাকাস্থ মিরপুর বাংলা কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন শাহেদ আলী। তিনি শুধু একজন সফল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সম্প্রসারকই ছিলেন না, তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি একজন মহান ভাষা সৈনিকও ছিলেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র 'দৈনিক সৈনিক' পত্রিকার সম্পদনার দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি খেলাফত রব্বানী পার্টির ব্যানারে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[২৯৫] ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি মাসিক প্রভাতী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি 'দৈনিক বুনিয়াদ' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

---

২৯২. প্রাগুক্ত।

২৯৩. সৈয়দ মোস্তফা কামাল সম্পাদিত, রাগীব রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান স্মারক ১৯৯৮, সিলেট : ১৯৯৯, পৃ. ২৪

২৯৪. প্রাগুক্ত।

২৯৫. জাকির হোসেন রাজু সম্পাদিত, *আমাদের সুনামগঞ্জ*, সুনামগঞ্জ, ২৬ মে, ১৯৯১, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০ সালে ইসলামিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হন। তিনি প্রায় ২০ বৎসর ১৯৬২ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন।[২৯৬] একই সাথে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ও ফাউন্ডেশনের বিখ্যাত শিশু মাসিক পত্রিকা 'সবুজ পাতা'র সম্পাদনার দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা একাডেমী পত্রিকার সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি ১৯৫৬ সালে 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

সাহিত্যকর্ম

অধ্যাপক শাহেদ আলী শুধু শিক্ষাবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে প্রাবন্ধিক, গবেষক, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক ও শিশু সাহিত্যিক। লেখক জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখালেখি ও সাহিত্যকর্মের সাথে জড়িত থেকে তিনি এ ক্ষেত্রে তাঁর গভীর নিবিষ্টতা ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে জননন্দিত হয়েছেন। তাঁর ৭৬ বছরের জীবনে মোট ৩৫টি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছেন। তাঁর এ সৃষ্টিকর্মই আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ ক্ষেত্রে কবি মুকুল চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "তাঁর গল্পের গুণ ও মান, গল্পের শুদ্ধতা ও নান্দনিকতা, তাঁর উপলব্ধির ব্যাপকতা ও বৈচিত্রময় শিক্ষা, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং সেই দৃষ্টিকে বৃহত্তরের মর্মমূলে পৌঁছানোর যে শিল্পিত নির্মাণ কুশলতা তাকে আন্তর্জাতিক মানের কথাশিল্পীর শিরোপায় ভূষিত করেছে।"[২৯৭] শাহেদ আলীর সাহিত্যকর্মের মূলে ছিল মানবতা, মনুষত্ববোধ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। গ্রামের মানুষের বৈশিষ্ট্য ও অবহেলিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন বৈচিত্র্যের স্বার্থক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত তাঁর লিখনীর ভাষায়। কোন সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, অত্যাচার-নিপীড়ন, অরাজকতা, পৈশাচিকতা নয়; বরং মানবিক গুণাবলিতে প্রস্ফূটিত হওয়ার শিক্ষাই তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করেছেন। নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

১৯৪০ সালে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে 'মাসিক সওগাত' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'অশ্রু' প্রকাশিত হয়।[২৯৮] এরপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেন একজন জীবনধর্মী লেখক।

গল্প গ্রন্থ

- জিব্রাইলের ডানা, ১৯৫৩
- একই সমতলে, ১৯৬৩

---

২৯৬. প্রাগুক্ত।

২৯৭. মুকুল চৌধুরী, *শাহেদ আলী জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা : শব্দরূপ, ২০১৬), পৃ. ১৮

২৯৮. মাহমুদ ইউসূফ, *দৈনিক সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

- শানঘর, ১৯৮৫
- অতীত রাতের কাহিনী, ১৯৮৬
- অমর কাহিনী, ১৯৮৭
- নতুন জমিনদার, ১৯৯২
- শাহেদ আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৯৯৬।

উপন্যাস

- হৃদয় নদী, ১৯৮৫

শিশু সাহিত্য

- রুহীর প্রথম পাঠ, ১৯৮০
- ছোটদের ইমাম আবু হানিফা, ১৯৮০
- সোনার গাঁয়ের সোনার মানুষ, ১৯৯২

গবেষণা গ্রন্থ

- বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান, ১৯৬৫

ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি

- তরুণ মুসলিমের ভূমিকা, ১৯৪৬
- একমাত্র পথ, ১৯৪৬
- তরুণের সমস্যা, ১৯৬০
- তওহীদ, ১৯৬৫
- মুক্তির পথ, ১৯৬৫
- বুদ্ধির ফসল আত্মার আশিস, ১৯৭০
- ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা, ১৯৭০
- জীবন নিরবচ্ছিন্ন, ১৯৮০

ইতিহাস বিশ্লেষণ

- ফিলিস্তিনে রুশ ভূমিকা, ১৯৪৮
- সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া, ১৯৫০
- বিপর্যয়ের হেতু।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি গ্রন্থ

- Economic order of Islam, 1978
- Islam in Bangladesh, 1981

অনুবাদ

- মক্কার পথ (মূল : মুহাম্মদ আসাদ), ১৯৯৩
- ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি (মূল : মুহাম্মদ আসাদ), ১৯৬৬
- আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক মানুষ (মূল : জে.বি এইচ কোনান্ট)
- ইতিবৃত্ত (মূল : হিরোডেটাস), ১৯৯৪
- হিস্টরী অব পলিটিক্যাল থিওরী (মূল : জি এইচ সেবাইন আংশিক)
- ফান্ডামেন্টালস অব ইকোনমিকস (মূল : জি এইচ সেবাইন, আংশিক)
- আত-তাওহীদ (মূল : ইসমাইল আল-ফারুকীন)
- ডেইলী লাইফ অব এনসাইন্ট রোম (মূল : জেরোমি কাসোপিনো), অমুদ্রিত।

সম্পাদনা

- মাসিক প্রভাতী, ১৯৪৪-৪৬
- সাপ্তাহিক সৈনিক, ১৯৪৮-৫০
- দৈনিক বুনিয়াদ, ১৯৫৫
- ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ১৯৬২-৮০
- মাসিক সবুজ পাতা, ১৯৬৩-৮২

অন্যান্য সম্পাদনা

- সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক মিল্লাত, ১৯৫৬
- প্রথম সম্পাদক, বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্স, ১৯৫৯-৬০
- সদস্য, সম্পাদনা বোর্ড, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৬৩-৬৪
- সদস্য, সম্পাদনা বোর্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ (ই.ফা.বা)
- অনুবাদক ও সম্পাদক, আল-কুরআনুল কারীম (ইসলামিক একাডেমী প্রকাশিত), ১৩৭৪-১৩৭৮ বাংলা
- সম্পাদক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জাতীয় সম্বর্ধনা গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি ও পুরস্কার

শাহেদ আলী তাঁর সাহিত্য কর্ম, ভাষা আন্দোলন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য যে সব পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেন তা নিম্নরূপ :

১. বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৬৪

২. তমঘায়ে ইমতিয়াজ পুরস্কার ১৯৬৯

৩. ভাষা আন্দোলন পদক ১৯৮১

৪. নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক ১৯৮৫

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার ১৯৮৬

৬. জালালাবাদ লায়ন ক্লাব পদক ১৯৮৮

৭. রাষ্ট্রীয় একুশে পদক ১৯৮৯

৮. জালালাবাদ যুব ফোরাম একুশে ও স্বাধীনতা পদক ১৯৯০

৯. জালালাবাদ সমিতি স্বর্ণপদক ১৯৯৪

১০. বাংলা সাহিত্য পরিষদ পদক ১৯৯১

১১. বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এওয়ার্ড ইংল্যান্ড ১৯৯১

১২. দুবাই সাতিহ্য পুরস্কার ১৯৯২

১৩. ফররুখ স্মৃতি জালালাবাদ ১৯৯৭

১৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পদক ২০০০

১৫. সেলুলাস সাহিত্য পুরস্কার ২০০০

১৬. জাসাস স্বর্ণপদক ২০০২ (মরণোত্তর)

১৭. কিশোর কণ্ঠ পুরস্কার ২০০৩ (মরণোত্তর)

ইন্তেকাল

বহুধা প্রতিভার অধিকারী শাহেদ আলী ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে, স্ত্রী ও অসংখ্য গুণগ্রাহীকে রেখে ২০০১ সালে ৬ নভেম্বর ঢাকায় পরলোক গমন করেন।[২৯৯]

শাহেদ আলীর সাহিত্যে শিক্ষণীয় উপদান ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান

শাহেদ আলী ইতিহাস সচেতন, ঐতিহ্যনিষ্ঠ, বাস্তবধর্মী সমাজমনস্ক লেখক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর লেখায় ও শিক্ষা দর্শনে মাটি ও মানুষের কথা, মানুষের জীবন সংগ্রামের বিচিত্র শিক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর লেখায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশার নিরন্তন দোলাচলে

২৯৯. মোহাম্মদ তৌফিকুর হায়দার, শাহেদ আলী, বাংলাপিডিয়া, ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় অবিমিশ্র জীবনের দ্বন্দ্বমুখর চিত্র ও শিক্ষা ফুটে উঠেছে। বিশ্বাস ও আচরণে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তাঁর সাহিত্যেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। বিশ্বাসের সাথে বাস্তবতার সংমিশ্রণে যে জীবনধর্মী শিক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পারে, তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত শাহেদ আলীর সাহিত্য। তিনি মুসলিম জীবন-চিত্র গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, স্বপ্ন-সম্ভাবনা নিয়ে জীবনধর্মী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ভাষার ব্যবহারে দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর সাহিত্যে মোটামোটি তিনটি দিক সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রথমত, জীবনদৃষ্টি। ইসলামের আলোকে লালিত বিশ্বাস ও জীবন দৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ও শিক্ষা রয়েছে তাঁর সাহিত্যে। তবে তা কখনো প্রচারণার রূপ লাভ করেনি। যথার্থ শিল্পসম্মতভাবে জীবনরসে জারিত হয়ে তা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন জীবন শিল্পী। বাস্তব জীবনের নানা প্রসঙ্গ ও শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। শিল্পের আশ্লেষে নির্মিত জীবন বাস্তবতার ঘনিষ্ট রূপায়ণ তাঁর সাহিত্যকে করেছে রসবিধুর ও পাঠকপ্রিয়। তৃতীয়ত, আজন্ম লালিত গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রামীণ জীবনের সাধারণ জীবনচিত্র তাঁর সাহিত্যে অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিমভাবে রূপায়িত হয়েছে। গ্রামীণ জীবনের সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণে তিনি তাদের পরিবেশ, জীবন-বৈচিত্র, জীবনের সুখ-দুঃখ-ভালবাসা, আনন্দ-বেদনা, রূপ এবং সে সঙ্গে তাদের ভাষ্য স্বপ্ন-কল্পনা সবই সফলভাবে চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। যা সমাজের সকল স্তরে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় উপাদানে ভরপুর।

একজন যথার্থ শিল্পীর নিকট তাঁর অভিজ্ঞা ও পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উর্ধ্বে উঠে বা এর প্রভাবকে অস্বীকার করে কেউ প্রকৃত জীবন শিল্পী হতে পারে না। জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

"My Writing are about my experience, about my environment. There is a great deal about my rural life but my themes are also urban, often I respond to my own feelings about the anomalies in urban life, about the erosion of social values in moral standards. The sum total of my massage is to illustrate and convey the sufferings, the pain and the tragedies which people are forced to bear and struggle against. I do not believe that a writer can or shoot try to create anything outside the context of his own experience. To be authentic, you must be a product of your own environment. I contradict theory that true poets and writers are bonded to humanity at large, not to a particular place or time. A writer is born in a particular country at a particular time and in a particular place."[৩০০]

৩০০. *Gulf Weekly,* Dubai, 19 March, 1992.

Dhaka University Institutional Repository

শাহেদ আলী নিজ সমাজ ও পরিবেশের নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন। এ সমাজের দুঃখ-কষ্ট দুর্দশায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন এবং তাঁর করুণ চিত্র তার লেখায় তুলে ধরেছেন। সমাজের নিকট দায়বদ্ধতার কারণেই সমাজের আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধকে অকৃত্রিম আবেগে তিনি লালন করেছেন ও তার স্খলনে বেদনাবোধ করেছেন। এটা তাঁর জীবন বাস্তবতার এক সংবেদনশীল দিক। এ সামাজিক স্খলন-পতন-অবক্ষয় তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন একজন প্রতিবাদী লেখক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীনতার মহান শিক্ষা তিনি তাঁর প্রতিটি লেখায় উপস্থাপন করেছেন। অন্য একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

"I have devoted to the study of life in the lower range of society. I give utterance to their sufferings. A writer has to have commitment for his place, his community and his time. The greatest of writers have written about their own life."[৩০১]

এক কথায় শাহেদ আলীর সাহিত্যে গণমানুষের জীবন, চিন্তা-চেতনা, দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ, স্বপ্ন কামনার প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষত এদেশের সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ তাঁর সাহিত্যে শিক্ষণীয় রূপে চিত্রায়িত হয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর সাহিত্য আমাদের জাতীয় সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত এবং তিনি এ ক্ষেত্রে এক আধুনিক আলোকিত ধারার উজ্জ্বল পথিকৃৎ।

অধ্যাপক শাহেদ আলী সত্যিকার অর্থেই ছিলেন কালজয়ী ও বহুমুখি প্রতিভার এক অনন্য মনীষিতুল্য ব্যক্তিত্ব। তিনি গেয়ে গেছেন সুচারু কালি কলম ও মন দিয়ে গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ মানুষের জীবন গাথা। দেশ ও জাতির কল্যাণে গঠনমূলক কর্মসেবায় তিনি ছিলেন আজন্ম নিবেদিত একজন সাধক। তাঁর কর্মবহুল জীবনের প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার আলো সম্প্রসারণ করেছেন। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে যেমন তিনি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করেছেন তেমনি তাঁর অসংখ্য সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে তিনি নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আপোষহীনতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি বিপুল ভোটে এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি সুনামগঞ্জ শহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর মসজিদে পালাক্রমে জুমার নামায আদায় করেছেন এবং নামায পূর্ববর্তী সময়ে তাঁর রাজনৈতিক দল 'রব্বানী পার্টি'র আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তৃতার মাধ্যমে মুসল্লিদের একটি আদর্শবাদী আন্দোলন ও শিক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। তাঁর এসব বক্তৃতার মূল উপজীব্য ছিল– "দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মালিক এক আল্লাহ। সকল মানুষ ও প্রাণীকুলের

৩০১. *Khaleej Times,* Dubai, 29 February, 1992.

Dhaka University Institutional Repository

এতে হক আছে। কাউকে তার ন্যায্য হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আল্লাহর আসমানের আলো সকলে মিলে ভোগ করে। তাঁর পানি, হাওয়ায় যেমন সকলের সমান অধিকার তেমনি তাঁর জীবনেও রয়েছে সকল মানুষের ন্যায্য হক। এই হক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুদ, ঘুষ ও শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদি থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে হবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। তবেই এ পার্থিব জীবন ও পরবর্তী জীবনে আসবে সুখ ও শান্তি।[৩০২] এর অধিক সফল শিক্ষার সম্প্রচার আর কি হতে পারে? আমাদের বর্তমান রাজনীতিবিদরা তাদের পূর্বসূরি এ সংসদ সদস্য থেকে যদি শিক্ষা গ্রহণ করতেন তবে আমাদের সমাজের জন্য তা কতই না ফলপ্রসূ হত!

শুধু শিক্ষা দান নয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে শিক্ষা বিস্তারের পথকে সুগম করেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের একজন অগ্রসেনানী। ভাষা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনকারী সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশ'-এর একজন শ্রেষ্ঠ কর্ণধার। ভাষা আন্দোলনের স্পিরিটকে ধারণ করে ১৯৫৩ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তমুদ্দিনিক আদর্শে বিশ্বাসী অধ্যক্ষ আবুল কাশেমসহ অন্যান্যদের নিয়ে মিরপুর 'বাংলা কলেজ' প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৩০৩] ইসলামে আল্লাহর মালিকানার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যবাদের আদর্শকে ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে সম্প্রসারণের ব্রত নিয়ে মহানবী (সা.)-এর অন্যতম সাহাবী ইসলামী সাম্যবাদের প্রবক্তা হযরত আবু জর গিফারী (রা.)-এর নামে ঢাকার মালিবাগে আবু জর গিফারী কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৩০৪]

অধ্যাপক শাহেদ আলী স্বপ্ন দেখতেন শুভ্র সুন্দর শিশু মনের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের নৈতিকতা ও আদর্শবাদের মূল ভিত্তিটা যদি গেঁথে দেয়া যায় তবে তমসাচ্ছন্ন জাতির এ দুর্দিনে হয়ত একটা আলোর পথ দেখা যেতে পারে। তিনি মনে করেন, যে কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রকৃতি নির্ভর করে তার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও দর্শনের উপর। জীবন সত্তার বিকাশে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় জীবনের জীবন বিধান অনুযায়ী সুশৃঙ্খল ও আদর্শবাদী হিসেবে শিশুদের মন মানসিকতার সুষ্ঠু বিকাশের মজবুত ভিত গড়ার কোন সঠিক দিকনির্দেশনা নেই। পৃথিবীর গোড়াপত্তনের নিমিত্ত বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজ এই তিনের আদর্শগত লক্ষ্যে একমুখিনতা থাকা একান্ত আবশ্যক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুদের শিক্ষার ভিত নৈতিক ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

৩০২. অধ্যাপক চেমন আরা, *শাহেদ আলীর জীবন কথা*, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২৭

৩০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৩০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বনানীতে ১৯৮৩ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্কুলটির নামকরণ করে 'তামরীন'[৩০৫]। যার বাংলা অর্থ প্রাথমিক অনুশীলন। তাঁর আশা ছিল এ ধরনের স্কুল বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হলে শিশু মনে নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

১৯৯৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি নিজ এলাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন। যেহেতু তাঁর নিজ এলাকাতে কোন স্কুল ছিল না বিধায় এলাকার ছেলে মেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ মর্মবেদনা থেকে একটি বহুমুখী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের মানসে তিনি নিজ গ্রাম মোয়াজ্জেমপুরের অকৃষি খাস জমি ইজারা প্রাপ্তির জন্য সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক চেমন আরা তাঁর ভাই ইদ্রিস আলীসহ অন্যান্যদের সহযোগিতায় ১৯৯৫ সালেই প্রতিষ্ঠা করেন মোয়াজ্জেমপুর হাইস্কুল।[৩০৬] আমৃত্যু তিনি স্কুলটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বর্তমানে স্কুলটি সুনমাগঞ্জ জেলার একটি শ্রেষ্ঠ স্কুলে রূপান্তরিত হয়ে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এছাড়া তিনি নিজ এলাকার বহু মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা ও স্কুলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন। নিজ এলাকার অসহায়, নিঃস্ব ও অস্বচ্ছল মানুষদের তিনি বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে সামাজিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। পরিশেষে বলা যায়, অধ্যাপক শাহেদ আলী আমাদের সমাজের এক অমূল্য রত্ন, যাকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা যায়।

ড. আখলাকুর রহমান (১৯২৭-১৯৯২)

জন্ম ও পরিচিতি

ড. আখলাকুর রহমান ছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের একজন সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে তাঁর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারা এক অপ্রতিরোদ্ধ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁকে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করে। জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও তিনি লাভ করেছেন একাধিক পুরস্কার। সুনামগঞ্জ যে সব কৃতি মনীষিদের পদচারণায় ধন্য হয়েছে ড. আখলাক তাদের অন্যতম।

---

৩০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৩০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার তেঘরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান।[৩০৭] সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ দারাস আলী ও মাতার নাম যুবাইদা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ভূমি মালিক। পিতল, কাপড় ও ভূমি ব্যবসা ছাড়াও তিনি নিজ গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতাও করতেন।

শিক্ষা জীবন

ছাত্র হিসেবে ড. আখলাকুর রহমান ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। মাত্র তিন বছর বয়সেই গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয় শিশু আখলাকের প্রাথমিক শিক্ষা। গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন শেষে তিনি মঙ্গলচণ্ডী হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ সালে মেট্রিক পাশ করেন।[৩০৮] ১৯৪৪ সালে সিলেটের বিখ্যাত এম.সি কলেজ থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। খুব ভালো ফল করায় এরপর তিনি বি.এ পড়তে চলে যান তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের আলীগড়ে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে তিনি বি.এ পাশ করেন। এরপর ঢাকায় ফিরে তিনি অর্থনীতিতে এম.এ-তে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ছিলেন পাশ কোর্সের ছাত্র। ১৯৪৯ সালে তিনি এম. এ তে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হন।[৩০৯] তাঁর পরীক্ষার ফল বের হলে তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আয়ার তাঁকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর অভুতপূর্ব ফলাফলের জন্য অভিনন্দিত করেন।

কর্মজীবন

এম.এ পাশ করার পর পরই ড. আখলাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।[৩১০] দু' বছরের মাথায়ই তিনি সরকারী বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য সুযোগ পান ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টারে। তবে বাম রাজনীতি করার অপরাধে লন্ডন যাওয়ার পথে তাঁকে করাচী থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৫২ সালে ড. আখলাক নিজ খরচে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য লন্ডন যান। কিন্তু সময় মত পৌছাতে না পারায় প্রাথমিক অবস্থায় তাঁকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়নি। পরে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অর্থনীতির উপর ক্লাসে একটা বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি চেয়ে নেন তিনি। বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন কর্তৃপক্ষ। তাঁকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া

৩০৭. মুহম্মদ আসাদ্দর আলী, *গৌরবময় সিলেট বিভাগ* (সিলেট : তাইয়্যীবা প্রকাশনী, ১ সেপ্টেম্বর, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৯৮

৩০৮. মুক্তাদীর আহমদ মুক্তা, শিক্ষাব্রতী অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান, sylhettoday24.com

৩০৯. প্রাগুক্ত

৩১০. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[৩১১] দু' বছর অধ্যয়ন শেষে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি নিজ কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে গেলে তাঁকে চাকুরীতে যোগদান করতে দেয়া হয়নি। ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তানের পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যোগদান করেন।[৩১২] এ সময়ে তিনি পাকিস্তান ইকনমিক জার্নালে সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৩১৩] ১৯৫৯ সালে আখলাক পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে করাচী 'পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস' (PIDE) নামক গবেষণা সংস্থার জ্যৈষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হিসেবে যোগদান করেন। এখানে থাকাকালীন সময়েই ১৯৬২ সালে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাসেচুয়েটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (MIT) থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।[৩১৪] তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি MIT থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার অভিসন্দর্ভটি পরবর্তীতে পিআইডিই থেকে 'Partition Integration Economic Growth and Inter-regional Trade' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[৩১৫] পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতি সংক্রান্ত বৈষম্যের বাস্তব দালিলিক প্রমাণাদিসহ পাকিস্তানের আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের উপর লেখা বইটি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম এক কীর্তি।

ষাটের দশকের শেষার্ধে ড. আখলাকুর রহমান পিআইডিই ছেড়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে যোগদান করেন। এ চাকুরীতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করায় অল্পদিনের মধ্যেই তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংকের গবেষণা উপদেষ্টা হিসেবে তিনি চলে যান করাচীতে। তাঁর বদান্যতায় সে সময় বেশ কিছু বাঙালি ইউনাইটেড ব্যাংকের গবেষণা কেন্দ্রে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলেন।[৩১৬] ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ সম্মেলন। সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনাসহ সকল ক্ষেত্রেই ড. আখলাকই ছিলেন মধ্যমণি। ১৯৭০ সালে ড. আখলাক ইউনাইটেড ব্যাংকের গবেষণা কেন্দ্র থেকে 'The Private sector of East Pakistan : An Analysis of lagged development' নামে একখানা গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের পথ নির্দেশ করেছিলেন।[৩১৭] ১৯৭০ সালে অর্থনীতি সমিতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহীতে। উক্ত সম্মেলনে ড. আখলাক পাকিস্তানের

---

৩১১. *গৌরবময় সিলেট বিভাগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৩১২. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত

৩১৩. Obituary.Quantummethod.org.bd

৩১৪. প্রাগুক্ত

৩১৫. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

৩১৬. প্রাগুক্ত

৩১৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রাস্ফীতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির প্রায় প্রতিটি সম্মেলনেই ড. আখলাকের সরব উপস্থিতি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন তৎকালীন অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়ক ছিল। ১৯৮০ সালে ড. আখলাক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।[৩১৮] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটে দু'বার সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ার পরও তৎকালীন সরকার কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেননি।

রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান

ছাত্র জীবন থেকেই আখলাকুর রহমানের মাথায় ছিল রাজনীতির কীট। সারা বছর তাঁর রাজনীতি নিয়েই কাটতো। পরীক্ষা আসলে কয়েকদিন দরজা বন্ধ করে একটানা পড়তেন, এতেই পাশ করতেন কৃতিত্বের সাথে। ছাত্রাবস্থায় আখলাকুর রহমান ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ছাত্র ফেডারেশন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন। ১৯৪৮ সালে ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন।[৩১৯] এরপর ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে এদেশের কিছু সচেতন রাজনৈতিক কর্মীর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিলো 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এর উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন আখলাক। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে যারা এ দেশে প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে তোলেন তাদের অন্যতম ছিলেন ড. আখলাক। গণতান্ত্রিক যুবলীগের বুলেটিন সম্পাদনায়ও তিনি অন্যতম সম্পাদক হিসেবে জড়িত ছিলেন। মাত্র কয়েকটি সংখ্যা বের হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও তাঁর সরব পদচারণা ছিল। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে প্রগতি বিরোধী বলে চিত্রিত করার প্রবণতা দেখা দেয়। তার ঢেউ এসে লাগে বাংলায়। তখন এ দেশের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের সংগঠন 'ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সদস্যদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। লেখক সংঘের অধিকাংশ সদস্য রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিবিরোধী আখ্যা দিয়ে তার সাহিত্য বর্জনের পক্ষ অবলম্বন করেন। এর পুরোভাগে মুনীর চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল মুতী, সরফুদ্দীন প্রমুখ ছিলেন তাঁর মতানুসারী।[৩২০] উল্লেখ্য, প্রগতিশীল লেখকদের এ অতি বাম চিন্তাধারা পরবর্তীকালে ভুল বলে স্বীকৃতি লাভ করে ও পরিত্যক্ত হয়।

---

৩১৮. সৈয়দ মুহাদ্দিস আহমদ সম্পাদিত, *কথকতা* (সুনামগঞ্জ : প্যারাডাইস প্রিন্টার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০২), পৃ. ৮০

৩১৯. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৩২০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালে ড. আখলাক পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশে ফেরার পথে ভারতে গ্রেপ্তার হন। অল্প কিছুদিন পর ছাড়া পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এ দফায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। তখন কিছুদিন ট্রাক বহরের ব্যবসাও করেন ড. আখলাক। এ সময়ে তিনি জাসদের রাজনীতির সাথে তাত্ত্বিক উপদেষ্টা হিসেবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৫ এর নভেম্বরে সিপাহী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কর্নেল তাহের ও অন্যান্যদের সাথে ড. আখলাকও গ্রেপ্তার হন।[৩২১] বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে তিনি ছাড়া পান।

জাসদ রাজনীতির ফলশ্রুতিতে ড. আখলাক বাংলায় দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় 'একচেটিয়া ধনতন্ত্র : সাম্রাজ্যবাদ' এবং ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় 'মার্কসীয় অর্থনীতি'।[৩২২] ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত 'পলিটিক্যাল ইকোনমি' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন ড. আখলাক। তাঁর সে বক্তৃতা 'যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ' শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।[৩২৩] তাঁর সে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "বাংলাদেশ আজ উপনীত হয়েছে এক যুগ সন্ধিক্ষণে। আমরা সবেমাত্র স্বাধীনতা পূর্ব বিকাশের স্তরটাকে লংঘন করেছি। স্বনির্ভর উন্নয়ন প্রণালী প্রবর্তন করতে হলে সৃষ্টি করতে হবে যথোপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ। যে পথটা আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় তা অতি কঠিন ও দুর্গম। এ পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগুবার জন্য চাই সঠিক জাতীয় দিকদর্শন এবং লৌহকঠিন জাতীয় মনোবল। স্বাধীনতার জন্য যে জাতি আত্মত্যাগ করেছে তাকে বৃথা হতে দেয়া যায় না। এটাকে রুদ্ধ করার জন্য চাই সত্যিকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়াতে রাষ্ট্র চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে জনগণের সত্যিকার প্রগতিশীল জনপ্রতিনিধিগণ, যে প্রক্রিয়াতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অবসান ঘটবে সর্বপ্রকার অগণতান্ত্রিকতার; যে প্রক্রিয়াতে আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে স্বনির্ভরতায়; যে প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র বিধ্বংসকারী কুচক্রীশক্তি আর কোনদিন সাহস পাবে না মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে বাংলাদেশের বুকে।"[৩২৪] ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ড. আখলাক 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা নির্মাণের অর্থনীতি' শিরোনামে মাজহারুল হক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন।

'৫২ এর ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ড. আখলাক। সে সময়ে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন তরুণ প্রভাষক। ১৯৪৮-৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের

---

৩২১. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

৩২২. প্রাগুক্ত

৩২৩. প্রাগুক্ত

৩২৪. শিক্ষাব্রতী অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান, *যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি স্তরে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ কারণে সরকার তাঁর বিদেশে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে এমনকি তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়।[৩২৫] একটি দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি গঠনে মাতৃভাষার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি অসংখ্য বক্তৃতা প্রদান করেছেন এবং প্রবন্ধ লিখেছেন যা মাতৃভাষা আন্দোলনকে বেগবান করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি তাঁর আদর্শিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন পাকিস্তানের ইউনাইটেড ব্যাংকে কর্মরত। যুদ্ধ শুরু হলে সেখানকার আটকে পড়া বাঙালিদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেন ড. আখলাক। যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে বুদ্ধিভিত্তিক নানা পরামর্শ প্রদানসহ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন।[৩২৬]

ব্যক্তি চরিত্র, সমাজ সেবা ও শিক্ষা বিস্তার

ড. আখলাক জীবনে কখনো সুবিধাবাদের প্রশ্রয় দেননি। তাঁর মতো একজন যুগশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ইচ্ছে করলেই বিদেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আরামের জীবন বেছে নিতে পারতেন; কিন্তু তা না করে তিনি সর্বদা দেশের সেবা করাকেই বড়ো করে দেখেছেন। সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদী রাজনীতির অনুসারী ড. আখলাক কর্মজীবনে অনেক বড় বড় সুযোগ পেলেও নীতির প্রশ্নে তিনি কখনো আপোষ করেননি। বাস্তব জীবনে প্রত্যেককে একজন নীতিবান মানুষ হওয়ার শিক্ষাই তিনি সমগ্র জীবনভর বিস্তার করেছেন। গভীর আত্মমর্যাদাবোধের কারণে নিজ থেকে কখনো কারো কাছে কিছু চাননি ড. আখলাক। এমনকি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে একটা দীর্ঘ সময় কারাভোগ করলেও পরবর্তীতে এর কোন সুবিধাও তিনি নেননি। ব্যক্তি জীবনে প্রত্যেকটি মানুষকে আত্মমর্যাদাবোধে বলীয়ান হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন।

একজন সমাজবাদী হিসেবে নিজের আর্থিক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও দরিদ্রক্লিষ্ট মানুষের কথা কখনো ভোলেননি ড. আখলাক। দরিদ্রের সেবায়, অসহায়ের সমর্থনে যখন যেখানে প্রয়োজন তিনি ছুটে গেছেন ক্লান্তিহীনভাবে। সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে ১৯৪৩ সালে একবার ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দিলে তিনি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সেখানে ছুটে যান। দেখেন মৃতপ্রায় অর্ধউলঙ্গ মানুষ ঘরের ছাদে, গাছের ডালে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসওএস পাঠিয়ে সাহায্যের আবেদন জানালেন, দ্রুত সাড়াও পেলেন। তাঁর আহ্বানে মানুষ এগিয়ে আসলো বানিয়াচংয়ের দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে।[৩২৭] ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের সেবা করতে করতে ড. আখলাক নিজেও পড়লেন

৩২৫. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৩২৬. শিক্ষাব্রতী অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান, প্রাগুক্ত

৩২৭. Obituary.Quantummethod.org.bd

Dhaka University Institutional Repository

ম্যালেরিয়ার কবলে। মাসাধিককাল তিনি শিলংয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার পর সুস্থ হন। এসব কারণেই পরবর্তী জীবনে দেশে এবং দেশের বাইরে ম্যালেরিয়া নির্মূলের বিভিন্ন কার্যক্রমে ড. আখলাক সফল ভূমিকা পালন করেন।[৩২৮] আধ্যাত্মিকতার প্রতিও তাঁর ছিল এক দুর্নিবার আকর্ষণ। আর এ আকর্ষণের কারণেই ১৯৭৪ সাল থেকে তিনি শহীদ আল-বোখারীর সাথে ঘনিষ্ঠ হন এবং যোগধ্যানের অনুশীলনে একাত্ম হন। ১৯৮৩ সালে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় ড. আখলাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩২৯]

ড. আখলাক আজীবন ছিলেন একজন ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক। ছাত্ররাই ছিল তাঁর অতি আপনজন। সব সময় ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান লাভের অন্বেষায় তাঁকে ঘিরে রাখতো। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষার আলো দিয়ে আলোকিত করেছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তিনি সর্বদাই নবতর শিক্ষা সম্প্রসারণ করেছেন। রাজনীতি, সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তিনি অনুকরণীয় শিক্ষা বিস্তার করেছেন। নিজ এলাকার শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্তে সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৯৬৮ সালে স্কুলের বর্তমান স্থানটি তিনি নির্ধারণ করেন।[৩৩০] জন্মলগ্ন থেকে স্কুলটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্কুলটির সার্বিক উন্নতির পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি নিজ উপজেলা জগনাথপুরে তাঁর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি শিক্ষা ট্রাস্ট। যার নাম 'যোবায়দা খাতুন শিক্ষা ট্রাস্ট'।[৩৩১] প্রতি বছর তাঁর এলাকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ ট্রাস্টের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। জগন্নাথপুরের শিক্ষা বিস্তারে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে এ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

শেষবিদায়

ড. আখলাকুর রহমান ৬৫ বছর বয়সে ১৯৯২ সালের ৪ মে ঢাকায় তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩৩২] তাঁর মহাপ্রয়াণ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলের এক অপূরণীয় শূন্যতা।

---

৩২৮. প্রাগুক্ত

৩২৯. প্রাগুক্ত

৩৩০. ওমর মেহেদী, *তেঘরিয়ার কৃতি পুরুষ ড. আখলাক*, সিলেট কণ্ঠ, ৪ মে ১৯৯৭, পৃ. ৩

৩৩১. শিক্ষাব্রতী অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান, প্রাগুক্ত

৩৩২. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আব্দুল হাই (১৯২৭-১৯৮৩)

সুনামগঞ্জের কিংবদন্তী এক মনীষির নাম মুহাম্মদ আব্দুল হাই। জ্ঞানগর্বে সমৃদ্ধ একজীবন। নিজস্ব আঙ্গিনায় বিস্তর হাওরাঞ্চলের বিশাল জলরাশিতে সৃষ্টি এক উজ্জ্বল মহাসড়ক। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেয়া এক অতি সাধারণ জীবন, বিরল প্রতিভার অধিকারী এক অসাধারণ মানুষ। সুনামগঞ্জের শিক্ষা-সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় বিচরণকারী মানুষেরা আজও যার স্পর্শ ও আদর্শ অনুভব করেন সেই কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার মন মানুষের নাম মুহাম্মদ আব্দুল হাই। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, জননেতা, অভিনেতা, ভাষাসৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধসহ বহু গুণে গুণান্বিত এক মডেল ব্যক্তিত্ব। জীবনে সকল কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন ও নৈতিক চারিত্রিক মৌল মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনসহ সর্বগুণে গুণান্বিত হওয়াই তাঁর একক কৃতিত্ব। কোন কিছু পাওয়ার জন্য নয় আজীবন ত্যাগের মহিমা নিয়ে প্রবলভাবে কাজ করেছেন বিধায় তিনি আজো অমর অক্ষয়। জেলার সকল শ্রেণি-পেশার গুণীজনদের মাঝে তিনি আজীবন প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন এবং থাকবেন। সকল হৃদয়ে তিনি চিরস্থায়ী শ্রদ্ধার আসনে ঠাঁই পেয়েছেন বিধায় কারো দৃষ্টিতে তিনি সুনামগঞ্জের সেরাদের সেরা আবার কারো দৃষ্টিতে তিনি সুনামগঞ্জের সোনার মানুষ।

জন্ম ও পরিচিতি

মুহাম্মদ আব্দুল হাই ১৯২৭ সালের ২৩ মে হযরত শাহ আরেফিন (রহ.)-এর স্মৃতিধন্য সুনামগঞ্জ পৌরসভার আরপিন নগরের বিখ্যাত তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৩৩] তাঁর পিতার নাম আব্দুস সামাদ তালুকদার এবং মাতার নাম মুর্শিদা খাতুন চৌধুরী। ৬ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বাবা-মার পঞ্চম সন্তান। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ আব্দুল হাই চৌধুরী। পরিবারের সবাই আদর করে তাঁকে 'গোলাপ মিয়া' বলে ডাকতেন। গোলাপ মিয়া নামেই তিনি এলাকায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার জগতে তাঁর 'হাসন পছন্দ' নামটি অধিক প্রচলিত ছিল। নিজেকে মরমী কবি হাছন রাজার একজন প্রকৃত ভাবশিষ্য জ্ঞান করে বিজ্ঞ আদালতে হলফনামা প্রদানের মাধ্যমে তিনি এ নামটি ধারণ করেন।[৩৩৪] 'নকীব' ছদ্মনামেও তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[৩৩৫]

৩৩৩. ইমানুজ্জামান মাহী সম্পাদিত, *সময়ের স্মৃতিতে বহুমাত্রিক প্রতিভা মুহাম্মাদ আব্দুল হাই* (সিলেট : চৈতন্য প্রকাশনী, ২০১৯), পৃ. ৩৬

৩৩৪. আল হেলাল, সুনামগঞ্জের সোনার মানুষ হাসন পছন্দ, *বজ্রকণ্ঠ*, সুনামগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর ২০০১, পৃ. ২

৩৩৫. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

আরপিন নগর কে. বি. মিয়া (কাদির বক্স মিয়া) মক্তবে মুহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। ১৯৪০ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি উক্ত মক্তব থেকে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং সমগ্র আসাম প্রদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সুনামগঞ্জ জেলার গৌরব বৃদ্ধি করেন।[৩৩৬] ১৯৪৮ সালে সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে সুনামগঞ্জ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করলেও কেবলমাত্র মুহাম্মদ আব্দুল হাই কৃতকার্য হন। ১৯৫১ সালে তিনি সিলেটের বিখ্যাত এম.সি কলেজে বি.এ ক্লাসে ভর্তি হন। এম.সি কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে সিলেটের যে কোন কলেজে পুনরায় ভর্তি হবার অধিকার হারানোসহ তিনি বহিস্কৃত হন।[৩৩৭] পরবর্তীতে বহু চেষ্টা তদবীর করে ১৯৫৪ সাল সিলেটের মদনমোহন কলেজ থেকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে তিনি স্নাতক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান। কিন্তু পরীক্ষার মাত্র ১০ দিন পূর্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হলে এবং দেশে ১৯২(ক) ধারা জারি হলে তিনি গ্রেফতার হন ও কারাবরণ করেন। অনেক প্রচেষ্টার পর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে স্নাতক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ৪৩ জন কারাবন্দী পরীক্ষার্থীর মধ্যে একাই ডিস্ট্রিংশনসহ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৩৩৮] ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ঐ সময় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় তখন সর্বত্র ত্রাণ কমিটি গঠন ও লঙ্গরখানা খোলা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সুনামগঞ্জ মহকুমা রিলিফ কমিটি গঠন করে লঙ্গরখানা চালুর মাধ্যমে দুস্থ মানুষদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের কাজ চলছিল। এর সম্পাদক ছিলেন কমরেড বরুণ রায়। বরুণ রায়ের গ্রেফতারের পর পরবর্তী সম্পাদক নির্বাচিত হন জনাব আব্দুল হাই। এমতাবস্থায় শিক্ষাজীবনের ইতি টেনে ১৯৫৬ সালে তিনি সুনামগঞ্জে ফিরে আসেন এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের ত্রাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সুনামগঞ্জ শহরসহ আশপাশ এলাকায় ১৬টি লঙ্গরখানা চালু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে তিনি অনাহারী মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেয়ার এক মহান মানবতাবাদী মিশনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি টানলেন বটে; কিন্তু মানবতার নবতর প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন।

---

৩৩৬. ফজলুর রহমান, *সিলেটের আরও একশ একজন*, ঢাকা এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৩৭১

৩৩৭. প্রাগুক্ত

৩৩৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনীতি

শৈশব কৈশোরেই আব্দুল হাইয়ের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে ১৯৪৮ সাল থেকেই ন্যাট্য চর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান বিরোধী জনমত গঠনের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। স্থানীয়ভাবে সর্বপ্রথম এ আন্দোলনের সূচনা করেন ছাত্র নেতা আব্দুল হাই।[৩৩৯] ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে সুনামগঞ্জ কলেজে ভাষা সংক্রান্ত প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন করেন আব্দুল হাই। ঐ সময় তিনি সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে কয়েকটি সারগর্ভ নিবন্ধ রচনা করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৯৫১ সালের ১লা বৈশাখ ভাষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে সুকৌশলী আব্দুল হাই বর্ষবরণ উপলক্ষে মীর কাসিম নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিলে পুলিশ নাটকের পাণ্ডুলিপি জব্দ করে। পরে পাণ্ডুলিপি ছাড়াই পুরাতন কলেজ প্রাঙ্গণে তিনি নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং সমবেত ছাত্র জনতার উদ্দেশ্যে ভাষা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়ে অগ্নিঝরা বক্তব্য দেন।[৩৪০] ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এইচ.এম.পি স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় জনাব আব্দুল হাইকে আহ্বায়ক করে সুনামগঞ্জ মহকুমা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[৩৪১] তার সুদক্ষ নেতৃত্বে সুনামগঞ্জে ভাষা আন্দোলন সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কিছুদিন সিলেট কারাগারে আটক রাখা হয়। জনাব আব্দুল হাই-এর মত মহান ভাষা সৈনিকদের ত্যাগের মহিমায় আজ বাংলা শুধু রাষ্ট্রভাষাই নয়; বরং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় উন্নীত হয়েছে। জীবদ্দশায় তেমন স্বীকৃতি না পেলেও ২০০১ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে স্থানীয় শহীদ আবুল হোসেন মিলনায়তনে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখার জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক তিনি মরণোত্তর সম্মাননায় ভূষিত হন।[৩৪২]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন জনাব আব্দুল হাই। তিনি সুনামগঞ্জ সর্বদলীয় স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। বালাট সাবসেক্টর পরিচালনায় গঠিত ৮ সদস্য বিশিষ্ট বেসামরিক কমিটির তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য।[৩৪৩] বাংলাবাজার এলাকায় শরণার্থী শিবির স্থাপন করে অসহায় লোকদের তিনি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন রণাঙ্গনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনাসহ শরণার্থীদের খাবার সংগ্রহ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অস্ত্র বণ্টনের মত

---

৩৩৯. *সুনামগঞ্জের সোনার মানুষ হাসন পছন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩৪০. প্রাগুক্ত

৩৪১. প্রাগুক্ত

৩৪২. *সাপ্তাহিক সুনামগঞ্জ বার্তা*, সুনামগঞ্জ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৫

৩৪৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন জনাব আব্দুল হাই। এ ছাড়াও ৫নং সেক্টরের অধিনস্থ বালাট সাবসেক্টরের তথ্য ও প্রচার দপ্তরের গুরুদায়িত্বও পালন করেন মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই। যুদ্ধকালীন দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাইকেল চলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের এবং সুনামগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অভিযানের খরব সংগ্রহ করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও আকাশবাণীতে প্রেরণ করতেন[৩৪৪] যা নিয়মিত প্রচারের ফলে মুক্তিযুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এ ছাড়া ২৫ শে মার্চ 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত' শিরোনাম দিয়ে জনমত নামক একটি মুক্তিযুদ্ধ বুলেটিন প্রকাশ করেন।[৩৪৫] মুক্তিযুদ্ধে তাঁর নানামুখী তৎপরতা ও পদক্ষেপ আজো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

১৯৪৭ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে রেফারেন্ডাম আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন জনাব আব্দুল হাই। আবার ১৯৫৪ সালের মুসলিম লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে পুরো মহকুমার ৫টি আসনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের স্বপক্ষে নির্বাচনী জনসভাগুলোতে অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদানের পাশাপাশি মুখ্য সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫১ সালের ১৬ নভেম্বর গঠিত অসম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন সিলেট জেলা ছাত্র ইউনিয়ন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন জনাব আব্দুল হাই।[৩৪৬] পরে যুবলীগে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে গঠিত সুনামগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রথম কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের রাজনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারী করলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং কিছুদিন কারাভোগ করেন। জনাব আব্দুল হাই এর রাজনীতি ছিল মানুষের জন্য, দেশের জন্য সর্বোপরি মানবতার জন্য। ভোগ নয় বরং ত্যাগ, এ মহান শিক্ষাই তিনি তাঁর রাজনীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

শিক্ষকতা ও শিক্ষার সম্প্রসার

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের জারিকৃত সামরিক শাসনের ফলে রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার পর বসে না থেকে গ্রাম বাংলায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে মানুষ গড়ার সংগ্রামে তিনি নিয়োজিত হন। ১৯৫৮ সালেই তিনি বর্তমান দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার প্রাচীন বিদ্যাপীঠ জয়কলস উজানীগাঁও রশিদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে মহান পেশা শিক্ষকতায় যোগ দেন।[৩৪৭] জয়কলস

৩৪৪. আব্দুস শহীদ, স্মৃতিতে একজন আব্দুল হাই, সাপ্তাহিক সুনামগঞ্জ বার্তা, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১৭; *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

৩৪৫. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

৩৪৬. আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩৪৭. ডা. মোরশেদ আলম, বহুমুখী প্রতিভাবান মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, *দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর*, জুলাই ২৯, ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতাসহ নানা কারণে স্কুলটি বন্ধ হবার উপক্রম হলে ম্যানেজিং কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাঁর বলিষ্ঠ কার্যনির্বাহে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলটি নবজীবন লাভ করে পূর্ণ উদ্দ্যমে চালু হয়। দায়িত্ব পালনকালে তিনি আর্থিকভাবে বিদ্যালয়টির প্রভুত উন্নতি সাধন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় স্কুলটি পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এক পর্যায়ে তিনি সুনামগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে তিনি হাজী মকবুল পুরকায়স্থ (এইচ.এম.পি) হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। একটানা দীর্ঘদিন এ পদে আসীন থেকে এ প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। দীর্ঘদিন সরকারী অনুদান বঞ্চিত এ প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি তাঁর অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টায় নবজীবন দান করেন। স্কুলটিতে তিনি স্কাউটের শাখাও চালু করেন। ১৯৬৪ সালে তাঁর সুনিপুণ নেতৃত্বে বিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুল হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে।[৩৪৮] এই স্কুলের স্বীকৃতি প্রাপ্তির বিষয়ে একটি সুন্দর ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইনস্পেক্টর অব স্কুলস জনাব সৈয়দ বেলায়েত হোসেন স্কুল পরিদর্শনে আসলে প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা চলছিল; এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল হাই স্কুল পরিদর্শনের ব্যাপারে ইনস্পেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইনস্পেক্টর বলে উঠলেন, "আব্দুল হাই যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সে স্কুল পরিদর্শনের প্রয়োজন নেই।" এভাবেই স্কুলটি স্বীকৃতি পেয়েছিল।[৩৪৯] ইনস্পেক্টরের ছোট উক্তি থেকে জনাব আব্দুল হাই এর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ১৯৭৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রধান শিক্ষক থাকাবস্থায় তিনি সুনামগঞ্জ শহরের মেট্রিক পরীক্ষায় বার বার ফেল করা ছাত্রদের নিজ স্কুলে জড়ো করে বিনা বেতনে পড়িয়ে ও তত্ত্বাবধান করে পাশ করিয়েছেন।

আব্দুল হাই ছিলেন আপাদমস্তক একজন শিক্ষক। তিনি ছিলেন অনুকরণীয়, আদর্শিক জ্ঞানের অধিকারী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, শালীন ও মার্জিত চরিত্রের গুণাবলিসম্পন্ন এক মহান পুরুষ। উত্তম আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা, কথা ও কাজে মিল রাখা, আদর্শ প্রচারে কৌশলী ও সাহসী হওয়া, শিক্ষকতাকে পেশা ও নেশা হিসেবে লালন করা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসাসম্পন্ন হওয়া, নিয়মিত জ্ঞানচর্চা করা, মেধা বিকাশে সহায়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেয়া, সকল শিক্ষার্থীদের সমান দেখা, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভে উৎসাহিত

৩৪৮. প্রাগুক্ত
৩৪৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করা, দরদী মন নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভুলগুলো শুধরে দেয়া ইত্যাদি অমূল্য বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার অপূর্ব সমাহার ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তিনি মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে অটল থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩৫০] তিনি অভিভাবকের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখাশোনা করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতেন। জনাব আব্দুল হাই এর দেখানো এ পথ ও অমূল্য শিক্ষা আমাদের বর্তমান প্রজন্মের জন্য অনুসরণ করা একান্ত অপরিহার্য।

সাংবাদিকতা ও সাহিত্য কর্ম

সুনামগঞ্জের সাংবাদিকতার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত আব্দুল হাই পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম সুনামগঞ্জ প্রেসক্লাবের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৬২-৬৪ ও ১৯৬৪-১৯৬৯ দু'মেয়াদে সুনামগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রথম ও দ্বিতীয় কার্যকরী কমিটিতে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলা সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ১৪ আগস্ট প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে তাঁর সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে 'দেশের দাবী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৫৮ সালের ২৬ জুলাই পর্যন্ত পত্রিকাটি সগৌরবে টিকে ছিল। দেশে সামরিক শাসন জারী হলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৩৫১] ১৯৬২ সালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সুনামগঞ্জ থেকে সাহিত্য পত্রিকা 'সুরমা' প্রকাশিত হয়। তিনি দীর্ঘদিন 'সুরমা' সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সফল সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে পাক্ষিক হিসেবে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর লগ্নে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে 'জনমত' নামে তিনি একটি বুলেটিন প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার পর জনাব আব্দুল হাই-এর সম্পাদনায় প্রথমে অর্ধ সাপ্তাহিক 'দেশের কথা' ১৯৭২ সালে এবং পরে ১৯৭৩ সালে সাপ্তাহিক 'সূর্যের দেশ' নামে দু'টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৩৫২] এ ছাড়া তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রতিনিধি হিসেবেও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। এক কথায় তাঁর হাতে সুনামগঞ্জের সাংবাদিকতায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। এ মহান ব্যক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা, পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্যজন সাংবাদিকতা পেশায় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

---

৩৫০. ফাতেমা চৌধুরী স্বপ্না, আরপিননগর তালুকদার বাড়ীর এক প্রথিতযশা পুরুষ আব্দুল হাই, বজ্রকণ্ঠ, পৃ. ২১

৩৫১. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৩৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

জনাব আব্দুল হাই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ৫৬ সাল বা তারও আগে থেকেই তাঁর সাহিত্য ও কাব্য চর্চা চলতে থাকে। তাঁর প্রকাশিত দু'টি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। এগুলো হলো 'উতলা বাতাসে' এবং 'উত্তাল তরঙ্গ' যা যথাক্রমে ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৫৩] ১৯৭৭ সালে দেওয়ান গনিউর রাজার সঙ্গীতের উপর 'গনি সংগীত' ও 'ভাইবে রাধা রমন বলে' শীর্ষক দু'টি গানের সংকলন তিনি রচনা করেন। হাছন গীতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি লিখেছেন, "হাছন রাজার গান কি ছিল, কি হয়েছে এবং কি হওয়া উচিত?" হাছন রাজার জীবনী ও কাব্য সংগীত নিয়ে 'উদাস হাছন রাজার কথা' প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে হাছন রাজাকে উপস্থাপন করেছেন সগৌরবে।[৩৫৪] তাছাড়া 'হাছন রাজার গান' নামে একটি পুস্তিকা ও 'দর্শনের দর্শন' নামে একটি রম্য রচনা তিনি প্রকাশ করেন। ১৯৭৫ সালে হাছন রাজা স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'মাটির পিঞ্জিরার মাঝে' তিনি সম্পাদনা করেন। এছাড়া তিনি 'বিগত প্রচ্ছদে' নামক একটি কবিতা সংকলন ১৯৭৯ সালে সম্পাদনা করেন।[৩৫৫] তা ছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে ১৯৮১ সালে 'সাতফুল একজোড়া একলিপি' শিরোনামে তাঁর রচিত ৭টি কবিতার একটি পকেট বই সুনামগঞ্জ রহমানিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির বিনিময় মূল্য লেখা ছিল 'যথমন তুল্য'। তাঁর রচিত গান, কবিতা ও কাব্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন দেশের গুণী কবি ও সাহিত্যিকরা। তাঁর গানের মূল্যায়ন করে অধ্যাপক রামেন্দু ভূষণ রায় যথার্থই বলেছেন : "তাঁর রচনার উপাদান সুদূর বিস্তৃত। তাঁর কল্পনাও বহুদূরগামী। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলি থেকে শুরু করে আধুনিক দিনের ঢেউ তাঁর গানে দোলা দিয়েছে। এক কথায় হাজার বছরের বাংলার অমিয় কথা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন আধুনিক ভাষা ও আঙ্গিকের আবরণে।"[৩৫৬] অধ্যাপক শাহেদ আলী যথার্থ বলেছেন : "... গান কটির উপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ মনে হলো এ যেন এক আবিষ্কার। যেন বহুদিগন্তের চেনা মানুষের সাথে নতুন করে পরিচয়। অন্তরে বৈরাগীর লাউ নিয়ে কত সংসারী মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই ভেবে বিস্মিত হই।"[৩৫৭]

সামাজিক কৃতিত্ব

১৯৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শহরের সেরা বই পাঠক নির্বাচিত হন জনাব আব্দুল হাই। ছোটবেলা থেকেই বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠে তাঁর গভীর মনযোগ ছিল। 'জানতে হলে পড়তে হবে' এ নীতিকে

---

৩৫৩. *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৩৫৪. *সুনামগঞ্জের সোনার মানুষ হাসন পছন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩৫৫. *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৩৫৬. মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, *উত্তাল তরঙ্গে* (সুনামগঞ্জ : মুর্শিদী প্রেস, ১৯৭৭), পৃ. অভিমত

৩৫৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে ধারণ করে তিনি নিজ বাড়িতে গড়ে তোলেন এক বিশাল লাইব্রেরি। তাঁর বাড়ি ভর্তি ছিল শুধু বইয়ের আলমারী। পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ তাঁর এক স্মৃতিচারণে বলেছেন : "শহরের ধনীক শ্রেণির মানুষের বাড়িতে দামি দামী আসবাব দেখেছি, তবে আব্দুল হাই সাহেবের মত বই ভর্তি আলমারী দেখিনি। আমার শৈশবে তাঁর মত ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই আর কারো ছিল কি না আমার জানা নেই। শিক্ষার জ্ঞানে-পাণ্ডিত্যে তিনি সমাজকে শুধু দিয়েই গেছেন।"[৩৫৮] বই পড়ার মাধ্যমে সমাজে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিতরণের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সুনামগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় শুরু থেকে তিনি সর্বাঙ্গীনভাবে যুক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬০, ১৯৬২-৬৩, ১৯৬৫ ও ১৯৬৮ সালে গঠিত প্রত্যেকটি কার্যকরী কমিটিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।[৩৫৯] লাইব্রেরিতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমদানীকৃত বই ও পত্র-পত্রিকার যোগানও দিতেন আব্দুল হাই। তাঁর নিজ বাড়িতে তাঁর বড় ভাই আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরীর নামে স্থাপিত ওয়াহেদী গ্রন্থাগারের সবগুলা বই তিনি পাবলিক লাইব্রেরিতে দান করেন। ১৯৬১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি গঠিত সুনামগঞ্জ আর্টস কাউন্সিলের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৪ সালে যা শিল্পকলা একাডেমিতে রূপান্তরিত হয়। শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংস্কৃতি ও সুস্থ বিনোদনের শিক্ষা সম্প্রসারে তাঁর অবদান অর্নস্বীকার্য। তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরাতন শিল্পকলা ভবনটির নামকরণ করা হয়েছে 'আব্দুল হাই মিলনায়তন'।[৩৬০]

তিনি সুনামগঞ্জের নাট্য জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। অসংখ্য নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি শিল্পী সংসদ নামে একটি সংসদ গড়ে তোলেন। এই সংসদের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সৃজন, বই সংগ্রহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। জেলার স্বনামধন্য মুদ্রণ ব্যবসায়ীও ছিলেন জনাব আব্দুল হাই। স্টিমারযোগে কলকাতা থেকে লেটার প্রেস মেশিন সুনামগঞ্জে এনে নিজ মায়ের নামে শহরের কামারখালি ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় 'মুর্শেদী প্রেস' স্থাপন করেন। এ প্রেস থেকেই তিনি নিজ সম্পাদিত দেশের দাবী, সুরমা, দেশের কথা, সাপ্তাহিক সূর্যের দেশ প্রকাশ করতেন।[৩৬১] সমগ্র সুনামগঞ্জের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেই প্রেস। দেশ স্বাধীনের পর শহরের প্রগতিশীল নেতাকর্মী সমর্থকদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন স্বেচ্ছাসেবী অরাজনৈতিক সমাজ উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান

---

৩৫৮. পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ, সুনামগঞ্জের উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম আব্দুল হাই, *সুনামগঞ্জ বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩৫৯. সুনামগঞ্জের সোনার মানুষ হাসন পছন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৩৬০. প্রাগুক্ত
৩৬১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

'সোভিয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি'। এ সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন সময়ের প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী বৃত্তি নিয়ে রাশিয়ায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করে।[৩৬২] সমাজ তথা নিজ এলাকার যুব সমাজকে সামাজিক কল্যাণকামিতার দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে তিনি আজীবন সাধনা করেছেন।

শেষজীবন ও মৃত্যু

জীবনের শেষের দিকে জনাব আব্দুল হাই-এর মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবন থেকে অনেকটা সরে গিয়ে তিনি ভাববাদী জগতে প্রবেশ করেন। সারাক্ষণ ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। জড়জগৎ ছাড়িয়ে যেন অজড় জগতে, অদৃশ্য জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন। হয়ত তখন তিনি তাঁর শাশ্বত স্বরূপ দেখতে পাচ্ছিলেন যা তাঁর ভেতর থেকে বের হয়ে তাঁরই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। হয়ত তাঁর চিন্তা ও চেতনায় প্রেম, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা মিশে তাঁর ভোগবাদী সত্তাকে দূরে বহুদূরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সূফী দার্শনিকের মত নিরাসক্ত এক সত্তা, এক পুরুষ। এমতাবস্থায় একজন সফল সাধক মানুষের ন্যায় ১৯৮৩ সালের ২৫ এপ্রিল শহরের গুলবাগ রেস্টুরেন্টে একটি চেয়ারে বসে মাথা নুয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ই মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩৬৩] পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত একটি মাত্র সাধারণ বসতঘর, স্ত্রী, তিন মেয়ে এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেননি। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, "We live in deeds not in yeard". অর্থাৎ

জীবনের পরিমাপ দৈর্ঘ্য দিয়ে নয়
কর্ম মাঝে জীবনের মিলে পরিচয়।

বাস্তবিক তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

ব্যক্তি আব্দুল হাই : মূল্যয়ন

জনাব আব্দুল হাই ছিলেন খুবই সহজ সরল ও নিরহংকারী। তিনি কোনদিন বংশ গৌরব বা বিত্ত-বৈভবের অহংকার করতেন না। সমাজে নিজেকে সর্বদা জৌলুসহীনভাবে উপস্থাপন করতেন। তিনি কখনো তাঁর নামের আগে বা পরে 'তালুকদার', 'চৌধুরী' এসব পদবী ব্যবহার করেন নি, করতে পছন্দও করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখ সারির যোদ্ধা জনাব আব্দুল হাই সামন্তবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই ১৯৪৭ সালেই তিনি নিজ নাম থেকে পারিবারিক টাইটেল 'চৌধুরী' কেটে বাদ দেন। উনার তিন মেয়ের নামের শেষে চৌধুরীর পরিবর্তে তাঁর মায়ের নাম যুক্ত

৩৬২. প্রাগুক্ত
৩৬৩. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তাঁর ভাতিজা আনোয়ার হোসেন চৌধুরীকে স্কুলে ভর্তি করার সময় চৌধুরী কর্তন করে তিনি শুধু আনোয়ার হোসেন নামে ভর্তি করেন।[৩৬৪] আব্দুল হাই ছিলেন স্বল্পভাষী, গুরুগম্ভীর ও রাশভারী স্বভাবের লোক। চালচলনে ছিল আভিজাত্যের ছাপ। পোশাক-আশাকে ছিলেন সর্বদা পরিপাটি। সব সময় ইস্ত্রী দেয়া সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পরতেন। জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ পিপাসা। সুনামগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে তিনি ছিলেন এক মহান শিক্ষাগুরু। শুধু শিক্ষা নয় সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, নাটক সর্বোপরি মানব ও সমাজসেবা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর উত্তরসূরিদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যখন যেখানে যেমনভাবে প্রয়োজন তিনি নিজেকে সেখানে তেমনিভাবে নিয়োগ করেছেন। অন্তরে-বাহিরে তিনি ছিলেন এক সাদা মনের মানুষ, কারো বিরুদ্ধেই তাঁর মনে কোন অভিযোগ ছিল না। সুনামগঞ্জের নানা সমস্যা সমাধান এবং পশ্চাদপদ এ জনপদের উন্নয়নেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গেছেন। কিন্তু বিনিময়ে কারো নিকট থেকে কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন নি।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব আব্দুল হাই শুধু একটি নাম নয়–একটি ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠান। আজকের প্রজন্মের জন্য তিনি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান। তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি আজো সুনামগঞ্জবাসীর জন্য আজীবন প্রেরণার উৎস। তাঁকে নিয়ে গবেষণা করা আজকের সময়ের দাবী।

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী (১৯২৯-২০০৫)

বাংলাদেশের গবেষণা, সাহিত্য, শিক্ষা ও লোক সংস্কৃতির বিশাল অঙ্গনে মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী ছিলেন একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেদীপ্যমান। গকেষণাকর্মে দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা, সত্যানুসন্ধানে একাগ্রতা, যুক্তি প্রতিষ্ঠা, নির্লিপ্ততা, নিরাসক্ততা, নিরপেক্ষতা, পরিশ্রম, অনুশীলন প্রভৃতি দুর্লভ গুণের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে অনেক গবেষকের মধ্যে এ সব গুণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় না। মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী এসব বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর গবেষণাকর্ম সততার ঔজ্জ্বল্যে, বুদ্ধির তেজোদ্দীপ্ততায় ও নির্মোহ বিশ্লেষণের প্রাবল্যে উজ্জ্বল। নিজ জন্মভূমিকে তিনি অনেক বেশি ভালোবাসতেন। খ্যাতি, বিত্ত, অনুরাগ-বিরাগ, সম্মাননা প্রভৃতি সাময়িক সন্তুষ্টির যাবতীয় উপকরণকে অবলীলাক্রমে অবহেলা করে সত্য উদঘাটনে তিনি সদা তৎপর ছিলেন। গবেষণাকর্ম ও সত্যানুসন্ধানের যে শিক্ষা তিনি আমৃত্যু সম্প্রসারণ করেছেন, সত্যনিষ্ঠা ও যুক্তির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণের যে বাগান তিনি পরিচর্যা করেছেন, তার ফসল দীর্ঘদিন এ দেশেরে লোকজন আনন্দে ভোগ করবে।

৩৬৪. রুমানা জামান, আরপিন নগরের গোলাপ দাদা, *সুনামগঞ্জ বার্তা*, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ও পরিবার পরিচিতি

সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার লুদরপুর গ্রামে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী পরিবারে মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬৫] তাঁর পিতার নাম মৌলভী ওসমানুল্লাহ এবং মায়ের নাম মসতুরা খাতুন। তাঁর পিতামহ শেখ ধনাই ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তিনি ফার্সিতে চমৎকার শের রচনা করতেন। তিনি তাঁর মা-বাবার ছয় সন্তানের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। গ্রামে হলেও শিক্ষিত পরিবারে মুহাম্মদ আসাদ্দর আলীর জন্ম। তাঁর পিতা সেকালের পাঠশালা পাস ছিলেন। তিনি কলকাতায় সামুদ্রিক জাহাজে চাকরি করতেন। তাঁর মাতা নিজ গ্রামে মুন্সী আয়ান উদ্দিনের বাড়ির বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।[৩৬৬]

শিক্ষাজীবন

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলীর লেখাপড়া শুরু হয় বাড়িতে মা বাবার কাছে। তাঁদের গ্রামে তখন কোন বিদ্যালয় ছিল না। লুদরপুর থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সৈয়দপুরে পাঠশালায় তিনি কিছুদিন পড়াশুনা করেন। এরপর বেশ কিছুদিন তাঁর লেখাপড়া বন্ধ থাকার পর তিনি ভর্তি হন সৈয়দপুর ৭২ নম্বর পাঠশালায়। সুনামগঞ্জ লোকেল বোর্ডের পাঠশালা থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তখন তাঁর পিতা উৎসাহিত হয়ে তাঁকে সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলি হাইস্কুলে ভর্তি করান ১৯৫২ সালে। স্কুলের মুসলিম হোস্টেলে তিনি দীর্ঘ ছয় বছর আবাসিক ছাত্র ছিলেন। এখান থেকে তিনি ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী চার বছর সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজে পড়াশুনা করেন। এ কলেজ থেকে তিনি ১৯৬০ সালে আই.এ এবং ১৯৬২ সালে বি.এ পাশ করেন। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৫ সালে এম.এ পাশ করেন। একই বছর টেলেন্ট স্কলারশিপ হোল্ডার হিসেবে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে অতিরিক্ত বিষয় 'এডুকেশন্যাল থিসিস'সহ প্রথম বিভাগে বি.এড পাশ করেন। সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ বিভাগে এম.এড কোর্সে ভর্তি হন।[৩৬৭] কিন্তু পারিবারিক কারণে কোর্সটি শেষ করতে সক্ষম হননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগেও তিনি বছরখানেক পড়াশুনা করেন। এভাবেই তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

৩৬৫. প্রফেসর নন্দলাল শর্মা, *রচনা সমগ্র-১* (ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা, ১০ জুলাই, ২০১৩), পৃ. ২২৬

৩৬৬. প্রাগুক্ত

৩৬৭. ড. মুহম্মদ হুমায়ুন কবীর, *অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী শিকড় সন্ধানী একজন সত্যনিষ্ঠ গবেষক*, ১৯৯৪, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলীর কর্মজীবন একেবারে সংক্ষিপ্ত। প্রথম জীবনে একজন আত্মীয়ের সহায়তায় তিনি ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর একজন সহপাঠী কলেজের শিক্ষক বন্ধুর পরামর্শে মাত্র ৩০০ টাকা মাসিক বেতনে সিলেট মদনমোহন কলেজে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেন। কয়েকমাস চাকুরী করার পর আর্থিক দিক থেকে ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে চাকুরী ছেড়ে আবার এক বন্ধুর সাথে যৌথভাবে আমদানী ব্যবসা শুরু করেন। কয়ের বছর পর বন্ধুর অকাল মৃত্যু হলে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ কমে যাওয়ায় ব্যবসাতে আর অগ্রসর হননি। এমনকি চাকুরীর মন মানসিকতাও অবশেষে হারিয়ে ফেলেন।[৩৬৮]

সংসার জীবন

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী ১৯৭৬ সালের ১ আগস্ট গোলাপগঞ্জ উপজেলার রফিপুর গ্রামের সিরাজ উদ্দিন চৌধুরীর কন্যা নূরুন্নাহার চৌধুরীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। নূরুন্নাহার চৌধুরী ১৯৭২ সালে ঢাকা ইডেন গার্লস কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। তাদের একমাত্র কন্যা তাইয়ীবা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স পাশ করে সিলেট স্কলার্সহোমে রসায়ন বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর স্বামী এ.বি.এম খোরশেদ আলমও স্কলার্সহোমে গণিতের সহকারী অধ্যাপক। সংসার জীবনে মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী অত্যন্ত সুখী ছিলেন।

সাহিত্য জীবন

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলীর সাহিত্য চর্চা ছাত্রজীবন থেকেই শুরু হয়। তিনি বইপড়া, বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের প্রতি ছোটবেলা থেকে আকৃষ্ট হন। স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাবস্থায় তিনি নিজ বাড়িতে পিতা-মাতা ও বড় ভাইয়ের সামান্য সংখ্যক কয়েকখানা বই নিয়ে একটি পারিবারিক লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। বছরে দু'চার বার ঢাকা গিয়ে ফুটপাত থেকে অতি কম দামে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয় করতেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পূর্বে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থের সংখ্যা দুই হাজার অতিক্রম করেছিল।[৩৬৯] এত অল্প বয়সে নিভৃত এক পল্লীতে এ ধরনের লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার নিদর্শন এক বিরল দৃষ্টান্ত। লাইব্রেরির বই পড়ার মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞানের সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁর এ অবদান চির নন্দিত হয়ে আছে।

স্কুল জীবনের শেষ দিকে একটানা তিন বছর তিনি জুবিলী স্কুলের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যত নাম করা মাসিক পত্রিকা বের হতো সবগুলোর তিনি গ্রাহক

---

৩৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৩৬৯. *রচনা সমগ্র-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন।[৩৭০] তিনি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগার এবং সিলেট শহরস্থ ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রের গ্রন্থাগারেও অনেক বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা তাঁর সংগ্রহ থেকে দান করেছেন। এছাড়া সিলেট বিভাগের অনেক সংস্থা, সংগঠন এবং পাঠাগার প্রভৃতিতে তিনি প্রচুর বই-পত্র দান করেছেন।[৩৭১]

কবিতা, গান, গল্প প্রভৃতি প্রথম জীবনে লিখলেও মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী একজন নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে পাণ্ডিতমহলে স্বীকৃত। বি.এড অধ্যয়নকালে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে 'এডুকেশন্যাল থিসিস' রচনার মাধ্যমে তাঁর গবেষণাকর্মের যে হাতেখড়ি, আমৃত্যু সে গবেষণার ধারাবাহিকতায় তিনি অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন, শিক্ষা ও জ্ঞানের রাজ্যকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করেছেন। দীর্ঘদিন গবেষণায় মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী সিলেটের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন। সিলেটী ভাষার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ডুব দিয়ে বহুসংখ্যক মণিমুক্তা আহরণের মাধ্যমে সিলেটী ভাষার শব্দসম্ভার, বাগধারা, লিপি, লোকসাহিত্য সম্ভার, নিজস্ব ভাষা ও লিপিতে বিধৃত লিখিত সাহিত্যসম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নৃতত্ত্ব ও ভৌগোলিক প্রাচীনত্ব এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের মূল্যবান শিক্ষা এবং এর উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে সিলেটী ভাষাকে একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ভাষা এবং সিলেটবাসীদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র জাতি সত্তার অধিকারী হিসেবে দাঁড় করানোর সার্থক প্রয়াস পেয়েছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী।[৩৭২]

বাংলা সাহিত্যের অনেক বিতর্কিত বিষয়ের সমাধান করেছেন মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী। চর্যাপদের ভাষা বিশ্লেষণ করে তিনি এর সংগে সিলেটী ভাষার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। 'সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় জালালাবাদ' এবং 'চর্যাপদে সিলেটী ভাষা' এ দু'টি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন চর্যাপদের কবিগণ সিলেট অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন।[৩৭৩] মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানকে চট্টগ্রামের অধিবাসী হিসেবে দাবী করে ড. আহমদ শরীফ তাঁর পিএইচ.ডি থিসিস রচনা করেন। অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী 'মহাকবি সৈয়দ সুলতান' নামক বই লিখে ড. আহমদ শরীফের দাবি যে সত্য নয় তা প্রমাণ করেছেন। তিনি সৈয়দ সুলতানের বিভিন্ন লেখা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন সৈয়দ সুলতান সিলেটের লোক ছিলেন।[৩৭৪] তিনি প্রমাণ করেছেন 'ময়মনসিংহ গীতিকা' বলে প্রকাশিত গ্রন্থের অধিকাংশ গীতিকা সিলেটে রচিত।[৩৭৫] দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মোহাম্মদ কবীর এবং

৩৭০. রাগিব হোসেন চৌধুরী, একজন আসাদ্দর আলী তাঁর জন্যে সিলেটবাসীকে একশ' বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। *আসাদ্দার রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, ২০০২, পৃ. ৫৭২-৫৭৩

৩৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪

৩৭২. ড. মুহম্মদ হুমায়ুন কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩৭৩. ফরীদ আহমদ রেজা, অধ্যাপক আসাদ্দর আলীর কাছে আমাদের ঋণ

৩৭৪. প্রাগুক্ত

৩৭৫. *রচনা সমগ্র-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

মোহাম্মদ সগীরও যে আদৌ চট্টগ্রামবাসী নন তা দেখানোর জন্য মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী 'দৌলত, মাগন, কবীর, সগীর-এ চার রত্ন কি সিলেটের ছিল না?' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি সিলেটী ভাষার সাথে উল্লিখিত কবিগণের কাব্যে ব্যবহৃত ভাষার মিল এবং চট্টগ্রামী ভাষার সাথে বেমিলের ভিত্তিতেই প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন তারা চট্টগ্রামী নন; বরং তারা ছিলেন সিলেটী।[৩৭৬]

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী দীর্ঘ তিন দশক ধরে বৃহত্তর সিলেটের ফোকলোর সংগ্রহ ও গবেষণা করেছেন। তাঁর ফোকলোর চর্চার মূল্যায়ন করে ড. গোলাম কাদির লিখেছেন : "সিলেটের সাহিত্য, ভাবী সমাজ ও জীবনের কথা তিনি বলতে চেয়েছেন গবেষণার সত্যের আলোতে। নির্মোহ তত্ত্ব ও ঐতিহ্যেরে লালনে তিনি একনিষ্ঠ, নির্মম সত্যের প্রকাশে তিনি সোচ্চার কণ্ঠ। লোক সাহিত্যের সংগ্রহের ক্ষেত্রে যতটা তাঁর চেয়ে ভাষা বিশ্লেষণে মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী অধিকতর দৃশ্যমান। ভাষা ও সমাজতাত্ত্বিক সূত্রে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও নৃতত্ত্বের বৃহত্তর ও জটিল ক্ষেত্রে প্রসারতা পায় লোক সাহিত্য। সিলেটের লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলীর জ্ঞান ও মুন্সীয়ানা সন্দেহাতীত।"[৩৭৭] সিলেট অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ ও আলোচনায় মুহাম্মদ আসাদ্দর আলীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। 'সিলেট জেলার প্রবাদ-প্রবচন প্রসঙ্গ' শীর্ষক তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে মাসিক জালালাবাদ ষষ্ঠ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (জুন-জুলাই ১৯৬৯) প্রকাশিত হয়। তিনি সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় বাগধারার উপরও কাজ করেছেন। এ সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "মনের সাধারণ ভাব ব্যক্ত করা ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষার ভেতর আবেগ-আবেদন, ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাস্য-কটাক্ষ, প্রেম নিবেদন, প্রীতি সম্ভাষণ প্রভৃতি যাবতীয় মনের ভাব ব্যক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে।"[৩৭৮] উক্ত প্রবন্ধে তিনি ১০০ সিলেটী বাগধারার অর্থ সিলেটী ভাষার বাক্যে প্রয়োগ এবং বাক্যকে প্রমিত বাংলায় রূপান্তর দেখিয়েছেন। যাতে জীবনঘনিষ্ঠ অনেক শিক্ষা লুকায়িত আছে।

দীর্ঘ তিন দশক লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণা করার পর তিনি ১৯৯৫ সালে 'লোক সাহিত্যে জালালাবাদ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাংলা লোকসাহিত্য, বিচার বিশ্লেষণের ইতিহাসে গ্রন্থটি একটি মূল্যবান সংযোজন। তিনি সিলেটের মরমী সাহিত্যের উপরও প্রচুর কাজ করেছেন। ইতিহাসে বিস্মৃত অনেক মরমী সাধকদের পরিচিতি এবং তাদের জীবনধর্মী শিক্ষা তিনি তাঁর 'সিলেটের মরমী সাহিত্যের

---

৩৭৬. হারুন আকবর, মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী : আপন অবয়বে, *আল-ইসলাহ*, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৮৫-৮৬

৩৭৭. ড. গোলাম কাদির, ভূমিকা, সৈয়দ মোস্তফা কামালের 'ঐতিহ্যের সোনালী অধ্যায় : সিলেটের লোক সাহিত্য প্রসঙ্গে', সিলেট, ১৯৮৮, পৃ. ৩-৪

৩৭৮. মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সম্পাদিত, কাফেলা, সিলেট, ৩য় সংকলন, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত ধারা' শীর্ষক গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। সিলেটের নাগরী লিপি ও সাহিত্য সম্পর্কে মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী একজন সত্যনিষ্ঠ গবেষক। তিনি 'সিলেটীদের মাতৃভাষা ও সিলেটী নাগরী', 'সিলেটী নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রভৃতি লিখনীর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্বেও এই জ্ঞানবৃদ্ধ ধ্যানী তাপস জরা-বার্ধক্যকে জয় করে তারুণ্যের আবেগ ও যৌবনের দৃঢ়তা ধারণ করে অবিরাম লিখনীর মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসার করেছেন। তাঁর প্রতিটি গবেষণা কর্ম ও লিখনী সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণে বৌদ্ধিক প্রজ্ঞায় ও পাণ্ডিত্যের মননশীলতায় শ্রীমণ্ডিত।

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী : রচনাবলি ও সম্পাদনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী তাঁর সমগ্র জীবনভর অসংখ্য গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অগণিত ম্যাগাজিন ও সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. সিলেটের মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারা, ১৯৮২

২. মহাকবি সৈয়দ সুলতান, ১৯৯০

৩. চর্যাপদে সিলেটী ভাষা, ১৯৯৩

৪. লোকসাহিত্যে জালালাবাদ, ১৯৯৫

৫. সিলেটী নাগরী হরফে সিলেট বিভাগের মুসলমানদের বাংলাভাষায় সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা, ১৯৯৬

৬. মহাকবি শেখচান্দ, ১৯৯৬

৭. সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় জালালাবাদ, ১৯৯৬

৮. বাংলা একাডেমীর প্রকাশনাসহ কিছু গবেষণাগ্রন্থ প্রসঙ্গে, ১৯৯৬

৯. ময়মনসিংহ গীতিকা বনাম সিলেট গীতিকা

১০. পুঁথি শহর চরিত এবং আগাজ পুঁথি এবাদতে মগজ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ

১১. সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ, ১৯৯৮

১২. সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় রকীব শাহ, ১৯৯৮

১৩. ছিলোটি ভাষা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

১৪. ছিলটি প্রবাদ-প্রবচন, ১৯৯৯

১৫. জালালাবাদ ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, ১৯৯৯

১৬. সিলেটের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ২০০১

১৭. সিলেট ধন্য যাদের গুণে, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

১৮. গৌরবময় সিলেট বিভাগ, ২০০২

১৯. আসাদ্দর রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, ২০০২; ২য় খণ্ড, ২০০৩; ৩য় খণ্ড, ২০০৩; ৪র্থ খণ্ড, ২০১১।

সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে (১৯৫২-৫৮) তিনি হাতে লিখে চমৎকার দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেন। সিলেট এম.সি কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি 'বিচিত্রা' নামে সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেন। তিনি নিজ এলাকা জগন্নাথপুরের সৈয়দপুর থেকে ষাটের দশকের প্রথম দিকে ১৬০ পৃষ্ঠার সাহিত্যপত্র 'কাকলি' সম্পাদনা করেন।[৩৭৯] ১৯৭৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে তাঁর সম্পাদনায় 'সিলেট একাডেমী পত্রিকা' বের হয়। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে সিলেটে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির অষ্টম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন আসাদ্দর আলী। 'সিলেট দর্পণ' নামক পত্রিকাটি দীর্ঘদিন তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে সিলেট একাডেমী থেকে 'সিলেট একাডেমী' নামে যে বিশেষ প্রকাশনাটি প্রকাশিত হয়, এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন আসাদ্দর আলী। ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি মাসিক আল-ইসলাহ এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁর লেখা প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ

গবেষণা কর্মে অসামান্য অবদানের জন্য মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী যে সব সাহিত্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন তা নিম্নরূপ :[৩৮০]

১. লায়লা রাগিব স্মৃতি পুরস্কার পদক - ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

২. জালালাবাদ যুব ফোরাম এর 'একুশে পদক' - ১৯৯০।

৩. সিলেট নাট্যালোক আয়োজিত সংবর্ধনা ও পদক - ১৯৯০।

৪. বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল স্টুডেন্টস এওয়ার্ড - ১৯৯০।

৫. মহাকবি সৈয়দ সুলতান সাহিত্য ও গবেষণা পুরস্কার- ১৯৯৫।

৬. রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক এওয়ার্ড - ১৯৯৮।

৭. রকীব শাহ পরিষদ কর্তৃক সম্মাননা - ১৯৯৮।

৮. আল হেলাল সাহিত্য সংসদ কর্তৃক সম্মাননা - ২০০১।

৯. রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার - ২০০২।

১০. সিলেট মোবাইল পাঠাগার কর্তৃক সম্মাননা - ২০০২।

---

৩৭৯. মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, জগন্নাথপুরের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, জগন্নাথপুরের কথা, সম্পাদক, রাগিব হোসেন চৌধুরী, ১৯৯৭, পৃ. ৫৯-৬১

৩৮০. *রচনা সমগ্র-১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

১১. Human Development Organization (HDO) পদক - ২০০২।

১২. Millenium Award-২০০৩।

১৩. কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ সাহিত্য পুরস্কার - ২০০৪।

১৪. বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার - ২০০৫।

১৫. রোটারেন্ট ক্লাব অব সিলেট সিটি সম্মাননা পদক - ২০০৫।

পরলোকগমন

মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী দীর্ঘকাল ধরে ডায়বেটিস আক্রান্ত ছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর চোখের সমস্যাও ছিল। তারপরও সমানতালে তিনি পঠন-পাঠন চালিয়ে গেছেন। ২০০৫ সালের ১২ এপ্রিল হঠাৎ করে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।[৩৮১] মৃত্যুর দু'দিন আগেও তিনি একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। পরদিনও একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করার কথা ছিল। আসলে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবার সুযোগও পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লে লেখক, সাহিত্যিক ও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ১৩ এপ্রিল বুধবার বাদ যোহর হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজার সংলগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে নামাযে জানাযা শেষে মাজার সংলগ্ন গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবলি

ব্যক্তি জীবনে মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী ছিলেন অত্যন্ত সৎ, প্রচারবিমুখ, খোদাভীরু, বন্ধু বৎসল, নিরহংকার এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। 'জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করে' এ আপ্তবাক্যের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। চলন বলন এবং স্বভাব চরিত্রে কখনও কোন দাম্ভিকতা ছিল না। অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন সব সময়। 'বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ' এ মহান শিক্ষা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু গ্রন্থকীটই ছিলেন না, গ্রন্থ সংগ্রহ করাও তাঁর আজীবনের প্রধান শখ হিসেবে গণ্য ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর। পাজামা, পাঞ্জাবী ও টুপি এই ছিল তাঁর বাইরের পোশাক। বাইরে বের হলে অধিকাংশ সময় ছাতা ও ব্যাগ হাতে থাকত। কখনও উঁচু স্বরে কথা বলতেন না। দুঃখ পেলেও কখনও রাগ করতেন না। অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। আজীবন গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণই ছিল তাঁর জীবনের

---

৩৮১. *দৈনিক জালালাবাদ*, সিলেট, ১৩ এপ্রিল, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

ব্রত। পরনিন্দা-পরচর্চা প্রভৃতি থেকে দূরে থাকার শিক্ষা তিনি প্রচার করেছেন। ধর্মীয় অনুশাসনগুলো তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। পরধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল। সময়ের কাজ তিনি সর্বদা সময়েই করতেন। জন্মভূমির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই বৃহত্তর সিলেটের শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করে তিনি জন্মভূমির ঋণ পরিশোধে সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আব্দুল হামিদ মানিক লিখেছেন : "একটি পরিচ্ছন্ন জীবন বোধের অধিকারী আসাদ্দর আলী ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী, হারাম-হালাল ভেদ বিচারবোধ তাঁর অত্যন্ত তীব্র, পদে পদে হিসেবী, অন্যের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, নিরহংকার অনুচ্চভাষী আসাদ্দর আলীর সুশৃঙ্খল জীবন যাপন পদ্ধতি পরিচিত জনদের মুগ্ধ করে। প্লেন লিভিং এন্ড হাই থিংকিং বলতে যা বুঝায় আসাদ্দর আলী তারই যেন জীবন্ত প্রতীক। অন্যকে উপরে তুলে ধরে আত্মতৃপ্তি লাভের উদারতাসম্পন্ন আসাদ্দর আলী প্রথম থেকেই প্রচারবিমুখ। তাঁর সহজ-সরল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যের উপকারের নীরব প্রচেষ্টা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রকেই মুগ্ধ করে।"[৩৮২] হারুন আকবরের মতে : "সাহিত্য চর্চায় তিনি সততা, স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনেও এর প্রয়োগ ও প্রতিফলন ছিল দৃশ্যমান। তাঁর দায়িত্ববোধ, কর্তব্য পরায়ণতা ছিল শিক্ষণীয় ব্যাপার।"[৩৮৩] মাহবুব জামান চৌধুরীর মতে : "গবেষণাকর্ম ছিল তাঁর সাধনা, জীবন চর্চারই অনুষঙ্গ। বৃদ্ধ বয়সেও খাটাখাটনিতে ছিলেন ক্লান্তিহীন। সেই সাথে অন্যরাও সাহিত্য চর্চায় মেতে উঠুক, মনে প্রাণে চাইতেন।"[৩৮৪]

শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত অধ্যাপক আসাদ্দর আলী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন নি সত্য; কিন্তু বাস্তবিক অর্থে নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠান থেকে সমগ্র জীবনভর গবেষণা ও জীবনধর্মী নানাবিধ শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছে। তাঁর গবেষণা কর্ম ও জীবনচরিত গোটা দেশ ও জাতির জন্য অনুকরণীয়।

---

৩৮২. আব্দুল হামিদ মানিক, কর্মের আলোকে উৎসভিসারী এক নাবিক, *দৈনিক জালালাবাদ*, সিলেট, ১২ এপ্রিল, ২০০৯

৩৮৩. হারুন আকবর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

৩৮৪. মাহবুব জামান চৌধুরী, আমার শিক্ষক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, *আল-ইসলাহ*, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত আলিম-ওলামাগণ

মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক (জ. ১৯৪৫)

মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক একাধারে ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আপোষহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ও মর্দে মু'মিন। তিনি আপন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক আদর্শ শিক্ষাবিদই শুধু নন; বরং একজন সমাজ হিতৈষী হিসাবেও সমধিক পরিচিত। তাকওয়া-পরহেযগারী, চারিত্রিক মাধুর্য ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী এ আলেমে দ্বীন একজন সুবক্তা হিসেবেও সুধিমহলে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

জন্ম

মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলাধীন দোলারবাজার ইউনিয়নের জাহিদপুর গ্রামে ১৯৪৫ সালের ১৮ জানুয়ারি এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম সুফী ইসমাইল (সুফী সাহেব) একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি ছিলেন এবং মাতা আলহাজ্ব সিতারা বেগম একজন পরহেযগার ও গুণবতী নারী।[৩৮৫]

শিক্ষাজীবন

মাতা পিতার একান্ত আগ্রহ ছিল ছেলেকে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করে আলেমে দ্বীন হিসেবে গড়ে তোলা। শৈশবে পিতা গ্রামের মক্তবে তাঁকে ভর্তি করেন এবং মরহুম হরমুজ আলী ছাহেবের নিকট তিনি কুরআন শরীফ খতম করেন। অতঃপর জাহিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে বিশ্বনাথ উপজেলাধীন সিরাজপুর কাজিবাড়ী দাখিল মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় ৬ বছর অধ্যয়ন করার পর ১৯৬৩ সালে সৎপুর আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তখনকার সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যে কয়টি বিখ্যাত মাদরাসা ছিল তন্মধ্যে সৎপুর আলিয়া মাদরাসা ছিল অন্যতম।

১৯৭০ সালে যখন তাঁর ফাযিল ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয় এবং তিনি সৎপুর আলিয়া মাদরাসার কামিল ১ম বর্ষের ছাত্র তখন তিনি অত্র মাদরাসার ছাত্র সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে, তুমুল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের বিদায় ঘটে। শেষ পর্যন্ত দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

---

৩৮৫. মাওলানা শায়খ তাজুল ইসলাম, *চলমান জালালাবাদ : ইসলামী রেনেসাঁয় অনন্য যাঁরা* (সিলেট : প্রতিজ্ঞা সাহিত্য ফোরাম, অক্টোবর ২০০৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক জীবন

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়ার কেন্দ্রীয় সদস্য এবং স্থানীয় ছাত্র নেতা হিসেবে বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে যান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের দাবীতে আইয়ূব-মুনায়েম সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৬৬-৬৭-৬৮ সালে প্রত্যেকটি আন্দোলনে ও সংগ্রামে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া তৎকালীন সরকার (আয়ূব-মুনায়েম)-এর ইসলাম বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে ছাত্রনেতা হিসেবে বিভিন্ন আন্দোলনে সাহসী ও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউ.কে এন্ড আয়ারল্যান্ড শাখার এবং ইউ. কে উলামা সোসাইটির বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ইউ.কে তাফসীর মাহফিল কমিটি নামক একটি সংগঠনেরও প্রতিষ্ঠাতা।[৩৮৬]

মাওলানা ইছহাক দুটো গ্রন্থ রচনা করেছেন যা এখন ছাপার অপেক্ষায়। একটি হচ্ছে– 'শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযার নামায ও দোয়া' এবং অপরটি হলো 'ঈমানের মূল এশকে রাসূল (সা.)'।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে অবদান

মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক ১৯৭২ সালে নিজ গ্রামের জাহিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কামিল পরীক্ষায় অংশ নেন এবং কামিল ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ৬ (ছয়) বছর শিক্ষকতার পর পালপুর মাদরাসায় (ছাতক থানার অন্তর্গত) সুপারিন্টেনডেন্ট পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দাখিল শ্রেণির সরকারী অনুমোদন আদায় করতে সক্ষম হন। ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে বৃটেন চলে যান এবং গ্রেটার মানচেস্টার শহরে ওল্ড হাম মদীনা মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের খতীব হিসেবে কাজে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, এই নতুন মসজিদটির উদ্বোধন তিনি নিজেই করেন। এখানে প্রায় ৮ বছর খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত শহরের আরেকটি জামে মসজিদ 'গ্লড উইক জালালাবাদ জামে মসজিদ'-এর খতীব হিসেবে আরো ৩ বছর দায়িত্ব পালন করেন (১৯৯৬-৯৯)। বিলাতে পৌঁছেই তিনি প্রবাসী মুসলমান সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিভাবে তাদের ইসলামী শিক্ষা দেয়া যায়, কিভাবে বিরূপ পরিবেশের একটি দেশে মুসলমানদের সন্তানদের মুসলমান হিসেবে টিকিয়ে রাখা যায়, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা তাঁর মনের মধ্যে দারুণভাবে রেখাপাত করে। কিন্তু বিলাতের মতো দেশে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল

---

৩৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

এবং দুরূহ ব্যাপার। তাই বৃটেনে বহু আলেম উলামা ও দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশী অনেক কম ব্যক্তিই আছেন যারা এমন সাহস করতে পারেন। মাওলানা ইছহাক অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অসামান্য ঝুঁকি নিয়ে এই মহান কাজে হাত দেন। তিনি ওল্ডহাম জামেয়া আল জালালিয়া নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০০ সাল থেকে মাদরাসায় নিয়মিত ক্লাস এবং হিফয শাখা সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। তাঁর উদ্দেশ্য এটাকে উচ্চ পর্যায়ের একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা। তিনি মাদরাসার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা ট্রাষ্টি। তিনি অত্র মাদরাসার বর্তমান প্রিন্সিপাল হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।[৩৮৭]

মাওলানা নূরুল ইসলাম খান (জ. ১৯৫১)

শায়খুল হাদীস মাওলানা নূরুল ইসলাম খান দ্বীনি ইল্‌ম বিতরণের ক্ষেত্রে এক আত্মনিবেদিত ব্যক্তিত্ব। সামাজিকভাবে দ্বীনের তা'লিম প্রচার ও প্রসারে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ ও বাগ্মী-ওয়ায়েয হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে।

জন্ম

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দরগাহপুর গ্রামে ৩ জানুয়ারি ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম সৈয়দ খান এবং মাতা মরহুমা উজ্জ্বলা খানম।[৩৮৮]

শিক্ষাজীবন

জামেয়া ইসলামিয়া দরগাহপুর মাদরাসায় তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। তিনি জামেয়া ইসলামিয়া দরগাহপুর মাদরাসা থেকে আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম বোর্ডের অধীনে ফযীলত চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার্থে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান। সেখানে ১৩৮৯ হিজরীতে সীমান্ত প্রদেশের কাসিমুল উলুম মাদরাসায় তাকমীল ফিল হাদীসে ভর্তি হন এবং সেখানে তিনি আল্লামা মুফতী মাহমুদ (র.)-এর নিকট বুখারী শরীফ পড়ার সৌভাগ্য হাসিল করেন। হাদীসের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। সেজন্য ১৩৯০ হিজরীতে তিনি নুসরাতুল উলুম গুজরানওয়ালাতে পুনরায় তাকমীল ফিল হাদীসে ভর্তি হয়ে আল্লামা সরফরাজ খান (ছফদর) সাহেবের কাছে বুখারী শরীফ পড়ার সুযোগ লাভ করেন। এরপর তিনি ইলমে তাফসীরের প্রতি মনোযোগী হন। ১৩৯১ হিজরীতে হাফিজুল হাদীস শায়খুত তাফসীর আল্লামা

---

৩৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

৩৮৮. সম্পাদনা পরিষদ, *হেরার আলো*, সুনামগঞ্জ, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ দরখাস্তী (র.)-এর কাছে তাখাসসুস ফিত তাফসীর অধ্যয়ন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।[৩৮৯]

হজ্জব্রত পালন

তিনি ২০০৩ সালে প্রথম হজ্জব্রত পালন করেন। তাছাড়া তিনি আরও কয়েকবার পবিত্র হজ্জ ও উমরাহ পালন করেন।[৩৯০]

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে অবদান

১৩৯৩ হিজরীতে তিনি নিজ গ্রামের দারুল উলূম দরগাহপুর মাদরাসায় শায়খুল হাদীস পদে যোগদানের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে কার্যক্রম শুরু করেন। বর্তমানে তিনি দারুল উলূম দরগাহপুর মাদরাসার মুহতামিম হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ আলেমে দ্বীন দারস ও তাদরীসের পাশাপাশি ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি সুনামগঞ্জ পূর্ব বাজার জামে মসজিদের খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি সুনামগঞ্জ জেলা তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের সভাপতি। তাছাড়া তিনি বেশ কিছু সামাজিক ও দ্বীনি সংগঠন ও সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে ফেদায়ে মিল্লাত মাওলানা আসআদ মাদানীর কাছে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর অসংখ্য কৃতিছাত্র দেশ-বিদেশে বিভিন্ন শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দ্বীনি খেদমতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (রহ.) (১৯৫৪-২০২০)

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.) ছিলেন একজন বরেণ্য আলিমে দ্বীন, আশিকে রাসূল, আবিদ ও পবিত্র কুরআনের একনিষ্ঠ মহান খাদিম। বাস্তব জীবনে তিনি যেমন ছিলেন ইলমে দ্বীনের পতাকাবাহী একজন সফল কর্মবীর তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও ছিলেন উঁচু মাপের বুযুর্গ। বিনয়ী, উদার মানসিকতা ও শান্ত স্বভাবের একজন ঈমানদীপ্ত মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি 'বুরাইয়ার হুজুর' নামে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন।

জন্ম

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.) সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার সবুজ ছায়াঘেরা নিভৃত পল্লী ঘোড়াডুম্বুরে ১৯৫৪ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাজী রুশন আলী ও মাতা মোছাঃ আফতাবান বিবি।

---

৩৮৯. সম্পাদনা পরিষদ, *দস্তারবন্দী মহাসম্মেলন স্মারক*, সুনামগঞ্জ, ২০০৪, পৃ. ৩২

৩৯০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

প্রাকৃতিক ও জন্মগতভাবে তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.) গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলির জ্ঞান অর্জন শুরু করেন। পরবর্তীতে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের অধীনে সিলেট সদর উপজেলায় অবস্থিত হাউসা আলিম মাদরাসা ও ছাতক উপজেলার লাকেশ্বর দাখিল মাদরাসা শাখা কেন্দ্রে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা অর্জন করেন। তাছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষাও সমাপন করেন। অতঃপর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসায় ১৯৬৬ সালে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৬৯ সালে দাখিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৭১ সালে আলিম ১৯৭৩ সালে ফাযিল ও ১৯৭৫ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তাছাড়া তিনি শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)-এর নিকট থেকে ১৯৭৪ সালে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন।[৩৯১]

আধ্যাত্মিক জীবন

ছাত্রাবস্থায় তিনি যামানার মুজাদ্দিদ, আধ্যাত্মিক সম্রাট আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর হস্ত মুবারকে বায়আত গ্রহণ করে ধীরে ধীরে তাসাউফের উচ্চশিখের পৌঁছেন এবং স্বীয় মুর্শিদের নিকট থেকে তরিকতের খিলাফত লাভ করেন। তিনি তাঁর পীর ও মুরশিদের অনুমতি ক্রমে ১৬টি স্থানে নিয়মিত খানকাহ মাহফিল পরিচালনা করেন। স্থানগুলো হচ্ছে– বুরাইয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা, ঘোড়াডুম্বুর হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা, লতিফিয়া ইরশাদিয়া দাখিল মাদরাসা (গোয়াহরী), খাইরুল ওয়ারা হাফিজিয়া মাদরাসা সিচনী, রসুলগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ (জগন্নাথপুর), হলিয়ারপাড়া জামে মসজিদ (জগন্নাথপুর), আক্তারপাড়া বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, সিঙ্গেরকাছ বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, আলমপুর জামে মসজিদ, জাহিদপুর জামে মসজিদ, পালপুর জামে মসজিদ, বরাটুকা মেওয়াতৈল জামে মসজিদ, মাওলানা আব্দুস সালাম (র.) তেলিকোনী সাহেবের বাড়ি, তেলিকোনা বাদশাহ মিয়া সাহেবের বাড়ি, জালালপুর আব্দুল মতিন সাহেবের বাড়ি, ভাটিপাড়া জামে মসজিদ তাছাড়া অনিয়মিতভাবে আরো ৪টি স্থানে খানকাহ মাহফিলের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

---

৩৯১. মোহাম্মদ মঈনুর ইসলাম পারভেজ, ইলমে দ্বীনের মহান খাদিম; হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.), www.MNBD24.com. ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জব্রত পালন

তিনি ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম হজব্রত পালনের জন্য পবিত্র ঘর কাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পবিত্র মক্কা মুকাররামায় হজ্জের কার্যাদি সমাপন ও মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারত শেষে বাড়িতে ফিরে আসেন। মোট ১১ বার তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণে অবদান

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.) ১৯৭৫ সালে বুরাইয়া কামিল মাদরাসায় সহকারী মাওলানা পদে যোগদান করে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে সহকারী মাওলানা পদটি প্রভাষক (আরবী) পদে রূপান্তরিত হলে তিনি বুরাইয়া কামিল মাদরাসার প্রভাষক (আরবি) পদে সমাসীন হন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে প্রভাষক (আরবি) পদে থাকাবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট বুরাইয়া কামিল মাদরাসায় পবিত্র কুরআনের খিদমতে ছিলেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত একাধারে সুদীর্ঘ ৩০ বছর ফুলতলীতে দারুল কিরাত প্রধান কেন্দ্রে নিঃস্বার্থভাবে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছেন ঘোড়াডুম্বুর হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা। তাছাড়া ছিলেন দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট বুরাইয়া কামিল মাদরাসা শাখার সভাপতি ও ঘোড়াডুম্বুর হাফিজিয়া মাদরাসা শাখার নাজিম। একাধারে ১২ বছর বুরাইয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে এবং ১৫ বছর ঘোড়াডুম্বুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মোতাওয়াল্লী ও ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন। একজন দ্বীনের খাঁটি সেবক ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়ায-নসিহত ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পথহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দানের নিমিত্ত তিনি গোটা জীবন অতিবাহিত করেন। ইলমে কিরাতে তাঁর লক্ষাধিক ছাত্র রয়েছেন যারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কুরআন মজীদ বিশুদ্ধরূপে তিলাওয়াতের শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছেন। তাছাড়া সুদীর্ঘ ৪০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে অসংখ্য শিক্ষার্থীর অন্তরে শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত করেছেন। কুরআন সুন্নাহদীপ্ত এ খাদিমের নিকট থেকে হাজারো শিক্ষার্থী সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দেশ বিদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত রয়েছেন।[৩৯২]

ইন্তেকাল ও জানাযা

ইলমে দ্বীনের মহান খাদিম, বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির ঘোড়াডুম্বুরী (র.) ১লা সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে ফযরের নামায সমাপনান্তে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে অসংখ্য শিক্ষার্থী ও

৩৯২. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ, প্রাগুক্ত, www.MNBD24.com. ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

ভক্ত মুরিদানদের কাঁদিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে বিশাল জানাযার নামাযে ইমামতি করেন তাঁর পীর ও মুরশিদ রাহনুমায়ে তরিকত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর সুযোগ্য ছাহেবজাদা বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র সভাপতি হযরত মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী। জানাযা শেষে নিজ বাড়ির পূর্ব পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মুফতি মাওলানা আবুল কালাম যাকারিয়া (রহ.) (১৯৫৬-২০১৯)

জন্ম

মুফতী মাওলানা আবুল কালাম যাকারিয়া (রহ.) ১৯৫৬ সালে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাধীন বাগুয়া গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা লালা মিয়া একজন সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মাতা খায়রুন্নেসা ছিলেন পূণ্যবতী, আবেদা, যাহেদা মহিলা।[৩৯৩]

শিক্ষাজীবন

মুফতি মাওলানা আবুল কালাম যাকারিয়া (রহ.) তাঁর মহীয়ষী মায়ের তারবিয়াতে শিশু বয়স থেকেই ধর্মানুরাগী হয়ে উঠেন। তাঁর বয়স যখন ৫-৬ বছর তখন ১৯৬৩ সালে স্বীয় গ্রামের বাড়ির পাশেই সাতগাঁও বাগুয়া জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসা নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উক্ত মাদরাসায় ১৯৬৫ সালে ভর্তি হয়ে একাধারে ছয় বছর অধ্যয়ন করেন। অতঃপর সুনামগঞ্জ জেলার জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া রামনগর মাদরাসায় কিছুদিন অধ্যয়ন করে বর্মা উত্তর বানীপুর মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে কাফিয়া জামাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯৭৩ সালে সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহজালাল (র.) মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে একাধারে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে ১৯৭৮ সালে দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। তিনি আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করেন।[৩৯৪]

রচনাবলি

তিনি একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত। ১৯৮৮ সালে 'হায়াতে ঈসা (আ.)' নামে তাঁর লিখা শতাধিক পৃষ্ঠার একটি বাংলা প্রামাণ্য বই প্রকাশিত হয়। তাছাড়া 'বাইবেলের ইতিকথা ও স্বরূপ' নামে একটি পাণ্ডুলিপি এখন অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। 'সত্যের আলোর মুখোশ উন্মোচন' নামে

---

৩৯৩. *ইসলামী রেনেসাঁয় অনন্য যারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩-২৪

৩৯৪. *ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সুনামগঞ্জের কওমী মাদরাসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। বুখারী শরীফের ২৮ নম্বর পারার বঙ্গানুবাদও করেছেন তিনি। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক সংকলিত হাদীসের কিতাব 'কিতাবুল আসার' এর একটি আরবী দীর্ঘ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাছাড়া তাঁর রচিত তাফসীরে বায়যাভী-এর উর্দু ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তাকরীরে কাসিমী' একটি সমাদৃত কিতাব।[৩৯৫]

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণে অবদান

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপন করে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৮৯ সালে জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহ.) মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে তিনি সুখ্যাতির সাথে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ক কিতাবাদি শিক্ষা দান করেন। তিনি জটিলতর বিষয়কে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনার মাধ্যমে সহজলব্ধ করে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন। ফলে তিনি ছাত্রদের মধ্যমণিতে পরিণত হন। তিনি জামেয়ার প্রাক্তন সদরুল মুদাররিসীন, বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় মাওলানা মুফতী রহমত উল্লাহ (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে ফতোয়া লেখালেখির কাজ শুরু করেন। ১৪০১ হিজরী সনে জামেয়া থেকে মুফতী রহমত উল্লাহ শিক্ষক পদ থেকে অব্যাহতি নিলে ফাতোয়া বিভাগের পুরো দায়িত্বটা কার্যত মুফতী আবুল কালাম যাকারিয়া (রহ.)-এর উপর চলে আসে। পরবর্তীতে তিনিই এ বিভাগের প্রাণপুরুষে পরিণত হন। ১৪১৭ হিজরীতে জামেয়া তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহ (ইসলামী আইন শাস্ত্রে গবেষণা ও রিসার্চ বিভাগ) চালু হওয়ার পর থেকে ঐ বিভাগের প্রধান হিসেবে মৃত্যু অবধি দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ১৪২২ হিজরীর শেষ দিকে জামেয়ার শিক্ষা বিভাগের নায়েবে নাজিমে তা'লিমাত পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ২০০৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মুহতামিমের দায়িত্ব সুনামের সাথে পালন করেন। জামেয়া কাসিমুল উলুম থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত 'ফুযালা পরিষদ' এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত 'মাসিক আদর্শ' (অনিয়মিত)-এর সম্পাদকের দায়িত্ব মৃত্যু অবধি পালন করেন। তাছাড়া ঐ পরিষদেরই মুখপত্র 'মাসিক আল কাসিম'-এর সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৪২৩ হিজরীর শুরুতে তিনি আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ এর সংকলন-সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিভাগ দু'টির নাযিম (সম্পাদক) নিযুক্ত হন। এরপর থেকে তাঁর রচনা ও সম্পাদনায় বোর্ডের বাংলা, উর্দু, আরবী অনেক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'খাদিমুল কুরআন পরিষদ' সিলেট-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মৃত্যু অবধি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

---

৩৯৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তেকাল ও জানাযা

দ্বীনের এ মহান খাদিম ২০১৯ সালে তার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট এ অবস্থানরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা মাঠে বিশাল জানাযা শেষে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযার প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা আব্দুস সালাম আল-মাদানী (জ. ১৯৫৯)

মাওলানা আব্দুস সালাম আল মাদানী একাধারে একজন প্রাজ্ঞ আলিম, শিক্ষাবিদ, মুফাসসীর, লেখক, গবেষক ও সমাজ সেবক। দীর্ঘদিন থেকে দ্বীনের একজন দাঈ হিসেবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। একজন বাগ্মী হিসেবে সুধীজনের কাছে তিনি সমধিক পরিচিত।

জন্ম

মাওলানা আব্দুস সালাম আল মাদানী ১৯৫৯ সালের ২৬ মার্চ, ১৫ রমজান বৃহস্পতিবার রাতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলাধীন দোলারবাজার ইউনিয়নের চাঁনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মাওলানা আনজব আলী ও দাদা আলহাজ্ব ইয়াকুব আলী এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পিতা মাওলানা আনজব আলী উত্তর ভারতের প্রখ্যাত রামপুর আলিয়া মাদরাসা থেকে ইলমে হাদিসের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, সিলেট রেফারেন্ডাম, পাকিস্তান আন্দোলনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর মাতা রহিমা বেগম। তিনি একজন পর্দানশীল ও পরহেযগার মহিলা হিসেবে এলাকায় সুপরিচিতা।[৩৯৬]

শিক্ষাজীবন

তিনি অতি শৈশবেই গ্রামের মক্তবে সদুখালী নিবাসী মৌলভী ক্বারী ছমিরুদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে পবিত্র কুরআনে কারীম শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী মঈনপুর পাঠশালায় ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা শেষে ১৯৬৮ সালে বুরাইয়া কামিল মাদরাসায় মক্তব চতুর্থ বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৭০ সালে সৎপুর দারুল হাদীস কামিল (এম.এ) মাদরাসায় দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ১৯৭৪ সালে দাখিল, ১৯৭৬ সালে আলিম ও ১৯৭৮ সালে ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৮ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় কামিল (হাদীস) প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৮০ সালে কামিল (হাদিস)

---

৩৯৬. আব্দুস সালাম আল-মাদানী, *আমার আব্বা আমার আম্মা* (সিলেট : পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, আগস্ট ২০২০), লেখক পরিচিতি।

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৮১ সালে কামিল (তাফসীর) বিভাগে অধ্যয়নকালে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ নিয়ে ১৯৮২ সালে সৌদি আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াহ বিভাগে ভর্তি হয়ে প্রথম বিভাগে ১৯৮৭ সালে লিসান্স ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরেন। ১৯৭৯ সালে তিনি রাঈসূল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.)-এর কাছ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন। তিনি বুরাইয়া কামিল মাদরাসা, হযরত শাহজালাল ডি.ওয়াই কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট ও গোবিন্দনগর ফজিলিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা কেন্দ্রে রামাদ্বান মোবারকে ইলমে কিরাতের খিদমত করেছেন। দেশে-বিদেশে তাঁর উস্তাদগণ হচ্ছেন– আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (রহ.), আল্লামা গোলাম হুসাইন সৎপুরী (রহ.), শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান, মাওলানা আব্দুস সালাম তেলিকুনী (রহ.), মাওলানা ইরশাদ হুসেন গুয়াহরী (রহ.), মাওলানা রইছ উদ্দিন হামজাপুরী (রহ.), মাওলানা আব্দুল হাই ছাতক, ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী, প্রফেসর ইয়াকুব শরীফ, খতীব মাওলানা উবায়দুল হক (রহ.), মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী, মাওলানা আনোয়ারুল হক কাসেমী। বিদেশে– শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায, ড. ছালেহ আল আবুদ, ড. লতিফ, ইমামুল হারাম, ড. আলী আল হুজাইফী, ইমামুল হারাম ড. ইব্রাহীম আখদার প্রমুখ।[৩৯৭]

হজ্জব্রত পালন

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সে দেশের সবক'টি এলাকা ব্যাপক সফর ছাড়া ও তিনি ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো, তাশখন্দ ও বৃটেন সফর করেছেন। ১৯৮২ সালে হজ্জ্ব আদায়সহ এযাবৎ মোট ৭ বার পবিত্র হজ্জ্ব আদায় করেছেন।[৩৯৮]

রচনাবলি

শিক্ষকতা ও সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মাওলানা আব্দুস সালাম আল মাদানী আরবী ভাষায় 'খালিদ বিন ওয়ালিদের রণ নৈপুণ্য', বাংলা ভাষায় 'ইবাদাতের তাৎপর্য', 'আমার আব্বা আমার আম্মা' নামক তিনটি বই রচনা করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী সমূহে নিয়মিত লিখে চলেছেন।

রাজনৈতিক জীবন

ছাত্রজীবনে মাওলানা আব্দুস সালাম আল-মাদানী বিশেষ করে মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় অধ্যয়নকালে মাদরাসা ছাত্রদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়সহ সামাজিক ও ধর্মীয় ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ

---

৩৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৩৯৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৮০/৮১ সেশনে তালাবায়ে আরাবিয়া কেন্দ্রীয় সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। স্বায়ত্বশাসিত মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে তিনি সারা বাংলাদেশ সফর করে আন্দোলন গড়ে তুলেন। ১৯৭৯ সালে রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রান্ত হলে এবং ১৪০০ হিজরীর প্রারম্ভে কাবা শরীফ আক্রান্ত হলে, রাশিয়া ও আমেরিকার দূতাবাসদ্বয় অবরোধসহ ঢাকার রাজপথে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শনে যুবক আব্দুস সালাম অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এবং আহত হয়ে কারাবরণও করেছেন। ১৯৯২ সালে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক সৎপুর আলিয়া মাদরাসায় অগ্নিসংযোগ করা হলে তিনি এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। তিনি মাজলিসুল উলামা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দাখিল, ইবতেদায়ি, হাফিজী মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৯৯]

তিনি ১৯৯১ সালে সুনামগঞ্জ-৫ (ছাতক-দোয়ারা বাজার) আসন থেকে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে ও ২০০১ সালের নির্বাচনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণে অবদান

শিক্ষাজীবনে তিনি ১৯৮১ সালে কিছুদিন বিশ্বনাথ দারুল উলূম ফাযিল মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জন করে দেশে এসে কিছুদিন বুরাইয়া কামিল মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে সৎপুর দারুল হাদিস কামিল মাদরাসায় প্রভাষক (আরবী) পদে যোগদান করে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৯৯৫ সালে গোবিন্দনগর ফজিলিয়া ফাযিল মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে অদ্যাবধি সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তিনি একজন সুবক্তা, তেজস্বী ও জেহাদী চেতনায় ভরপুর ব্যক্তিত্ব। সারা বছরব্যাপী সিলেট বিভাগে ওয়ায ও তাফসীর মাহফিলে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি 'আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার'-এর চেতানায় মানুষকে উজ্জীবিত করে থাকেন। দ্বীনের দাঈ মাওলানা আব্দুস সালাম আল-মাদানী শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে– চেয়ারম্যান, তাহফিযুল কোরআন বোর্ড বাংলাদেশ; সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় মোফাসসির পরিষদ; সহ-সভাপতি, ইত্তেহাদুল কোররা বাংলাদেশ; সভাপতি, উলামা মাশায়েখ পরিষদ সিলেট বিভাগ; আজীবন সদস্য, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ সিলেট; চেয়ারম্যান, ছাতক-দোয়ারা উন্নয়ন পরিষদ। তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ হিসেবে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে যে কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছেন তা অতুলনীয়।

৩৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দীন (জ. ১৯৬০)

পৃথিবীতে যারা নিজের কীর্তি গাঁথার স্বর্ণাস্বাক্ষর রেখেছেন, প্রতিভার আলো বিলিয়েছেন, জ্ঞান-পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন, আঁধারে দ্বীনের মশাল জ্বালিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যক্ষ মাওলানা ছমির উদ্দিন। মেধা, মননশীলতা, অধ্যবসায়, আমল-আখলাক, তাকওয়া-পরহেযগারী, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা, বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা, শিক্ষা-প্রশাসন ও সংস্থায় নেতৃত্বদান ও বাগ্মীতায় তিনি অর্জন করেছেন সুখ্যাতি। তিনি সকল গুণকে ছাপিয়ে পরিণত হয়েছেন একজন আদর্শ শিক্ষকে।

জন্ম

মাওলানা মোঃ ছমির উদ্দিন ১ জানুয়ারি ১৯৬০ সালে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার ইকড়ছই (সারং বাড়ী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ আছদ্দর উল্লাহ ও মাতা মোছাঃ ছুরত জান বিবি।[৪০০]

শিক্ষাজীবন

তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হয় গ্রামের স্থানীয় মক্তবে। তিনি মক্তবে জনাব হাফিজ ছফির উদ্দিন এর নিকট কুরআন শিক্ষাসহ প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষা সমাপন করে স্থানীয় ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। উক্ত বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন শেষে ১৯৬৭ সালে ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় মক্তব চাহারমে ভর্তি হন। তিনি ১৯৭৩ সালে ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা থেকে দাখিল চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর সুনামগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপীঠ বুরাইয়া কামিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৭৫ সালে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৭৫ সালে ঐতিহ্যবাহী সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৭৮ সালে ফাযিল (প্রাইভেট) ও ১৯৭৯ সালে কামিল হাদিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তাছাড়া তিনি ১৯৮৫ সালে রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন শামসুল উলামা হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.)-এর কাছ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন।[৪০১]

---

৪০০. শেখ মোঃ মোস্তাকিম বিল্লাহ, হযরত মাওলানা ছমির উদ্দিন সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, আলহাজ্ব আল্লামা মোঃ ছমির উদ্দিন সাহেব-এর অবসরোত্তর বিদায়ী সম্মাননা স্মারক, ২০২০, প্রকাশনায় : লতিফিয়া ছাত্র সংসদ, ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ, পৃ. ৪২

৪০১. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ, অধ্যক্ষ মাওলানা ছমির উদ্দিন এক উজ্জল নক্ষত্র, আলহাজ্ব আল্লামা মোঃ ছমির উদ্দিন সাহেব-এর অবসরোত্তর বিদায়ী সম্মাননা স্মারক, ২০২০, প্রকাশনায়: লতিফিয়া ছাত্র সংসদ, ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জব্রত পালন

তিনি ২০০০ সালে প্রথমবার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। ২০০১ সালে যুক্তরাজ্যে দাওয়াতি সফরে যান দেশে ফেরার পথে দ্বিতীয়বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। ২০০৩ সালে তৃতীয়বার, ২০০৫ সালে চতুর্থবার এবং সর্বশেষ তাঁর সহধর্মীণীকে নিয়ে ২০০৭ সালে পঞ্চমবার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন।

রাজনৈতিক জীবন

তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ জগন্নাথপুর উপজেলা শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী ২০০২ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে আঞ্জাম দেন। ২০১২ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে অবদান

তিনি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৭৯ সালের ২৮ এপ্রিল ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় সহকারী মৌলভী পদে যোগদান করেন ১৯৮১ সালের ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারি ছাতক উপজেলাধীন গোবিন্দনগর ফজলিয়া ফাযিল মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে ১৯৮৮ সালে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সাথে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১৯৮৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর শিকড়ের টানে যে প্রতিষ্ঠানে তাঁর শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনের হাতেখড়ি সে প্রাণের প্রতিষ্ঠান ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি মাদরাসাটিকে আলিম স্তরে উন্নীত করে অধ্যক্ষ পদে সমাসীন হন। ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসাটি আজ যে শক্ত ভীতের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা একমাত্র তাঁরই অবদান। মাদরাসার অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সুদীর্ঘ ৩২ বছর অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন শেষে ১ জানুয়ারি ২০২০ সালে তিনি ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

একজন দক্ষ ও ত্যাগী সংগঠক হিসাবে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তিনি মাদরাসা শিক্ষকবৃন্দের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন, বাংলাদেশ আনজুমানে মাদারিছে আরাবিয়ার দীর্ঘদিন বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন। ২০১০ সালে থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষক সমিতি জগন্নাথপুর এর

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি হিসাবে দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁকে সব সময় প্রথম সারিতে দেখা যায়। ইসলাম ও সমাজ বিরোধী যে কোনো আন্দোলনে তিনি প্রতিবাদে সরব হন, মিছিল মিটিং করেন ও রাজপথে জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোণা করেন। ষাটোর্ধ এ বয়সে সভা-সমিতিতে যথাসময়ে তার উপস্থিতি আমাদের জন্য প্রেরণার।

তিনি কয়েক যুগ ধরে বয়ানের মাঠে আছেন। বৃহত্তর সিলেটে একজন তাত্ত্বিক ওয়ায়েজ (বাগ্মী) হিসাবে তার সুখ্যাতি রয়েছে। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইসলামী আজিমুশ শান মাহফিলে কখনো প্রধান অতিথি কখনো বিশেষ অতিথি হিসেবে বয়ান করেন। তিনি বয়ানে আকাঈদি বিষয়গুলো সহজ ভাষায় জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করেন।

তার বক্তব্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই সুরে একই ধাচে থাকে। তাছাড়া একজন মুবাহিস হিসাবেও বৃহত্তর সিলেটে তার সুনাম রয়েছে। বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি আপোসহীন সিপাহসালার। শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)-এর কাছ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ গ্রহণ করে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে হবিবপুর কেশবপুর ফাযিল মাদরাসা শাখা ইলমে কিরাতের খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত গোবিন্দগঞ্জ ফজলিয়া ফাযিল মাদরাসা শাখায় নাযিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সাল থেকে অদ্যাবধি ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা শাখায় প্রধান ক্বারী হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাছাড়া দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের অধীনে শাখা কেন্দ্রসমূহের পরিদর্শক, খামিছ জামাতের পরীক্ষক এবং রাবে পরীক্ষা কেন্দ্রের হল সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি জগন্নাথপুর উপজেলা শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালনসহ বর্তমানে উপদেষ্টা হিসেবে সুপরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত রয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রায় বাঙালী দাখিল মাদরাসা, হাউসা দাখিল মাদরাসা, জগদীশপুর দাখিল মাদরাসা, নতুন জিয়াপুর দাখিল মাদরাসা।[৪০২]

রচনাবলি

তিনি একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবেও সুপরিচিত, তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইছালে সাওয়াব'। তাছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

৪০২. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজীজ (জ. ১৯৬০)

জন্ম

মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজীজ ১৯৬০ সালে ২ মার্চ সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলাধীন বিছনা গ্রামে মুন্সী বাড়ীতে এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- জোয়াদুর রহমান ওরফে সুন্দর আলী মাস্টার এলাকায় একজন সম্মানীত ব্যক্তি ছিলেন। দাদা- মরহুম আজীজ বক্স মুন্সি জামালগঞ্জ উপজেলার প্রভাবশালী মুরব্বি ও কামিল বুযুর্গ ছিলেন।[৪০৩]

শিক্ষাজীবন

নিজ গ্রামে সাবাহী মক্তব ও প্রাইমারী স্কুল থেকেই মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজীজ-এর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি উস্তাদগণের নিকট খুব প্রিয় ছিলেন। যার ফলে প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধীর বাবু কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁকে প্রাইভেট পড়াতেন। তিনি ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিছনা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর দাখিল মাদরাসায় সুনামের সাথে লেখাপড়া করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর ভগ্নিপতি কাটালিয়া গ্রামের মাওলানা তাজুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে কাটালিয়া ক্বওমী মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে ৩/৪ বছর লেখাপড়া করেন। মাওলানা মছিহুর রহমান ছাদী (র.) বালক তাফাজ্জুল হকের প্রতীভা দেখে সুনামগঞ্জের বাহাদুরপুর মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। এখানে তিনি ছরফ জামাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর সুনামগঞ্জ মাদানিয়া মাদরাসায় ২ বছর আবারও ছাদি ছাহেবের তত্ত্বাবধানে হবিগঞ্জের রায়ধর ছাদিয়া মাদরাসায় ৩ বছর, আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর মাদরাসায় ২ বছর, জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহ.) ১ বছর অধ্যয়ন করেন। ১৯৮৩ সালে আলেমকুল সম্রাট শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের নিকট ঢাকা লালবাগ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন শেষে টাইটেল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৪ সালে ঢাকা মীরপুর আরজাবাদ মাদরাসা থেকে তাফসীর বিভাগে ভর্তি হয়ে চূড়ান্ত ডিগ্রি অর্জন করেন।

রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা তাফাজ্জুল হক আজীজ ছাত্র জীবনে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিজ এলাকায় ইসলামী যুব পরিষদ নামে একটি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন অপসংস্কৃতি ও শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেন। তৎকালীন

---

৪০৩. *ইসলামী রেনেসাঁয় অনন্য যাঁরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কওমী মাদরাসার ছাত্রদের একমাত্র সংগঠন মুসলিম ছাত্র পরিষদের তিনি কেন্দ্রীয় সদস্যসহ বিয়ানীবাজার উপজেলা শাখায় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি লালবাগ দারুল উলূম মাদরাসায় অধ্যয়নকালে খেলাফত আন্দোলনের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ঢাকা তেজগাঁও থানা শাখার সহ-সভাপতি এবং সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি দু'দুবার ঢাকা মহানগরীর প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং পাঁচ বারের সহ সভাপতি হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছেন। পাশাপাশি অন্যান্য আন্দোলন সংগ্রাম যেমন ভারতে উগ্রহিন্দু কর্তৃক বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে ঐতিহাসিক লংমার্চ, '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, তাসলিমা ইস্যুসহ সকল নাস্তিক মুরতাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

রচনাবলি

সাহিত্য অঙ্গনেও তাঁর সরব পদচারণা রয়েছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নয়া দুনিয়া' পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবে ইতোমধ্যে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে– (ক) শাশ্বত মুজেজা ও আল কুরআন, (খ) ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা ও সম্পদ, (গ) ত্রিমুখী ষড়যন্ত্রের খপ্পরে বাংলাদেশ, (ঘ) দ্বীনের দাওয়াত।[৪০৪]

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণে অবদান

লেখাপড়া সমাপ্তির সাথে সাথে মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমেই কর্মজীবন শুরু হয়। প্রথমে মাওলানা মছিহুর রহমান ছাদী সাহেবের পরিচালনাধীন জামেয়া ইসলামিয়া ধর্মগঞ্জ ফতুল্লা ঢাকায় ১ বছর, মীরপুর আরজাবাদ মাদরাসায় এক বছর অতঃপর পীরজী হুজুর প্রতিষ্ঠিত ওয়াহাবুল উলূম সুভাড্ডা কেরানীগঞ্জ ঢাকায় ৪ বছর শিক্ষকতা করেন। এর পাশাপাশি কেরানীগঞ্জ কালীগঞ্জ মসজিদে পেশ ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে ঢাকা মহাখালী আরজত পাড়া জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এর প্রধান পরিচালক, পেশ ইমাম ও খতিব হিসেবে অদ্যাবধি দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। পাশাপাশি ঢাকা বিমানবন্দরস্থ বাবুস সালাম মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করছেন। তাঁর এলাকায় স্বীয় দাদা আজীজ বক্স এর নামে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া আজিজিয়া মাদরাসায় ১৯৯৭ সালে প্রধান পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এছাড়া তিনি ঢাকায় আবাবিল একাডেমী ইসলামিক কিন্ডারগার্ডেন স্কুল-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি জাতীয় পর্যায়ে বিশিষ্ট মুফাসসীরে কুরআন হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

---

৪০৪. মাওঃ শায়খ তাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় খতমে নবুওত সমন্বয় কমিটির মহাসচিব, বাংলাদেশ দুঃস্থ কল্যাণ পরিষদেও সেক্রেটারী, ঢাকার মহাখালীতে প্রগতিশীল গবেষণা সংসদেও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'জীবনের আলো' এবং চ্যানেল আই এর অন্যতম আলোচক। বাংলাদেশ বেতারের 'পথ ও পাথেয়' অনুষ্ঠানের ভাষ্যকার হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। অন্যদিকে সাহিত্য জগতেও তাঁর রয়েছে অবদান। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নয়া দুনিয়া' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।[৪০৫]

এ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী (জ. ১৯৬৩)

ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষায় মেধার স্বাক্ষর রেখে অল্প বয়সে জাতীয় রাজনীতিতে অবস্থান করে নিয়েছেন প্রত্যয়ী তরুণ আলিম এ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী। সৎ সাহসী ও নির্লুভ রাজনীতিবিদ হিসেবে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক মহলে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সুবক্তা ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে অর্জন করেছেন ব্যাপক খ্যাতি। অপসংস্কৃতির মোকাবেলা, সামাজিক মূল্যবোধ ও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। একজন সংগঠক, ইসলামী শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এ আলেমে দ্বীন, সৎ ব্যবহার, জনগণের প্রতি দরদী ও বিনয় ভূষণের অধিকারী।

জন্ম

এ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন পাটলী গ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী জনাব মাস্টার আব্দুস সাত্তার চৌধুরী। মাতা আজবুন্নেছা চৌধুরী একজন শিক্ষিকা ও দ্বীনদার, পর্দানশীন মহিয়ষী নারী ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি স্বীয় মাতা শিক্ষিকা আজবুন্নেছা চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত নিজবাড়ীর প্রাইমারী স্কুলে। পরবর্তীতে গ্রামের মক্তবে ইসলামী প্রাথমিক শিক্ষাসমাপন শেষে ১৯৭১ সালে পাটলী দারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৮০ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কাফিয়া জামায়াত (দশম শ্রেণি) পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৮০ সালে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল (র.) মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৮৫ সালে প্রথম বিভাগে দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই প্রখর মেধার অধিকারী এ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনূর

৪০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পাশা চৌধুরী সকল ক্লাসেই প্রথম স্থান অধিকারী ছিলেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ছাত্র সংসদের বিভিন্ন দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেন ও বোর্ড পরীক্ষায় বিভিন্ন সময় মেধাবৃত্তি লাভ করেন। তিনি জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল (র.) মাদরাসায় অধ্যয়নকালে ছাত্র সংসদ থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আদর্শ' নামক সাময়িকীর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ সালে বৃহত্তর সিলেট বিভাগের মেধাবী ছাত্র হিসেবে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্টস এ্যাওয়ার্ড পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে সিলেট রাজা জি.সি. উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৮৭ সালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এস.এস.সি চূড়ান্ত পরীক্ষায় লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৮৭ সালে সিলেটের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ এম.সি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৮৯ সালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচ.এস.সি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে (বি.এ) অনার্সে ভর্তি হন।[৪০৬] ১৯৯০ সালের ২২ নভেম্বর এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হলে শিক্ষা কার্যক্রমে দীর্ঘসময় বিরতির ফলে বি.এস.সি অনার্স বিষয় পরিবর্তন করে মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সিলেট থেকে ১৯৯১ সালে পাস কোর্সে উচ্চতর নম্বর পেয়ে বি.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তাছাড়া ১৯৯৫ সালে সিলেট আইন মহাবিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

রাজনৈতিক জীবন

তিনি জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল (র.) মাদরাসায় অধ্যয়নকালে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৭-৯০ সেশনে বাংলাদেশ মুসলিম ছাত্র পরিষদের পর পর দু'বার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অত্যন্ত প্রজ্ঞা, মেধা ও যোগ্যতার সাথে সংগঠনের নেতৃত্বে দেন। তিনি '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও নেতৃত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে প্রথমবার ও ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয়বার ছাত্র জমিয়ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে ছাত্র সমাজের যৌক্তিক দাবী আদায়ে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি যুব জমিয়ত বাংলাদেশের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯৭ সালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত নির্বাচনী লড়াইয়ে তিনি

৪০৬. *চলমান জালালাবাদ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩

Dhaka University Institutional Repository

অবতীর্ণ হন দেশের প্রবীণ রাজনীতিক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জননেতা মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ ও তৎকালীন জাতীয় পার্টির প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী জনাব ফারুক রশীদ চৌধুরীর সাথে। বেশ সাড়া জাগিয়ে তিনি নির্বাচনী তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ও ইসলামী ঐক্যজোট মনোনীত তরুণ এ প্রতিভাবান রাজনীতিককে ৪ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৫০০০ (পঁচাত্তার হাজার) ভোট পেয়ে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২য় স্থান অধিকার করেন। ২০০৫ সালে সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ) আসনের উপ-নির্বাচনের চার দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ (সতেরো) মাস বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জগন্নাথপুর-দক্ষিণ সুনামগঞ্জবাসীর ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন এবং রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালবার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো তৈরিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি ২০০২ সালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২০১২ সালে যুগ্ম মহাসচিব নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে দলের জাতীয় কাউন্সিলে তিনি সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে অদ্যাবধি গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি ঈমান ও দেশ বাঁচাও আন্দোলনে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ও ইসলামী ঐক্যজোটের অন্যতম নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[৪০৭]

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে অবদান

দ্বীনী ও জাগতিক উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত এ্যাডভোকেট মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে কর্মজীবনের সূচনা থেকে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে রাগীব-রাবেয়া ডিগ্রি কলেজে প্রভাষক (বাংলা) হিসেবে যোগদান করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অধ্যাপনা করেন। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ বারকাউন্সিল কর্তৃক এল.এল.বি সনদ লাভের পর সিলেট ও সুনামগঞ্জ জজকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করে মানুষকে আইনী সহায়তা প্রদান করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি সিলেটের শাহজালাল উপশহরে হযরত শাহজালাল (র.) ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিজস্ব উদ্যোগে ২০১২ সালে জামেয়া দারুল কুরআন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি দক্ষতা ও সুনামের সাথে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শক্তিশালী ভূমিকা পালনের জন্য 'তৌহিদী পরিক্রমা' নামক মাসিক

---

৪০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি সিলেটস্থ নূরানী যুবকল্যাণ সমিতির কার্যকরী পরিষদ সদস্য, অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগঠন মোজাহিদীনে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের আজীবন সদস্য। মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী সিলেট বিভাগ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন দাবী দাওয়ার আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। বরাক বাঁধ প্রতিরোধ, নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ ও কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে আন্দোলনে রয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা। এ সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নসহ দেশের সার্বিক সমস্যা সমাধান, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবী নিয়ে তিনি একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ১৯ মে ১৯৯৬ প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন। তিনি খতমে নবুওয়াত আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আঞ্জুমানে তানযিমুল মাদারিছের জয়েন্ট সেক্রেটারীর দায়িত্ব সুনামের সাথে পালন করেন। ১৯৯০ সালে মুসলিম সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইনকিলাবুল মুসলিমীন সাহিত্য পরিষদের তিনি অভিভাবক পরিষদের সদস্য। তিনি পাটলী এম.পি যুব সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘদিন। তিনি জগন্নাথপুর থানা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক।

আর্তপীড়িত দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি নিবেদিতপ্রাণ। উদার ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে তিনি জনপ্রিয়। বিভিন্ন সময়ে সুনামগঞ্জ তথা বৃহত্তর সিলেটসহ দেশের বন্যাকবলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৪০০ বাংলার বন্যাকবলিত সুনামগঞ্জবাসীর ক্ষতিপূরণ ও পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদানের জন্য তিনি সরকারের কাছে জোরদাবী জানান এবং তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ সময় তিনি বঞ্চিত মানুষের বন্ধু হিসেবে হাজারও দুঃস্থ মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন। এক কথায় তাঁর সৃজনশীল মনোভাব রয়েছে, আছে শক্ত মনোবল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।

মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ[৪০৮] (জ. ১৯৭৫)

মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে একটি পরিচিত নাম। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিবেদিত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই ব্যক্তিত্ব অদম্য স্পৃহা, কঠোর পরিশ্রম, আর বিরল মেধার বলে কর্মক্ষেত্রে রেখেছেন যোগ্যতার স্বাক্ষর। সদালাপী,

৪০৮. মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে, (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ০১.১১.২০১৯ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

মিষ্টভাষী, কর্মচঞ্চল আর বুদ্ধিদীপ্ত পদচারণায় তিনি নন্দিত সর্বত্র। তিনি একাধারে আদর্শ প্রশাসক, প্রাবন্ধিক, লেখক, গবেষক, সুবক্তা ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে অর্জন করেছেন ব্যাপক খ্যাতি। অপসংস্কৃতির মোকাবেলা, সামাজিক মূল্যবোধ ও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাছাড়া একজন বরেণ্য আলিমে দ্বীন, আদর্শ সংগঠক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে চালিয়ে যাচ্ছেন নিরন্তর প্রচেষ্টা।

জন্ম

১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন জগন্নাথপুর পৌরসভাস্থ হবিবপুরে এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ। তাঁর পিতা মোহাম্মদ দ্বীনুল ইসলাম। মাতা হেনা ইসলাম অত্যন্ত পরহেযগার, আবিদা ও পর্দানশীন গুণবতী মহিলা। তাঁর নানা ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শালিসী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল আজিজ চৌধুরী।

শিক্ষাজীবন

পিতা মোহাম্মদ দ্বীনুল ইসলাম এর নিকট তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতের খড়ি। আব্দুল তাহিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা। পরবর্তীতে স্বীয় পিতা বাড়ির পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপীঠ হবিবপুর কেশবপুর ফাযিল মাদরাসায় তাঁকে ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর ১৯৯০ ঐতিহ্যবাহী সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসায় আলিম প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৯২ সালে আলিম চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অতঃপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে ১৯৯৫ সালে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৭ম স্থান এবং ১৯৯৬ সালে মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তাছাড়া সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল, কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৯৮ সালে বগুড়া শেরপুর আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল (ফিকহ) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি যামানার মুজাদ্দিদ রাঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.)-এর নিকট থেকে ১৯৯০ সালে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর দেশের বিজ্ঞ মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে ইলমে হাদিস অধ্যয়ন করে ২০০৫ সালে শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.), ১৯৯৭ সালে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ শায়খুল হাদিস আল্লামা ফখর উদ্দিন (রহ.), ২০০৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল হাদিস আল্লামা হবিবুর রহমান, ২০১৬ সালে শায়খুল হাদিস আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী এর নিকট থেকে ইলমে হাদীসের সনদ লাভ করেন। ২০১৩ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে 'আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (রহ.) : জীবন ও কর্ম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন।

হজ্জব্রত পালন

তিনি সর্বপ্রথম ২০০১ সালে পবিত্র হজ্জ্ব পালন করেন। পবিত্র হজ্জ ও উমরাহ পালনকালে মক্কা মুকাররামা ও মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহলে বায়তের সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ খ্যাতনামা উলামা-মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তিন বার পবিত্র হজ্জব্রত ও দুইবার পবিত্র উমরাহ পালন করেন।

রচনাবলি

তিনি একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবে পাঠক মহলে সমাদৃত। শিক্ষকতা, রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখে যাচ্ছেন। তার লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ : (১) মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, ২০০৭ সালে এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। (২) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১৭ সালে। (৩) ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় জুন ২০১৭ সালে। (৪) সিয়ামে রামাদ্বান ও আমাদের করণীয়, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় মে ২০১৮ সালে। (৫) ইসলামের ঐতিহাসিক যুদ্ধ : রাসূল (সা.) এর মু'জিযা, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে– (১) আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (রহ.): জীবন ও কর্ম। (এম. ফিল গবেষণাকর্ম), (২) জ্ঞান অন্বেষণে ছোটদের অনীহা ও প্রতিকার, (৩) ইসলামে নারীর অধিকার ও বর্তমান প্রেক্ষাপট।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণে অবদান

ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের মহান ব্রত নিয়ে তিনি ২০০০ সালের ৩০ এপ্রিল জগন্নাথপুর উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহী হালিয়ারপাড়া জামেয়া কাদেরিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসায় প্রভাষক (আরবি) পদে যোগদান করে ১০ নভেম্বর ২০০৫ ইংরেজি পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে হালিয়ারপাড়া জামেয়া কাদেরিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসায় ১১ নভেম্বর ২০০৫ সালে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে অদ্যাবধি সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিলে তিলে হালিয়ারপাড়া জামেয়া কাদেরিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রি)

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। মাদরাসার অভূতপূর্ব অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয় তাঁর হাত ধরেই। মাদরাসার সুবিশাল একাডেমিক ভবনসমূহ, প্রশাসনিক ভবন ও মসজিদ তাঁর নিরব সাধনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইলমে কিরাতের খিদমতেও তিনি নিবেদিত। রাঈসুল কুররা ওয়াল মুহাদ্দিসীন আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.)-এর নিকট থেকে ১৯৯০ সালে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট হবিবপুর কেশবপুর ফাযিল মাদরাসায় সহকারী ক্বারী ও ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রধানক্বারী হিসেবে সততা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ২০১১ সাল থেকে অদ্যাবধি হলিয়ারপাড়া জামেয়া কাদেরিয়া সুন্নিয়া ফাযিল ডিগ্রী মাদরাসার নাযিম হিসেবে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের পরিদর্শক ও প্রধান কেন্দ্রের ছাদীছ জামাতের পরীক্ষক, খামিছ জামাতের পরীক্ষক এবং রাবে জামাতের সেন্টার পরীক্ষার হল সুপারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি ২০০৭ সাল থেকে অদ্যাবধি মাদরাসা শিক্ষকবৃন্দের একক প্রতিনিধিত্বশীল পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররেসীন সুনামগঞ্জ জেলা সাধারণ সম্পাদক, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, ২০১৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ২০১১ সাল থেকে অদ্যাবধি সিলেট বিভাগের মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ আনজুমানে মাদারিছে আরাবিয়ার কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনরত। তিনি মাদরাসা শিক্ষক সমিতি জগন্নাথপুরের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং উক্ত সংগঠনের সংবিধান প্রণেতা। ২০০৫ সাল থেকে মাদরাসা শিক্ষক সমিতি জগন্নাথপুরের সহ-সভাপতি এবং ২০২০ সাল থেকে অদ্যাবধি সভাপতি হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

তিনি অনেকগুলো মাদরাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত থেকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। তন্মধ্যে লোহারগাঁও আল-ইহসান একাডেমি জগন্নাথপুর, ক্লাসিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ সিলেট, শেখ আয়েশা খাতুন বড়বাড়ী হিফযুল কুরআন একাডেমী জকিগঞ্জ, লতিফিয়া হিফযুল কুরআন মাদরাসা সিলেট, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) দাখিল মাদরাসা জগন্নাথপুর, বেরী ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা জগন্নথাপুর, শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা স্বীকৃতি স্বরূপ, লতিফনগর, সিলেট উল্লেখ্যযোগ্য। তাছাড়া কুবাজপুর সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীরামসী হাফিজিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। শিক্ষাক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ২০০৫, ২০১৬ সালে বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

দ্বীনের খাদিম মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ শিক্ষকতা ও রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষে এলাকার শিক্ষিত ও উদ্যমী ছাত্র যুবকদের নিয়ে ১৯৯২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'জাগরণী সাহিত্য পাঠাগার' হবিবপুর। ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত জাগরণী সাহিত্য পাঠাগার হবিবপুরের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি সভাপতি হিসেবে একনিষ্ঠতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, পাঠাগারটি তিনবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি জগন্নাথপুর উপজেলা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ২০০৩ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক এবং ২০১১ সাল থেকে অদ্যাবধি সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ (জ. ১৯৭৪)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম সৈয়দপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ খ্রি. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা-আসামের বিশিষ্ট দ্বীন প্রচারক ও সিলেটের ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম শাহ সৈয়দ শামছুদ্দিন (রহ)-এর ২০শ তম অধস্তন পুরুষ। পিতা হাফিজ সৈয়দ বশারত আলী একজন আলেমে দ্বীন, মাদ্রাসা শিক্ষক এবং সৈয়দ শাহশামছুদ্দিন (রহ) দরগাহ জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাঁর মাতা সৈয়দা আজিজুন নেছাও একজন আলিমা ও শিক্ষিকা ছিলেন।

শিক্ষা

মাত্র চার বছর বয়সে পিতার প্রতিষ্ঠিত বাড়ীর ফুরকানিয়া মক্তবে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু। পরবর্তীতে সৈয়দপুর দারুল হাদীস মাদরাসায় ভর্তি হয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯৮৭খ্রি. তিনি সৈয়দপুর দারুল হাদীস মাদরাসায় হিফজ বিভাগ থেকে কুরআন হিফজ সমাপন করেন। সৈয়দপুর আলীয়া মাদরাসা থেকে ১৯৮৯খ্রি. দাখিল এবং ১৯৯২খ্রি. আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন। একই সময়ে তিনি কওমি মাদরাসার দরস (পাঠগ্রহণ) অব্যাহত রাখেন। ১৯৯৩খ্রি. তিনি জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট থেকে দাওরায়ে

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস (তাকমিল ফিলহাদীস বা টাইটেল) পাশ করে কওমী ধারার শিক্ষা সমাপন করেন। ১৯৯২খ্রি. তিনি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি 'আলকুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগে ১৯৯৫খ্রি. স্নাতক (সন্মান) এবং ১৯৯৬খ্রি. স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি আলিয়া মাদরাসা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৪খ্রি. ফতেহপুর কামিল মাদরাসা, সিলেট থেকে ফাজিল এবং ১৯৯৯খ্রি. কুওয়াতুল উলুম কামিল মাদরাসা, কুষ্টিয়া থেকে কামিল ফিল-হাদীস পাশ করেন।

সৈয়দ রেজওয়ান প্রফেসর ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন এর অধীনে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে "সাবেক খতীব মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী (রহ) : শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক বিষয়ে ২০১৩ খ্রি. এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি প্রফেসর ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন এর অধীনেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে, ২০২০ খ্রি. পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর পিএইচ.ডি'র অভিসন্দর্ভ ছিল "যাকাত ব্যবস্থাপনা ও আদায় পদ্ধতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"।

কর্মজীবন

ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ কর্মজীবন শুরু হয় জগন্নাথপুর উপজেলার 'সৈয়দপুর আদর্শ কলেজ' এর প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে। তিনি ১৯৯৯খ্রি. থেকে ২০০০খ্রি. পর্যন্ত সৈয়দপুর আদর্শ কলেজে কর্মরত ছিলেন। ২০০১খ্রি. তিনি সুনামগঞ্জ জেলার প্রথম ইসলামি বিদ্যাপীঠ সৈয়দপুর সৈয়দীয়া শামছিয়া ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পান এবং বর্তমানে এখানেই কর্মরত আছেন।

মাদরাসার দায়িত্ব গ্রহণের তাঁর কিছু উলেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- মাদরাসার স্বীকৃতি নবায়ন
- শূন্যপদে শিক্ষক কর্মচারীনিয়োগ
- শিক্ষার্থী বৃদ্ধিতে অভিযান
- মাদরাসার ভৌত অবাকাঠামো উন্নয়ন
- সীমানা চিহ্নিত করণ ও দেওয়াল নির্মান
- মাদরাসা মার্কেট তৈরি
- নতুন শ্রেণি কক্ষ নির্মান ও পুরাতন মেরামত ও সংস্কার
- ছাত্রাবাস নির্মাণ
- পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন
- বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা খোলা

- ফাজিল শ্রেণি অনুমতি লাভ
- আইসিটি ভবন ও গ্রন্থাগার নির্মাণ

স্বীকৃতি

- জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানপ্রধান, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০০৩
- বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৭।

শিক্ষক সংগঠন

- মাদরাসা শিক্ষক সমিতি, জগন্নাথপুরের প্রতিষ্ঠাকাল (২০০১ খ্রি.) থেকে এখন পর্যন্ত তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। উলেখ্য, অন্যান্য পদে রদবদল হলেও প্রতিবার তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই পদে নির্বাচিত হন।
- বেসরকারী মাদরাসাসমূহের শিক্ষক সংগঠন 'জমিয়াতুল মোদাররেসীন বাংলাদেশে, সুনামগঞ্জ জেলার ২০০৩ খ্রি. থেকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন।
- বাংলাদেশে সকল মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, মাদরাসা এবং কলেজে কর্মরত শিক্ষক সংগঠন (পেশাজীবী) স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ (স্বাশিপ) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্য এবং স্বাশিপ মাদরাসা ইউনিটের সিলেট বিভাগের অন্যতম আহ্বায়ক।

প্রকাশনা

- সহজ এ'রাব শিক্ষা, ২০০৩ খ্রি.
- খতীব মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী : শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে তাঁর অবদান (গবেষণা কর্ম), মাকতাবাতুল হেরা, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : এপ্রিল-২০১৪ খ্রি.।
- তিন হজরতজিকে নিয়ে স্মৃতিকথা (মাওলানা ইলয়াস, মাওলানা ইউসুফ, মাওলানা এনামুল হাসান); আনোয়ার লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুলাই-২০১৭ খ্রি.।
- মাওলানা তারিক জামিলের হৃদয় কাড়া বয়ান (অনুবাদ), মুন্তাখাব লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : এপ্রিল-২০১৬ খ্রি.।
- বিশ্ব ইজতেমার বয়ানসমগ্র (অনুবাদ ও সংকলন), আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুলাই-২০১৬ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

- আত্মার চিকিৎসা (অনুবাদ), মুন্তাখাব লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : এপ্রিল-২০১৮ খ্রি.।
- আশরাফ আলি থানবির প্রিয় গল্প-০১; আনোয়ার লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : জুন-২০১৭ খ্রি.।
- আশরাফ আলি থানবির প্রিয় গল্প-০২, আনোয়ার লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : নভেম্বর-২০১৮ খ্রি.।

সমাজ কর্ম

- তৌহিদী যুব সংঘ, সৈয়দপুর (১৯৮৪ খ্রি.)
- শামছিয়া ফুরকানিয়া সবাহি মক্তব (১৯৯০ খ্রি.)
- হালিমা খাতুন এডুকেশন ট্রাস্ট, জগন্নাথপুর (২০০5 খ্রি.)
- শাহওয়ালী উল্লাহ নূরানী একাডেমী, সৈয়দপুর (২০০৬ খ্রি.)
- সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ, জগন্নাথপুর (অধুনালুপ্ত ২০১৪ খ্রি.)
- সেবা সংস্থা সৈয়দপুর (গরীব ও অসহায় পরিবারের কঠিন এবং জটিল রুগীদের উন্নত চিকিৎসা সেবার সহযোগিতার উদ্যোগ); (২০১৭ খ্রি.)
- শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী রাহ. পরিষদ (২০১৮ খ্রি.)
- যাকাত ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ (২০২০ খ্রি.)।[৪০৯]

---

৪০৯. তথ্য প্রদান : অধ্যক্ষ, সৈয়দপুর সৈয়দীয়া শামছিয়া ফাজিল মাদরাসা, সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ। তথ্য সংগ্রহ : ০১.১১.২০১৯ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায়, পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় মুসলিম মনীষিগণের অবদান

হাওরাঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা সুনামগঞ্জ। মেঘালয় সীমান্তবর্তী এ জেলার ১১টি উপজেলাই হাওর পরিবেষ্টিত। মৎস ও ধান উৎপাদন করে এ জেলার জনগণ প্রতিবছর কয়েকশ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়ে থাকলেও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা ও যোগাযোগের দিক দিয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে সুনামগঞ্জ। দিরাই, ছাতক, জগন্নাথপুর জামালগঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য উপজেলার সাথে জেলা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও খুবই খারাপ। হাওরের শিক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যা অন্যতম কারণ। হাওরাঞ্চল পরিবেষ্টিত জেলা হিসেবে সুনামগঞ্জের সুনাম থাকলেও শিক্ষার হার ও মানের দিক দিয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে। যেখানে অন্যান্য জেলার শিক্ষার অবস্থা অগ্রগতির দিকে সেখানে এ জেলায় শিক্ষিতের হার মাত্র ২৫ শতাংশ। জেলার সার্বিক সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৯.৭৫ শতাংশ।[৪১০] সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নিলেও হাওরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় এখানে তার বাস্তবায়ন যৎসামান্য। এ জেলার অধিকাংশ গ্রামই দ্বীপের মত। নৌকাযোগে যাতায়াতের ফলে শিক্ষার প্রতি মানুষের ঐতিহ্যগত অনীহা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা, মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্ন সংস্থানের অভাব প্রভৃতি কারণে এখানকার জনজীবন শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হতে পারছে না। এ ধরনের শত প্রতিকূলকতার মধ্যেও অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত এ জনপদে শিক্ষার আলো সম্প্রসারণে অনেক মুসলিম মনীষি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ইংরেজ পূর্ব আমল, মুসলিম আমল, ইংরেজ আমল এবং ইংরেজ পরবর্তী আমলেও শিক্ষার বিস্তারে অনেক মুসলিম মনীষির প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। তাদের সীমাহীন প্রচেষ্টায় জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি অনেক মুসলিম মনীষির দক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজে শিক্ষার আলো বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবার অনেক মনীষির দক্ষ পরিচালনায় ভাটি অঞ্চলে শিক্ষার পথ সুগম হয়েছে। আলোচ্য পর্যায়ে সুনামগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন মুসলিম মনীষির অবদান তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

---

৪১০. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, জুন ২০১৯, এক নজরে সুনামগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ

'সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ' সুনামগঞ্জের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কলেজটি সুনামগঞ্জের শিক্ষার্থীদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সারিসারি বৃক্ষরাজি, বিশাল দীঘি নিয়ে সুনামগঞ্জ জেলা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত 'সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ'। ১৯৪৪ সালে সুনামগঞ্জ জেলায় সর্বপ্রথম কলেজ হিসেবে এটি স্থাপিত হয়।[৪১১] তৎকালীন আসামের প্রথম বেসরকারী বিজ্ঞান কলেজ এটি। আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর সহায়তায় ১৯৪৪ সালে এই কলেজে আই.এস.সি কোর্স চালু হয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞান শিক্ষায় এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। দেশবরেণ্য খ্যাতিমান অনেকে এই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং বিদেশে অনেক ছাত্র তাদের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৪-১৯৪৭), পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এর একাডেমিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ১৯৬১ সালে ঢাকা বোর্ড উচ্চ মাধ্যামিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পায়। ১৯৬২ সাল থেকে তা কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত হয়। ১৯৯৯ সালে সিলেট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ এই বোর্ডের উপর অর্পিত হয়। ডিগ্রী ও অনার্স শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত থাকলেও ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই পরিচালিত হয়ে আসছে।[৪১২]

সুনামগঞ্জ মহকুমার তৎকালীন এস.ডি.ও সৈয়দ মুর্তাজা আলীর উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই মূলত কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একজন দক্ষ প্রশাসকের পাশাপাশি তিনি একজন সুলেখকও ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমাদের কালের কথা'য় কলেজ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "সুনামগঞ্জ মহকুমায় তখন কোন কলেজ ছিল না। সুনামগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত ছিল না। সর্ব সাধারণের একান্ত ইচ্ছা ছিল সুনামগঞ্জে একটি কলেজ স্থাপিত হোক। কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাঁদা সংগ্রহের জন্য আমি গ্রামাঞ্চলে যাই। প্রথমে পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে কলেজের মঞ্জুরীর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করি। কলেজ পরিদর্শনের রির্পোটের আলোকে পরবর্তীতে পুনরায় চাঁদা সংগ্রহের অভিযান করি ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হই।"[৪১৩] সৈয়দ মুর্তাজা আলীর উদ্যোগে সাড়া দিয়ে সুনামগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠায় যে সমস্ত মুসলিম মনীষি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং ঐতিহাসিক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা হলেন– মরহুম আব্দুল বারী চৌধুরী,

৪১১. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

৪১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৯ এপ্রিল, ২০০৮ ইং।

৪১৩. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *আমাদের কালের কথা* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

উকিল মফিজ চৌধুরী, আব্দুল খালিক আহমদ, আব্দুল হান্নান চৌধুরী ও মরহুম মকবুল হোসেন চৌধুরী।[৪১৪]

কলেজের নিজস্ব ভবন না থাকায় প্রথমে স্থানীয় টাউন হলে কলেজের ক্লাস শুরু হয়। ১৯৪৪ সালের শেষ ভাগে আসামের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদ উল্লাহ আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।[৪১৫] ১৯৬০ সালে কলেজটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৯ সালে পুকুরের খোদাই শুরু হয়। প্রথমে টিনশেড একাডেমিক ভবনে ক্লাস শুরু হয় ১৯৬০ সালের ১৪ মার্চ। ১৯৬১ সালের ২৮ আগস্ট নতুন ভবনে নব উদ্যোমে ক্লাস শুরু হয়।[৪১৬] উপরোক্ত সময়ে কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ক্যাপ্টেন করিম উদ্দিন আহমদ। ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে দিরাইয়ের বরাইল গ্রামে আব্দুল মান্নান চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দৃঢ়চিত্তের অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জনাব চৌধুরী কলেজের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে সমর্থ হন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯৬৭ সালে পুকুরপাড়ের পূর্বদিকে একটি টিনশেড সেমিপাকা ভবন তৈরি হয়। তাঁর অন্যান্য নান্দনিক কার্যক্রমে কলেজটি অপূর্ব সৌন্দর্যবিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৭ সালে কলেজে বি.এস.সি ও বি.কম কোর্স চালু করা হয়।[৪১৭] অবশেষে ১৯৮০ সালের ৩ মার্চ কলেজটি জাতীয়করণ হয়ে সরকারী কলেজের মর্যাদা লাভ করে। জাতীয় করণকালীন সময়ে তৎকালীন কলেজ গভর্নিং বডি কর্তৃক ১৪.০৫.১৯৮০ সালে সম্পাদিত ৮৫৮৫/১৯৮০ নং দানকৃত দলিলের মাধ্যমে ২৫.৬৫ একর ভূমি সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজকে প্রদান করা হয়। কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরিত দলিলের বিভিন্ন খাতিয়ানে এই ভূমি হস্তান্তর সম্পাদিত হয়। জমিদার মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার পৌত্র লক্ষণশ্রীর তৎকালীন জমিদার দেওয়ান আনোয়ার রেজা চৌধুরী উপরোক্ত ভূমি কলেজের নামে দান করেন।[৪১৮] সুনামগঞ্জ কলেজ যতদিন থাকবে দেওয়ান আনোয়ার রেজা চৌধুরীর এ অবদান চিরদিন থাকবে অম্লান। তাঁর এ অবদান সুনামগঞ্জের শিক্ষার ইতিহাসে এক স্বর্ণজ্জ্বোল অধ্যায়।

১৯৯২-৯৩ সালে পুরাতন বিজ্ঞান ভবনের পিছনে একটি দ্বিতল ভবন নির্মিত হয় যা পরবর্তীতে অনার্স ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে স্টাফ কোয়ার্টারের পাশে একটি নতুন পুকুর খনন

৪১৪. সম্পাদনা পরিষদ, *'উন্মীলন'* কলেজ বার্ষিকী-২০১২, সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ, পৃ. ৩
৪১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৪১৬. প্রাগুক্ত
৪১৭. সৈয়দ মহিবুল ইসলাম, ৬৮ বছর গৌরবের সৌরভের, *কলেজ বার্ষিকী*-২০১২, পৃ. ৪০
৪১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়, একই সময়ে নির্মিত হয় নতুন দ্বিতল বিজ্ঞান ভবন। ১৯৯৫-৯৬ সালে দু'টি শ্রেণিকক্ষকে একত্রিত করে একটি স্থায়ী মঞ্চসহ ছয়শ জন দর্শকের আসন সংবলিত মিনি অডিটরিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৫ সনে নির্মিত হয় কলেজ গেইট। ১৯৯৫-৯৬ সালে কলেজ পুকুরের দক্ষিণ পাশে একটি টিনশেড ঘরে ক্যান্টিন স্থানান্তর করা হয় এবং কলেজ পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। অবকাঠামোগত এসব উন্নয়ন কার্যাবলি মূলত ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রফেসর মোঃ নূরুল গণী অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের পর থেকেই সম্পন্ন হয়েছে।[৪১৯] তিনি একাধারে ১০ বৎসর এ কলেজের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সুনামগঞ্জ কলেজের সার্বিক উন্নতি সাধন ও শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর এ অসামান্য অবদান প্রশংসার দাবীদার। ২০০১ সালে কলেজটিতে বাংলা, দর্শন, ইতিহাস ও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। ২০০৪ সালে তিনতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে তৎকালীন সংসদের মাননীয় হুইপ এবং সুনামগঞ্জ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব ফজলুল হক আছপিয়া এবং ২০১১ সালে একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণের ক্ষেত্রে সুনামগঞ্জ-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মতিউর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।[৪২০]

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কলেজটির সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষার সম্প্রসারণে যে সমস্ত মুসলিম মনীষি অধ্যক্ষ হিসেবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ (১৯৫৪-৫৭), এ. কে শামস (১৯৫৭-৫৯), ক্যাপ্টেন করিমুদ্দিন আহমদ (১৯৫৯-৬২), এ মান্নান চৌধুরী (১৯৬৫-৭৮) প্রফেসর এম.আই চৌধুরী (১৯৮০-৮৮), প্রফেসর মোঃ নূরুল গণী (১৯৯৩-২০০২), প্রফেসর মোঃ আফতাব হোসেন (২০০৬-২০১০) এবং প্রফেসর মেজর ছয়ফুল কবীর চৌধুরী (২০১১-২০১৭) সময় পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[৪২১]

৭৭ বছরে অনেক কৃতি ছাত্র এই কলেজকে গৌরবান্বিত করেছেন। শিক্ষা বিস্তারসহ সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এ কলেজের ছাত্ররা গৌরবের বার্তা বহন করে চলছেন। বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম. মতিউর রহমান ও অধ্যাপক ড. আব্দুর রশিদ, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হালিমা বেগম, বিচারপতি মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী রুমি, বিচারপতি জেসমিন আরা বেগম, বিশিষ্ট গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির, সাংবাদিকতা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হাসান শাহরিয়ার, প্রখ্যাত সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হুমায়ুন বখত, গ্রুপ ক্যাপেটন মমিনুর রহমান পীর প্রমুখ

৪১৯. www.bdtoday.com

৪২০. *উন্মীলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৪২১. কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে রক্ষিত অনার বোর্ড থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

এ কলেজের ছাত্র ছিলেন।[৪২২] সুনামগঞ্জ কলেজ বরাবরই সংস্কৃতি চর্চা ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সুতিকাগার হিসেবে গণ্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই কলেজের অনেক ছাত্র অংশগ্রহণ করেন। তৎকালীন ছাত্রনেতা হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, জনাব মতিউর রহমান, আ.ত.ম ছালেহ, সৈয়দ ছালিক আহমদ প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রনেতা তালেব আহমদ, গিয়াস উদ্দীন, আসগর স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে যাতে তিন শহীদের নাম উৎকীর্ণ আছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হয়ে এ কলেজের অনেক ছাত্র কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। মহান জাতীয় সংসদে এ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জনাব সমছু মিয়া চৌধুরী, আব্দুল হক, আব্দুজ জহুর, মেজর ইকবাল হোসেন চৌধুরী, দেওয়ান শামছুল আবেদীন, আবুল হাসানাত আব্দুল হাই ও বর্তমান সাংসদ আলহাজ্ব মতিউর রহমান।[৪২৩]

তিনবারের নির্বাচিত সুনামগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান কবি মমিনুল মউজদীন, পৌরসভার প্রথম মেয়র আইয়ুব বখত জগলুল, জেলা পরিষদ প্রশাসক ব্যারিস্টার এনামুল কবির ইমন এ কলেজের গর্বিত ছাত্র।[৪২৪] অনুরূপ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ কলেজে অধ্যয়ন শেষ করে সমাজ ও দেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ যদিও আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে তথাপি কলেজটিতে আরও বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স মাস্টার্স কোর্স চালু, অবকাঠামোগত বর্তমান সমস্যা দূরীভূতকরণ, শিক্ষক সংকট প্রভৃতি সমস্যা সমাধান করা হলে সুনামগঞ্জের উচ্চশিক্ষা বিস্তারে কলেজটি আরো যুগান্তকারী ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে।

সুনামগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ

সুনামগঞ্জ জেলার একমাত্র মহিলা শিক্ষার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো 'সুনামগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ'। সুনামগঞ্জ সদরের প্রাণকেন্দ্র বাধনপাড়ায় কলেজটি অবস্থিত। কলেজটির পূর্বের নাম সুনামগঞ্জ সরকারী মহিলা বিদ্যালয়। কলেজটিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও সাধারণ কক্ষ রয়েছে। কলেজটি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিমুক্ত। জেলার অন্যতম কলেজ হিসেবে ইতোমধ্যে কলেজটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি ক্রমান্বয়ে কুঁড়ি থেকে বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগে মাত্র ১১ জন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু

---

৪২২. ৬৮ বছর গৌরবের সৌরভের, *কলেজ বার্ষিকী*-২০১২, পৃ. ৪২-৪৩

৪২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৪২৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করলেও বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগসহ স্নাতক পর্যায়ে বি.এ ও বি.এস.এস (পাস) কোর্স চালু রয়েছে। কলেজটিতে বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪৩০০ জন।[৪২৫] সুনামগঞ্জের নারীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজটি কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সুনামগঞ্জের নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার মানসে সুনামগঞ্জের কতিপয় মহীয়সী নারী ও সমাজকর্মী সুনামগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এসব মহীয়সী নারীদের মধ্যে ছিলেন বেগম রাবেয়া বারী চৌধুরী, বেগম রফিকা রইছ, বেগম রাবেয়া রহমান, বেগম রাবেয়া লেইছ, বেগম রাশেদা মাজেদা খানম ও বেগম অঞ্জলী চৌধুরী।[৪২৬] তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে কলেজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ০১.০৩.৮৩ সালে প্রথম সাত সদস্য বিশিষ্ট সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব শফিকুর রহমান। কমিটির সদস্যবৃন্দ ও মূল উদ্যোক্তাগণ সুনামগঞ্জ শহরে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তৎকালীন মহামান্য প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের নিকট উপস্থাপন করলে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান এবং তাৎক্ষণিক দশ লক্ষ টাকা কলেজ ফান্ডে অনুদান প্রদান করেন।[৪২৭] পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত দশ লক্ষ টাকার সাথে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের আর্থিক অনুদানে ১.৫২ শতাংশ ভূমির উপর ৩ মার্চ ১৯৮৬ সালে কলেজটি নিজস্ব ভবনে উদ্বোধন করা হয়।[৪২৮] উল্লেখ্য, তৎকালীন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খানও উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রথম পর্যায়ে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে শুধু মানবিক শাখায় সাতজন শিক্ষক, একজন স্টাফ ও ১১ জন ছাত্রী নিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়। তখন প্রতিষ্ঠান ভবনে মোট ০৪টি কক্ষ ছিল।

০১.০১.১৯৯১ সালে কলেজটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লা কর্তৃক একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে মানবিক শাখার পাশাপাশি বিজ্ঞান শাখাও চালু করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে কলেজটি পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে অনুমতি লাভ করে। ০৬ এপ্রিল ১৯৯৭ সালে কলেজটিকে জাতীয়করণ করা হয় এবং ২০১১ সাল থেকে কলেজটি ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়। বর্তমানে কলেজটিতে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৫০০।[৪২৯] জেলার একমাত্র মহিলা কলেজ হিসেবে সুনামগঞ্জের নারী শিক্ষার উন্নয়নে কলেজটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

---

৪২৫. *দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর*, ২৫ মার্চ ২০১১, সুনামগঞ্জ জেলা, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সিলেট টুয়েন্টিফোর ডটনেট, ৩০ মে, ২০১৮

৪২৬. sunamganj-gwc.org. History of the college

৪২৭. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

৪২৮. প্রাগুক্ত

৪২৯. History of the college, Ibid

Dhaka University Institutional Repository

যে সমস্ত মনীষিগণের আর্থিক অনুদানে মহিলা কলেজটি স্থাপিত হয়েছে তাদের এ অবদান চিরস্মরণীয়। শিক্ষা বিশেষত নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে যে সব মহান ব্যক্তি আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– সুনামগঞ্জ সদরের জনাব ফিরোজ আলী ২৫,০০০ টাকা, বালু পাথর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে জনাব কামরুল নূর মিয়া ২০,০০০ টাকা, ধর্মপাশা ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল আওয়াল ১১,০০০ টাকা, সুনামগঞ্জ পৌরসভার তৎকালীন কমিশনার জনাব রফিক আহমদ ১০,০০০ টাকা, জানীগাও নিবাসী জনাব এ.এম. আব্দুল নূর ১০,০০০ টাকা, বাস মালিক সমিতির পক্ষে জনাব গোলাম রব্বানী ১০,০০০ টাকা, পাথর ব্যবসায়ী জনাব ওয়ালিউর রহমান ১০,০০০ টাকা, জামালগঞ্জ নিবাসী জনাব আব্দুর রাজ্জাক ১০,০০০ টাকা, আজমিরিগঞ্জ নিবাসী জনাব মাজহারুল ইসলাম ১০,০০০ টাকা, ফতেপুর ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল খালেক ৬,০০০ টাকা, যোলঘর নিবাসী জনাব আব্দুল হক আকঞ্জি ৬,০০০ টাকা, নাজিম ট্রেডার্স-এর স্বত্বাধিকারী জনাব নাজিম আহমদ ৫,০০০ টাকা, কাসেম রেস্ট হাউসের মালিক জনাব ইউসুফ হাসান ৫,০০০ টাকা, হাসন নগর নিবাসী বেগম রাবেয়া লেইছ ৫,০০০ টাকা, নতুন পাড়া নিবাসী জনাব নূরুল হুদা মুকুট ১০,০০০ টাকা প্রমুখ।[৪৩০] এছাড়াও উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে আরো অনেকের অবদান অস্বীকার করা যায় না। দানের পরিমাণ যতই অল্প হোক প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের জন্য তা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের এ অনুদান ও স্মরণীয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত সুনামগঞ্জ জেলার একমাত্র মহিলা কলেজটি আজ একটি মানসম্মত ও স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পর্যায়ে ন্যূনতম ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিও তাই আজ সকলের নিকট স্মরণীয় বরণীয়।

ছাতক সরকারী কলেজ

সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যে ছাতক উপজেলা অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য উপজেলা থেকে সমৃদ্ধ থাকলেও ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ছাতকে কোন কলেজ ছিল না। ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুবিধার্থে ছাতকে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এলাকার সুশীল সমাজ, তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রতিনিধিগণ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অবশেষে ১৯৭২ সালের ৫ আগস্ট ছাতক মহাবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়।[৪৩১] প্রথমে কলেজের নিজস্ব ভবন না থাকায় ছাতক হাইস্কুলে এর কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন

৪৩০. কলেজ অধ্যক্ষের কক্ষে সংরক্ষিত অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকা সম্বলিত বোর্ড থেকে সংগৃহীত।

৪৩১. রুহুল ফারুক, *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (সিলেট : সিটি অফসেট প্রেস, নভেম্বর ২০০৪), পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ছাতক হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব মিরাজ উদ্দিন। মোমেনশাহী জেলার অধিবাসী হলেও নবীন ছাতক কলেজকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে তার অনবদ্য অবদান অনস্বীকার্য। কলেজ পরিচালনার জন্য প্রথম যে কমিটি গঠিত হয় তাঁর সভাপতি ছিলেন তৎকালীন এম.পি জনাব সামছু মিয়া চৌধুরী এবং সেক্রেটারী ছিলেন জনাব মিরাজ উদ্দিন।[৪৩২]

১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ ছাতকের কদমতলীতে নিজস্ব ভূমিতে ছাতক কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সুনামগঞ্জের কৃতি পুরুষ আব্দুস সামাদ আজাদ। নিজস্ব ভবনে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন জনাব আব্দুল কাদির মাহমুদ। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় কলেজটি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়। পরবর্তীতে জনাব মোবারক আলী ও উপাধ্যক্ষ জনাব আব্দুল খালিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম বেগবান হয়।[৪৩৩]

কলেজ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কলেজের জন্য ৭.১৫ একর জমির সংস্থান করা হয়। উল্লিখিত পরিমাণ জমির মধ্যে বাগবাড়ি নিবাসী জনাব জমিরুল ইসলাম ২ বিঘা, ছাতকের অধিবাসী জনাব সুজন মিয়া চৌধুরী ১ বিঘা জমি দান করেন।[৪৩৪] তাছাড়া ছাতক নিবাসী জনাব হাজী উবায়দুল্লাহ ও জনাব মোঃ সমছু মিয়া চৌধুরীও কলেজের জন্য ভূমি দান করেছেন বলে বর্তমান অধ্যক্ষ মঈন উদ্দিন আহমদ জানান। বাকী জমি ক্রয়কৃত। ছাতক কলেজ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, লাইম স্টোন এসোসিয়েশন আর্থিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দাতা সদস্য হিসেবে ছাতক উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব সুজন মিয়া চৌধুরী ও সাবেক চেয়ারম্যান আকল মিয়া ১০ হাজার টাকা করে কলেজ ফান্ডে দান করেন।[৪৩৫] অনুরূপ অনেকের দান-অনুদানে কলেজটি পূর্ণতা লাভ করে। ২০১৮ সালে কলেজটিকে সরকারীকরণ করা হয়।[৪৩৬] কলেজটিতে দু'তলা বিশিষ্ট ১টি, চারতলা বিশিষ্ট ১টি, ৩ তলা বিশিষ্ট দু'টি ভবন রয়েছে। ছাতকের উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে ছাতক কলেজের ভূমিকা অপরিসীম।

ছাতক কলেজের সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আরো যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জনাব মোঃ আঃ খালিক, মোঃ ছিদ্দিক আলী, মোঃ রমজান আলী, মোঃ জয়নাল আবেদীন, মোঃ আব্দুল করিম, মাহবুব আহমদ চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন খান, মোঃ আহবাব খান, শামছুল ইসলাম তালুকদার, আশরাফ হোসেন চৌধুরী ও মোঃ আমিনুল হক প্রমুখ।[৪৩৭]

---

৪৩২. প্রাগুক্ত

৪৩৩. আলোবার্তা কলেজ বার্ষিকী-১৯৮১, পৃ. ১১

৪৩৪. *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত।

৪৩৫. প্রাগুক্ত

৪৩৬. *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ঢাকা, আগস্ট ১২, ২০১৮

৪৩৭. *দৈনিক ছাতকের বাজার*, ২৩ মার্চ ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ

সিলেট বিভাগের সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তরেখায় ছাতক উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রস্থল হলো গোবিন্দগঞ্জ। ১৯৭২ অবধি ছাতক থানায় কোন কলেজ না থাকায় শিক্ষা-দীক্ষায় ছাতক থানা ছিল নিতান্তই অনগ্রসর। গ্রামীণ শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখা, বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র, স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গোবিন্দগঞ্জ এলাকার শিক্ষাহিতৈষী জনসাধারণ ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে গোবিন্দগঞ্জে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষত জনাব লুৎফুর রহমান সরকুম, খুরমা ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মুছব্বির ও বাবু হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ প্রমুখের উদ্যোগে সর্বস্তরের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় গোবিন্দগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৭৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাধারণ কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গোবিন্দগঞ্জে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কলেজের স্থান নির্ধারণের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'স্থান নির্ধারণ কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটির প্রধান হিসেবে গোবিন্দনগর নিবাসী জনাব ওয়াহাব আলীকে মনোনীত করা হয়।[৪৩৮]

পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় সভায় গঠিত হয় ২৩ সদস্য বিশিষ্ট 'কলেজ পরিচালনা পর্ষদ'। সিলেট জেলার তদানীন্তন জেলা প্রশাসক আব্দুল মালেককে কমিটির সভাপতি এবং জনাব আব্দুল মুছাব্বিরকে সেক্রেটারী মনোনীত করা হয়। উপরোক্ত সভায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এবং তৎকালীন মন্ত্রী জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।[৪৩৯] অতঃপর মাননীয় মন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি সানন্দে এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালনে সম্মতি প্রদান করেন। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর সভাপতিত্বে কলেজের সাধারণ পরিষদের ৩য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে প্রস্তাবিত কলেজের নামকরণ করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জনাব আব্দুল হক এম.এন.এ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অক্ষয় স্মৃতি ধরে রাখার লক্ষ্যে কলেজটির নাম 'গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ' রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪৪০] এই সভায় কলেজের জন্য স্থায়ীভাবে স্থান সংকুলানের পূর্ব পর্যন্ত গোবিন্দনগর গ্রাম নিবাসী

---

৪৩৮. www.gahsc.edu.bd

৪৩৯. Ibid

৪৪০. মোঃ সুজাত আলী রফিক, কলেজের ইতিহাস প্রসঙ্গ, শামসুন নাহার সম্পাদিত, *দ্যুতিময় গাংচিল*, কলেজ বার্ষিক- ২০১৬, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

জনাব আবুল হোসেনের একটি সুপরিসর চৌচালা টিনের ঘরে সাময়িকভাবে ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কার্যকরী পরিষদের সেক্রেটারী জনাব আব্দুল মুছাব্বিরকে কলেজের জন্য একজন অধ্যক্ষ এবং বাংলা, ইংরেজি, পৌরনীতি, ইসলামের ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য প্রভাষকবৃন্দ নিয়োগের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সুযোগ্য সেক্রেটারী অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় তরুণ নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় স্টাফ সংগ্রহে সমর্থ হন। ইতোমধ্যে কলেজের জন্য জমি সংগ্রহের কাজ অতি দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কাজও শুরু হয় এবং গোবিন্দগঞ্জ হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে আরো একটি অস্থায়ী দোচালা টিনের ঘর স্থানীয় জনসাধারণের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়। নিয়মিত কলেজ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন লাভের জোর প্রচেষ্টা চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের তৎকালীন কলেজ পরিদর্শক জনাব আবু মোহাম্মদ নব প্রতিষ্ঠিত কলেজটি পরিদর্শন করেন। তাঁর পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কতিপয় শর্তাধীনে কলেজটি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।[৪৪১]

এভাবে কলেজটি দ্রুতগতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। ইতোমধ্যে কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয়ের কাজ সম্পন্ন হলে গোবিন্দগঞ্জ নয়াবাজার থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এখানেও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় একটি চৌচালা টিনশেড ঘর নির্মিত হয়। সিলেট সরকারী এম.সি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ জনাব আব্দুল আজিজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের পথকে সুসংহত করেন। ১৯৭৫ সালের ২৩ নভেম্বর কলেজের শিক্ষক হিসেবে জনাব সিরাজুল ইসলাম ইংল্যান্ড সফরে গেলে কলেজের ভৌত অবকাঠামো তৈরি ও উন্নয়নের ব্যাপারে প্রবাসীদের সাথে আলোচনা করে লন্ডনে 'আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ সহায়তা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। জগন্নাথপুর থানার বনগাঁও নিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব রজব মিয়াকে কমিটির সভাপতি এবং কলেজের শিক্ষক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে (পরবর্তীতে অধ্যক্ষ) সর্ব সম্মতিক্রমে সেক্রেটারীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৪৪২] প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বহুতল ভবন নির্মাণ ছাড়াও কলেজের আর্থিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রবাসী কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কলেজের সার্বিক উন্নয়নে লন্ডন প্রবাসী কলেজ এলাকার নেতৃবৃন্দের অবদান অনস্বীকার্য।

---

৪৪১. অনুমোদন পত্রের স্মারক নং সি. এর ১১৮/ সিল/৭২/ ৯৮৪, তারিখ ৫.৬.১৯৭৩ ইং

৪৪২. *কলেজের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫-১৯৭৬ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়। ১৯৭৭ সালে বার্ধক্যজনিত কারণে কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল আজিজ অব্যহতি গ্রহণ করলে লন্ডন ফেরত শিক্ষক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে ২৫ মে ১৯৭৭ সালে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়।[৪৪৩] ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজ স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত হয়। ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে এ প্রতিষ্ঠান উচ্চ শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।[৪৪৪]

কলেজের মূল জমির পরিমাণ ৪.৫০ একর। তন্মধ্যে কিয়দংশ দানে পাওয়া গেলেও সিংহভাগ জমি কলেজ এলাকার গোবিন্দনগর, একানিধাসিঙ্গুয়া, হরিনগর, শ্যামনগর, পূর্ব সুহিতপুর, দশঘর, বিশ্বম্ভরপুর, বিলপার, তকিপুর, ইলামের গাঁও, বুড়াইর গাঁও, আলমপুর ও হায়াতপুর গ্রামের আপামর জনসাধারণের চাঁদার মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের মধ্যে জনাব ওহাব আলী, এমাজ উদ্দিন, হাজী মৌলভী গোলাম মোস্তফা, নজির হোসেন, মাস্টার আলাউদ্দিন, আপ্তাবুর রহমান, এমাদ উদ্দিন, আবুল হোসেন, লুৎফুর রহমান সরকুম, আব্দুল লতিফ হাজী প্রমুখ কলেজের জমি সংগ্রহ করার কাজে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। জমি ক্রয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দিয়েছেন খরিদিচর নিবাসী ফখর উদ্দিন, কায়স্তকোনা নিবাসী আব্দুল মান্নান, লামাবাজার নিবাসী রাশিদ আলী, গড়গাঁও নিবাসী বসির আহমদ ও সিংচাপইড় নিবাসী আব্দুর রহমান।[৪৪৫] প্রবাসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে হাজী মৌলভী আরমান আলী, হাজী আবু তাহের, গোলাম কিবরিয়া এবং কারী আব্দুল মান্নান কলেজের সহায়তার লক্ষ্যে লন্ডনে ব্যাপক গণসংযোগ চালিয়ে কলেজের ফান্ড সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জমি সংগ্রহ, আর্থিক অনুদান সংগ্রহ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রজব উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক, সৈদেরগাও ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মনির উদ্দিন, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী আব্দুল মুছাব্বির, পরবর্তী সেক্রেটারী এ. কে. এম মাহবুবুল হক, কারী ইদ্রিছ আলী ও ছৈদুর রহমান যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন কলেজের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।[৪৪৬]

১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কলেজ কমিটির সভাপতি

---

৪৪৩. মোঃ ওয়ারিছ আলী, গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজের ইতিকথা, *সুনামগঞ্জ দর্পণ*, ২৩ জুন ১৯৮৩

৪৪৪. প্রাগুক্ত

৪৪৫. কলেজের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

৪৪৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও তৎকালীন বিমান ও নৌ পরিবহন মন্ত্রী জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী। এ যাত্রার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে কলেজে প্রশাসনিক ভবনের একটি বিশাল দ্বিতল ভবন, একটি দ্বিতল একাডেমিক ভবন, দ্বিতল বিজ্ঞান গবেষণাগার, একটি সুপরিসর পাকা টিনের গৃহ, একটি দ্বিতল অনার্স ভবন, কম্পিউটার ল্যাব, একটি পাকা ছাত্র মিলনায়তন ও পৃথক শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। এছাড়া কলেজ প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি চমৎকার শহীদ মিনার। তা ছাড়া অতি সম্প্রতি কলেজের উত্তর-পূর্বকোণে একটি সুবৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। কলেজের দীর্ঘদিনের অধ্যক্ষ মরহুম মোঃ সিরাজুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মসজিদটির নামকরণ করা হয় 'অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম জামে মসজিদ'। এক্ষেত্রে তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য কলিম উদ্দিন আহমদ মিলনের অবদান স্মরণযোগ্য।[৪৪৭] ১৯৯৩ ইং সনে কলেজে স্নাতক কোর্স চালুকরণের জন্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব আব্দুছ ছোবহান (মদরিছ মাস্টার)-কে সভাপতি, লুৎফর রহমান সরকুমকে সহ-সভাপতি ও অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কলেজে স্নাতক কোর্স খোলার পাশাপাশি কলেজের সার্বিক উন্নয়নেও ব্যাপক অবদান রাখেন। বি.এস.এস ও পরবর্তীতে বি.কম কোর্স খোলা এবং ডিগ্রী পরীক্ষার সেন্টার করণের ব্যাপারে সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের অবদানও এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৩টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করণের ক্ষেত্রে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত ও স্থানীয় সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিকের সর্বাত্মক সহযোগিতা স্মরণীয়।[৪৪৮]

কলেজের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও প্রেরণা দানের অভিপ্রায়ে বিলপার নিবাসী লন্ডন প্রবাসী জনাব আশীর উদ্দিন 'আশীর-খুশবাহার শিক্ষা ট্রাস্ট' নামে পাঁচ লক্ষ টাকার একটি ট্রাস্ট এ কলেজের মাধ্যমে গঠন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর এ অকৃত্রিম সহযোগিতায় প্রতিবছর অত্র প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ সুগম হচ্ছে।[৪৪৯]

কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে কলেজ পরিচালনা তথা কলেজের সার্বিক উন্নয়নে জড়িত থেকে যারা এলাকায় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন তন্মধ্যে কারী ইদ্রিছ আলী, অধ্যাপক আখতার হোসেন, মোঃ ওয়াহাব আলী, আজাদ মিয়া, আয়বর আলী, মোঃ আবুল হোসেন, আলতাফুর রহমান, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ সৈয়দুর রহমান, আবুল খয়ের, মোঃ আবুল লেইছ, মোঃ

---

৪৪৭. কলেজের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪৪৮. www.gahsc.edu.bd

৪৪৯. কলেজের ইতিহাস প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

মুছন আলী, মখলিছুর রহমান, শেখ সুলতান আহমদ, অধ্যাপক আব্দুল আজিজ মণ্ডল, মোঃ শামসুর রহমান, আব্দুর রউফ, আব্দুর রকীব চৌধুরী, মোঃ আজহার আলী, মোঃ নাজির হোসেন, হাজী ছোয়াব আলী, হাজী আবুল কালাম, শাসমুদ্দিন (কাচা মিয়া), গীতিকার গিয়াস উদ্দীন, মনিরুজ্জামান, রফিকুল আলম, ফজলুর রহমান, এডভোকেট আবুল হাসান, মাস্টার আব্দুল লতিফ, আলহাজ্ব নিজাম উদ্দিন, মোঃ তৈয়ব আলী, আশিকুর রহমান আশিক, হাজী আছলাম আলী, খালেদ হাসান, অধ্যাপক আব্দুন নূর তাহের, অধ্যাপক সৈয়দ মুহাদ্দিস আহমদ প্রমুখের নাম সবিশেষ স্মরণীয়।[৪৫০] বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক আব্দুর রব কলেজটি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে কলেজের সার্বিক উন্নয়নে প্রথমদিকের শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা বিস্তারে, পরবর্তীতে প্রবাসে কলেজের ফান্ড সংগ্রহ এবং বিশেষত কলেজটিকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন।

বৃহত্তর সিলেটের বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার বিখ্যাত গ্রামীণ ব্যবসা কেন্দ্র গোবিন্দগঞ্জ সংলগ্ন সিলেট-ছাতক রেললাইনের পশ্চিম পার্শ্বে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক ও সিলেট-ছাতক সড়কের সংগম স্থলে চমৎকার সড়ক, রেল ও নৌযোগাযোগের কেন্দ্রস্থলে কলেজটির অবস্থান। এলাকার সর্বস্তরের মানুষের স্বতস্ফূর্ত চাঁদা ও অনুদানে গড়ে উঠা এ প্রতিষ্ঠান এলাকাবাসীর প্রাণের আশ্রয় ও স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়েছে। তথ্য যোগযোগ প্রযুক্তিনির্ভর ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার দক্ষ কারিগর তৈরি সর্বোপরি জ্ঞানের শিখা প্রজ্বলনে গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজের কর্মসাধনা অব্যাহত রয়েছে।

দিরাই ডিগ্রী কলেজ

কালনী নদীর তীরে গড়ে উঠা ভাটির জনপদ দিরাই। কৃষি সমৃদ্ধ সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক আগ থেকে দিরাই উপজেলা সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে দিরাই প্রসিদ্ধি লাভ করলেও শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল নিতান্তই অনগ্রসর। স্বাধীনতার অর্ধশত বৎসর পরেও এই অঞ্চলের স্বাক্ষরতার হার মাত্র ৩৭ শতাংশ। শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা ও অভাব।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে দিরাইয়ের বিভিন্ন সচেতন ও ধনী পরিবারের সন্তানরা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে অধ্যয়নের জন্য সিলেট, সুনামগঞ্জ কিংবা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে চলে যেত। এই প্রতিকূল পরিবেশের কারণে অনেকেই লেখাপড়া করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ১৯১৫ সালে দিরাই হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার ৬০ বছরের মধ্যেও দিরাইয়ে কোন কলেজ ছিল না। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ

৪৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ একবার দিরাইয়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেও তা সফলতার মুখ দেখেনি। পরবর্তীতে দিরাইয়ের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে এবং ভাটি বাংলার কৃষক সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ১৯৭৮ সালে দিরাইয়ে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন দিরাইয়ের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগী জনাব সুজাত চৌধুরী। দিরাই উপজেলার তাড়ল গ্রামের সুজাত চৌধুরী প্রথমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী রাজাপুরের তারিফ উদ্দিন চৌধুরী এবং রণভূমির সালেহ উদ্দিন চৌধুরীর সাথে। উপরোক্ত তিন চৌধুরী ছিলেন একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুজাত চৌধুরী জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর হাতে গড়া জাতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় সদস্য নির্বাচিত হন। তারিফ উদ্দিন চৌধুরী ছাত্র জীবনে ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত থাকলেও পরবর্তীতে তিনি জাতীয় জনতা পার্টির সুনামগঞ্জ জেলার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনোনীত হন এবং তাঁরই একনিষ্ঠ বন্ধু সালেহ উদ্দিন চৌধুরী হন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক।[৪৫১]

১৯৭৮ সালের শেষের দিকে তিন বন্ধুর সম্মিলিত উদ্যোগে দিরাই কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে সুজাত চৌধুরীকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। আর সদস্য হিসেবে মনোনীত হন যথাক্রমে তারিফ চৌধুরী, সালেহ চৌধুরী, রণদা প্রসাদ রায়, সুজানগর নিবাসী আবদুল হাকিম চৌধুরী, জগদল নিবাসী এম.এ গনি ও মাহতাব মিয়া, চণ্ডিপুর নিবাসী আলাউদ্দীন চৌধুরী এবং আব্দুল কুদ্দুস ও আলতাফ মিয়া।[৪৫২] কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু বাধা আসলেও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও তৎকালীন মন্ত্রী সুনামগঞ্জের কৃতি পুরুষ জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীর হস্তক্ষেপে তা নিরসন হয়। স্থানীয় কোন্দল মিটিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাছাড়া সুনামগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক আলী আশরাফও দিরাইয়ে কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

দিরাই কলেজের জন্য নিজস্ব জমি সংগ্রহের ক্ষেত্রে দিরাই সংলগ্ন ভরাগাঁও এবং মজলিশপুরের বিত্তবান লোকেরা এগিয়ে আসেন। জমি প্রাপ্তির পর নিজস্ব জমিতে অবকাঠামো তৈরির জন্য তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক আলী আশরাফ ১৮শ মণ গম দান করেন।[৪৫৩] অবকাঠামো তৈরির নিমিত্তে একটি প্রজেক্ট কমিটি গঠন করা হয়। যার সভাপতি ছিলেন রণদা প্রসাদ রায় এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সালেহ উদ্দিন চৌধুরী। সালেহ উদ্দিন চৌধুরী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে মাটি কাটা কাজের তদারকি করেন। তাঁর সাথে আরেক শিক্ষানুরাগী আব্দুল হান্নান চৌধুরীও নিরলসভাবে পরিশ্রম

৪৫১. সার্জেন্ট ফাহাদ মুহাম্মদ, *দিরাই কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস*, সত্য তরীর নির্ভিক মাঝি, দিরাই, জুন ১৯৮২

৪৫২. www.jagovati.com

৪৫৩. *দিরাই কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করে কলেজ যাত্রার পথ সুগম করেন।[৪৫৪] তাছাড়া কলেজ স্থাপনে দিরাই উপজেলার প্রবাসীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব সুজাত চৌধুরী তহবিল সংগ্রহের জন্য ইংল্যান্ড সফরে গেলে সেখানে বসবাসরত দিরাই উপজেলার অধিবাসীরা তাঁকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেন। মূলত প্রবাসীদের অর্থানুকুল্যেই ১৯৭৯ সালে কলেজের নিজস্ব ভূমিতে একটি টিনশেড দালান নির্মিত হয়। ইতিপূর্বে দিরাই উচ্চ বিদ্যালয়ে কলেজের ক্লাস শুরু হয়। মাত্র ২ জন শিক্ষক এবং ৯ জন ছাত্র নিয়ে পথচলা শুরু হয় স্বপ্নের দিরাই কলেজের। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আব্দুল হান্নান চৌধুরী। প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন সালেহ উদ্দিন চৌধুরী।[৪৫৫] সূচনাপর্বে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে শিক্ষার যে ভিত তৈরি হয়েছিল পরবর্তীতে তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। ভাটির কৃষক সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দিরাইয়ের তিন মুসলিম মনীষি যে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা অবিস্মরণীয়। ২০১৮ সালে কলেজটিকে সরকারীকরণ করা হয়।[৪৫৬] নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গড়ে উঠা এ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে একটি আদর্শ ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। এ কলেজ থেকে অনেক প্রতিভাবান ছাত্র উচ্চ শিক্ষা লাভ করে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষার জন্য এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় যে সব মনীষি অবদান রেখেছেন তাঁদের কাছে ভাটির মানুষ আজীবন কৃতজ্ঞতা ডোরে আবদ্ধ থাকবে।

ধর্মপাশা ডিগ্রী কলেজ

ধর্মপাশার শিক্ষানুরাগী স্বাধীনতার চেতনায় উদ্ভাসিত কিছু বরেণ্য শিক্ষাব্রতী সুধীজনের প্রচেষ্টায় ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মপাশা ডিগ্রী কলেজ।[৪৫৭] ধর্মপাশার সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার চেতনাকে সামনে রেখে প্রথমে এর নামকরণ করা হয় 'ধর্মপাশা মহাবিদ্যালয়'। তৎকালীন স্থানীয় সংসদ সদস্য এলাকার আপামর জনতার অত্যন্ত প্রিয়মুখ বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জনাব নাজির হোসেনের উদ্যোগেই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ধর্মপাশায় একটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ লক্ষ্যে একটি সভা আহ্বান করলে সভায় সর্বসম্মতভাবে ধর্মপাশায় কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠায় জনাব নাজির হোসেনকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেন ধর্মপাশা সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব হাবিবুর রহমান জাতি মিয়া,

৪৫৪. মাহবুব খান, দিরাইয়ের কৃতি পুরুষ, মাসিক মানব চাহিদা, সুনামগঞ্জ, মার্চ ১৯৮৪
৪৫৫. প্রাগুক্ত
৪৫৬. www.jagovati.com
৪৫৭. আব্দুল মতিন মিয়া সম্পাদিত, অ-আ-ক-খ, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মপাশা উপজেলার তৎকালীন নির্বাহী অফিসার খোরশেদ আলম, তরুণ কান্তি চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, আলমগীর কবীর, আব্দুল মতিন মাস্টার, আব্দুল লতিফ ও এমদাদুল হক।[৪৫৮]

মাত্র ১৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে পশ্চাদপদ এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও উচ্চশিক্ষা প্রসারে কলেজটি কার্যকর অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৪৮৭ জন।[৪৫৯] ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এ কলেজটি ১৯৯৯ সালে ডিগ্রি অধিভূক্তির স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০০১ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন স্থানীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ধর্মপাশা কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনীত হয়ে কলেজ শিক্ষার কলেবর বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে সমাজকর্ম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় দু'টি চালু করেন। শিক্ষক সংকট নিরসনে নতুন শিক্ষক নিয়োগসহ কলেজটির সার্বিক উন্নয়নে তিনি সময়োপযোগী কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ৩টি আধা পাকা টিনশেড ভবন তিনি পুনঃনির্মাণ করেন এবং কলেজের জন্য একটি চারতলা নতুন ভবন নির্মাণ করেন।[৪৬০] ধর্মপাশা কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে কলেজ কমিটির সম্মানিত সভাপতিকে নিরন্তর সহযোগিতা করেন কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল করিম। কলেজের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং কলেজটিকে একটি আদর্শ কলেজ হিসেবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ আব্দুল করিমের অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

ভাটি অঞ্চল ধর্মপাশার একমাত্র কলেজটি সরকারী কলেজে রূপ লাভ করুক ধর্মপাশাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের এ দাবীর প্রেক্ষিতে গত ০৮.০৮.২০১৮ সালে কলেজটিকে জাতীয়করণ করা হয়। ৪ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত কলেজটিতে ১টি ৩ তলা ভবন, ১টি ৪ তলা ভবন, ৩টি আধাপাকা টিনশেড ভবন, ১৫টি শেণিকক্ষ, ১টি বিজ্ঞানাগার, ১টি পাঠাগার, ১টি কম্পিউটার ল্যাব, ১টি মসজিদ, ৩টি পুকুর ও ১টি বিস্তৃত খেলার মাঠ রয়েছে। যেসব মনীষির অক্লান্ত পরিশ্রমে ধর্মপাশার কৃষক সন্তানদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, ধর্মপাশার আপমর জনগণ তাদের প্রতি কতজ্ঞ।

---

৪৫৮. দৈনিক হাওরাঞ্চল, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, ১০ মে ২০০১

৪৫৯. http://bd.bcale.online.dharmapasha

৪৬০. নূর মুহাম্মদ, আলোকিত জনপদ ধর্মপাশা, ফখরুল আলম সম্পাদিত, প্রভাত, জানু ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

জামালগঞ্জ কলেজ

উত্তরে গারো পাহাড়, দক্ষিণে দিরাই, পূর্বে সুনামগঞ্জ সদর, পশ্চিমে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ–এর মধ্যবর্তী স্থানে হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল ও মাদরাসা থাকলেও অত্র ভাটি এলাকায় আশির দশক পর্যন্ত কোন কলেজ গড়ে উঠেনি। ফলে বিভিন্ন স্কুল ও মাদরাসা থেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় জামালগঞ্জের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার প্রকট অভাব দূর করার জন্য জামালগঞ্জের কৃতি মনীষি জনাব গোলাম কিবরিয়া জামালগঞ্জে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কলেজ স্থাপনের মহান উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে ১২.১১.৮৪ সালে তৎকালীন জামালগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা দেওয়ান আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে এলাকার শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে স্থানীয় একটি অডিটরিয়ামে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি এবং গোলাম কিবরিয়াকে সম্পাদক করে ৬৮ সদস্যের একটি সাধারণ কমিটি এবং নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি জনাব সাদেক আলীকে সহ-সভাপতি ও জনাব আব্দুস সোবহান আফিন্দীকে সম্পাদক করে ১৫ সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।[৪৬১]

১২.০৯.১৯৮৫ সালে জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবনে জামালগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী। ২২.০১.৮৭ সালে কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জেলা প্রশাসক জনাব আবুল কাশেম। ৬ আষাঢ় ১৩৯৬ বাংলা জামালগঞ্জ কলেজের নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত প্রথম ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জেলা প্রশাসক জনাব ইয়াকুব আলী চৌধুরী।[৪৬২] প্রাথমিক পর্যায়ে কলেজের প্রভাষক আব্দুল মতিন মিয়াকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়ে কলেজ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অতঃপর গভর্নিং বডি জনাব গোলাম ছোবহানীকে প্রথম নিয়মিত অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দান করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ জনাব সালাত উল্লাহ খানকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রদান করেন। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অত্যন্ত বন্ধু বৎসল জনাব সালাত উল্লাহ খান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি ছিলেন অতিশয় সদাশয় ও একান্তভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায় কলেজটি সত্যিকার অর্থে একাডেমিক রূপ লাভ করে। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ববোধ, প্রখর ধী শক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুন নবীন এ কলেজটি অনেকাংশে পূর্ণতা লাভ করে।[৪৬৩] জামালগঞ্জ কলেজকে সত্যিকার অর্থে একটি আদর্শ কলেজ হিসেবে

---

৪৬১. গোলাম মর্তুজা, *জামালগঞ্জের ইতিহাস* (সুনামগঞ্জ : ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ইং), পৃ. ৮৯

৪৬২. প্রাগুক্ত

৪৬৩. মোঃ নূরুল আলম ও মোঃ ফখরুল আলম সম্পাদিত, স্মৃতির অলিন্দে, জামালগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি লাভের পেছনে এ মহান মনীষির অবদান সর্বজন স্বীকৃত। জনাব খান এর বিদায়ের পর জনাব রফিকুল ইসলাম বিন বারী কিছুদিন সাময়িকভাবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল থেকে জনাব হাবিবুর রহমান চৌধুরী অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন অত্যন্ত সফলতার সাথে কলেজটি পরিচালনা করেন। বর্তমানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব রফিকুল ইসলাম বিন বারী।[৪৬৪] কলেজ অবকাঠামো ও শিক্ষার উন্নয়নে প্রতিজন অধ্যক্ষের নিরলস পরিশ্রম ও কর্ম সাধনা প্রশংসার দাবীদার।

১৯৮৯ সাল থেকে জামালগঞ্জ কলেজ নিজস্বভাবে বোর্ডের পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে কলেজে বিজ্ঞান শাখা এবং মে ১৯৯৩ ইং সাল থেকে ডিগ্রী ক্লাস চালু করা হয়। ১৯৯৯ ইং সাল থেকে কলেজটি উচ্চ মাধ্যমকি পরীক্ষা কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে।[৪৬৫]

জামালগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে কলেজটিকে সরকারীকরণ করা হয়।

দান ও খরিদ সূত্রে কলেজের মোট জমির পরিমাণ ৫.৫৯ (পাঁচ একর উনষাট শতক)।[৪৬৬] ১৯৯৮ সালে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক তিনতলা একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়। যার উদ্বোধন করেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সুনামগঞ্জের কৃতি পুরুষ আলহাজ আব্দুস সামাদ আজাদ। কলেজের সরকারী অনুদান প্রাপ্তি ও সার্বিক উন্নয়নে তাঁর অবদান ও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জামালগঞ্জবাসীর অর্থানুকুল্যে কলেজে আরো তিনটি ভবন নির্মিত হয়েছে।

জামালগঞ্জ সদর থেকে মাত্র ২০০ গজ পশ্চিমে সাগর সেচা মুক্তার মতোই কালীদহ নদীর বুক চিরে জেগে উঠেছে জামালগঞ্জবাসীর প্রাণের স্পন্দন 'জামালগঞ্জ কলেজ'। মহাবিদ্যালয় থেকে যা আজ সরকারী ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। এলাকার মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মেধা-মননের চর্চায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসার ও বিকাশে প্রতিষ্ঠানটি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

জাউয়া বাজার কলেজ

জাউয়া বাজার সুনামগঞ্জ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান ও ব্যবসা কেন্দ্র। দীর্ঘদিন ধরে অত্র এলাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী অব্যাহত ছিল। জনমানুষের প্রাণের এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিত ১৯৯৪ সালে জাউয়া বাজারে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'জাউয়া বাজার কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি' নামে একটি

---

৪৬৪. http://m.facebook.com.JUC.jamalgong
৪৬৫. *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৪৬৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি করা হয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক আলহাজ মোঃ খলিলুর রহমানকে। কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে আ. ন. ম ওহিদ, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এলাকার বিশিষ্ট রাজনীতিক ও শিক্ষাসেবী ডা. মোঃ হারিছ আলী, কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আলহাজ মৌলভী আরশ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে চেয়ারম্যান মোঃ মকদ্দুছ আলী, প্রচার সম্পাদক হিসেবে আলহাজ মোঃ আস্তর মিয়া এবং দপ্তর সম্পাদক হিসেবে মোঃ শাহাব উদ্দিনকে মনোনীত করা হয়। তাছাড়া উক্ত কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যথাক্রমে– মোঃ তজম্মুল খান, মোঃ মাসুক মিয়া চেয়ারম্যান, শামছুল কবির মোহিত, চেয়ারম্যান মোঃ কদর মিয়া, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ, আলহাজ মোঃ চান মিয়া, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ আপ্তাব মিয়া, মোঃ আব্দুল জলিল, মোঃ রেজা মিয়া তালুকদার, মোঃ নূরুল ইসলাম, মোঃ ছোরাব আলী, জ্যোতিকা রঞ্জণ ভৌমিক ও মোহাম্মদ আব্দুল গাফফারকে।[৪৬৭]

২২ সদস্যের কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির ধারাবহিক কর্মপ্রচেষ্টা ও সাধনায় ১৯৯৫ ইং সনের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় জাউয়া বাজার কলেজ। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অস্থায়ী টিনশেড ঘরে প্রাথমিকভাবে কলেজের কার্যক্রম চালু হলেও বর্তামানে তা একটি পরিপূর্ণ ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন একাধিক ভবন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কলেজটি দেখলে যে কারো মন জুড়িয়ে যায়। ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে কলেজটি কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।[৪৬৮] কলেজের জমিক্রয় ও অবকাঠামো নির্মাণ পুরোটাই জাউয়া বাজার এলাকার জনসাধারণের এবং অত্র এলাকার প্রবাসীদের আর্থিক অনুদানে সম্পন্ন হয়েছে।

জাউয়া বাজার কলেজ প্রতিষ্ঠায় দেশে ও বিদেশে যারা আর্থিকভাবে অনুদান প্রদান করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– জাউয়া নিবাসী হাজী ওয়াসিদ আলী ২ লক্ষ টাকা, বিনন্দপুর পাইগাও নিবাসী রইছ আলী ১ লক্ষ টাকা, কায়েস্তকোণার হাজী মনির আহমদ ১ লক্ষ টাকা, পাইগাও নিবাসী আব্দুল মুছাব্বির ১ লক্ষ টাকা, লক্ষমসোম গ্রামের তোফাজ্জল হোসেন ১ লক্ষ টাকা, দেবেরগাও নিবাসী হাজী নূরুল হক ১ লক্ষ টাকা, গাগলাজুর নিবাসী হাজী মন্তাজ আলী ১ লক্ষ টাকা, কায়স্তকোণার হাজী উস্তার আলী ১ লক্ষ টাকা, ছিফতনগরের নিজামুল ইসলাম ২ লক্ষ টাকা, চরগোবিন্দের নূরুল আলম ১ লক্ষ টাকা, মনিপুরের কাজী আব্দুল হান্নান ১ লক্ষ টাকা, পাইগাঁও এর সুয়েব আল আজাদ বখত ১ লক্ষ টাকা, সরিষাপাড়ার মনছব আলী ১ লক্ষ টাকা, সাদারাই নিবাসী মজিবুর রহমান ১ লক্ষ টাকা, লক্ষণসোমের সিরাজুল ইসলাম ১ লক্ষ টাকা, ক্ষিদ্রাকাপনের ফারুক আহমদ ১ লক্ষ টাকা ও ইমদাদুল

৪৬৭. রুহুল ফারুক, ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (সিলেট : সিটি অফসেট প্রেস, নভে. ২০০৪), পৃ. ৫০
৪৬৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হক ১ লক্ষ টাকা, পরেশপুরের হাজী ধন মিয়া ১ লক্ষ টাকা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুদান দিয়ে জাউয়া বাজার কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন জনাব শওকত আলী, ইউনুস আলী, আব্দুস সাত্তার, মৌলভী আরমান আলী, মতিন মিয়া, হাজী রইছ আলী, আবারক আলী, হাজী আব্দুল হাকিম, আব্দুল হক, মৌলভী আরশদ আলী ও ময়নুল হক প্রমুখ।[৪৬৯]

জাউয়া বাজার কলেজ বাস্তবায়নে যুক্তরাজ্যে চাঁদা সংগ্রহের জন্য কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি আলহাজ খলিলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ডা. হারিছ আলীর অনুপ্রেরণা ও তাগিদে স্থানীয় প্রবাসী মোহাম্মদ ফজলুল হক লন্ডনে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেন। এ মহৎ প্রচেষ্টায় তাঁকে নিরলসভাবে সহযোগিতা করেন আলহাজ রইছ আলী, ডা. রুয়াব আলী, আলহাজ মোক্তার মিয়া, আলহাজ ওয়াসিদ আলী, নূরুল হক, আলহাজ মাস্টার মনির আহমদ, মৌলভী আরমান আলী, আলহাজ উস্তার আলী, মৌলভী আরশদ আলী, আব্দুল মান্নান, আব্দুল মছব্বির ও তোতা মিয়া।

উপরোক্ত সবার ব্যাপক গণসংযোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৯৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মৌলভী আরমান আলীকে সভাপতি, মৌলভী আরশদ আলীকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, মোঃ ফজলুল হককে সাধারণ সম্পাদক ও মোঃ আব্দুল মান্নানকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট জাউয়া বাজার কলেজ এ্যাসিস্টেন্স কাউন্সিল ইউ.কে গঠন করা হয়।[৪৭০] এছাড়াও কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে আলহাজ সিরাজ মিয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মতিন মিয়া, সহ-কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আলহাজ মোক্তার মিয়া ও আলহাজ নূরুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আলহাজ ওয়াসিদ আলী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আব্দুল গৌস ও আব্দুল হাই, প্রচার সম্পাদক হিসেবে আব্দুল মালিক বুটি ও সহ প্রচার সম্পাদক পদে আলহাজ রইছ আলী মনোনীত হন। নির্বাহী সদস্য পদে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এমদাদুল হক এমদাদ, ওয়াহিদ মিয়া, তফজ্জুল হোসেন, আব্দুল মুছাব্বির, সিরাজুল ইসলাম, সোয়াইব আল-আজাদ বক্স, ফারুক আহমদ, মঈনুল হক, আব্দুর রউফ, আব্দুস সালাম, সিরাজুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম মাশুককে।[৪৭১]

কমিটির সুদক্ষ সাংগঠনিক তৎপরতা ও শিক্ষার আলো প্রজ্বলনে উদ্বুদ্ধকরণ কর্ম প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রবাসীদের অনেকেই জাউয়া বাজার কলেজ বাস্তবায়নে উদার হস্তে অনুদান প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– কায়স্তকোণা গ্রামের প্রবাসীদের মধ্যে জনাব আব্দুল মান্নান (৫০০০ পাউন্ড), সিরাজুল ইসলাম (৫০০ পাউন্ড), আনা মিয়া (৫০০ পাউন্ড), হাজী তোরাব আলী (২৫০ পাউন্ড),

---

৪৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪৭০. এ.টি.এম মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ব্রিটিশ বাংলা নিউজ, লন্ডন, ২ অক্টোবর, ১৯৯৭

৪৭১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হাজী কলমধর আলী (২৫০ পাউন্ড), হাজী জমসর আলী (২৫০ পাউন্ড), সফিক উদ্দিন (২৫০ পাউন্ড), আব্দুর রউফ (২৫০ পাউন্ড), আব্দুস সালাম (৫০০ পাউন্ড), চেচান প্রবাসী হাজী সিরাজ মিয়া (৫০০ পাউন্ড), সরিষাপাড়ার জগন্বর আলী (৫০০ পাউন্ড) ও আব্দুল মালিক (৫০০ পাউন্ড), ছাতারপাই গ্রামের প্রবাসী আব্দুল গৌছ (১০০০ পাউন্ড), জামক প্রবাসী তোতা মিয়া (২৫০ পাউন্ড) ও হাজী কালা মিয়া (২৫০ পাউন্ড), দেবের গাও প্রবাসী তারা মিয়া (২৫০ পাউন্ড), হাবিদপুর প্রবাসী হাজী ইদ্রিস আলী (২৫০ পাউন্ড)।[৪৭২] এ ছাড়াও অনেক প্রবাসী বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

জাউয়া বাজার এলাকার স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় প্রবাসীদের কষ্টার্জিত আর্থিক অনুদানেই মূলত জাউয়া বাজার কলেজের জমি ক্রয়, ভবন নির্মাণ, পরিসর বৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এসব মহান মনীষির অনবদ্য অবদানে শিক্ষার যে শিখাটি প্রজ্বলিত হয়েছে, যুগ যুগ ধরে তা আলো প্রজ্বলিত করবে, শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করবে গোটা অঞ্চলকে। শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে এসব মনীষির নাম চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে।

জয়নাল আবেদিন কলেজ, তাহিরপুর

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো জয়নাল আবেদিন কলেজ। তাহিরপুরের অন্তর্গত বাদাঘাটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন ১৯৯২ ইং সনে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৭৩] তাঁর নিজের নামেই কলেজের নামকরণ করা হয় 'জয়নাল আবেদিন কলেজ'। এই মহান মনীষির অর্থায়নেই কলেজের প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মিত হয় এবং মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান শাখায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে ১৯৯২ সালেই কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তাহিরপুরের সাবেক কৃতি মনীষি আলী মুর্তাজাকে। তাঁর সুনিপুণ পরিচালনা ও নেতৃত্বে কলেজটি ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে। একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলেজটির বিভিন্ন স্টাফ নিয়োগ, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও পরিচালনা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন তদারকিসহ বিভিন্ন কর্মে কলেজ প্রতিষ্ঠাতা জনাব জয়নাল আবেদিনকে সবদিক দিয়েই তিনি সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাহিরপুরের উচ্চশিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর এ অবদানও উল্লেখযোগ্য।

---

৪৭২. ডা. বসির আহমদ সম্পাদিত, সাপ্তাহিক সুরমা, লন্ডন, ৩০ মে ১৯৯৯, পৃ. ১১

৪৭৩. http://bn.m.wikipedia.org

Dhaka University Institutional Repository

কলেজের নিজস্ব ভূমির পরিমাণ মোট ৭.৫৫ একর। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি প্রতিষ্ঠাতার দান ও অর্থায়নে পাওয়া গেলেও এলাকার অনেক মুসলিম মনীষিও এলাকার শিক্ষা বিস্তারের মহান ব্রত নিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমি দিয়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য– জামালগড় নিবাসী কাঁচামিয়া, আলকাছ মিয়া, আমীর হোসেন, সোহরাব আলী, আব্দুস শহীদ, হাবিবুর রহমান, রাশিদ উল্লা, আব্দুল মান্নান, শফিক মিয়া, নূর মামুদ, আবছা বিবি, ছালামত আলী, আরজাদ আলী, টাকাটুকিয়া নিবাসী কাসেম আলী, আব্দুছ ছোবহান, জমিলা খাতুন, শের আলী ও আবু চান্দ চৌধুরী।[৪৭৪] এ ছাড়া বেশ কয়েকজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীও কলেজে ভূমি দান করেছেন।

আলহাজ জয়নাল আবেদিন শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য যে কলেজটি স্থাপন করেন তা আজ ডিগ্রী কলেজে রূপ লাভ করেছে। তাহিরপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম অবলম্বন হলো এ কলেজ। যার অনন্য বদান্যতায় কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই মহান মনীষি আলহাজ জয়নাল আবেদিন তাহিরপুরের সর্বস্তরের মানুষের নিকট চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

জনতা কলেজ, মঈনপুর

গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থার উদ্যোগে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ছাতকের মঈনপুরে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জনতা মহাবিদ্যালয় মঈনপুর'।[৪৭৫] গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গ্রামীণ জনপদে শিক্ষার আলো বিস্তারের কাজ করছিল। বিশেষত বয়স্কদের স্বাক্ষরতার শিক্ষা প্রদান, শিশু-কিশোরদের স্কুলমুখী করা কর্মসূচী গ্রহণ, অর্থাভাবে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোসহ শিক্ষার বিস্তারে এ সংস্থার নানামুখী কর্মসূচী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঈনপুর এলাকায় দীর্ঘদিন কোন কলেজ না থাকায় এলাকার সাধারণ জনতার প্রাণের চাওয়াকে উপলব্ধি করে গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা অত্র এলাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন দোলারবাজার ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান আব্দুল মুমিন ও মঈনপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক। তাদের কর্মতৎপরতা ও কলেজ প্রতিষ্ঠার বাস্তবিক পদক্ষেপে এ মহতি উদ্যোগকে সফল করতে আরো এগিয়ে আসেন ছৈলা আফজলাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছাইম উল্লাহ, সাবেক চেয়ারম্যান আবুল খায়ের, ছাতক প্রেসক্লাব সভাপতি একরাম উদ্দিন আহমদ, আলহাজ আফরোজ মিয়া, নোয়ার মিয়া মজুমদার, মোঃ ওয়ারিছ আলী, ফেরদৌস আলী, মহরম আলী, আজাদ

---

৪৭৪. অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংরক্ষিত ভূমিদাতাগণের নাম সম্বলিত বোর্ড থেকে সংগৃহীত।

৪৭৫. http://moumaachi.dev.csm.to

রব্বানী, ডা. সাইদুর রহমান, আব্দুল হান্নান পীর, হাজী বাদশা মিয়া, আব্দুল হক, মোকারম আলী প্রমুখ।[৪৭৬]

উপরোল্লিখিত মুসলিম মনীষিদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা, আর্থিক সহযোগিতা, সর্বোপরি এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণকে কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৪ সালের ১ জুলাই জনতা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। প্রথমে মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান এ তিন বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় মঙ্গনপুর গ্রামেরই কৃতি সন্তান আখলাকুর রহমানকে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কলেজটিকে সমৃদ্ধ ও নন্দিত প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেছেন। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, একাডেমিক মানবৃদ্ধি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কোন্নয়ন, অভিভাবক ও এলাকার সাধারণ জনগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করে তিনি দক্ষতার সাথে কলেজের কর্মাকাণ্ড পরিচালনা করে কলেজটিকে বিকশিত করেন। কলেজই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান ও প্রাণ। তিনি সুনিপুণ দক্ষতায় জনতা কলেজের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই কলেজটি ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রীধারী মোঃ আখলাকুর রহমান বহুগুণে গুণান্বিত একজন মহান মনীষি। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও ম্যাগাজিনে তাঁর প্রচুর লেখা ছাপা হয়েছে। তাছাড়া সিলেট বিভাগ বাস্তবায়ন আন্দোলনের তিনি ছিলেন অনন্য সংগঠক। ২০০০ সালে তিনি সুনামগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।[৪৭৭] ২০০১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে (প্লে গ্রুপ থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত) তিনি জনতা কলেজ ক্যাম্পাসে 'হলি গ্রীন কিন্ডার গার্ডেন' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘদিন নিজেই এর অবৈতনিক অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। সুনামগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে মোঃ আখলাকুর রহমান সর্বদাই একজন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

জনতা কলেজ মঙ্গনপুরের সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তীতে আরো যারা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মিছবাহ উদ্দিন, মোঃ আখলাকুজামান বাবুল, সাদেকুর রহমান খান, মহিউল ইসলাম জুয়েল, মোঃ খালেদ আহমদ, শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ জহিরুল হক, মোঃ ফরিদ আহমদ, মোঃ আব্দুর রশিদ ও মোঃ আশফাকুর রহমানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪৭৮]

---

৪৭৬. *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৪৭৭. প্রাগুক্ত
৪৭৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার সাধারণ জনতার স্বতঃস্ফূর্ততায় গড়ে উঠা জনতা কলেজ সত্যিকার অর্থেই সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষার আলো প্রজ্বলনের একটি শ্রেষ্ঠ বাতিঘর। যে বাতিঘরটি জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষার শিখা ছড়িয়ে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে অনেক আলোকিত ও যোগ্য মানুষ।

জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ

ব্রিটিশ ভারতীয় আমলের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী স্কুল হলো সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়। ১৮৮৭ সালের ২১ ডিসেম্বর স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৭৯] বিদ্যালয়ের উত্তরে সুরমা নদী, দক্ষিণে সুনামগঞ্জ পৌরসভা, পূর্বে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ এবং পশ্চিমে সুনামগঞ্জ পৌর কলেজ অবস্থিত। সুনামগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে ডি.এস. রোডে সুরমা নদীর তীরে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ১৮৩৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাণীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৭ সালে রাণীর ক্ষমতা গ্রহণের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে উপমহাদেশের ১৪টি বিদ্যালয় 'জুবিলী' নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪৮০] তারই ধারাবাহিকতায় জুবিলী উৎসব চিরদিন স্মরণ রাখার জন্যই সুনামগঞ্জেও প্রতিষ্ঠা করা হয় 'সুনামগঞ্জ জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়'। একটি সমৃদ্ধ পৃথক লাইব্রেরি ভবনসহ ৫টি ভবন, দু'টি হোস্টেল ও একটি পুকুর নিয়ে বিদ্যালয়টি ৬.৪৫ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগে অবস্থিত ব্রিটিশ আমলের তৈরি সুরমা আধাপাকা টিনশেড ভবনটি এখনও শতাধিক বৎসরেরও অধিক প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। ১৯১১ সালে এটি হাইস্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯২৮ সালে স্কুলটি সরকারীকরণ করা হয়।[৪৮১] প্রভাতী ও দিবা শিফটে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দুই শিফটের জন্য আলাদাভাবে দু'জন সহকারী প্রধান শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকের মোট পদ আছে ৫০টি। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা ১৭৮০ জন।[৪৮২] এটি শুধু সুনামগঞ্জ জেলার নয়; বরং সারা বাংলাদেশের সেরা স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর শিক্ষার পরিবেশ, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত গঠনমূলক কার্যক্রম, খেলাধুলা, শৃংখলা, মনোরম পরিবেশে এর অবস্থান সব মিলিয়ে এটি জেলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কৃতি ছাত্ররা অতীতের মতো আজো দেশের বহু উচ্চতর পদে ও কাজে নিয়োজিত আছেন। ১৩৫ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার আলো বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সুনামগঞ্জের সুনাম রক্ষা, বর্ধন ও উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করার ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানে যারা

---

৪৭৯. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

৪৮০. jubleesunamgonjpress.com

৪৮১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭

৪৮২. স্কুল অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করছেন, তাদের বেশিরভাগই এ স্কুলের ছাত্র। ফলে সমাজ বিনির্মাণ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অনবদ্য।

সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় ২০০৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়। ২০০১ সালে শিশু একাডেমি আয়োজিত জ্ঞান জিজ্ঞাসা প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০১১ সালে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ১০ম ও ২০১২ সালে ১৯তম স্থান অধিকার করে। তা ছাড়া ২০১১ সালে বিদ্যালয়ের একজন স্কাউট 'প্রধানমন্ত্রী এ্যাওয়ার্ড' লাভ করে।[৪৮৩] এভাবে জন্মলগ্ন থেকে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে আসছে।

সুনামগঞ্জ জেলার প্রাচীন ও ঐতহ্যবাহী এ বিদ্যাপীঠটি মূলত তৎকালীন প্রশাসনের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদানও রয়েছে এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া না গেলেও বিদ্যালয়ের জমিদানের ক্ষেত্রে লক্ষণশ্রীর জমিদার দেওয়ান আনোয়ার রাজা ও দুহালিয়ার জমিদার দেওয়ান মোহাম্মাদ আসফের অবদান অনস্বীকার্য।[৪৮৪] সুরমা নদীর তীরে ঐতিহ্যবাহী নান্দনিক স্থাপনায় গড়ে উঠা এ বিদ্যাপীঠ শুরু থেকে অদ্যাবধি জ্ঞানের আলো বিতরণে গৌরবময় প্রতিনিধিত্ব করছে। যেসব মুসলিম মনীষি বিভিন্ন সময়ে কর্ণধার হয়ে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– মৌলভী আরশ আলী, মৌলভী মজাক্কির আলী চৌধুরী, মৌলভী আব্দুর রশিদ চৌধুরী, মৌলভী আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী, জনাব এ. এফ. এম মহসীন, কাজী সিরাজুল হক, আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী, তফাজ্জুল হোসেন, আব্দুল গনি, নূরুল আলম, শাহ সৈয়দ মনিরুল হক, নজির মিয়া, চৌধুরী আব্দুল লতিফ, শফিকুল হক চৌধুরী, মহিউদ্দিন খন্দকার, বাবর আলী সরকার, আব্দুর রহমান তালুকদার, আব্দুর রাজ্জাক, আনোয়ার হোসেন, সেকেন্দর আলী খলিফা, আব্দুল হামিদ, আব্দুল মালেক মিয়া ও এ. এফ. এম মাসুদুল হাসান।[৪৮৫] বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন মোঃ ফয়েজুল রহমান।

শিক্ষাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যেসব জুবিলীয়ানরা যশ ও খ্যাতি অর্জন করে জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন তন্মধ্যে সাবেক শিক্ষা সচিব ও পি.এস.সি চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মাদ সাদিক, বিচারপতি মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী রুমি, প্রখাত সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমান, সংসদ

---

৪৮৩. bn.m.wikipedia.org

৪৮৪. শাহজাহান চৌধুরী সম্পাদিত, *স্ফুলিঙ্গ*, সাহিত্য সাময়িকী, সুনামগঞ্জ, ২০ ফেব্রু., ১৯৭৮, পৃ. ১৩

৪৮৫. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ, সাবেক হুইপ ফজলুল হক আছপিয়া, সাকেব প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক চৌধুরী, কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি হাসান শাহরিয়ার প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪৮৬] শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, নৈতিকতা ও আদর্শের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়টি এক পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। নৈতিকতা ও আদার্শের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ ক্লাস নেয়ার দৃষ্টান্ত বিদ্যালয়টিকে স্বাতন্ত্রিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

ছাতক বহুমুখী মডেল হাইস্কুল

সভ্যতার ক্রম বিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে কিছু ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব ঘটেছে এবং তাদের ত্যাগ ও কর্ম প্রচেষ্টায় সমাজ উপকৃত ও বিকশিত হয়েছে। তেমনি কালজয়ী এক মহান মনীষি ছিলেন সুনামগঞ্জ মহকুমার তৎকালীন এস.ডি.ও সৈয়দ মর্তুজা আলী। সুনামগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালনের জন্য সুনামগঞ্জবাসীর নিকট তিনি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে তিনি ছাতক ভিজিটে এসে জানতে পারেন যে, সারাদেশে কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে পরিচিত ছাতক শহরে একমাত্র চন্দ্রনাথ এম.ই স্কুল জোনাকীর মত জ্বলছে। এখানে কোন হাইস্কুল নেই। এ অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হন এবং এলাকার কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিকে একটি সাধারণ সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ছাতকে একটি 'হাই ইংলিশ স্কুল' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৬.০১.১৯৪১ ইং তারিখে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মর্তুজা আলী এস.ডি.ও সুনামগঞ্জ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মি. এ.সি বিশ্বাস, মি. টি পেলাম, বাবু কেদার নাথ দাস, হাজী আলী রাজা চৌধুরী, জুয়াদুর রাজা চৌধুরী, দেওয়ান মোঃ আহবাব চৌধুরী, দেওয়ান আজরফ চৌধুরীসহ মোট ৪৯ জন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব।[৪৮৭] এ সভায় উপস্থিত ৪৯ জন সদস্য নিয়ে ছাতকে 'হাই ইংলিশ স্কুল' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এরপর ০৭.০৩. ১৯৪১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে স্থানীয় জনাব আব্দুল মতিন সাহেবের বাড়িতে বার্ষিক ৫৪ রুপী ভাড়ায় ৭ম শ্রেণির ক্লাস চালুর মাধ্যমে স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়।[৪৮৮]

---

৪৮৬. মোঃ বুরহান উদ্দিন, ১৩০ বছর ধরে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৭ জানু, ২০১৭

৪৮৭. মোঃ মঈনুল হোসেন চৌধুরী, ছাতক বহুমুখী মডেল হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সৈয়দ হারুন অর রশিদ সম্পাদিত, *স্মৃতির তরঙ্গমালা* (সুনামগঞ্জ : ৩ এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ৫৩

৪৮৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের Proceeding Book পর্যালোচনাক্রমে দেখা যায় যে, ২৯.০৫.১৯৪২ ইং তারিখে এস.ডি.ও সুনামগঞ্জকে সভাপতি ও এস.আর সুনামগঞ্জকে সেক্রেটারী করে ছাতক হাই ইংলিশ স্কুলের ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়। ১১.০৮.১৯৪২ ইং তারিখে এস.ডি.ও সৈয়দ মর্তুজা আলীর সভাপতিত্বে ছাতক হাই ইংলিশ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি, কার্যনির্বাহী কমিটি ও চন্দ্রনাথ এম.ই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ মোট ১০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস চালু করার পর ভাড়া বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান না হওয়ার প্রেক্ষিতে ছাতক হাই ইংলিশ স্কুলের কার্যক্রম সাময়িকভাবে চন্দ্রনাথ এম.ই স্কুলে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত মেতাবেক ০১.০৯.১৯৪২ থেকে ৩১.১২.১৯৪৩ পর্যন্ত উক্ত স্কুলের কার্যক্রম চন্দ্রনাথ এম.ই স্কুলে চালানো হয়।[৪৮৯]

১০.০১.১৯৪৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার ৪নং প্রস্তাবে চন্দ্রনাথ এম.ই স্কুলের সেক্রেটারীকে স্কুলের যাবতীয় ফান্ড ছাতক হাই ইংলিশ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির নামে পরিচালিত 'সিলেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক', ছাতক শাখায় স্থানান্তরের জন্য এবং হাইস্কুলের ভাগের আসবাপত্র অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।[৪৯০]

স্কুলের বর্তমান ভিটা ও পুকুরের মূল মালিক ছিলেন গৌরীপুর স্টেটের তৎকালীন জমিদার বি. কে রায় চৌধুরী। সম্পত্তিটি পরিত্যক্ত থাকায় এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ বিশেষত এস.ডি.ও এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে স্কুলের মূল ভিটা পুকুর ও পুকুর পাড় সহ ১.৫১ একর ভূমি জমিদার বি. কে বাবু প্রথমে ব্যবহারের অনুমতি ও পরবর্তীতে দলীল করে স্কুলে দান করেন।[৪৯১] জমিদার বাবুর অনুমতি প্রাপ্তির পর বর্তমান ভিটায় ছাতকের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী ও বিত্তবান ব্যক্তিগণের নিকট থেকে অনুদান সংগ্রহ করে প্রথমত একটি টিনের কাঁচা ঘর নির্মাণ করা হয়। অনুদান প্রদান করে স্কুলটি বিনির্মাণে এগিয়ে আসেন হাজী আবুল মহসীন, হাজী আব্দুল কবির, সুজন মিয়া চৌধুরী, হাজী আরজ মিয়া চৌধুরী, হাজী মদরিছ চৌধুরী প্রমুখ মুসলিম মনীষিবৃন্দ।[৪৯২] ১০.০২.১৯৪৪ ইং তারিখে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সৈয়দ মর্তুজা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার 18(a) নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চেয়ারম্যান 'আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট লি. ছাতক'কে অত্র স্কুলে একটি বিল্ডিং নির্মাণের লক্ষ্যে ২০০০ রুপি অনুদান প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

---

৪৮৯. প্রাগুক্ত।

৪৯০. https://yellow.place.chhatak.bohu

৪৯১. Z.Ahmed Chowdhury. District Manager. Govt. Aquired States, Sylhet, Memo no-1463/SA/ XXVII-3(a); Date : 11.09.1956

৪৯২. https://www.cgbmhs.edu.bd-index

Dhaka University Institutional Repository

সিমেন্ট কোম্পানি অনুদান প্রদানে সম্মত হওয়ার প্রেক্ষিতে ১২.১১.১৯৪৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিমেন্ট কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার মি. এ. কে বিশ্বাসকে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত করা হয়।[৪৯৩] ১৯৫৪ সালে আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানি স্কুলের প্রথম টিনশেড ভবনটি নির্মাণ করে দেয়।

বহুমুখী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এ স্কুলটি ১৯৪৪ সাল থেকে তার নিজস্ব ভূমিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ০৩.০৭.১৯৪৪ ইং তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলটি প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথমত স্কুলে শুধুমাত্র মানবিক বিভাগ চালু হয়। ০১.০১.১৯৬৮ সালে চালু হয় বিজ্ঞান বিভাগ, এরপর চালু হয় কৃষি বিজ্ঞান বিভাগ। স্কুলে দুই এর অধিক বিভাগ চালু হওয়ার পর থেকেই ছাতক ইংলিশ হাই স্কুলটি হয়ে যায় ছাতক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। ০১.০১.১৯৯৯ ইং তারিখ থেকে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু হয়। ০৫.০৭.২০১১ সালে '৩০৬টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্প পরিচালকের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর স্কুলটি 'ছাতক বহুমুখী মডেল হাইস্কুলে' রুপান্তরিত হয়।[৪৯৪] ১৯৭০ সাল পর্যন্ত স্কুলে সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলটি মডেল স্কুলে রূপান্তরের পর চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ২০১২ সাল থেকে পুনরায় সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষা কেন্দ্র, ২০১০ সাল থেকে জে.এস.সি পরীক্ষা কেন্দ্র, পি.এস.সি বৃত্তি পরীক্ষা ও বিভিন্ন নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবেও স্কুলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ২০১৮ সালের ২১ মে বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ হয়।

স্কুলের নিজস্ব ভূমির পরিমাণ ৫.৩১৫ একর। তন্মধ্যে ১.৫১ একর জমিদার বি. কে রায় চৌধুরীর দানকৃত। তাছাড়া মরহুম হাজী আবুল মহসীন এবং মরহুম হাজী আব্দুল কবির স্কুলের খেলার মাঠ তৈরির জন্য মাঠের নাম 'মহসীন ফিল্ড' রাখার শর্তে কয়েকটি প্লটে সাড়ে সাত কেদার জমি স্কুলে দান করেন। এ ছাড়া সুজন মিয়া চৌধুরী (আছাব মিয়া) এবং তাঁর ছোট ভাই আরজ মিয়া চৌধুরী নিঃশর্তভাবে স্কুলে এক কেদার জমি দান করেন। তাছাড়া জনাব আশকর আলী, মমশ্বির আলী, শামীম আহমদ, তানজিদ আহমদ ও ইশতিয়াক আহমদ হিমেল দশ শতাংশ করে স্কুলে ভূমি দান করেছেন।[৪৯৫] ১৯৪৫ সালে সিমেন্ট কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত ভবনটি জরাজীর্ণ হওয়ায় অতি সম্প্রতি তা ভেঙ্গে ফেলা হলেও বর্তমান ৪টি ভবনের মধ্যে পুরাতন তিনতলা ভবনটি এখনও ঐতিহ্যের স্মারক

---

৪৯৩. *স্মৃতির তরঙ্গমালা*, প্রাগুক্ত।

৪৯৪. প্রাগুক্ত।

৪৯৫. স্কুলে সংরক্ষিত ভূমি দাতাদের পুরাতন রেজিস্টার খাতা থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল আজম খান ছাতক সফরে আসলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে ফ্যাসেলিটিজ বিভাগ কর্তৃক পূর্বমুখী তিনতলা ভবন, ২০০৪ সালে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উত্তরমুখী দু'তলা ভবন এবং ২০১৪ সালে মডেল স্কুলে রূপান্তরের পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমমুখী তিনতলা ভবন নির্মিত হয়েছে। স্কুলের এ অবকাঠামোগত অগ্রগতি ও শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সর্বাগ্রে যার ভূমিকা অনস্বীকার্য তিনি হলেন স্কুল প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ভূমিদাতা ও দীর্ঘদিন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ছাতকের কৃতি পুরুষ হাজী আরজ মিয়া চৌধুরী।[৪৯৬] স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ স্থায়ীকরণ, সেকশনের অনুমোদনের মাধ্যমে নতুন শিক্ষক নিয়োগ, প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব আধুনিকায়নসহ যুগান্তকারী অনেক কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে স্কুলটিকে তার পূর্বের মহিমায় ভাস্বর করেছেন।

ছাতক অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এ বিদ্যালয়ের কালজয়ী অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বর্তমান সময়ে অনেক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও ছাতক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের উপর বিন্দুমাত্র দাগ পড়েনি; বরং উক্ত বিদ্যালয়ের স্বীয় ঐতিহ্য বরাবরের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। অত্র বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবন শেষ করে বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগ করে শিক্ষার আলো বিস্তারের পাশাপাশি দেশ ও জনগণের সেবা করে বিদ্যালয়ের সুনামকে আরো বৃদ্ধি করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণ বিদ্যালয়টির ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করেছে। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামেও এ স্কুলের ছাত্ররা অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন।

৮০ বছরের পথ পরিক্রমায় প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার হিসেবে শিক্ষার মান উন্নয়নে যে সব মুসলিম মনীষি শ্রম ও মেধা দিয়ে ছাতকবাসীকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন– জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মোঃ জোয়াহির রাজা চৌধুরী, মিরাজ উদ্দিন আহমদ, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল মুগনী, মোঃ আলিম উদ্দিন এবং ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি মোঃ মঈনুল চৌধুরী।[৪৯৭]

সর্বোপরি সুনামগঞ্জ জেলা তথা সমগ্র সিলেট অঞ্চলের শিক্ষাঙ্গনের এক গৌরবোজ্জ্বল নাম 'ছাতক বহুমুখী মডেল হাই স্কুল'। প্রাচীন এ বিদ্যাপীঠ আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল থেকে দীর্ঘ ৮০ বছর ধরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আলোকিত করেছে এ জনপদকে। যে সব মহৎ প্রাণ ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও

---

৪৯৬. ধীরাজ কুমার দাস, আরজ মিয়া চৌধুরী প্রসংগে কিছু কথা, *স্মৃতির তরঙ্গমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪৯৭. *স্মৃতির তরঙ্গমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যাদের কর্ম পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটির উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, সুনামগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।

সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রামের নাম সৈয়দপুর। হযরত শাহজালাল (রহ)-এর অন্যতম সঙ্গী হযরত শাহ শামসুদ্দীন (রহ) সৈয়দপুর দরগাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এ গ্রামের সিংহভাগ অধিবাসীই হযরত শাহ শামসুদ্দিন (রহ)-এর অধস্তন বংশধর। শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উক্ত গ্রামের স্বাতন্ত্রিক ঐতিহ্য সর্বজন স্বীকৃত। এ গ্রামেরই একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়।

সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কোন একক ব্যক্তি নন, এটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। ১৯৬২ সালে সৈয়দপুর গ্রামের যে সব ছাত্ররা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতেন তাদের মধ্যে সৈয়দপুরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেখা দেয়। তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, ঐতিহ্যবাহী এ গ্রামে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার। তখন এটি ছিল একটি স্বপ্নমাত্র। উক্ত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের কোন এক বৃষ্টি ভেজা দিনে গয়গড় নিবাসী ডা. সৈয়দ আছাব মিয়ার বাড়িতে উল্লিখিত উদ্যোক্তা ছাত্রবৃন্দ একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে সৈয়দপুর গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[৪৯৮] উক্ত হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সামনে রেখে পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডনের পার্ট সেক্রেটারী সৈয়দ আশফাক হোসেন ফারুকের পোস্ট অফিস বাড়িতে প্রথম পরামর্শ সভায় মিলিত হন। উক্ত সভায় সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ফখরুল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, সৈয়দ নজমুল হোসেন, শেখ মোহাম্মাদ আসাদ্দর আলী, সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[৪৯৯] নভেম্বর মাসে উদ্যোক্তা ছাত্রগণ গ্রামের হালিচারা মাঠে সে সময়ের বি.এ পরীক্ষার্থী সৈয়দ আব্দুল মালিক (যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের জি.এম হয়েছিলেন), তখনকার কলেজ ছাত্র সৈয়দ আমিরুল, ইউ. পি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল খালিকসহ অন্যান্যদের সাথে আরেকটি পরামর্শ সভা করেন। উক্ত সভায় সৈয়দ আব্দুল মালিক তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত গ্রামের সকল ছাত্রই যাতে প্রস্তাবিত সৈয়দপুর স্কুলে এসে ভর্তি হন তার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শের প্রেক্ষিতে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের স্কুল পড়ুয়া ছাত্রগণ নিজ নিজ স্কুল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে নিজ গ্রামে প্রস্তাবিত নতুন স্কুলে ভর্তি হতে চলে আসেন।

---

৪৯৮. রাগিব হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, *জগন্নাথপুরের কথা*, সুনামগঞ্জ, ১৯৯৭, পৃ. ২৭

৪৯৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা যা স্কুল প্রতিষ্ঠাকে তরান্বিত করেছে বহুগুণে। স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ধারাবহিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অবশেষে বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাড়পত্র নেয়া গ্রামের শিক্ষার্থীদের নিয়েই ১৯৬৩ সালের ১৩ মার্চ এক সুন্দর সকালে চৌধুরী বাড়ির সৈয়দ আজমল আলীর বাংলোয় যাত্রা শুরু হয় 'সৈয়দপুর জুনিয়র হাইস্কুলের'।[৫০০]

সৈয়দপুর স্কুল স্থাপনের প্রারম্ভে কারো নিকট থেকে কোন আর্থিক সহায়তা নেওয়া হয়নি। সৈয়দ আব্দুল মালিক, মোঃ আব্দুল খালিক, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ফখরুল, সৈয়দ তৈমুছ আলী–এই চার মহান ব্যক্তি প্রথমে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রথম দিকে শুধু ছাত্রদের বেতন এবং কিছুদিন পর স্কুল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে মাসিক এক টাকা চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে স্কুলের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হতো। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে মৌলভী সৈয়দ শফিকুল হক পাইলগাঁও হাইস্কুল থেকে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজ গ্রামের নব প্রতিষ্ঠিত স্কুলে যোগদান করেন। তাঁর এ মহান ত্যাগ এবং পরবর্তীতে স্কুল গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর নানামুখী পদক্ষেপ ও কর্ম তৎপরতা আজীবন স্মরণীয়। স্কুলটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্কুল কমিটির প্রথম সেক্রেটারী সৈয়দ আব্দুল মান্নান সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করেন। আজীবন তিনি স্কুলটির উন্নয়নের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্কুলটির প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্বে উল্লিখিত চারজন ছাড়াও পরবর্তীতে যারা বিনা বেতনে শিক্ষকতা করে শিক্ষার আলো সম্প্রসারণ করে নিজেদের মহীয়ান করেছেন তারা হলেন, সৈয়দ কবির আহমদ–এডভোকেট, সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন–ব্যাংকার ও সৈয়দ নজমুল হোসেন।[৫০১] প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আব্দুল মালিকসহ উপরোক্ত শিক্ষকগণের অনুকরণীয় এ দৃষ্টান্ত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৬৮ সালে স্কুলটি চৌধুরী বাড়ি থেকে বর্তমান স্থানে স্থাপিত হয়। স্কুলের বর্তমান স্থানটি নির্ধারণ করেন স্কুল কমিটির প্রথম সভাপতি সৈয়দ আরজুমন্দ আলী ও সৈয়দপুরের কৃতি পুরুষ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান।[৫০২] জন্মলগ্ন থেকে স্কুলটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা, স্কুলের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতির পেছনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষত সৈয়দ আরজুমন্দ আলীর সারা জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান ছিল এ স্কুল। আমৃত্যু স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জ্ঞানের আলো সম্প্রসারণে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। সৈয়দ মজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় প্রথম দিকে স্কুলটি সরকারী অনুদান ও সকল প্রকার সাহায্য পায়। সৈয়দ মহিউদ্দিন (কাঁচা মিয়া) একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এ স্কুলের সম্পূর্ণ ভূমি একাই দান করেছেন। ১৯৭১ সালে সৈয়দ আরজুমন্দ আলী ও সৈয়দ মুজিবুর রহমানের

---

৫০০. https://www.Syedpurpiloths.edu.bd

৫০১. প্রাগুক্ত।

৫০২. সিলেট কল্যাণ সমিতি সম্পাদিত, *সৈয়দপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ১৯৯৩, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে স্কুলটি জুনিয়র স্কুল থেকে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। একই বছরেই প্রথম স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি পায়। প্রথমে স্কুলটিতে শুধু মানবিক শাখা থাকলেও পরবর্তীতে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু হলে স্কুলটি 'সৈয়দপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৫০৩]

স্কুলের প্রাক্তন মূল ভবন তৈরি হয় সৈয়দপুর গ্রামের লন্ডন প্রবাসীদের আর্থিক সহযোগিতায়। যারা প্রবাসে থেকেও এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে স্কুলের অবকাঠামো নির্মাণে আর্থিক অনুদান প্রদান করছেন তারা হলেন– সৈয়দ মনাজ আলী (সন্ত মিয়া), সৈয়দ শামসুল হক (পাখি মিয়া) ও সৈয়দ আনহার মিয়া।[৫০৪] পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনসহ পাইলট প্রকল্পের অধীনে অন্যান্য ভবনসমূহ সরকারী অনুদানে স্থাপিত হয়। সরকারী অনুদান প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সৈয়দপুরের কৃতি সন্তান বর্তমানে যুগ্ম-সচিব হিসেবে কর্মরত সৈয়দ জগলুল পাশা।[৫০৫] ১৯৮৬ সালে পাইলট প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিদ্যালয়টির নমকরণ করা হয় 'সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যায়ল'। ১৯৮৭-৮৮ সালে প্রকল্পের অধীন একটি দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়। শিক্ষার আলো আরো ব্যাপকারে ছড়ানোর লক্ষ্যে অত্র বিদ্যালয়ে ১৯৯৪ সালে 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রাম চালু করা হয়। ফলে নিয়মিত ঝরে পড়া অনেক শিক্ষার্থী এস.এস.সি পাশ করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। জগন্নাথপুর উপজেলায় এটি একমাত্র 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এস.সি প্রোগ্রামের টিউটরিয়াল এবং পরীক্ষা কেন্দ্র। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে একটি ভার্চুয়াল কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে একধাপ এগিয়ে চলতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে একটি বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে। একই সালের ম্যানেজিং কমিটির অর্থায়নে ৩৭৫ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৫৫ ফুট প্রস্থ সীমানা প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। 'সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়' আবাসন ও অবকাঠামোগত দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আকর্ষণীয় বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টিকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসার পেছনে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব আরজুমন্দ আলীর সুযোগ্য পুত্র সৈয়দ রশীদ আহমদ এহসান, শিক্ষানুরাগী সদস্য সৈয়দ শাহ কামাল চৌধুরী, অভিভাবক সদস্য সৈয়দ মশহুর আলীর অবদান সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য।[৫০৬] তাছাড়া ২০১০ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে

---

৫০৩. https:// bn.m.wikipedia.org-wiki

৫০৪. *জগন্নাথপুরের কথা*, প্রাগুক্ত।

৫০৫. *কথকতা*, প্রাগুক্ত।

৫০৬. *সৈয়দপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

থাকা সৈয়দা নূরুন নাহার বিদ্যালয়টির অবকাঠামোসহ মানসম্মত শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি যেমন সুনামগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন তেমনি তার প্রতিষ্ঠানকেও জগন্নাথপুর উপজেলা পর্যায়ে এবং পরে সুনামগঞ্জ জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।[৫০৭] সৈয়দপুর গ্রামেরই কৃতি সন্তান বর্তমান প্রধান শিক্ষক সৈয়দা নূরুন নাহার মাতৃস্নেহে নিজ প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের লালন-পালন করে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

সুনামগঞ্জের এক স্বনামধন্য এলাকার নাম গোবিন্দগঞ্জ। এই এলাকায় শিক্ষার আলো বিলিয়ে দিয়ে জেলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছে 'গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়'। সিলেট-সুনামগঞ্জ মিলনস্থলে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃহৎ এ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্য বহন করে আসছে। ১৯৫৭ সাল থেকে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকার লোকদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলতে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্রিটিশ ভারতে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ছাতক অঞ্চলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, ছিল একমাত্র গোবিন্দনগর এম ই মাদরাসা যা ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌলভী ফজলুল করিম মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৫০৮] ব্রিটিশ ভারতে পিছিয়ে পড়া মুসলমান তথা এলাকাবাসীর ক্যলাণে এ মহতী উদ্যোগ পরবর্তীতে কেবল প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই নয়, এলাকার সার্বিক উন্নয়নে আলোকবর্তিকার ন্যায় কাজ করে। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দিকে আসামের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ছাতকের কৃতি পুরুষ মাওলানা আবু নছর মোহাম্মদ ওয়াহিদ। এ সময় ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি সিলেট অঞ্চলে মাদরাসা শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ১৯১২ সালের এক তথ্যে পাওয়া যায়, উপরোক্ত সময়ে সুনামগঞ্জে ৫টি মিডল ইংলিশ প্রতিষ্ঠান ছিল তন্মধ্যে অন্যতম ছিল গোবিন্দনগর এম. ই মাদরাসা। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই মাদরাসার পরিচালক ও হেড মৌলভী ছিলেন মাওলানা মফিজ উদ্দিন।[৫০৯] তাঁর মৃত্যুর পর মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মাদরাসা ভবনটি প্রায় এক বৎসর পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে এলকার কিছু সংখ্যক মানুষ চিন্তা-ভাবনা করেন, কি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় চালু করা যায়।

---

৫০৭. *দৈনিক আগামীর সময়*, ১৬ নভেম্বর, ২০১৮

৫০৮. মুহাম্মাদ ফয়জুর রহমান, *বৃহত্তর সিলেটের শিক্ষা* (সিলেট : জালালাবাদ যুব অতীত ও বর্তমান ফোরাম, ১৯৮৯), পৃ. ১০৩

৫০৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিঃস্বার্থ কর্মস্পৃহা, অর্থপূর্ণ অবদানে সমাজজীবন উপকৃত ও আলোকিত হয়। কর্মগুণে মৃত্যুর পরও তাঁরা অমর হয়ে থাকেন, মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নেন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। তেমনি দু'জন মহান ব্যক্তি এগিয়ে আসেন গোবিন্দগঞ্জে শিক্ষার মশাল পূর্ণ প্রজ্বলিত করতে। সে মহান ব্যক্তিদ্বয়ের একজন হলেন গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক এ. কে. এম শামছুল হক (ছমরু মিয়া), গ্রাম- পালপুর প্রকাশিত জামুরাইল, ইউনিয়ন কালারুকা। অপরজন হলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সহকারী প্রধান শিক্ষক আলহাজ আব্দুছ ছোবহান (মদরিছ মাস্টার), গ্রাম- রাজনপুর, ইউনিয়ন দোহালিয়া।[৫১০] উক্ত দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মহান ব্যক্তিদ্বয় ১৯৫৬ সালের প্রথমদিকে গোবিন্দনগরের মুরব্বীগণের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন মাদরাসার পরিত্যক্ত ভবনে একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। তখন অনেকেই পরিহাস করলেও স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন মৌলভী গোলাম মোস্তফা, ওয়াহাব আলী মেম্বার, মোবারক আলী, এফাজ উদ্দিন, আফতাবুর রহমান, মুন্সী ওয়াহাব আলী, সফিকুল হক, মাস্টার মখছুদুল করিম, মাস্টার রইছ আলী, আবুল হোসেন, হেমু বাবু ও মখলিছুর রহমান।[৫১১]

দুই বন্ধুর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে এবং এলাকাবাসীর সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা ও পরিশ্রমে তৎকালীন গোবিন্দনগর এম. ই মাদরাসার পরিত্যক্ত ভবনে ১৯৫৭ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় 'গোবিন্দগঞ্জ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৪০ জন, ৭ম শ্রেণিতে ১৪ জন এবং ৮ম শ্রেণিতে ০৪ জন ছাত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলটির কার্যক্রম শুরু হয়।[৫১২] ০৪.০৭.১৯৫৮ সালে স্কুলটি জুনিয়র হাইস্কুল হিসেবে এবং ০১.০১.১৯৬৬ সালে পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৫১৩] সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করেন তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য মৌলভী ফজলুল করিম (মুক্তিরগাও) ও জাতীয় পরিষদ সদস্য সিরাজুন নেছা চৌধুরী (দূর্গাপাশা)।

স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখনকার সময় গ্রামীণ এলাকার ছাত্রদের জায়গীরের সুবন্দোবস্ত থাকায় দূর-দূরান্ত থেকে এসে ছাত্ররা স্কুলে ভর্তি হতে থাকে। ছাত্র জায়গীর দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুছ ছোবহান (মদরিছ মাস্টার)। তিনি এলাকায় অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। স্কুল সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ঘুরে ঘুরে তিনি

---

৫১০. আব্দুস সহিদ মুহিত সম্পাদিত, কালের প্রবাহ, স্মারকগ্রন্থ, ডিসেম্বর, ২০১৪

৫১১. প্রাগুক্ত।

৫১২. প্রাগুক্ত।

৫১৩. স্কুলে সংরক্ষিত রেকর্ড থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের জায়গীরের ব্যবস্থা করতেন এবং পরবর্তীতে ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে খোঁজ নিতেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর এ নিরলস কঠোর সাধনা যুগ যুগ ধরে গোবিন্দগঞ্জবাসীর হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দিন দিন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরাতন ভবনটি সম্প্রসারণ করেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কুলটি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে বর্তমান স্থানে ২ কেদার জমি ক্রয় করা হয় এবং প্রায় পৌনে তিন কেদার জমি এলাকার শিক্ষা হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ স্কুলের নামে দান করেন। জমি দান করে শিক্ষা বিস্তারে যারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তারা হলেন তকিপুর নিবাসী হাজী মেহের উদ্দিন ৩০ শতক, হাজী আব্দুল লতিফ ০৭ শতক ও আব্দুর রাজ্জাক ০৭ শতক। রামপুর নিবাসী আব্দুল আজিজ ০৭ শতক ও আব্দুল মান্নান ০৭ শতক, চানপুর নিবাসী আয়বর আলী ০৭ শতক, ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী ইদ্রিছ আলী ০৮ শতক ও এ. কে এম শামছুল হক (ছমরু মিয়া) ০৮ শতক। ক্রয় ও দান সূত্রে স্কুলের মোট জমির পরিমাণ ১ একর ৪১ শতক।[৫১৪] পূর্বতন স্থানে ২ কেদার জমি বিক্রি করে বর্তমান স্থানে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ইট ভাটা পুড়িয়ে স্কুল গৃহ নির্মাণের প্রস্তুতি নেয়া হয়। এ সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্ররা স্কুলগৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাঁশ-গাছ কেটে কাঁধে করে বহন করে নিয়ে এসেছেন। প্রধান শিক্ষক ছমরু মিয়া দিন রাত ছাত্রদের নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন ভবনের কাজ আরম্ভ করে অতি দ্রুততার সাথে একটি এল সাইজ সেমি পাকা ঘর নির্মাণ করে স্কুলটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।[৫১৫] এ ঘরটি কালের সাক্ষী হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মদরিছ মাস্টার লন্ডনে পাড়ি জমান। সেখানেও তিনি স্কুলের জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করেন। লন্ডন প্রবাসীদের মধ্যে তকিপুরের গোলাম মোস্তফা, রামপুরের হাজী মোহাম্মদ দানাই, হাউলীর পীর শাহ জমশেদ আলী, শ্যামনগরের নানু মিয়া ও আঙ্গুর মিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অনুদান দিয়ে স্কুলের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেন।[৫১৬] ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেই আবার তাঁর নিজ স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষকতা শুরু করেন। স্কুলের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে এ মহান ব্যক্তি পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারও হন। স্কুলের জন্য তিনি প্রতি অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান সংগ্রহ করে প্রথম দিকে স্কুলের ব্যয়ভার সংকুলান করতেন। তিনি লটারী খেলা ও নাটক মঞ্চস্থ করেও স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। স্কুলের জন্য তাঁর এ বহুমুখী কর্মতৎপরতা তাঁকে আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয় করেছে।

---

৫১৪. স্কুলের ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ের দলীল থেকে সংগৃহীত।

৫১৫. *কালের প্রবাহ*, প্রাগুক্ত।

৫১৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদদের মধ্যে জেনারেল এম.এ.জি ওসামানী, দেওয়ান ফরিদ গাজী, সংসদ সদস্য কলিম উদ্দিন মিলন ও মহিবুর রহমান মানিকের অবদানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত ২০০২ সালে তৎকালীন এম.পি কলিম উদ্দিন মিলনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্কুলে দু'টি ভবন নির্মিত হয়।

যে সমস্ত মহৎপ্রাণ মনীষিগণ শিক্ষার আলো বিতরণের পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকতা ও সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে স্কুলটিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে নিরলস সাধনা করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন জনাব এ. কে. এম শামসুল হক (ছমরু মিয়া), মোঃ মুহিবর রহমান, মোঃ আজহার আলী, সৈয়দ আকবর আলী, মোঃ আবদুল আলীম চৌধুরী, আব্দুল হাছিব, আব্দুছ ছোবহান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল মুগনী, মোঃ ফজলুল করিম ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ আতাউর রহমান।[৫১৭]

স্কুলের পাশাপাশি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত 'ছমরু মিয়া ও মদরিছ মাস্টার মেমোরিয়াল এডুকেশন ট্রাস্ট'ও এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। স্কুলের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছমরু মিয়াকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁরই সহযোদ্ধা মদরিছ মাস্টার ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'এ. কে. এম শামসুল হক (ছমরু মিয়া) মেমোরিয়াল এডুকেশন ট্রাস্ট'। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ ট্রাস্ট ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ২৫ জনকে আনুষ্ঠানিক বৃত্তি ও সনদ প্রদান, ছাতক উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে ইউনিয়নভিত্তিক ১টি ট্যালেন্টপুল ও ২টি সাধারণ বৃত্তি অত্র স্কুলে অধ্যয়নরত ৭ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীদের বৃত্তি ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও কোমলমতি শিশুদের মেধার বিকাশ ও শিক্ষার প্রতি অদম্য উদ্যোমীকরণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৩ সালে ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা মদরিছ মাস্টার ইন্তেকাল করলে ১২.০৫.১৪ ইং তারিখে ট্রাস্টের কার্যকরী কমিটির সভায় ট্রাস্টের নতুন নামকরণ করা হয় 'ছমরু মিয়া ও মদরিছ মাস্টার মেমোরিয়াল এডুকেশন ট্রাস্ট'।[৫১৮] ট্রাস্টটি শিক্ষা বিস্তার ও আর্ত মানবতার কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং শিক্ষার জন্য আত্মউৎসর্গকারী দু'মহান ব্যক্তির অম্লান স্মৃতি বহন করছে।

স্কুলটি নানা প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে শিক্ষার আলোকবার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। বর্তমানে স্কুলটি একটি পূর্ণাঙ্গ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে একটি আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। কালের ইতিহাসে লেখা থাকবে প্রতিষ্ঠাতা ছমরু মিয়া এবং মদরিছ মাস্টারসহ যারা অবদান রেখেছেন তাদের নাম।

---

৫১৭. প্রাগুক্ত।

৫১৮. https://www.gobindagonjhs.edu.bd

Dhaka University Institutional Repository

এইচ.এম.পি উচ্চ বিদ্যালয় সুনামগঞ্জ

এইচ.এম.পি উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ণ নাম হচ্ছে 'হাজী মকবুল পুরকায়স্থ উচ্চ বিদ্যালয়'। এটি ব্রিটিশ ভারতীয় আমলের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী একটি বিদ্যাপীঠ। স্কুলটি সুনামগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্র সুনামগঞ্জ স্টেডিয়ামের পূর্ব পাশে অবস্থিত।[৫১৯] ১৯৩৭ সালে লোকাল বোর্ডের ভূমিতে সুনামগঞ্জ টাউন এম.ই মাদরাসা নামে যে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সময়ের বিবর্তনে তাই এইচ.এম.পি উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে তাহিরপুর থানার মোল্লাপাড়া নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী হাজী মকবুল পুরকায়স্থ প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ আর্থিক দায়দায়িত্ব একাই নিজ কাঁধে তুলে নেন। তখন থেকেই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'হাজী মকবুল পুরকায়স্থ উচ্চ বিদ্যালয়'। ১৯৬২ সালে এটিকে জুনিয়র হাইস্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৬৩ সালে এটি জুনিয়র হাইস্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পায়, ঠিক এক বছর পরই ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৫২০] শিক্ষা-দীক্ষায় সুনামগঞ্জ অঞ্চল যখন নিতান্তই অনগ্রসর ছিল এমন এক মুহূর্তে হাজী মকবুল পুরকায়স্থের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয় সুনামগঞ্জে শিক্ষার আলো বিস্তারে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করে। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ এ অবদান ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। ১৯৬২ সালে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক হন মুহাম্মাদ আবুদল হাই। যিনি তখন শিল্পকলা একাডেমির সম্পাদক এবং সুরমা পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। বহুগুণে গুণান্বিত এ মনীষির সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিচর্যায় স্কুলটি দ্রুত স্বীকৃতি লাভের পাশাপাশি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হয়। তিনি যখন প্রধান শিক্ষক তখন চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইনসপেক্টর স্কুলটি পরিদর্শনে আসেন। স্কুল ইনসপেক্টরের সাথে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাই আলাপরত অবস্থায় স্কুল ইনসপেক্টরকে স্কুলটি পরিদর্শন করার আমন্ত্রণ জানালে উত্তরে স্কুল ইনসপেক্টর বললেন, "আব্দুল হাই যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সে স্কুল দেখার প্রয়োজন আছে কি?"[৫২১] স্কুল ইনসপেক্টরের এ মন্তব্য থেকেই জনাব আব্দুল হাই এর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সত্যিকার অর্থেই আব্দুল হাই এর মত ব্যক্তির যাদুর পরশে প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টায় স্কুলটি সুনামগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ একটি স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। এইচ.এম.পি উচ্চ বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রমের অধীন প্রাথমিক স্তরে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হয়। বিজ্ঞান বিভাগের জন্য এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান ল্যাব। তাছাড়া পৃথক কম্পিউটার ল্যাবও

---

৫১৯. https://bn.m.wikipedia.org-wiki

৫২০. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৫২১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে, রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক সকল পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগারে ৫ হাজারের অধিক গ্রন্থ রয়েছে। জ্ঞানের আলো সম্প্রসারণে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি গ্রন্থাগারটিও কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[৫২২]

বিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম ও সার্বিক উন্নয়নে যারা অনবদ্য অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে সাবেক হুইপ ফজলুল হক আছপিয়া, মোঃ সাবের হোসেন, মোঃ জাফর সিদ্দিক, গোলাম সরোয়ার, মোঃ নাজিম উদ্দিন, মোঃ ফজলুর রহমান, গোলাম মোস্তাফা, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ শামছুল হুদা, মোঃ আর্শদ আলী, মোঃ ইনছান মিয়া প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫২৩]

জামালগঞ্জ সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

জামালগঞ্জ সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় একটি প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ। বহমান সুরমার পশ্চিম তীরের স্বপ্নের শহর জামালগঞ্জ-এর উত্তর পার্শ্বে নদীর কূল ঘেষে জামালগঞ্জ সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য যে কারো মন কাড়ে। বিদ্যালয়টি ভাটি অঞ্চলের বিশাল জনপদের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বছরের পর বছর শিক্ষার আলো বিস্তার করে যাচ্ছে। এ স্কুলে শত শত ছাত্র আজো দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিদ্যালয়টি ২০২৩ সালে ৭৫ বছরে পদার্পণ করবে।

নয়াহালট গ্রামের রহমত উল্লাহ তালুকদার ও মৌলভী আবুল বরকত এলাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় জামালগঞ্জ সরকারী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেন। তাদের এ মহতি উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করতে সুপরার্মশ ও আন্তরিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন তৎকালীন স্কুল ইনসপেক্টর জনাব সামছুল হক ও মাইজবাড়ি নিবাসী কৃষি অর্গানাইজার বিশিষ্ট শিক্ষাসেবী জনাব মুবাশ্বির আলী। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে বর্তমান ডাকবাংলার স্থানে একটি ছনের ঘরে জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা হয়।[৫২৪] জনাব মুবাশ্বির আলীর অফিস কাম বাসস্থানটিই ছিল জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুতিকাগৃহ। ধনপুর গ্রামের জনাব অলিউর রহমানকে স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি মাত্র ১২ (বার) জন ছাত্র নিয়ে জামালগঞ্জের শিক্ষাহীন আঁধার ভূবনে প্রজ্বলিত করেন মাধ্যমিক শিক্ষার এ আলোকবর্তিকা।[৫২৫]

---

৫২২. মোঃ আর্শাদ আলী সম্পাদিত, মুকুলিকা, বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০০৮।

৫২৩. প্রাগুক্ত।

৫২৪. গোলাম মর্তুজা, *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, সুনামগঞ্জ, ২১ ফেব্রু., ২০০০, পৃ. ৮১

৫২৫. https://m.facebook.com>jamalganj

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ সালে এ শিশু বিদ্যালয়ের স্থানান্তর ঘটে জনাব রহমত উল্লাহ কন্ট্রোলের মালের ঘরে। নিজস্ব ভূমিতে স্কুলটি স্থায়ীভাবে নির্মাণের জন্য ভূমিদান করেন রহমত উল্লাহ তালুকদার, শরাফত উল্লাহ তালুকদার, ছিফত উল্লাহ তালুকদার, আজাফর আলী ও সাচনা নিবাসী যোগেন্দ্র কুমারদাশ।[৫২৬] নিজস্ব ভূমিতে স্কুলের গৃহ নির্মাণে সমস্যা দেখা দিলে উপরোক্ত ভূমিদাতাগণ ও মূল উদ্যোক্তাবৃন্দ জনাব আম্বর আলী তালুকদার, আব্দুস সাত্তার পীর ও এলাকাবাসীর সক্রিয় সহযোগিতায় নৌকাযোগে রহিমপুর এম.ই স্কুলের পরিত্যক্ত গৃহটি তুলে এনে বর্তমান স্থানে স্থাপন করেন। এতে রহিমপুর স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হলে এস.ডি.ও মুকিম উদ্দিনের হস্তক্ষেপে তা প্রশমিত হয়।

নিজস্ব ভূমিতে নিজ গৃহে নব উদ্যোমে স্কুলটি চালু হওয়ার কিছু দিন পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় জনাব গোলাম কিবরিয়াকে। গোলাম কিবরিয়ার আমলকে জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়। তিনি তাঁর ক্যারিশমাটিক কর্মকাণ্ডে রাতারাতি স্কুলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৮৮ সালে বিদ্যালয়ের ভৌতিক অবকাঠামো, ছাত্রসংখ্যা, বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল, তদুপরি শিক্ষকগণের গুণগত মান ইত্যাদি বিচার্যে জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় বৃহত্তর সিলেট জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।[৫২৭]

স্কুলটিতে পৃথক বিজ্ঞান ভবন, অডিটরিয়াম, কম্পিউটার ল্যাব, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, পৃথক অফিস ভবনসহ 'গোলাম কিবরিয়া ছাত্রাবাস' নামে একটি ছাত্রাবাসও রয়েছে। বিতর্ক, আবৃত্তি, স্কাউট, বি.এন.সি.সি-সহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়মিত পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের দক্ষ করারও কর্মপ্রয়াস চালিয়ে স্কুলটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। ২০১২ সালে এটি উপজেলার মডেল স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং ২০১৭ সালের ১৪ জুন এটিকে সরকারী স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।[৫২৮]

শুরু থেকে যে সমস্ত মহান মনীষিগণ প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাদের মেধা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে স্কুলটির সার্বিক উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে জনাব অলিউর রহমান, মিয়াদ হোসেন, আব্দুর রশিদ, মহিবুর রহমান, গোলাম কিবরিয়া (দু'বার), আবুল হাসান, হারুন অর রশিদ ও আবুল কাশেমের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[৫২৯] বর্তমানে মোঃ লুৎফুর রহমানের সুদক্ষ পরিচালনায় স্কুলটি শিক্ষা বিস্তারের মহান ব্রত পালন করে যাচ্ছে।

---

৫২৬. *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত।

৫২৭. প্রাগুক্ত।

৫২৮. www.findglocal.com

৫২৯. *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সুরমা নদীর পশ্চিম তীরের জামালগঞ্জ শহরের উত্তর পাশে প্রতিষ্ঠিত জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছে এর খাঁজকাটা বহির্বেষ্টনী, মূল ফটক, জনাব গোলাম কিবরিয়ার এক বুক স্নেহ ও সযত্নে লালিত অফিস ভবনের সামনের বাগান এবং বহির্বেষ্টনীর গা ঘেষে প্রোথিত কাঞ্চনপুরী নারিকেল গাছের সারি।

বুলচান্দ হাইস্কুল

সুনামগঞ্জের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে যে কটি স্কুল সুদূর অতীত থেকে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে 'বুলচান্দ হাইস্কুল' তন্মধ্যে অন্যতম। সুনামগঞ্জের নতুন পাড়ায় স্কুলটি অবস্থিত। মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা এ তিন বিষয়ে স্কুলটিতে শিক্ষাদান করা হয়।

একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে বিভিন্ন সরকারী হাইস্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রদের বহিষ্কার করা হলে অত্র এলাকার অনেক ছাত্র শিক্ষা বঞ্চিত হয়ে পড়লে এ সব বঞ্চিত ছাত্র অভিভাবক ও রাজনীতিবিদ এলাকার সন্তানদের শিক্ষা দেয়ার মানসে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা বঞ্চিত ছাত্রদেরকে নিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ০১ জানুয়ারি ১৯৩২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলটি উদ্বোধন করা হয়।[৫৩০] প্রথমে বাজারের একটি ঘরে, পরে জামাইপাড়ার একটি বাসায় স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এলাকার সর্বস্তরের জনগণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত স্কুলটি ১৯৩৮ সালে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সুনামগঞ্জের সদর থানার রংগারচর নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও দানবীর সুজাত্তর তালুকদার বর্তমান স্থানে স্থাপিত স্কুলটির সম্পূর্ণ জমি দান করে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নিজের নামটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করে রেখেছেন। বৈঠাখালীর অধিবাসী বুলচান্দের সন্তানগণ তাদের পিতার নামে স্কুলের নামকরণ শর্তে গৃহ নির্মাণ ও ভৌতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেন।[৫৩১] স্কুলটির সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম, জনাব আবেদ মাহমুদ চৌধুরী, মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ জমিরুদ্দীন, মোঃ জয়নাল আহমদ, এহসান আহমদ উজ্জ্বল, মোঃ আব্দুল আজিজ প্রমুখ।[৫৩২]

দীর্ঘদিন ধরে স্কুলটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন মোঃ নূরুল আবেদিন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় স্কুলটি সুনামগঞ্জের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। তাকে নিরলসভাবে সহযোগিতা দিয়ে

৫৩০. https://sohopathi.com>bulchand

৫৩১. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

৫৩২. https://cumaps.net>bulchand-wish

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছেন ফিরোজা খাতুন, জসিম উদ্দিন, ফারুক আহমেদ, রুহুল আমিন, শরিফ উদ্দিন, মোঃ আব্দুল মালেক, মোছাঃ মৌফিদা হাসান প্রমুখ। স্কুলটির শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশে এ সব গুণী ব্যক্তিদের অবদান চিরস্মরণীয়।

আব্দুর রশিদ হাইস্কুল

দক্ষিণ সুনামগঞ্জের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান হলো 'আব্দুর রশিদ উচ্চ বিদ্যালয়'। বৃটিশ ভারত আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের দীপ্ত শিখা প্রজ্বলন করে যাচ্ছে। মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা এ তিন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এখান থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। এটি দক্ষিণ সুনামগঞ্জের বৃহৎ ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দূর্গাপাশা এলাকায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, যার ফলে অত্র এলাকার শিক্ষার্থীরা সিলেট শহরসহ অন্যান্য শহরের স্কুলে ভর্তি হতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে এলাকার নিজ সন্তানদের সীমাহীন এ দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ১৯১২ সালের দিকে দূর্গাপাশার কৃতিসন্তান তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট, পরবর্তীতে যিনি অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, যিনি সাবেক স্পীকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ন রশিদ চৌধুরী ও সাবেক অর্থ প্রতিমন্ত্রী ফারুক রশিদ চৌধুরীর গর্বিত পিতা জনাব আব্দুর রশিদ চৌধুরী এলাকার লোকজনকে সাথে নিয়ে আব্দুর রহিম চৌধুরীর বাংলা ঘরে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। দু'জন শিক্ষক দিয়ে মক্তবটি চালু করা হয়। তারা দু'জন হলেন গোলাম ইজদানী চৌধুরী ও শামছুল হোছাইন চৌধুরী। শিক্ষাহীন অঞ্চলে জনাব আব্দুর রশিদ চৌধুরীর উদ্যোগে ও উপরোক্ত দুজন মহান শিক্ষকের অক্লান্ত সাধনায় শিক্ষার মশাল প্রজ্বলিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই মক্তবের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অগণিত শিক্ষার্থী মক্তবে ভর্তি হওয়ার জন্য ভিড় জমাতে থাকে। শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের প্রবল আগ্রহ ও মক্তবের আশাতীত সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আলোকিত ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুর রশিদ চৌধুরী ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ অবারিত করে মক্তবটিকে 'রশিদিয়া জুনিয়র মাদরাসা'য় রূপান্তরিত করেন যা মিডল ইংলিশ স্কুল (এম.ই) হিসেবে খ্যাত ছিল। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় এবং শিক্ষার প্রতি এলাকার জনগণের অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনা করে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করার মানসে শিক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব দূর্গাপাশার মহান কৃতিপুরুষ জনাব আব্দুর রশিদ চৌধুরী ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'আব্দুর রশিদ হাইস্কুল'।[৫৩৩] স্কুলের সম্পূর্ণ ভূমি ও স্থাপনার সমুদয় ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেন এবং আমৃত্যু স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিজেকে শিক্ষার জন্য

৫৩৩. https://www.dhmdargapasha.co.uk/education.htm/

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদেত প্রাণ এক মহান মনীষি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১৯৪৪ সালে স্কুলটি কলকাতা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। ২০ থেকে ২৫ মাইলের মধ্যে কোন স্কুল না থাকায় দূর-দূরান্ত থেকেও অনেক শিক্ষার্থী এ স্কুলে ভর্তি হয়ে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন।

জনাব আব্দুর রশিদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর স্কুলটির সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেন তাঁরই সুযোগ্য সহধর্মিণী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী। তিনিও আমৃত্যু স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন। জনাব আব্দুর রশিদ চৌধুরী ও বেগম সিরাজুন্নেসার পরবর্তীতে তাদের তিন সূর্য সন্তান জনাব হুমায়ন রশিদ চৌধুরী, জনাব ফারুক রশিদ চৌধুরী ও জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী তাদের পিতার প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে শিক্ষা সম্প্রসারণে তাদের বংশগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

যে সমস্ত মহৎপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ তাদের মেধা, শ্রম ও সাধনা দিয়ে স্কুলটির শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তন্মধ্যে বর্তমান প্রধান শিক্ষক শেখ শফিকুল ইসলামের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। তাকে যোগ্য সহচার্য দিয়ে যারা শিক্ষা সম্প্রসারণে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন তাদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম তালুকদার, সুলতানা মাহমুদ, মামুনুর রশীদ, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫৩৪]

লবজান চৌধুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

লবজান চৌধুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সুনামগঞ্জের নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি শহরের জামতলা এলাকায় প্রথমিকভাবে স্কুলের যাত্রা শুরু হয়।[৫৩৫] পরবর্তীতে স্কুলের নিজস্ব ভূমিতে শহরের বড়পাড়া এলাকায় স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়ে সগৌরবে টিকে আছে। মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী লবজান চৌধুরীর স্মৃতিকে চির অম্লান করার জন্য হাছন রাজার পরিবারের সদস্যদের উদ্যোগে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলটি চালু হলেও পর্যায়ক্রমে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা এ তিন বিষয়ে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষা লাভের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিম্ন মাধ্যমিক থেকে স্কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৫ সালে স্কুলটি বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। পৌর এলাকার চমৎকার লোকেশনে অবস্থিত স্কুলটি অবকাঠামোগত দিক থেকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্কুলটিতে তিনটি পাকা ভবন ও আধা পাকা টিনশেড ভবন রয়েছে। তন্মধ্যে হাছন রাজার প্রপৌত্র দেওয়ান

---

৫৩৪. প্রাগুক্ত।

৫৩৫. *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

শামছুল আবেদীনের নামে বিজ্ঞান ভবন ও দেওয়ান আনোয়ার রাজা চৌধুরীর নামে একটি একাডেমিক ভবন রয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে স্কুলটির প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার। তাঁর সুদক্ষ পরচিালনায় স্কুলটি শিক্ষা কার্যক্রম, আকর্ষণীয় ফলাফল অর্জনসহ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে। সুনামগঞ্জের নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে উক্ত স্কুলের কার্যক্রমে আরো যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের মধ্যে খাদিজা খাতুন, শামীমা সুলতানা, রাহেলা বেগম, নাসরিন আক্তার, শারমিন আক্তার, প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫৩৬]

ইসলামপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ছাত্রক উপজেলার গনেশপুর এলাকায় ১৯৮৫ সালে প্রায় এক একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এক সময় গনেশপুর ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক দিক দিয়ে অনেক অগ্রসর থাকলেও শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল নিতান্তই পিছিয়ে। হিন্দু গনেশরা এ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলে এ গ্রামের নাম ছিল গনেশপুর। পরবর্তীতে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে বৃহৎ এ গ্রামটি ৪টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিভক্ত একেকটি গ্রামের নামকরণ করা হয় বাহাদুরপুর, ইসলামপুর, নিয়ামতপুর ও জৈন্তাপুর।[৫৩৭] শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর এ এলাকায় শিক্ষার আলো প্রজ্বলনে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন হেকিম নজারত আলী, ব্যবসায়ী আলহাজ্ব ইলিয়াছ আলী, বশির উদ্দিন ও চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান। মূলত তাদের উদ্যোগ ও বাস্তবিক কার্যকর ভূমিকায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সাথে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক শামছুল ইসলাম, এডভোকেট বদর উদ্দিন, মেরাজ উদ্দিন এম.এ।[৫৩৮]

এডভোকেট বদর উদ্দিনকে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনা ও নেতৃত্বে স্কুলটি দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। বর্তমানে স্কুলটি এলাকার শিক্ষা বিস্তারের এক শ্রেষ্ঠ আলোকবির্তকা।

মুজিবুর রহমান একাডেমি

সুনামগঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে মুজিবুর রহমান একাডেমি এক অনন্য নাম। ছাতকের আমেরতল নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জনাব মুজিবুর রহমান এলাকার শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণ

---

৫৩৬. https://www.sohopathi.com>lobian

৫৩৭. *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৫৩৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সাধনের নিমিত্তে ১৯৯৪ সালে নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করেন 'মুজিবুর রহমান শিক্ষা ও জনকল্যাণ ট্রাস্ট'।[৫৩৯] এই ট্রাস্টের অধীনেই ২০০১ সালে নিজস্ব ২.৫০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় মুজিবুর রহমান একাডেমি। একাডেমির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার ট্রাস্টের ফান্ড থেকে নির্বাহ করা হয়। ভবিষ্যতের ব্যয়ভার নির্বাহের লক্ষ্যে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে একাডেমির নামে নিজস্ব জমি, ভবন এবং আয়ের পৃথক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মুজিবুর রহমান একাডেমি যেমন একটি অনন্য নাম তেমনি এর প্রতিষ্ঠাতা মুজিবুর রহমানও শিক্ষাদরদী এক মহান মনীষি হিসেবে আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয়।

সাতগাঁও হাইস্কুল

জামালগঞ্জের ফতেহপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত শাহপুর গ্রামের মরহুম মৌলভী আব্দুল কাদির ১৯২৩ সালে নিজ গ্রামে একটি এম.ই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন যা তৎকালীন সময়ে উক্ত অঞ্চলের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এম.ই মাদরাসার মাধ্যমে এলাকার সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তৃত হয়। এ আলোকে আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করার মানসে শাহপুর, অনন্তপুর, বাঘুয়া, বসন্তপুর, রাজেন্দ্রপুর, খিদ্দরপুর ও মশালঘাট নামক সাতটি গ্রামের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এলাকায় একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে একাধিক সভায় মিলিত হন। এক পর্যায়ে তারা মৌলভী আব্দুল কাদিরের স্মরণাপন্ন হন। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ মহান মনীষি মৌলভী আব্দুল কাদির উক্ত সাতগ্রামের সর্ব সাধারণের সহযোগিতায় ১৯৩৪ সালে তাঁর নিজস্ব জায়গার উপর প্রতিষ্ঠা করেন সাতগাওঁ জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়।[৫৪০]

১৯৫৮ সালে স্কুলটি সরকারের অনুমোদন পায়। অতঃপর ১৯৬৮ সালে স্কুলটি পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। স্কুলটির এককালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব আব্দুজ জহুর। যিনি পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্কুলটির সার্বিক উন্নয়নে তাঁর আন্তরিকতা ও সহযোগিতা সর্বদা স্মরণযোগ্য। স্কুলটির প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী জনাব এডভোকেট আলী ইউনুছ ও জনাব শফিকুল হক স্কুলটির ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন– স্কুলের ইতিহাসে তা স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া সার্বিক সহযোগিতা ও নানামুখী পদক্ষেপের মাধ্যামে স্কুলের শিক্ষা সম্প্রসারণে যারা অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে মকবুল হোসেন (এম.পি.এ), শাহপুর নিবাসী আব্দুল জলিল বি.এ, বড়দল নিবাসী ডা. হারেছ উদ্দিন, রাধানগর নিবাসী ডা. আকমল হোসেন, মুক্তিখোলা নিবাসী এডভোকেট

---

৫৩৯. প্রাগুক্ত।

৫৪০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল গনি, সাতগাঁও নিবাসী মুহিবুর রহামান এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য জনাব নজির হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য।[৫৪১]

ভীমখালি উচ্চ বিদ্যালয়

ধর্মপাশার তৎকালীন একমাত্র মুসলিম গ্রাজুয়েট মৌলীনগর গ্রামের জনাব আব্দুর রশিদ ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভীমখালি উচ্চ বিদ্যালয়।[৫৪২] এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদান প্রদান করে শিক্ষা সম্প্রসারণে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বিছনা গ্রামের সিদ্দিক আলী আফিন্দী, আবু মিয়া ও এখলাছুর রহমান এবং কাঠালিয়া গ্রামের মৌলভী আব্দুল জলিল, স্থানীয় জনসাধারণও স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে মৌলভী আজর আলী ও আব্দুস সাত্তার তালুকদার সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে নিজেদেরকে অনেক উচ্চ অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন।

১৯৭৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে স্কুলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে মৌলী নগরের মুজাহিদ আলী, বিছনা গ্রামের ফজর আলী তালুকদার ও আবুল খায়ের তালুকদার অর্থ ও শ্রম দিয়ে বিদ্যালয়টিকে নবজীবন দান করেন।[৫৪৩] তাদের অর্থায়নে নির্মিত বিভিন্ন কক্ষে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম নবউদ্যমে চালু হয়। জনাব সিদ্দিক আলী আফিন্দী, আবু মিয়া ও এখলাছুর রহমান বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য ভূমি দান করেন।

১৯৭২ সালে স্কুলটি মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয় এবং ১৯৭৬ সালে প্রথমবারের মত স্কুলের শিক্ষার্থীগণ এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্কুলের সার্বিক উন্নতি ও শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব গুল আহমদ। বর্তমানে মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রাচীন এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান করে স্কুলটিকে একটি আর্দশ প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত করার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

আলাউদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়

ফেনেরবাক ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক চৌধুরী ছিলেন একজন শিক্ষাহিতৈষী সমাজদরদী ব্যক্তিত্ব। এলাকায় শিক্ষার আলো সর্বত্র বিস্তৃতি এবং আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে তিনি ১৯৬৭ সালে সেলিমগঞ্জ বাজারে একটি জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সুনামগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক জনাব শামছুল আলম সি.এস.পি কাশীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলামের ৪র্থ খলিফা

৫৪১. প্রাগুক্ত।

৫৪২. *সুনামগঞ্জ পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

৫৪৩. *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলী মর্ত্তুজা (রা.)-এর নামানুসারে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে 'আল-মর্ত্তুজা জুনিয়র হাইস্কুল' নামে এ নতুন বিদ্যালয়টির নামকরণসহ স্কুলের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।[৫৪৪]

সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অর্পিত হয় সুনামগঞ্জের সত্যানুসন্ধানী লেখক ও গবেষক গোলাম মর্ত্তুজার উপর। তিনি তাঁর সৃজনশীলতা দিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটিকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সমর্থ হন। শিক্ষা-দীক্ষায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলটির সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালে বিদ্যালয়ের নতুন স্থান নির্ধারণ, নতুন ভবন নির্মাণ ও পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ক্রয়সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে আসেন ফেনেরবাক গ্রামের আব্দুস সাত্তার চৌধুরী, আব্দুল মালেক চৌধুরী, আব্দুল খালেক চৌধুরী ও আলহাজ সৈয়দ আলী মুন্সী। ফলে এলাকাবাসী তাদের এ অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের পিতার নামে বিদ্যালয়টির নতুন নামকরণ করেন 'আলাউদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়'।[৫৪৫] স্কুলটি ১৯৬৮ সালে জুনিয়র এবং ১৯৯৩ সালে উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে বোর্ডের স্বীকৃতি লাভ করে।

শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল খালেকের অসামান্য অবদানের বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কিতাব আলী, আবুল মাজন তালুকদার, আব্দুস শহীদ প্রমুখ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও পরিচালনায় প্রাচীন এ বিদ্যালয়টি ভাটি বাংলায় শিক্ষার মশাল জ্বালাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

একসময়ে জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ই ছিল জামালগঞ্জ থানার একমাত্র বিদ্যালয় যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করতো। জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাপ অবলোকন করে আশির দশকের প্রথম দিকে জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব গোলাম কিবরিয়া জামালগঞ্জে একটি মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর এ অনুভূতি তিনি জামালগঞ্জ থানার বিএনপি'র তৎকালীন সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব জনাব মোক্তার হোসাইনকে অবহিত করেন। অবস্থার

৫৪৪. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শিক্ষা ও কল্যাণ শাখা, সুনামগঞ্জ জুলাই ২০১৯।
৫৪৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোক্তার হোসাইন সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক জনাব আশরাফের সাথে পরামর্শক্রমে জামালগঞ্জ থানার ৬ জন ইউপি চেয়ারম্যানকে নিয়ে জামালগঞ্জে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সভায় মিলিত হন। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিকভাবে অর্থায়নে সম্মত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে থানার দক্ষিণপাড়ে অবস্থিত বন্যাত্রাণ শিবিরে বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।[৫৪৬]

৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে চালু হওয়া নবীন এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) কাজী আব্দুল মতিন। তিনি নব প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটিকে সর্ব সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের সর্বাত্মক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই স্কুলটি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করলে তার পরিধি বৃদ্ধি ও স্কুলটি স্থায়ীভাবে রূপদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতায় স্থায়ীভাবে স্কুল নির্মাণের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়।

স্কুলের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ১০.০৪. ১৯৮১ সালে জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক জনাব আশরাফ। তিনি বিদ্যালয়ের জন্য প্রকিউরমেন্ট থেকে অনুদান লাভেরও ব্যবস্থা করে দেন। তিনি স্থানীয় চেয়ারম্যানগণের মাধ্যমে দেড় লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠন করেন। প্রকিউটরমেন্ট থেকে প্রাপ্ত অনুদানের অতিরিক্ত টাকা উক্ত তহবিল উন্নয়নে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। স্কুল প্রতিষ্ঠার মূল পরিকল্পনা, প্রাথমিক তহবিল সংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে জনাব আশরাফের এ অবদান জামালগঞ্জের নারী শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক। জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় জনগণের মধ্যে জনাব সাদেক আলী, মোক্তার হোসাইন, আব্দুল মালেক, বদিউজ্জামান ও আব্দুল মান্নান চৌধুরী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৫৪৭] জন্মলগ্ন থেকে এলাকার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত দান স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর সাফল্যের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

১৪.০৪.১৯৮২ খ্রি. তারিখে নবনির্মিত ভবনে জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক এ. এইচ. এম সিরাজুল হক। তিনি বিদ্যালয়ের ফান্ডে ৪০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে এর অগ্রযাত্রায় নিজেকেও শামিল করেন। ২৫.৫.৮৩ খ্রি. তারিখে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার অর্পিত হয় এক আদর্শ শিক্ষাব্রতী রজত ভূষণ দাস-এর উপর। তিনি তার সৃষ্টিকর্ম ও গভীর শ্রম সাধনায় এ বিদ্যাপীঠকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করে গড়ে তোলেন। অল্পদিনের মধ্যেই

৫৪৬. https://www.m.facebook.com>category

৫৪৭. *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। জনাব আব্দুল বাতিন, মমতাজ বেগম, গোলাম মর্তুজা, মৌলভী নূরুজ্জামান প্রমুখ নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক মণ্ডলী তাদের অক্লান্ত শ্রম ও শিক্ষানুরাগী স্বপ্নীল মনের মেধা ও মনীষা বিক্ষেপন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গনে জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে দিয়েছেন উন্নয়নের উচ্চতর শিখরে।[৫৪৮] বকুল, শেফালী, কৃষ্ণচূড়া, নারিকেল আর মেহগনী বৃক্ষরাজির নিরালা পরিবেশ বিদ্যালয়টিকে পরিণত করেছে এক প্রশান্ত তপোবনে। প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য বেষ্টিত বিদ্যালয়টি জামালগঞ্জের নারী শিক্ষার এক আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।

সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়

সাচনা বাজার সুদূর অতীত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ হলেও শিক্ষা-দীক্ষার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদের আগামী প্রজন্মকে আলোকিত করার অভিপ্রায়ে সাচনা বাজারে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ০৯.০১.১৯৮৭ খ্রি. তারিখে বাজারের ঋষিকেশ রায়ের গদীঘরে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব করম আলী, ইউসুফ আল আজাদ, এম. নবী হোসেন, রেজাউল করিম শামীম, রফিকুল বারী রফিক, মোহাম্মদ আলী, মনোরঞ্জন পাল ও উছমান আলী প্রমুখ। এলাকার সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাচনা বাজারে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জনাব মনোরঞ্জন পালকে সভাপতি এবং এম. নবী হোসেনকে সম্পাদক করে ১১ সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।[৫৪৯] কমিটির বাস্তবসম্মত পদক্ষেপে ২২.০১.৮৯ খ্রি. তারিখ সাচনা পশ্চিম বাজারে পরিত্যক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আনুষ্ঠানিতভাবে চালু হয় 'সাচনা বাজার জুনিয়র স্কুল'। তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল মনসুর আহমদ তালুকদার স্কুলটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা উল্লেখের দাবী রাখে। মাত্র ১৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলটির শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। অল্প দিনের মধ্যেই স্কুলটিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়।

এমতাবস্থায় স্কুলটির স্থায়ী ঠিকানা নির্দিষ্টকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পলক গ্রামের উছমান আলী তাঁর গ্রামীণ ১.৫০ (এক একর পঞ্চাশ শতক) ভূমি বিক্রি করে সাচনা বাজার হতে দুই ফার্লং উত্তরে সাচনা- সুনামগঞ্জ রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে চমৎকার লোকেশনে স্কুলের জন্য জমি ক্রয় করেন।[৫৫০]

---

৫৪৮. প্রাগুক্ত।

৫৪৯. ফখরুল আলম চৌধুরী সম্পাদিত, *প্রভাত*, ফেব্রু. ১৯৯০

৫৫০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন থানা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম শেখ নির্ধারিত ভূমিতে স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্কুল কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক সাচনা বাজার থেকে বিশ হাজার টাকা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফকির হাসান সরওয়ার দশ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে স্কুলের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থায়নে এগিয়ে আসেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে তৎকালীন সংসদ সদস্য বরুন রায় ৫ বান্ডিল, সংসদ সদস্য বদরুদ্দোজা আহমদ সুজা ৫ বান্ডিল এবং তৎকালীন অর্থপ্রতিমন্ত্রী ফারক রশীদ চৌধুরী ১০ বান্ডিল টিন প্রদান করেন। সুনামগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোশতাক উদ্দিন আহমদ পাঁচশত মন গম অনুদান প্রদান করে স্কুলটি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মেধা, শ্রম, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও অনুদান দিয়ে সর্বোতভাবে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন থানা নিবার্হী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম খান। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর এ অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।

১৯৯৫ সালে স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। বিদ্যালয়ের তৎকালীন কার্যকরী কমিটির সভাপতি রেজাউল করিম শামীমের সঠিক নির্দেশনা, যোগ্য ব্যবস্থাপনা ও নানামুখী অনুদানে স্কুলটি সমৃদ্ধির শিখরে উপনীত হয়। বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ রইচ মিয়ার সুদক্ষ নেতৃত্বে স্কুলটি ভাটি বাংলায় সগৌরবে শিক্ষার আলো বিরকণ করে যাচ্ছে।

হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়

১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল ভীমখালি ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান জমির উদ্দিন আহমদ আটগাঁও এর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে স্থানীয় অষ্টগ্রাম কওমী মাদরাসাকে অষ্টগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা চালু থাকলেও এপ্রিলের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে স্কুলটি ভূলুণ্ঠিত হলে আর উঠে দাঁড়ায়নি। ১৯৯৪ সালে আটগাঁও মাহমুদপুরে কিছু সংখ্যক বিদ্যোৎসাহী তরুণ ২২ বছর পূর্বে তাদের স্মৃতি বিজড়িত অবলুপ্ত আটগাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উক্ত যুবকগণের মধ্যে আব্দুল খালিক, নূরল আমিন, আশরাফ ও মোবাশ্বির আলী স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে মাহমুদপুরের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় স্থানীয় মোঃ খালেদ উদ্দিনকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে ১৯৯৪ সালে স্কুলটি পুনরায় চালু করা হয়।[৫৫১]

---

৫৫১. আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *প্রতিধ্বী*, নভে., ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানাভাব, জনবিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তিবিদ্বেষ ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার বিগত উদাহরণ সামনে রেখে উদ্যোক্তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে জনাব আপ্তাব উদ্দিন, নুরুল আমিন ও ফকর উদ্দিন ভ্রাতৃত্রয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্থান ও অর্থ প্রদানে সম্মত হওয়ার প্রেক্ষিতে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের মরহুম পিতার নামে নব উদ্যোমে পরিচালিত বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় 'হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়টি ০১.০১.১৯৯৭ খ্রি. তারিখে নিম্ন মাধ্যমিক জুনিয়র বিদ্যালয় হিসেবে পুনরায় অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ০১.০৪.১৯৯৯ খ্রি. তারিখে উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়।[৫৫২]

হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট জমির পরিমাণ তিন একর। লালবাজার থেকে দক্ষিণে ফেকুল, মাহমুদপুর ও মাহমুদপুরের মধ্যবর্তী সাচনা ভাটিপাড়া রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে চমৎকার লোকেশন ও মনোরম ভৌতিক অবকাঠামো নিয়ে বিদ্যালয়টি নিরত শিক্ষার আলো বিস্তারে নিয়োজিত রয়েছে। মাহমুদপুরের কৃতি সন্তান মোঃ আশরাফুল ইসলাম (বি.এ,বি.এড) প্রধান শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন স্কুল পরিচালনা করে আসছেন। তাঁর সুনিপুণ দক্ষতায় 'হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়' সুনামগঞ্জের একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

বেহেলী উচ্চ বিদ্যালয়

বেহেলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সিরাজুল হকের উদ্যোগে ও মোঃ তুরাব আলী, রাধানগরের ইসমাঈল হোসেন, হরিনগরের শাহ সাইফুজ্জামান উকিল ও মোঃ আলকাছ মিয়া প্রমুখ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এবং জামালগঞ্জ থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে ২১.০১.৯৩ ইং তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম শেখ বেহেলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।[৫৫৩] বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব থানার ওসি জনাব নজরুল ইসলাম। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় মূলত নবীন এ বিদ্যালয়টি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ায়।

স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব নজির হোসেন স্কুল গৃহ নির্মাণে সমস্ত টিন প্রদান করেন। ১২০ ফুট লম্বা টিনের গৃহটি ১৯৯৪ সালে কালবৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত হলে সরকারী ও বেসরকারী দানে বিদ্যালয় গৃহটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। ০১.০১.১৯৯৫ খ্রি. তারিখে বিদ্যালয়টি প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। ০১.০১.১৯৯ খ্রি. তারিখে এম.পিওভুক্ত এবং ১৯৯৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়।[৫৫৪]

---

৫৫২. প্রাগুক্ত।

৫৫৩. *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৫৫৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পেছনে সর্বাগ্রে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মতিউর রহমান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় স্কুলটি যেমন শিক্ষার আলো বিস্তার করে যাচ্ছে তেমনি জনাব মতিউর রহমানও একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সম্প্রসারক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নিজের নামকে সগৌরবে সংযুক্ত করেছেন।

তাহিরপুর বালিকা বিদ্যালয়

তাহিরপুর সুনামগঞ্জ সড়কের সাথেই শনির হাওড় পাড়ে গড়ে ওঠা 'তাহিরপুর বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সুনামের সাথে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সার্বিক সহযোগিতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৫৫] ১৯৯৪ সালে স্কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আব্দুল জলিল তালুকদার, মোঃ নূরুল আমিন, মোঃ নূরুল ইসলাম, মোঃ শামছুল হক প্রমুখ স্কুল প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন।

স্কুলের অগ্রগতি বিশেষত ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সাবেক সাংসদ নজির হোসেন, মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, সাবেক তাহিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান কামরুল হাসানের অনবদ্য অবদান স্কুলটির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে বহুগুণে। বিদ্যালয়ে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা মোট তিনটি বিষয়ে ছাত্রীরা অধ্যয়নের সুযোগ পায়। নারী শিক্ষার অগ্রযাত্রায় স্কুলটি একটি শ্রেষ্ঠ আলোকবর্তিকা হিসেবে সকলের নিকট সমাদৃত।

স্কুলটির বর্তমান গৌরবজনক এ অবস্থান সৃষ্টিতে যার সিংহভাগ অবদান রয়েছে তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইয়াহিয়া তালুকদার। সার্বক্ষণিক স্কুলের তত্ত্বাবধান ও ছাত্রীদের শিক্ষাগত মান-উন্নয়নে তার সৃজনশীল কর্মদক্ষতা, স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে তার সহজাত ব্যক্তিচরিত্র স্কুলটিকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁকে যোগ্য সহচার্য দিয়ে স্কুলটিকে তাহিরপুরের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত করার জন্য যারা শিক্ষা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন তারা হলেন- মোঃ মাজহারুল ইসলাম, পূর্ণিমা চৌধুরী, মালা হোসাইন, মোঃ তরিকুল ইসলাম, মোছাম্মাৎ আমিনা খানম, মোঃ সোহরাব মিয়া, মোঃ মোত্তাকীন হোসেন, মোঃ মাহবুবুল আলম সুমন ও মোঃ জাকির হোসাইন চৌধুরী।[৫৫৬]

৫৫৫. দৈনিক বাংলার চোখ ২৮ জানুয়ারী ২০১৮।

৫৫৬. https://www.sohopathi.com>tahirpur

Dhaka University Institutional Repository

বুরাইয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা

বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী খ্যাত সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলাধীন ছাতক উপজেলার দোলার বাজার ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বুরাইয়া গ্রামে জেলার একমাত্র কামিল স্তরের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বুরাইয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা' অবস্থিত। বুরাইয়া গ্রামের প্রখ্যাত আলিম ও পীর মরহুম মাও. নিয়ামত উল্লাহ, মরহুম মাও. আলতাফুর রহমান এবং মরহুম পীর মাহমুদ আলীর আন্তরিক প্রত্যাশা ও দোয়ার বদৌলতে বুরাইয়া চিছরাওলী গ্রামের হক্কানী আলিমে দ্বীন মরহুম মৌলভী জাফর আলীর মূল উদ্যোগ ও স্থানীয় মুরব্বীয়ানদের আন্তরিক সহযোগিতায় ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সুনামগঞ্জ জেলার সর্ববৃহৎ ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ 'বুরাইয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা'।[৫৫৭]

হাওর অধ্যুষিত সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলাধীন এক আদর্শ জনপদ বুরাইয়া। প্রসিদ্ধ বারো জন সূফী সাধক ও আলিমের মাতৃপল্লী এই গ্রামটি তৎকালীন সময়ে ভাটি বাংলার এক সুসভ্য জনপদ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। ধর্ম, জ্ঞানচর্চা এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনভিত্তিক গড়ে উঠা পরিবেশ কালের পরিক্রমায় আজো এখানে বিদ্যামান রয়েছে। এই গ্রামে, জন্ম নেওয়া মাও. নিয়ামত উল্লাহ, মাও. আলতাফুর রহমান ও মাও. পীর মাহমুদ আলী ছিলেন বারো জন আলিমের মধ্যে অন্যতম। একদা কোন এক রাতে পীর মাহমুদ আলী স্বপ্নে দেখেন যে, বুরাইয়া গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হবে। একই স্বপ্ন দেখেন মাওলানা আলতাফুর রহমান ও পীর মাহমুদ আলীও। তারা তিনজনই তাদের স্বপ্নের আলোকে বুরাইয়া গ্রামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সচেষ্ট হলেও তাদের জীবদ্দশায় তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। তারা তাদের উত্তরসূরিদের মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অসীয়ত করে যান।

এমতাবস্থায় পীর মাহমুদ আলী পরলোক গমনের প্রাক্কালে তার স্বপ্নে দেখা ঘটনার আবর্তে তৎকালীন সময়ে ১০০০ টাকা ভাবি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য দান করে যান। পরবর্তীতে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি বুরাইয়া গ্রামের প্রখ্যাত আলিম মৌলভী জাফর আলী কলকাতা ও ঢাকা আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দ্বীনের খেদমত করে জীবনের সিংহভাগ অতিবাহিত করে অবশেষে জননী জন্মভূমির টানে নিজ গ্রাম বুরাইয়া চিছরাওলীতে ফিরে আসেন। নিজ গ্রামে ফিরে তিনি গভীরভাবে পশ্চিম সিলেটে ইসলামী শিক্ষার অভাবের কথা উপলব্ধি করেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ওলীদের অসিয়ত বাস্তবায়নার্থে ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজ গ্রামে একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সংকল্প করেন। এহেন প্রেক্ষিতে পীর মাহমুদ

৫৫৭. ছাত্র পরিষদ সম্পাদিত নেদায়ে হক মাদরাসা সাহিত্য বার্ষিকী, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

আলীর দানকৃত ১০০০ টাকার তহবিলকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে মৌলভী জাফর আলী একটি মসজিদভিত্তিক দীনী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসাটি প্রথমে বুরাইয়া বাজারের মসজিদে 'ফুরকানিয়া মাদরাসা' হিসেবে আরম্ভ করা হয়।[৫৫৮] বাংলাদেশের চিরাচরিত আবহাওয়া বৈশাখ মাসের কালবৈশাখী ঝড়ে বাজার মসজিদটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে বুরাইয়া চিছরাওলী জামে মসজিদে মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী জাফর আলী ও হাফিজ আলাউদ্দিন। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে বর্তমান মাদরাসার স্থানে একটি টিনের ঘর তৈরি করা হয় এবং মাদরাসার কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করা হয়। ঘরটির বেড়া ছিল খড়কোটার এবং বেঞ্চগুলো ছিল বাঁশের। বাঁশের খুটি ঘেরা টিনের ছাউনি দেয়া প্রায় চার যুগ আগের সেই জীর্ণ কুটিরখানি আজ গগনচুম্বি এক সুবিশাল ক্যাম্পাসে রূপান্তরিত হয়েছে। যে ক্যাম্পাসটি আজ দেশে বিদেশে বুরাইয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা নামে সুপরিচিত।[৫৫৯]

সুনামগঞ্জ জেলার সর্বোচ্চ দ্বীনী বিদ্যাপীঠ 'বুরাইয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা' প্রথমে মসজিদ-ভিত্তিক মক্তব হিসেবে চালু হলেও ১৯৬৭ সালে এর পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৬৮ সালে আলিম শ্রেণির স্বীকৃতি পেয়ে ক্রমান্বয়ে ১৯৭৮ সালে ফাজিল স্তরের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৩ সালে এই জ্ঞান বাগিচাটি মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর কামিল শ্রেণির পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৩ সাল থেকে অদ্যাবধি ইলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসারে মাদরাসাটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০০৬ সালে বুরাইয়া কামিল মাদরাসাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে ফাজিলকে ডিগ্রি ও কামিলকে মাস্টার্সের সমমান প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সাল থেকে উক্ত মাদরাসাকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত করা হয়।[৫৬০]

৫ একর জায়াগর উপর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটির বিশাল ক্যাম্পাসে রয়েছে ২টি ৪ তলা ও ১টি ১ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, ১টি ১ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন, ১টি পৃথক বিজ্ঞান ভবন, ছাত্রদের জন্য ২টি আবাসিক হল, তাহফিজ বিভাগের জন্য একটি তাহফিজ ভবন, ছাত্রদের জন্য ২ তলা বিশিষ্ট বিশাল জামে মসজিদ, ছাত্রীদের নামাজের জন্য ৩ তলা বিশিষ্ট মসজিদ, সুবিশাল কুতুবখানা-লাইব্রেরি ও শিশু শিক্ষার জন্য 'বুরাইয়া একাডেমি' নামে একটি ইসলামী কিণ্ডার গার্ডেন রয়েছে।[৫৬১]

---

৫৫৮. প্রাগুক্ত।

৫৫৯. ছাত্র পরিষদ সম্পাদিত, *আল-বালাগ*, মাদরাসা সাহিত্য বার্ষিকী।

৫৬০. মাদরাসা নিজস্ব ওয়েব সাইট https://bkm.edu.bd থেকে সংগৃহীত।

৫৬১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসাটির ভৌতিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন অধ্যক্ষ মাও. মুফতি আব্দুল খালিক। দীর্ঘদিন অধ্যক্ষের দায়িত্বে থেকে তিনি তাঁর সুদক্ষ কর্মতৎপরতায় মাদরাসাটিকে সুনামগঞ্জের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাঁর পরবর্তীতে অধ্যক্ষ মাও. আবুল হাসান, মোঃ নুরুল হকও মাদরাসার সার্বিক উন্নতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। বর্তমানে মাও. মোঃ সিরাজুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দ্বীনের মশালবাহী হাদীস জগতের অন্যতম এ সুতিকাগারের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রয়েছেন। ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকল মনীষির অবদান আজীবন স্মরণীয়।

সৈয়দপুর সৈয়দীয়া শামছিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসা

অলিকুল শিরোমণি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সঙ্গী হযরত শাহ সৈয়দ শামছুদ্দিন (রহ)- এর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অন্তরে এ প্রেরণা জাগে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধর্মীয় শিক্ষা তথা আলোর পথের সন্ধান দিতে গ্রামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৎকালীন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম মরহুম কাজী মৌলভী সৈয়দ শারাফত আলী, মরহুম মৌলভী সৈয়দ ইমদাদ আলী, মরহুম হাজী মৌলভী সৈয়দ আমতর আলীর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় এলাকার ধর্মপ্রাণ জ্ঞানপিপাসু সচেতন ব্যক্তিবর্গের সার্বিক সহযোগিতা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে ১ জানুয়ারি ১৯০৩ সালে চালু করা হয় সুনামগঞ্জ জেলার ইসলামী বিদ্যাপীঠ 'সৈয়দপুর সৈয়দীয়া শামছিয়া সিনিয়র মাদরাসা'।[৫৬২]

প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণপাড়ার ছায়াডুবি বাজারীপুতায় অস্থায়ীভাবে মাদরাসাটির কার্যক্রম শুরু করা হয়। উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় পরবর্তী পর্যায়ে মাদরাসা স্থানান্তর করা হয় স্থানীয় মিয়ার বাজারে, যা বর্তমানে সৈয়দপুর বাজার নামে পরিচিত। দীর্ঘদিন মিয়ার বাজারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার পর ১৯১৪ সালে স্থায়ীভাবে মাদরাসাটি স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে মাদরাসাটির মূলভবন যে স্থানটিতে অবস্থিত তার দাতা হলেন মৌলভী মোঃ আব্দুল মজিদ শিকদার।[৫৬৩] এ মহান মনীষির দানকৃত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সেদিনের নবীন এ বিদ্যাপীঠ বর্তমানে বটবৃক্ষের ন্যায় যুগের পর যুগ ধরে জ্ঞান পিপাসুদের আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে মাদরাসার স্থায়িত্বকল্পে এবং স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাদের কাছে সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেখা দেয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি। এই চাহিদা পূরণের জন্য তৎকালীন

৫৬২. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, শতবর্ষ পূর্তি উৎসব স্মারক সৈয়দপুর শামছিয়া মাদরাসা এপ্রিল, ২০০৪, পৃ ২৪
৫৬৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানুরাগী ও দানশীল ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ স্বত্ব-দখলীয় সাড়ে চার হাল (১৬.২ একর) আবাদী জমি সাফ কাবালা মূলে ওয়াকফ করে দিয়ে মাদরাসা পরিচালনার জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের তালিকায় নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সব শিক্ষানুরাগী ও দানশীল ব্যক্তিবর্গ হলেন কাজী মৌলভী সৈয়দ শারাফত আলী, মৌলভী সৈয়দ ইমদাদ আলী, হাজী মৌলভী সৈয়দ আমতর আলী, সৈয়দ আঞ্জব আলী চৌধুরী, সৈয়দ হেদায়েত আলী, কারী সৈয়দ আব্দুল জলিল, কারী সৈয়দ কলমদর আলী, সৈয়দ ইবরাহীম আলী, সৈয়দ বেলায়েত আলী, মোঃ জাবান উল্লাহ, মোঃ ইয়াসিন উল্লাহ, মোঃ কদর আলী, সৈয়দ মুহছন আলী, সৈয়দ রিয়াছত উল্লাহ, সৈয়দ মাহের আলী, সৈয়দ আব্দুল কাহের, সৈয়দ আমিন উল্লাহ, সৈয়দ ছাদুল আলী, সৈয়দ আইম আলী, সৈয়দ ইরাশাদ আলী, সৈয়দ গওহর আলী, মোঃ ফাজিল মল্লিক, মোঃ হাজির মল্লিক, মোঃ তমিজ উল্লাহ, মোঃ আলীম উল্লাহ, মোঃ নছির উল্লাহ, মোঃ মুহিব উল্লাহ মোঃ নছরত উল্লাহ, মোঃ ইয়াছিন উদ্দিন ও মোঃ আকিল উদ্দিন।[৫৬৪]

দীর্ঘদিন মাদরাসাটি বেসরকারীভাবে পরিচালিত হওয়ার পর ১৯২৮ সালে এম.ই (মিডিল ইংলিশ) মাদরাসা নামে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। মাদরাসাটি সরকারীভাবে অনুমোদন লাভ করার জন্য সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী আরো সম্পদের চাহিদা দেখা দিলে যে সব শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি তাদরে নিজস্ব স্বত্ব ত্যাগ করে তাদের ভূমি মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দিয়ে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য অবদান রেখেছেন তাদের অনেকের মধ্যে অন্যতম হলেন– মোঃ ওয়াছিল সারং, মোঃ আবরু মিয়া, মোঃ ছাবরু মিয়া, মোঃ মফিল উল্লাহ, সৈয়দা জহুরা বিবি, সৈয়দ মনিরছ আলী, সৈয়দ আব্দু মিয়া ও সৈয়দ আলী আহমদ।[৫৬৫]

প্রতিষ্ঠাতাগণ এ বিশাল সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এক লিখিত তাওলিয়াতনামা প্রণয়ন করে যান। প্রণীত তাওলিয়াতনামা অনুযায়ী মোতাওয়াল্লী নিয়োগ ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শর্তাবলি বিদ্যমান রয়েছে। তাওলিয়াতনামার নির্ধারিত শর্তাবলির প্রেক্ষিতে যে সব মহান ব্যক্তিবর্গ মোতাওয়াল্লী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন– সৈয়দ তাহির আলম, মৌলভী সৈয়দ ইমদাদ আলী, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আহমদ (বড় মৌলভী), কাজী মাওলানা সৈয়দ মোস্তাক আহমদ, হাকীম সৈয়দ নূরুল ইসলাম, ফরিদ আহমদ রেজা, সৈয়দ আব্দুল হক ও হাজী মোঃ আবুল বশর কোরেশী। তন্মধ্যে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আহমদ অর্ধশতাব্দীর মত সময় মোতাওয়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মারদাসার দায়িত্ব পালন করে এক মহীরূহ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

৫৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৫৬৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন।[৫৬৬] ২০০২ সাল থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে মাদরাসা ওয়াকফ স্টেটের ভারপ্রাপ্ত মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব দেয়া হয় যা অদ্যাবধি কার্যকর রয়েছে।

মাদরাসার সুপার হিসেবে মাওলানা লুৎফুর রহমান, মৌলভী সৈয়দ আব্দুল ওয়াহিদ, মাওলানা আব্দুল কাদির, মাওলানা আইয়ুব আলী, মাওলানা সৈয়দ ছাদীকুল হক, মাওলানা সৈয়দ আনওয়ার আলী, মাওলানা মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, মাস্টার মোঃ আব্দুল মতিন, মাওলানা সৈয়দ হাফিজ উদ্দিন ও মাওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার আলম তাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছেন। ১ এপ্রিল ২০০১ ইং তারিখ থেকে মাদরাসাটির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী, অন্যতম সফল সংগঠক এ মহান ব্যক্তি জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠানে প্রাণের সঞ্চার করেন। দীর্ঘদিনের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ, পুরনো শ্রেণিকক্ষ সংস্কার, মাটি ভরাট করে নতুন ক্লাসরুম ও ছাত্রাবাস তৈরি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, পৃথক হিফজ বিভাগ চালুসহ অসংখ্য সৃজনশীল কর্ম দ্বারা মাদরাসাটিকে একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও পরিচালনায় মাদরাসাটিতে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনসহ মাদরাসাটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসা হিসেবে অধিভূক্তি লাভ করেছে।[৫৬৭]

শতবর্ষের ধারাবাহিকতায় এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জন্ম দিয়েছে অনেক দেশ বরেণ্য কৃতি পুরুষদের যারা স্ব প্রতিভায় আলোকিত করেছেন দেশ ও জাতিকে। এই প্রতিষ্ঠানের কৃতি ছাত্রদের অনেকেই দেশের সরকারী-বেসরকারী অনেক উচ্চ পর্যায়ে আসীন হয়ে প্রতিষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কৃতি ছাত্রদের মধ্যে আব্দুর রশিদ চৌধুরী (সাবেক স্পীকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর পিতা) কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরে এম.এল.এ নির্বাচিত হন, মুছাব্বির হোসেন চৌধুরী, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী, সৈয়দ শাহাদত হোসেন সাবেক প্রধান সম্পাদক দৈনিক আজাদ ও দি ডন পাকিস্তান, আব্দুস সামাদ আজাদ সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সৈয়দ আরজুমন্দ আলী ডেপুটি একাউন্টেড জেনারেল, সৈয়দ আব্দুল মালিক সাবেক জি.এম বাংলাদেশ ব্যাংকসহ[৫৬৮] অসংখ্য চাকরিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিচারপতি, আইনজীবি, ব্যাংকার, মুহাদ্দিস, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি অসংখ্য শিক্ষকের জন্ম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের ক্যলাণ সাধনার পাশাপাশি জ্ঞানের সাম্রাজ্য বিস্তারে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

---

৫৬৬. অধ্যাপক আনছাফ হোসেন কোরেশী সৈয়দ পুর আলীয়া মাদরাসা ইতিকথা, সুনামগঞ্জ ২০০৪, পৃ. ৩৭

৫৬৭. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ, প্রেক্ষিত সৈয়দপুর সৈয়দিয়া শামছিয়া ফাজিল মাদরাসা আশ শামস, ২০১'৯ সালের প্রকাশিত বার্ষিক মুখপত্র, মার্চ, ২০১৯. পৃ. ১১

৫৬৮. শতবর্ষপূর্তি উৎসব স্মারক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দনগর ফজলিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসা

হযরত শাহজালাল (রহ) ও ৩৬০ আউলিয়ার পুণ্যভূমি বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার অন্তর্গত হিন্দুপ্রধান এলাকা গোবিন্দগঞ্জের গোবিন্দনগর গ্রামে গড়ে উঠা কুরআন-হাদীস ভিত্তিক জীবনগড়ার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'গোবিন্দনগর ফজলিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাস'।

গোবিন্দগঞ্জ এলাকাটি যখন পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিল, যাত্রা, জুয়া, ঘাটুগানসহ নানামুখী অনৈসলামিক কার্যকলাপ মানুষের দৈনন্দিন কাজের অংশ ছিল এমনি এক মুহূর্তে গোবিন্দনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মোঃ মুহসিন আলী (রহ) নামে এক মহান পুরুষ। যিনি ইসলামী শিক্ষা লাভের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতায়ও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি এলাকায় ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিতে আমৃত্যু সাধনা করে গেছেন। তাঁরই একান্ত শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন একই গ্রামের মাওলানা ফজলুর রহমান। মানবসেবায় আজীবন তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার, বাতিলের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর আপোষহীন ভূমিকা। বাস্তব জীবনে তিনি যেমন ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেরও তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একজন কামেল ওলী ও সত্যিকার রাসূল প্রেমিক ছিলেন। ঐ মহান সত্যের সাধক কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৮৯৭ সালে টাইটেল পাশ করে দেশের বাড়িতে ফিরে এসে এলাকার অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ ও ইলমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তাঁর মুর্শিদের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় এলাকায় একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। অল্প দিনের ভেতরেই তিনি নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় ছোট একটি ঘরে নিজ গ্রাম ও এলাকার ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে একটি মক্তব চালু করেন। তৎকালীন সময়ে এলাকার একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে দ্রুতগতিতে মক্তবে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় মাও. ফজলুর রহমানের ধারাবাহিক অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা এবং এলাকাবাসীর সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতায় গ্রামের ভটের খাল নদীর পশ্চিম পারে ৩০ হাত দৈর্ঘ্য ও ১০ হাত প্রস্থ হাফওয়াল ও ঢেউটিনের ছাউনিসহ একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। উক্ত গৃহেই ১৯০৬ সালে মাও. ফজলুর রহমানের চালুকৃত মক্তব পরিবর্তিত রূপে বৃহদাকারে রূপ নেয় "গোবিন্দনগর ফজলিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাস।"[৫৬৯]

নব প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি অল্পদিনেই শিক্ষা-দীক্ষার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এলাকার সর্বস্তরের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও অনেক ছাত্র মাদরাসায় এসে ভর্তি হয়।

---

৫৬৯. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত আল-ফদ্বল সাহিত্য বার্ষিকী-২০১৬, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা-দীক্ষার মানগত দিক দিয়ে মাদরাসাটি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করায় কিছুদিন পর ১৯১২ সালে মাদরাসাটি স্বীকৃতি লাভ করে।[৫৭০] ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মাদরাসার পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মাও. ফজলুর রহমান কুরআন-হাদীসের প্রচার ও প্রসারে যে অনবদ্য অবদান রেখেছেন তা সর্বকালের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তাঁকে যোগ্য সহাচর্য দেন তার সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী মাও. মোঃ নিয়ামত উল্লাহ। একই সনে তিনি মৃত্যু বরণ করলে মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে জামুরাইল নিবাসী শামছুল হক (ছমরু মিয়া), রাজনপুর নিবাসী আব্দুছ ছোবহান (মদরিছ মাস্টার) প্রায় বছর খানেক পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা মাদরাসা গৃহে একটি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সে মোতাবেক ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে মাদরাসা গৃহে গোবিন্দগঞ্জ স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। উক্ত স্থানে দীর্ঘ ৭ বৎসর স্কুল কার্যক্রম চলার পর ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে গোবিন্দগঞ্জ বাজারে বর্তমান স্থানে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়।

স্কুলটি স্থানান্তরিত হওয়ার পর এলাকাবাসীর অনুরোধে মাওলানা ছিদ্দেক আহমদ তালাবদ্ধ মাদরাসাটিতে আবার মক্তব চালু করেন। এক বৎসর পর তিনি অব্যাহতি নিলে এলাকাবাসী মাও. আব্দুল মুমিনের হাতে মাদরাসার দায়িত্ব তুলে দেন। ১৯৬৫ সালে মাও. আব্দুল মুমিন নব উদ্যমে মাদরাসা কার্যক্রম পুনরায় চালু করেন।[৫৭১] এমনি এক মুহূর্তে গ্রামবাসীর মনে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের প্রেরণা জাগে। এ প্রেক্ষিতে প্রাচীন মাদরাসা গৃহের অর্ধেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অর্ধেকে মাদরাসা কার্যালয় সমানতালে চলতে থাকে। সরকারী অনুমোদন পেতে হলে প্রতিষ্ঠান দু'টির পৃথক অবস্থান ও কাঠামো প্রয়োজন এ বাস্তবতায় গোবিন্দনগর গ্রাম ও এলাকার শিক্ষাহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সহযোগিতায় ২৫ হাত দৈর্ঘ্য ও ১০ হাত প্রস্থ বাঁশ পালা দ্বারা নির্মিত একটি গৃহ পুরাতন মাদরাসা গৃহের সম্মুখে নির্মাণ করা হয়। ধারাবাহিক পথ পরিক্রমায় ১৯৭২ সালে মাদরাসাটি দাখিল স্তরের স্বীকৃতি পায় আবার ১৯৭৫ সালে স্কুলটিও সরকারী প্রাথমিক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

দাখিল স্তরে উন্নীত হওয়ার পর মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হয়। শিক্ষার্থী সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন দেখা দেয় মাদরাসার নিজস্ব জমি ও নিজস্ব অবকাঠামোর। এহেন বাস্তবতায় স্থানীয় দুই সহোদর হাজী নূরুল গনী ও মোঃ নূরুল হক এগিয়ে আসেন এবং ১৯৭৫ সালে মাদরাসার জন্য এক কেদার জমি সাব কাবালামূলে দান করেন।[৫৭২] দানকৃত ভূমিতে মাও. আব্দুল মুমিন কালবিলম্ব না করে এলাকার ও বিশেষত এলাকার প্রবাসীদের সাহায্য ও

---

৫৭০. *কালের প্রবাহ*, প্রাগুক্ত।

৫৭১. *আল-ফদ্বল*, প্রাগুক্ত।

৫৭২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতায় ৬০ হাত দৈর্ঘ্য ও ১০ হাত প্রস্থ একটি নতুন ভবনের কাজ শুরু করেন। যে ভবনটি আজো মাদরাসার মূল ভবন হিসেবে অতীতের ঐতিহ্য বহন করে চলছে। শিক্ষার গুণগত মান বিবেচনায় ১৯৭৭ সালে মাদরাসাটি আলিম পর্যায়ের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত মাও. আব্দুল মুমিন মাদরাসার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মূলত এ মহান ব্যক্তির অসামান্য অবদানেই মাদরাসাটি পুনর্জন্ম লাভ করে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আলো ছড়ায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে এ মাদরাসার ২য় বা পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। মাদরাসা ক্যাম্পাসে অসংখ্য গাছ রোপন করে ছায়াময় সবুজ একটি প্রাকৃতিক পরিবেশও তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অত্র মাদরাসায় পশ্চিম সিলেটের সর্বপ্রথম দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলী শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মাদরাসার স্থায়িত্ব ও শিক্ষার মান উন্নয়নে এ মহান মনীষির অবদান চিরস্মরণীয়।

মাও. ফজলুর রহমানের কাছে শিক্ষা গ্রহণকারী তাঁর অসংখ্য ছাত্র তাদের কর্মজীবনে এমন বহু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেছেন, যে প্রতিষ্ঠানগুলো যুগের পর যুগ ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন-হাদীসের আলো দিয়ে সমাজকে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এসব মহান ব্যক্তি ও তাদরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের অসামান্য অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণের মধ্যে শাহ সূফি মাওলানা সিকন্দর আলী দ্বারা গাজীনগর দারুল হাদীস মাদরাসা, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম দ্বারা জাউয়া মাদরাসা, আসা, খাচর ও জাহানপুর মাদরাসা এবং মাও. ফজলুর রহমানের ছাত্র মাও. নিয়ামত উল্লাহর ছাত্রগণের মধ্যে মাও. গোলাম হোসেন দ্বারা সৎপুর কামিল মাদরাসা, মাও. আব্দুর রহমান দ্বারা ফতেহপুর কামিল মাদরাসা, মাও. ইর্শাদ হোসেন দ্বারা বুরাইয়া মাদরাসা, মাও. আয়ুবুর রহমান দ্বারা সৈয়দপুর মাদরাসা, মাও. আব্দুল লতিফ দ্বারা লামাকাজী মাদরাসাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অত্র মাদরাসার ছাত্রদের দ্বারা অসংখ্য মক্তব ও মাদরাসা গড়ে উঠেছে। প্রকারন্তরে যা ফজলুর রহমান ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দনগর মাদরাসার কৃতিত্ব বহন করে।[৫৭৩] শুধু তাই নয় মাও. ফজলুর রহমানের হাতে গড়া এ মাদরাসা থেকেই গোবিন্দগঞ্জের সবকটি প্রতিষ্ঠানও জন্ম নিয়েছে। পশ্চিম সিলেটের ইসলামী শিক্ষার মূল ও প্রাচীন শিক্ষায়তন হিসেবে সমগ্র সিলেটের পরবর্তী সময়ের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম।

মাদরাসাটি ১৯৯৫ সালে ফাজিল স্তরে উন্নীত হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সুনামগঞ্জেরই কৃতি সন্তান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক ও সমাজসেবক মাও. আব্দুস সালাস আল-মাদানী। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় মাদরাসাটির প্রভূত উন্নতি

---

৫৭৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সাধিত হয়। মাদরাসার ভৌতিক অবকাঠামোসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি এটিকে একটি মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর সুদক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকেই মাদরাসার উন্নয়নে এগিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি প্রফেসর মো. আব্দুর রব ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অর্থায়নে মাদরাসায় 'প্রফেসর মো. আব্দুর রব ও আলহাজ আখতারুন নাহার চৌধুরী হেনা ভবন' মাদরাসার উন্নয়নে আরেকটি মাইলফলক। মাদরাসার শিক্ষা সম্প্রসার কার্যক্রমে আরো যারা অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে মাও. আবু ছালেহ মোঃ আঃ সোবহান, মাও. আবুল খায়ের, মোঃ আঃ আজিজ, মো. দ্বীন ইসলাম, মাও. মুয়ীনুল হক মুমিন, মোঃ রাজিবুর রহমান ও মোঃ শাহজাহান তালুকদার অন্যতম।[৫৭৪]

নওগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা

নওগাঁও উত্তরপাড়ার মক্তবের শিক্ষক ছিলেন বিছনা গ্রামের মাও. জাকির হোসেন। একই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মক্তবের শিক্ষক ছিলেন করালী গ্রামের মাওলানা সাজিদুর রহমান। উক্ত দুই মাওলানা নওগাঁওয়ে একটি মাদরাসা স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে তারা উপস্থিতি হন তৎকালীন ভীমখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার তালুকদারের নিকট। চেয়ারম্যান মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সম্মতি দেন এবং সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। এ প্রেক্ষিতে দুই মক্তবের শিক্ষকদ্বয় প্রাথমিকভাবে ১৯৭৩ সালে নওগাঁও-এর প্রাক্তন মেম্বার আবদুল মতালিবের লঞ্চঘাটের পরিত্যক্ত ঘরে মাদরাসার কার্যক্রম চালু করেন।[৫৭৫] প্রতিষ্ঠার পরই মাদরাসাটিতে প্রচুরসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এক বছরের মধ্যেই মাদরাসাটিতে ছাত্র সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে ভীমখালি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার তালুকদার বৃহত্তর পরিসরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নওগাঁও, বিছনা, মীর্জাপুর, বাহাদুরপুর, জাল্লাবাজ, উজ্জ্বলপুর, চানবাড়ি ও মৌলীনগর-এ আটটি গ্রামের ধর্মপ্রাণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভায় মিলিত হন। উক্ত সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় 'নওগাঁও অষ্টগ্রাম মাদরাসা'।[৫৭৬]

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য মাদরাসার স্থান নিধারণ করা হয় বাহাদুরপুর গ্রামের পশ্চিম পাশে। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্থানীয় মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ও আমরিয়া নিবাসী মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সুচিন্তিত পরামর্শ ও সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেন। মাদরাসার অন্যতম উদ্যোক্তা

---

৫৭৪. প্রাগুক্ত।

৫৭৫. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *আলা-বালাগ*, মাদরাসা বার্ষিকী, ২০০১, পৃ. ৭

৫৭৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সাজিদুর রহমানকে প্রতিষ্ঠাতা সুপারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাদরাসটি পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করে। পরবর্তীতে মাওলানা এফ এম আব্দুল কাদির মাদরাসা সুপারের দায়িত্ব নিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কামলাবাজ নিবাসী মাও. নূর উদ্দিন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে মাদরাসাটি ভাটি বাংলায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৯৭৮ সালের ১ জুলাই মাদরাসাটি দাখিল মাদরাসা হিসেবে সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯২ সালে মাদরাসাটি আলিম স্তরের মর্যাদা পায়। ৩.০৫ (তিন একর পাঁচ শতক) জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মনোরম মসজিদ ও চারটি ভবনে মাদরাসা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নওগাঁও বাজারের আদায়কৃত টোল এ মাদরাসার আয়ের প্রধান উৎস।[৫৭৭]

লক্ষীপুর তাওয়াক্কুলিয়া দাখিল মাদরাসা

জামালগঞ্জের ফনেরবাক ইউনিয়েনের অন্তর্গত লক্ষীপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ জুম্মা বাড়িতে আংশিক দান ও মসজিদ সংলগ্ন খরিদা ভূমির উপর ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় লক্ষীপুর তাওয়াক্কুলিয়া দাখিল মাদরাসা। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আব্দুল আজিজ খান। তিনি ছিলেন কামারগাঁও এর আনন্দঠাকুর এর ছেলে। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আব্দুল আজিজ খান নাম ধারণ করেন। পরবর্তীতে তিনি লক্ষীপুর গ্রামের হেকমত আলী তালুকদারের কন্যাকে বিয়ে করেন।[৫৭৮]

আব্দুল আজিজ খান সিলেট আলীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে লক্ষীপুর গ্রামে ফিরে আসেন। গভীর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ও কর্মঠ এ মহান পুরুষ ইসলাম ধর্মের জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে লক্ষীপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের ধর্মপ্রাণ লোকদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোহিতায় এ মাদরাসাটি স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠার পর মাদরাসাটি এদারা পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে আসছিল। এক পর্যায়ে জামালগঞ্জের বিশিষ্ট শিক্ষক ও গবেষক গোলাম মর্ত্তুজা সহকারী শিক্ষক হিসেবে মাদরাসায় যোগদান করেন। তিনি তৎকালীন মহকুমা শিক্ষা অফিসার এন. আই মিয়াকে দিয়ে মাদরাসাটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। উক্ত পরিদর্শনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালে মাদরাসাটি সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং ০১.০১.১৯৮০ খ্রি. তারিখ থেকে মাদরাসাটি সরকারী অনুদান লাভে সমর্থ হয়।[৫৭৯]

মাদরাসার মোট জমির পরিমাণ চার হাল। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের তৈরি বিল্ডিং ছাড়াও তিনটি বৃহদাকার টিনসেড ঘরে মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘদিন সুপারের

---

৫৭৭. প্রাগুক্ত।

৫৭৮. *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৫৭৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালন করেন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল আজিজ খান। তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা ও বিরামহীন প্রচেষ্টায় মাদরাসাটি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁর পরবর্তীতে সুপার হিসেবে মাওলানা আশরাফ আলীও প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। বর্তমানে এম. এম. মিছবাহুর রহমানের সুদক্ষ পরিচালনায় মাদরাসাটি অত্র অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল হাদীস, হাসনাবাদ

দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতি অনুসরণে সুনামগঞ্জ জেলার শিল্পনগর ছাতক উপজেলার কালারুকা ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের হাসনাবাদ গ্রামের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব দারুল উলুম দেওবন্দের এক সময়ের কৃতি ছাত্র আলহাজ মাওলানা মুজাফফর আলী (রহ.) ও মাওলানা আর্শদ আলী (রহ.) দ্বয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও মূল উদ্যোগে ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে জামেয়া হাসনাবাদ। প্রখ্যাত আলিম হোসাইন আহমদ আল-মাদানী (রহ.) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[৫৮০] ইবতেদাইয়্যা ১ম ও ২য় শ্রেণি দিয়ে শুরু হওয়া এ মাদরাসা পরবর্তীতে সর্বোচ্চ ক্লাস দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নীত হয়ে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবাসিক-অনাবাসিক দু' ব্যবস্থায় মাদরাসা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাদরাসায় কর্মরত থেকে কুরআন-হাদীসের খেদমতে যারা নিয়োজিত তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল মান্নান, মাওলানা আব্দুল হাফিজ, মাওলানা হাছন আলী, মাওলানা মশহুদ আহমদ, মাওলানা ফরিদ আহমদ, মাওলানা জুবায়ের আহমদ, মুফতী আমিনুল হক, মুফতী সদরুল আমিন প্রমুখ অন্যতম।

মাদরাসায় দু'টি বিশাল ভবন, ১টি মসজিদ ও ১টি সমৃদ্ধ কুতুবখানা রয়েছে। মাদরাসার নামে ৮ একর আমন ও ৫ একর বোরো জমি রয়েছে। যার আয় দ্বারা মাদরাসা পরিচালিত হয়। এছাড়া মাদরাসা সংলগ্ন হাসনাবাদ বাজারে একটি মার্কেট রয়েছে যা মাদরাসাটির আয়ের আরেকটি উৎস। মাদরাসাটি 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা বাংলাদেশ' ও 'নেযামুল মাদারিস সুনামগঞ্জ' বোর্ডদ্বয়ের অধীনে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করে যাচ্ছে।

পঞ্চগ্রাম ইমদাদুল উলুম মাদরাসা, কামরূপ দলং

সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পঞ্চগ্রাম এলাকা একসময় অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এলাকার কৃতি সন্তান মাওলানা মফিজুর রহমান দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া শেষ করে

---

৫৮০. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বছির সরদার, *ইতিহাস ঐতিহ্য সুনামগঞ্জের কওমী মাদরাসা*, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় ফিরে এসে এ অন্ধকার দূরীভূতকরণের লক্ষ্যে নিজ গ্রাম আস্তমায় একটি মাদরাসা স্থাপনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু বারবার আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও নিজগ্রামে মাদরাসার জমির ব্যবস্থা না হওয়ায় নিরাশ হয়ে কামরূপ দলং গ্রামে আসেন। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কামরূপদলং গ্রামের মুরব্বীদের সাথে তিনি একটি সভায় মিলিত হন এবং মাদরাসা স্থাপনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র গ্রামের বাসিন্দা মরহুম আব্দুল মতিন, মরহুম রহমত উল্লাহ ও মরহুম মিজাজ আলী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি দান করেন। উক্ত ভূমিতে ১৯৬০ সালে পঞ্চগ্রাম তথা আস্তমা, কামরূপদলং, সদরপুর, তালোকগাঁও ও পার্বতীপুর গ্রামের মুরব্বীদের সর্বসম্মতিক্রমে মাদরাসা কার্যক্রম শুরু হয়।[৫৮১] তিন বছর মাদরাসা কার্যক্রম চলার পর হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে মাদরাসাটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এলাকাবাসীর প্রচেষ্টা ও সাধনায় অবশেষে ১৯৬৭ সালে এলাকারই কৃতি সন্তান শায়খ আকবর আলীকে মুহতামিম নিযুক্ত করে পুনরায় চালু করা হয় 'পঞ্চগ্রাম এমদাদুল উলুম মাদরাসা কামরূপদলং'।[৫৮২] মাদরাসার সংস্পর্শে অল্প দিনেই এলাকার মানুষের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সকল প্রকার পাপাচার পরিহার করে নামাজী এমনকি অনেকে তাহাজ্জুদ গোজার বনে যায়। এলাকার যুবকদের মধ্যে অনেকেই মাওলান আকবর আলীর ভক্ত হয়ে যান এবং মাদরাসার সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। উক্ত যুবকদের মধ্যে আশ্রাফ আলী, মাস্টার মুনসিফ আলী, মাস্টার সৈয়দ আলী, রফাত আলী, হানিফ উল্লাহ মুন্সী ও মন্তরিছ আলীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[৫৮৩]

মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে আকর্ষণীয় নূরানী শিশু শ্রেণি থেকে সানাবিয়্যাহ উলইয়া ২য় বর্ষ পর্যন্ত মোট ১৩টি জামাতে। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন, ১টি আধাপাকা টিনশেড ভবন, পৃথক অফিস ভবন, মসজিদ ও গ্রন্থাগার রয়েছে। প্রতিদিন বেলা উঠলেই চারদিক থেকে কিতাব হাতে, কুরআন মাজীদ গলায় ঝুলিয়ে গ্রাম-গঞ্জের মেঠোপথ মাড়িয়ে অসংখ্য ছাত্রদের গুঞ্জনে মুখরিত হয় কুরআন-হাদীসের এ প্রেম বাগান।

যাদের অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায় মাদরাসাটি তার অভীষ্ট লক্ষ্যপানে ধাবিত হচ্ছে তাদের মধ্যে মুহতামিম শায়খ আকবর আলী, মৌলভী কমরুদ্দীন, মাওলানা আব্দুর রশিদ ও মাওলানা আব্দুন নুর এর নাম সর্বদা স্মরণযোগ্য।[৫৮৪]

---

৫৮১. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *আল-ইমদাদ*, ৫০ বছর পূর্তি স্মারকগ্রন্থ, ২১ ফেব্রু ২০১৭

৫৮২. প্রাগুক্ত।

৫৮৩. প্রাগুক্ত।

৫৮৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নয়াহালট ইসলামিয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা

বিগত ৪০ বছরেরও অধিক সময় ধরে ইলমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে 'নয়াহালট ইসলামিয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা'। ধরমণ্ডলের মাওলানা নূরুল হক শায়খে ধরমণ্ডলী ও রাজাবাজের কারী মৌলভী জহিরুল হকের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এবং নয়াহালট গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসলিম মনীষিদের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৭৭ সালে জামালগঞ্জ উপজেলার নয়াহালট গ্রামে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৮৫] উক্ত মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিজস্ব ভূমি প্রদান করে জনাব আব্দুল মালিক শিক্ষা সম্প্রসারে অমর কীর্তি স্থাপন করেছেন।

ইবতেদাইয়্যা ১ম ও ২য় জামাত দিয়ে মাদরাসাটির নবযাত্রা শুরু হলেও কালের পরিক্রমায় ১৯৯৫ সাল থেকে সর্বশেষ জামাত মুতাওয়াসসিতা ২য় বর্ষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। মাদরাসায় আংশিক আবাসিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শুরু থেকেই বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় মাদরাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

মাওলানা জহিরুল হক প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হিসেবে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানার্জনের যে ধারা সৃষ্টি করে গেছেন তারই ধারাবাহিকতায় হাফিজ মাওলানা বুরহান উদ্দিন, কারী মাওলানা আলী আকবর, মাওলানা আব্দুল হামিদ, মাওলানা মুশাহিদুল ইসলাম ও মৌলভী তৈয়বুর রহমান তাদের চেষ্টা, প্রজ্ঞা ও সাধনা দিয়ে মাদরাসাটিকে ইসলামী শিক্ষার এক মনোহর উদ্যানে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন।[৫৮৬]

'আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ' ও 'নেজামুল মাদারিস সুনামগঞ্জ' বোর্ডদ্বয়ের অধীনে মাদরাসার কারিকুলাম পরিচালিত হয়। সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মাদরাসাটিকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী, মাওলানা লুৎফুর রহমান শায়খে বরুনী, মাওলানা আমিন উদ্দিন শায়খে কাতিয়া ও মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ শায়খে মাহমুদপুরী প্রমুখ।

সৈয়দপুর হোসাইনিয়া হাফিজিয়া আরাবিয়া দারুল হাদীস টাইটেল মাদরাসা

একশ বছর ছুই ছুই পুরনো ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে 'সৈয়দপুর হোসাইনিয়া টাইটেল মাদরাসা'। কওমী জগতের উজ্জ্বল দিশারী আল্লামা সাইয়েদ আহমদ আল-মাদানীর সুযোগ্য দুইজন খলিফা শায়খ মাওলানা সৈয়দ আব্দুল খালিক (রহ.) ও শায়খ মাওলানা সৈয়দ তখলিছ হোসাইন (রহ.) ১৯৪০ সালে জগন্নাথপুর উপজেলার ঐতিহাসিক সৈয়দপুর গ্রামে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৮৭] তাহফিজুল কুরআন ও ইবতেদাইয়্যা ১ম শ্রেণি থেকে মুতাওয়াসসিতা ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত

---

৫৮৫. *জামালগঞ্জের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৫৮৬. প্রাগুক্ত।

৫৮৭. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *আলা-বালাগ*, মাদরাসা বার্ষিকী-২০১০, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

সূচনালগ্নে চালু হলেও মাদরাসার ধারাবাহিক শিক্ষার ক্রমবিকাশে ১৯৭৭ সালে সর্বোচ্চ জামাত দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) চালু করা হয়। হাদীসের প্রচার ও প্রসারে হাজার হাজার হাদীস বিশারদ তৈরিতে মাদরাসাটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছে। আবাসিক ও অনাবাসিক উভয় পদ্ধতিতে পরিচালিত মাদরাসাটিতে আবাসিকে দাওরায়ে হাদীস ও ফাইনাল জামাতের ছাত্রদেরকে পুরো বৎসর ফ্রি থাকা ও খাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

মাদরাসার ওয়াকফকৃত জমির পরিমাণ ১৯ হাল। উক্ত জমি থেকে প্রাপ্ত আয়, দেশী-বিদেশী দান-খয়রাত, বার্ষিক সভা, যাকাত ও ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় মাদরাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে। সূচনালগ্ন থেকেই 'আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ' ও 'নেজামুল মাদারিস সুনামগঞ্জ' বোর্ডদ্বয়ের অধীন উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের অনুসরণ ও অনুকরণে উক্ত বোর্ডদ্বয়ের পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী ১ম শ্রেণি থেকে দাওরায়ে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক, ইতিহাস, অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চমৎকার ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী দ্বীনের এ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নিকেতনে যারা শ্রম ও সাধনা দিয়ে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন– মাওলানা সৈয়দ মতিউর রহমান, মাওলানা আব্দুল হাই চৌধুরী, হাফিজ মাওলানা সৈয়দ ফখরুল ইসলাম, সৈয়দ মছরুর আহমদ কাসেমী, মাওলানা আব্দুর রউফ, মাওলানা শাহনুর আলী, মাওলানা লুৎফুর রহমান, মাওলানা সৈয়দ আব্দুল আউয়াল, মাওলানা তারিফ উদ্দিন, মাওলানা সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।[৫৮৮]

ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানে দেশ-বিদেশের প্রখাত অনেক উলামায়ে কেরামের আগমন ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ভারতের সাইয়েদ হুসাইন আহমদ আল-মাদানী, আল্লামা সহুল আহমদ উসমানী, সায়্যিদ আসআদ আল-মাদানী, আল্লামা মুফতী সাঈদ পালনপুরীসহ দেশের প্রখ্যাত আলেমদের মধ্যে আল্লামা সুলতান যওক নদভী, শায়খে বর্ণভী, শায়খে বাঘা, শায়খে কৌড়িয়া, আল্লামা কাসিমী, আল্লামা শাহ আহমদ শফী প্রমুখ।[৫৮৯]

উপরোক্ত মহান মুসলিম মনীষিগণের আগমনে মাদরাসাটির ঐতিহ্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তাদের সহচার্যে শিক্ষার্থীরা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত হয়েছে বহুগুণে।

৫৮৮. প্রাগুক্ত।
৫৮৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দারুল হাদীস হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদরাসা

মহিলাদের পরিবার বা সমাজের বোঝা না বানিয়ে বরং একটি আদর্শ জাতি উপহার ও টেকসই মানবসম্পদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে এবং বিশেষত আগামী প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ইসলামী জ্ঞানসমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ মাতৃকুল সৃষ্টির অভিপ্রায়ে আলহাজ শায়খ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন ও বেগম মোছাঃ ছুফিয়া নুরের যৌথ উদ্যোগে ১ জানুয়ারি ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দারুল হাদীস হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদরাসা, সুনামগঞ্জ'।[৫৯০] সুনামগঞ্জের পৌর এলাকার ৫নং ওয়ার্ডের তেঘরিয়া নামক স্থানে মাদরাসাটি অবস্থিত। নূরানী বিভাগের ৩টি জামাত দিয়ে মাদরাসাটি চালু হয়। অল্প দিনের মধ্যেই সুনামগঞ্জের নারী সমাজে মাদরাসাটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারীদের মাদরাসা শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালে মাদরাসাটিতে দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) ক্লাস চালু করা হয়।

ইসলামী আদর্শের অনুপম মূর্ত দিশারী হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসায় যে সব মহীয়সী নারী, নারী শিক্ষার উন্নয়নে নিজেদের উৎসর্গিত করেছেন তারা হলেন–বুশরা জামান, তামান্না আক্তার, বুশরা জাহান (নাজমা), সুরাইয়া আক্তার, লুবনা জাহান, লুবাবা আক্তার, হাবিবা আক্তার ও জান্নাতুল ফেরদাউস।[৫৯১]

মাদরাসাটিতে মোট ৫টি ভবন রয়েছে। মাদরাসাটি ২০১১ সাল থেকে 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ'-এর স্বীকৃতি লাভ করে। সুনামগঞ্জের রাজনীতিবিদদের মধ্যে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, সাবেক হুইপ ফজলুল হক আছপিয়া, সংসদ সদস্য আলহাজ মতিউর রহমান মাদরাসাটির উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

---

৫৯০. *ইতিহাস-ঐতিহ্যে সুনামগঞ্জের কওমী মাদরাসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৫৯১. প্রাগুক্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক নজরে থানাভিত্তিক সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলাভিত্তিক কলেজসমূহ[৫৯২]

ক্র.নং	কলেজের নাম	উপজেলার নাম	অধ্যক্ষের নাম
০১	সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ	সুনামগঞ্জ সদর	জনাব প্রফেসর নিলীমা চন্দ
০২	সুনামগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ	ঐ	জনাব প্রফেসর পরাগ কান্তি দেব
০৩	সুনামগঞ্জ পৌর কলেজ	ঐ	জনাব শেরগুল আহমদ
০৪	ইসলামগঞ্জ কলেজ	ঐ	জনাব আলী আহমদ
০৫	মঈনুল হক কলেজ	ঐ	জনাব মোঃ মতিউর রহমান
০৬	আলহাজ মতিউর রহমান কলেজ	ঐ	জনাব মশিউর রহমান
০৭	নর্থ ইষ্ট আইডিয়াল কলেজ	ঐ	জনাব দীপক চক্রবর্তী
০৮	আব্দুল মজিদ কলেজ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম
০৯	জগন্নাথপুর সরকারি কলেজ	জগন্নাথপুর	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম
১০	শাহজালাল মহাবিদ্যালয়	ঐ	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
১১	সৈয়দপুর আদর্শ কলেজ	ঐ	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান
১২	রাণীগঞ্জ কলেজ	ঐ	জনাব মোঃ আলাউর রহমান ঠাকুর
১৩	চন্দন মিয়া সৈয়দুন্নেছা কলেজ	ঐ	জনাব মোঃ আলী আকবর
১৪	ছাতক সরকারি ডিগ্রি কলেজ	ছাতক	জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ
১৫	গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ	ঐ	জনাব মোঃ সুজাত আলী
১৬	জনতা মহাবিদ্যালয়	ঐ	জনাব পবিত্র কুমার দেব *
১৭	জাউয়া বাজার ডিগ্রী কলেজ	ঐ	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গাফ্ফার
১৮	দোয়ারাবাজার সরকারি কলেজ	দোয়ারাবাজার	জনাব মোঃ একরামুল হক
১৯	জয়নাল আবেদীন কলেজ	তাহিরপুর	জনাব ফণী ভূষণ সরকার
২০	বাদাঘাট সরকারি ডিগ্রি কলেজ	ঐ	জনাব মুহাম্মদ জুনাব আলী
২১	দিগেন্দ্র বর্মণ সরকারি কলেজ	বিশ্বম্ভরপুর	জনাব বিমলাংশু রায়
২২	ধর্মপাশা সরকারি ডিগ্রী কলেজ	ধর্মপাশা	জনাব মোঃ আব্দুল করিম
২৩	বাদশাগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ	ঐ	জনাব কামরুল ইসলাম চৌধুরী
২৪	বংশীকুন্ডা কলেজ	ঐ	জনাব মোঃ নূরুল আমিন
২৫	জামালগঞ্জ সরকারি ডিগ্রী কলেজ	জামালগঞ্জ	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বিনবারী

৫৯২. জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯ নভেম্বর ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	কলেজের নাম	উপজেলার নাম	অধ্যক্ষের নাম
২৬	দিরাই সরকারি ডিগ্রি কলেজ	দিরাই	জনাব প্রদীপ কুমার দাস
২৭	জগদল মহাবিদ্যালয়	ঐ	জনাব পঙ্কজ কান্তি রায়
২৮	বিবিয়ানা মডেল কলেজ	ঐ	জনাব নৃপেন্দ্র চন্দ্র দাস তালুকদার
২৯	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মহিলা কলেজ	ঐ	জনাব মিহির রঞ্জন রায়
৩০	আটগ্রাম মহাবিদ্যালয়	ঐ	জনাব সৈয়দ জহুরুল আলম ইমন
৩১	শাল্লা সরকারি কলেজ	শাল্লা	জনাব মোঃ আব্দুস শহিদ
৩২	ভাটি বাংলা কলেজ	ঐ	জনাব রন্টু কুমার দাস

সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলাভিত্তিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ[৫৯৩]

উপজেলা : সুনামগঞ্জ সদর

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ফয়েজুল রহমান
২	সরকারী এস.সি. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব হাফিজ মোঃ মাশহুদ চৌধুরী
৩	সুনামগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	জনাব নাসিমা রহমান
৪	এইচ.এম.পি.উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ইনছান মিয়া
৫	বুলচান্দ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব নূরুল আবেদীন
৬	লবজান চৌধুরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল ছত্তার
৭	আলহাজ্ব জমিরুননূর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ফররুখ আহমদ তালুকদার
৮	হাজী লাল মামুদ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সোহরাব উদ্দিন
৯	জয়নগর বাজার হাজী গণি বক্স উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোহাম্মদ লিলু মিয়া
১০	চরমহল্লা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব পীযূষ কান্তি দাস
১১	ইয়াকুব উল্লা পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব গোলাম আহমদ
১২	রঙ্গারচর হরিনাপাটী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আব্দুল গফুর খান
১৩	নারায়নতলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব দীলিপ সরকার
১৪	মঙ্গলকাটা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
১৫	কৃষ্ণনগর হোসেনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা
১৬	অষ্টগ্রাম রাসগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুস শাহিদ
১৭	শান্তিগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম

৫৯৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১৮	আব্দুল আহাদ সাহিদা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ শহীদুর রহমান
১৯	চৌদ্দগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব সুলতানা বেগম
২০	সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ শামসুল আলম
২১	হাজী আঃ ছাত্তার এন্ড মরিয়ম নিম্ন মাধ্যঃ বিদ্যাঃ	জনাব মোঃ আকিকুর রহমান
২২	হামিদুল হক নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মহি উদ্দিন

উপজেলা : দক্ষিণ সুনামগঞ্জ

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	পাগলা সরকারি হাই স্কুল এন্ড কলেজ	জনাব সৈয়দ রমিজ উদ্দিন
২	ডুংরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ আব্দুল মোনায়েম
৩	সুরমা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
৪	জয়কলস উজানীগাঁও রশিদিয়া সরকারি উচ্চ বিঃ	জনাব শচীন্দ্র চন্দ্র সরকার
৫	আব্দুল গফুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী
৬	গণিনগর ষোলগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব কৃষ্ণ মোহন দাস
৭	সাতগাঁও জীবদাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ নোমান আহমদ
৮	আব্দুর রশীদ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব শেখ শফিকুল ইসলাম
৯	বীরগাঁও ইমদাদুল হক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আজিজ মিয়া
১০	নোয়াখালী সপ্তগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব বিশেন্দু কুমার দেব
১১	পূর্ব পাগলা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মৃত্যুঞ্জয় সরকার
১২	জয়সিদ্ধি বসিয়া খাউরী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব গিবাস চন্দ্র বিশ্বাস
১৩	পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল হাই
১৪	ইশাখপুর-শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব রধিকা রঞ্জন দাস তালুকদার
১৫	গাগলী নারাইনপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম
১৬	সপ্তগ্রাম হলদারকান্দি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন
১৭	সলফ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব রাজ বল্লভ বৈদ্য

উপজেলা : জগন্নাথপুর

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	স্বরূপচন্দ্র সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সায়াদ আলী
২	জগন্নাথপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব জয়ন্ত শেখর রায়

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
৩	নয়াবন্দর বি.এন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ মতিউর রহমান
৪	ষড়পল্লী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ হারুর অর রশিদ
৫	শ্রীরামসী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ হাজের আলী
৬	রানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ
৭	পাইলগাঁও বি.এন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব পঙ্কজ সরকার
৮	পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল মোহিত
৯	রৌয়াইল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আছলম উদ্দিন ফকির
১০	সফাত উল্লাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব শব্বির আহমদ চৌধুরী
১১	আব্দুস সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব সৈয়দ হুসবানুন নূর
১২	আটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব এইচ.এম আজমল
১৩	পাড়ারগাঁও আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
১৪	অরুনোদয় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ নছির আলী
১৫	চিলাউড়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ
১৬	পল্লবী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মহরম আলী
১৭	গুলবাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব পিন্টু চন্দ্র সরকার
১৮	আব্দুল খালিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব বিশ্বজিত দাস
১৯	ইসহাকপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আবদুজ জাহের
২০	শাহাড়পাড়া শাহ কামাল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আতাউর রহমান কামালী
২১	পাটলী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব নজির উদ্দিন আহমদ
২২	এরালিয়া বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব দিবানন্দ কুমার দাস
২৩	মীরপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আমীর হামজা
২৪	সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব সৈয়দা নূরুন নাহার
২৫	রসুলগঞ্জ এ.কে.এম.পি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ শামীম মিয়া
২৬	লামাটুকের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোছাঃ রাশেদা আক্তার
২৭	কেশবপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ফররুখ আহমেদ
২৮	সাজেদা খানম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ শামছুদ্দেহা
২৯	শাহজালাল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ফজলে আহমদ
৩০	আইডিয়াল গার্লর্স হাই স্কুল	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা : ছাতক

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	**ছাতক সরকারি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়**	জনাব মোঃ মঈনুল হোসেন চৌধুরী
২	চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
৩	বুরাইয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ আফজাল হোসেন
৪	উত্তর সুরমা আজমত আলী হাই স্কুল ও কলেজ	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন
৫	ঝিগলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
৬	সমতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন
৭	সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিঃ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব হারাধন তালকুদার
৮	ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ জালান আহমদ
৯	গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আতাউর রহমান
১০	নূতন বাজার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব বরুর কান্তি দাশ গুপ্ত
১১	পাইগাও উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব দিগেন্দ্র কুমার তালুকদার
১২	বাংলাবাজার সামারুননেছা স্কুল ও কলেজ	জনাব সোহেল আহমদ
১৩	মঈনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আবু রায়হান খান
১৪	হাজী কমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আব্দুল হাই মোহাম্মদ কামাল
১৫	হাজী আব্দুল খালিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোস্তাক আহমদ
১৬	চরমহল্লা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন খান
১৭	শুকুরুননেছা চৌধুরী স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
১৮	এল.পি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব এস.এম আশিকুর রহমান
১৯	পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মোস্তাবুর রহমান মোস্তাক
২০	ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আব্দুল গণি
২১	আনুজানী জনকল্যান উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব নূর মোহাম্মদ
২২	জাহিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল মালিক
২৩	এলঙ্গি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম
২৪	মুনিরজ্জাতি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ছয়ফুল আলম
২৫	খুরমা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সাঈদ হাসান
২৬	পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ পারভেজ মিয়া
২৭	সি.বি.পি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান
২৮	গনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন
২৯	জালালাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব শাহ মোঃ আমিনুল হক

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
৩০	হায়দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ এনামুল হক
৩১	হাজী জামাল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ হেলাল আহমদ চৌধুরী
৩২	একতা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আবু হেনা
৩৩	জনতা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ কবিরুল ইসলাম
৩৪	শাহজালাল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব শংকর চন্দ্র চৌধুরী
৩৫	ছাতক ইউনিয়ন এসইএসডিপি মডেল হাই স্কুল	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন
৩৬	আলহাজ্ব আয়াজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান
৩৭	সালেহা খাতুন কুর্শি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আবুল বাশার ওসমান গণি
৩৯	বড়কাপন আটগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব নূরুজ্জামান
৩৯	মোগলগাঁও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আজিজুল হক
৪০	হাজী রইছ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আজিজুল হক
৪১	হাফিজ আঃ গণি তালুকদার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব জগদীশ চন্দ্র দত্ত
৪২	সাউথ ওয়েস্ট সালেহ আহমদ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মাহমুদ আলী
৪৩	শাহজালাল ইসলামী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব আব্দুল মোমেন খান

উপজেলা : দোয়ারা বাজার

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	দোয়ারাবাজার সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক
২	বড়খাল বহুমুখী স্কুল ও কলেজ	জনাব মোঃ নজীর আহমদ
৩	সমুজ আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব সলিলেন্দু কুমার তালুকদার
৪	ঘিলাছড়া স্কুল এন্ড কলেজ	জনাব মোঃ সানুর মিয়া
৫	লিয়াকতগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ আব্দুল কাদির
৬	বগুলা রোছমত আলী রাম সুন্দর স্কুল এন্ড কলেজ	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল
৭	টেংরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
৮	হাজী কনু মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ রফিজ আলী
৯	আমবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান আহমদ
১০	মিতালী পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ময়না মিয়া
১১	প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ আলী উছমান
১২	মুক্তিযুদ্ধা ক্যাপ্টেন হেলাল খসরু উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ফারুক আহমদ
১৩	সোনালী চেলা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১৪	বাঁশতলা চৌধুরীপাড়া শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব জসিম আহমেদ চৌধুরী রানা
১৫	মুহিবুর রহমান মানিক সোনালী নূর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম
১৬	মুহিবুর রহমান মানিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমদ
১৭	সোনাপুর এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মুহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান
১৮	হাজী নুর উলাহ তালুকদার দশগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল হক
১৯	রাগীব রাবেয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
২০	সোনার বাংলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ শাহাদত কবীর

উপজেলা : তাহিরপুর

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	তাহিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন
২	তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ ইয়াহিয়া তালুকদার
৩	ট্যাকেরঘাট এলএম পি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ খায়রুল আলম
৪	বাদাঘাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম
৫	বালিজুরী হাজী এলাহী বক্স উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোছাম্মৎ শাহিমা খাতুন
৬	আনোয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব বিমল চন্দ্র দে
৭	আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
৮	জনতা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মোদাচ্ছির আলম
৯	মোয়াজ্জেমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মিজবাহুল আলম
১০	কাউকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম
১১	চাঁনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান
১২	বাগলী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব প্রদীপ চন্দ্র রায়
১৩	আলহাজ্ব জয়নাল আবেদনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব চির রঞ্জন তালুকদার
১৪	বড়দল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
১৫	হাজী এমএ জাহের উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ
১৬	দক্ষিণকুল এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান
১৭	ব্রাহ্মণগাঁও আর্দশ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আবু তাহের
১৮	দিগেন্দ্র কুমার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মণ মোহন তালুকদার
১৯	হাজী ইউনুছ আলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব হুমায়ুন কবির
২০	কলাগাঁও চারাগাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মিজানুর রহমান
২১	আইডিয়াল ভিশন একাডেমী	জনাব সুধাংশু রঞ্জন রায়

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা : বিশ্বম্ভরপুর

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	বিশ্বম্ভরপুর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
২	রতারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ মহসিন আহমদ ইয়াসিন
৩	হাজী মজিদ উল্লাহ্ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ফয়জুন্নুর
৪	কাটাখালী পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব বেনজির আহমেদ
৫	পলাশ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আবুল কাশেম *
৬	ধনপুর আছমত আলী পাবঃ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন
৭	সাতগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব শেখ মোঃ নজরুল ইসলাম
৮	মুরারীচাঁদ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব সীতেশ রঞ্জন তালুকদার
৯	শক্তিয়ারখলা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন
১০	বিশ্বম্ভরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব হারুন-অর-রশিদ
১১	মিয়ারচর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব অনিল চন্দ্র বিশ্বাস

উপজেলা : ধর্মপাশা

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	জনতা মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক খান
২	ধর্মপাশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব গুলসান আরা পারভীন
৩	বাদশাগঞ্জ পাবলিক সরকারি হাই স্কুল	জনাব মোঃ আলাল উদ্দিন
৪	মধ্যনগর বি.পি উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ	জনাব বিজন কুমার তালুকদার
৫	গোলকপুর হাঃ আঃ হাঃ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম
৬	গাছতলা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব সুমিতা বালা তালুকদার
৭	বাদশাগঞ্জ পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
৮	চামরদানী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী
৯	জয়শ্রী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব শেখ ফরিদ আহমেদ
১০	মহিষখলা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আব্দুল করিম মিরধা
১১	বংশীকুন্ডা মমিন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মাহাবুবুল আলম
১২	আবিদ নগর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব ফণী ভূষণ সরকার
১৩	গলহা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব বিধান চন্দ্র তালুকদার
১৪	মধ্যনগর পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
১৫	ভোলাগঞ্জ সার্বজনীন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ রঞ্জু মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১৬	একতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব শাহ্ ইল্‌ইয়াস আহমেদ
১৭	লায়েছ ভূইয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন
১৮	আব্দুর রশিদ মেমোরিয়াল নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব আজহারুল ইসলাম তালুকদার

উপজেলা : জামালগঞ্জ

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	জামালগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান
২	জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব বিধান ভুষণ চক্রবর্তী
৩	নবীন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব গোপেন্দ্র চন্দ্র দাস
৪	ভীমখালী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
৫	আলাউদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম
৬	সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ রইচ মিয়া
৭	বেহেলী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব রতি রঞ্জন পুরকায়স্থ
৮	হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম
৯	আব্দুল মুকিত উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সুলতান আহমদ ভূঁইয়া
১০	আলহাজ্ব ঝুনু মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ বদর উদ্দিন

উপজেলা : দিরাই

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	দিরাই উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব সব্যসাচী দাস
২	দিরাই সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	জনাব মোঃ জাফর ইকবাল
৩	বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমী	জনাব নাজমা বেগম
৪	রজনীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব এ.কে.এম.সামসুল হুদা
৫	ফকির মোহাম্মদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব দিলীপ কুমার চৌধুরী
৬	ভাটিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব গবেন্দু রঞ্জন রায়
৭	রফিনগর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব এস.বি. গোলাম মোস্তফা
৮	ব্রজেন্দ্রগঞ্জ আর.সি উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন
৯	তাড়ল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব ছাইনুল হক চৌধুরী
১০	ধল পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব প্রসেনজিত দাস তালুকদার
১১	এইচ.এম.পি উচ্চ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব জহর লাল সরকার

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১২	গচিয়া শামসুদ্দিন সিকান্দর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব দোলন রায় তালুকদার
১৩	জগদল আল-ফারুক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল পাশা
১৪	রাজানগর কৃষ্ণচন্দ্র পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব রাকেশ রঞ্জন সরকার
১৫	হাতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সাজিদুল ইসলাম
১৬	আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াহাব উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ সজ্জাদ আলী
১৭	আলহাজ্ব আব্দুলাহ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম
১৮	মাতারগাঁও মোহাম্মদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ জাকির হোসেন
১৯	আলহাজ্ব আব্দুল মতলিব উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান
২০	মাটিয়াপুর SESDP মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব বিষ্ণুপদ দাস
২১	চরনারচর SESDP মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব শোভনা ভট্রাচার্য্য
২২	আলোর দিশারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব আব্দুল মালেক
২৩	দত্তগ্রাম মাধ্যামিক বিদ্যালয	জনাব মির্জা এম.এ গালিব
২৪	মকসুদপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান
২৫	কুলঞ্জ মডেল নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব এস.এম আলমগীর
২৬	বামাচরন তালুকদার নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব দেবব্রত চৌধুরী

উপজেলা : শাল্লা

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১	সাউধেরশ্রী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	জনাব হরিপদ দাস
২	গোবিন্দ চন্দ্র সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	জনাব মহী পাল দাশ
৩	শাহীদ আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আরিফ মোহাম্মদ দুলাল
৪	গিরিধর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আনন্দ মোহন চৌধুরী
৫	শ্যাম সুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব নিহার রঞ্জন চৌধুরী
৬	আছলম উদ্দীন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ কাশেম আলী
৭	মামুদ নগর উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মনমথ কান্তি চৌধুরী
৮	হাফিজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব প্রদ্যেৎ কুমার দাস
৯	বলরামপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব গঙ্গেশ চৌধুরী
১০	সরলাল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মনোরঞ্জন দাস
১১	চাকুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব উৎপল চন্দ্র দাস
১২	প্রতাপপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব গিরীন্দ্র চন্দ্র দাস
১৩	আব্দুল মান্নান চৌধুরী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব দীপক চন্দ্র দাস

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম
১৪	মহিম চন্দ্র নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব রতন বৈষ্ণব
১৫	কালাই মিয়া চৌধুরী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী

সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলাভিত্তিক মাদ্‌রাসাসমূহ[৫৯৪]

উপজেলার নাম : সুনামগঞ্জ সদর

ক্র. নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	দ্বীনি সিনিয়র আলিম মডেল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আলী নূর
২	আলহেরা জামেয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
৩	ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ জমির উদ্দিন মাশুক
৪	দারুলহুদা দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসাইন
৫	অষ্টগ্রাম আহমদাবাদ দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী

উপজেলার নাম : দক্ষিণ সুনামগঞ্জ

ক্র. নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	আক্তাপাড়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ ময়নুল হক
২	আমরিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব আবু নছর মোঃ ইব্রাহিম
৩	দামোধরতপী মাহমুদপুর দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
৪	জামেয়া হাজী আক্রম আলী সিনিয়র মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
৫	বীরগাঁও ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ জুবায়ের আল মাহমুদ
৬	উমেদনগর হযরত শাহজালাল রঃ দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম

উপজেলার নাম : জগন্নাথপুর

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	হবিবপুর কেশবপুর ফাজিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম
২	সৈয়দপুর সৈয়দিয়া শামছিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা	ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ
৩	হলিয়ার পাড়া জাঃ কাঃ সুঃ ফাজিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ ময়নুল ইসলাম পারভেজ
৪	আল-জান্নাত ইসলামিক এডুকেশন ইনস্টিটিউট	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম নিজামী
৫	ইকড়ছই জামেয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ ছমির উদ্দিন

৫৯৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
৬	রসুলগঞ্জ জামেয়া কোঃ সিনিয়র আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব আবু ইউসুফ মোঃ মানিক
৭	রানীগঞ্জ বাজার দারুচ্ছুন্নাহ সিনিয়র মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল
৮	কামড়াখাই জয়নগর দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম
৯	চরা জামেয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ সালেহ আহমদ
১০	রসুলপুর বনগাঁও ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল গফ্‌ফার আজাদ
১১	জয়দা আরাবিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মখছুছুল করিম চৌধুরী
১২	চিলাউড়া দারুসুন্নাত দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম আলফাজ
১৩	শাহজালাল জামেয়া দ্বীনিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
১৪	বালিকান্দি আটপাড়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ জমির আহমদ
১৫	পূর্ব বুধরাইল আটঘর আউদত ইসঃ দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আমির আলী
১৬	পীরেরগাঁও সুন্নাহঃ দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ বদরুল ইসলাম
১৭	রসুলপুর জামেয়া ইসলামিয় দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম
১৮	হযরত আবুবকর সিদ্দিক(রাঃ) দাখিল মাদরাসা	জনাব মোঃ ফজলুল হক

উপজেলার নাম : ছাতক

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	বুরাইয়া কামিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
২	গোবিন্দ নগর ফজলিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা	জনাব আঃ তাঃ মোঃ আব্দুছ সালাম
৩	ছাতক জালালিয়া আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ
৪	সিংচাপইড় সিনিয়র আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল হাদী
৫	খরিদিরচর আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব এইউএম আল ফারুক
৬	পালপুর জালালিয়া আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
৭	সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
৮	লাকেশ্বর দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব আজিজুর রহমান
৯	নতুন বাজার দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব আবু তৈয়ব মোঃ শামছুননূর
১০	রাজ্জাকিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মোশাহীদ আলী
১১	দোলার বাজার ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ জুনায়েদ আহমদ
১২	জাহিদপুর জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ নূরুল হক
১৩	নূরুল্লাপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১৪	জামেয়া ইসলামিয়া বনগাঁও দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ সিরাজুল হক

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১৫	শাহ সুফি মোজাম্মিল আলী দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুস ছালাম
১৬	গাবুরগাঁও দারুল কোরআন দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
১৭	কুমারকান্দি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান
১৮	দিঘলী রাহমানিয়া মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ জহুর আলী
১৯	কালারুখা লতিফিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মাহবুর রহমান
২০	আল-ইখওয়ান বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ শামছুল ইসলাম
২১	রাধানগর মোহাম্মাদিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ শামছুল কবীর মিছবাহচৌ
২২	বন্দরগাও ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল কাউয়ুম
২৩	জামেয়া মুঃ মুক্তির গাঁও দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মখলেছুর রহমান
২৪	মুহাম্মদীয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ ওয়েছুর রহমান

উপজেলার নাম : দোয়ারাবাজার

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	কলাউড়া দারুসুন্নাৎ কাছিমিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ কালিম উল্লাহ
২	বড়ইউরি দারুসুন্নাৎ বহুমুখী আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব এ.এফ.এম সৈয়দ হোসেন কবির
৩	দ্বীনেরটুক দারুল কোরআন আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ জাকির হোসেন
৪	চামতলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল হক
৫	দারুলহেরা জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আঃ রব গাজী
৬	ইসলামপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব এ.টি.এম. সামসুদ্দিন
৭	সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) লতিফিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ কাজী মোঃ আব্দুল মুকিত *
৮	পেশকারগাঁও ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব আবু ইউসুফ মোঃ তোহা
৯	লামাসানিয়া জামেয়া ইসঃ দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মুঃ আব্দুর রশিদ
১০	নরসিংপুর আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ সাদেকুর রহমান

উপজেলার নাম : তাহিরপুর

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	তাহিরপুর হিফঃ উলুম আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান
২	বালিজুরী এইচ.এ উলুম আলীম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ হারিছ উদ্দিন
৩	বাদাঘাট আর.এ দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

৪	কলাগাঁও জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান
৫	শাহজালাল(রঃ) জামেয়া আরাবিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ শহিদুর রহমান
৬	বড়দল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা	জনাব ফারুক আহমদ

উপজেলার নাম : বিশ্বম্ভরপুর

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	মেরুয়াখলা মমিনিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা	জনাব আঃ মতিন *
২	কাপনা জালালিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আবুল কাশেম
৩	দিঘিরপাড় দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মতিউর রহমান
৪	মাছিমপুর দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব সালেহ আহমদ
৫	গাজীরগাঁও অষ্টগ্রাম দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আবু হানিফা
৬	ভাদেরটেক ইসলামিয়া হাফেজিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন চৌধুরী

উপজেলার নাম : ধর্মপাশা

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	খয়েরদিরচর আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ ছাইয়েদুর রহমান
২	মহিষখলা দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ
৩	নোয়াগাঁও দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক
৪	জামিয়া হাতিমিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ সামসুল হক সিদ্দিকী

উপজেলার নাম : জামালগঞ্জ

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	নওয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ নুরুদ্দিন
২	লক্ষীপুর তাওয়াক্কোলিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব এম. এম. মিছবাহুর রহমান
৩	কালীপুর নেছারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম
৪	শুকদেবপুর দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান
৫	হাজী জুলেখা তায়েব ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আাঃ মতিন তালুকদার
৬	লক্ষীপুর তায়েদুল ইসলাম রাহঃ দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার নাম : দিরাই

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	হাজী মাহমদ মিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল
২	শ্যামারচর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব কে.এম. সুলতান মাহামুদ
৩	ধল আশ্রম দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব ফারুক আহমদ
৪	রায় বাঙ্গালী শাহজালাল (রঃ) দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ সায়খুল ইসলাম
৫	হায়দরিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
৬	হাতিয়া পীর আকিল নেছারিয়া শাহ দাঃ মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আবু সাঈদ

উপজেলার নাম : শাল্লা

ক্র.নং	মাদ্‌রাসার নাম	প্রধানের নাম
১	শাল্লা হাসিমিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মিয়া
২	দামপুর আটপাড়া দাখিল মাদ্‌রাসা	জনাব মোঃ মতিউর রহমান

সুনামগঞ্জ জেলার কওমী মাদরাসাসমূহ[৫৯৫]

উপজেলার নাম : সদর

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
০১	জামেয়া ইসলামিয়া ইমদাদুল উলূম অষ্টগ্রাম শাখাইতি	মাও. মুফতি আব্দুল মালিক
০২	জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া বর্মাউত্তর রামনগর বাণীপুর	মাও. মাহমুদ হুসাইন
০৩	জামেয়া ইসলামিয়া বাইশগ্রাম বাহাদুরপুর	মাও. তাফাজ্জুল হক আজিজ
০৪	জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া সুনামগঞ্জ	শায়খ মাও. আব্দুল বছীর
০৫	জামেয়া ইসলামিয়া আস্‌আদিয়া হাসননগর	মাও. সাজিদুর রহমান
০৬	তালীমুল উলূম পৈন্দা মোহনপুর	মাও. শামসুল ইসলাম
০৭	টাইলা ইসলামিয়া হক্কানিয়া মাদরাসা	মাও. মহসিন উদ্দিন
০৮	দারুল কোরআন হাফিজিয়া হক্কানিয়া মাদরাসা	মাও. আতাউর রহমান
০৯	হরিণাপাটি রঙ্গারচর দারুস সালাম মাদরাসা	মাও. হাবিবুর রহমান
১০	হবতপুর হুসাইনিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	হা. নজমুল ইসলাম
১১	অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা বড়ঘাট	মাও. মনজুর আহমদ
১২	ইসলামিয়া আরাবিয়া চারগ্রাম সাফেলা মাদরাসা	মাও. মুজিবুর রহমান
১৩	মাহমুদিয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া হাছানবাহার পাঠানবাড়ী	মাও. আব্দুস সালাম

---

৫৯৫. কওমী মাদরাসার তালিকাটি 'আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ' নামক বোর্ডের সুনামগঞ্জ অফিস থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহের তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০১৯।

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
	মাদরাসা	
১৪	ভৈষবেড় দেওয়ান নগর দারুল উলূম হাফিজিয়া মাদরাসা	ক্বারী মফিজুর রহমান
১৫	কলাইয়া ফুরকানিয়া নাদিয়া মাদরাসা	হা. আব্দুল আহাদ
১৬	তেলিকোনা মনোহরপুর হাফিজিয়া নুরানীয়া মাদরাসা	হা. নাজিম উদ্দিন
১৭	চারগাঁও জামেয়া ইসলামিয়া জলিলপুর মাদরাসা	মাও. রমযান আলী
১৮	২৬ গ্রাম কাসিমুল উলূম শ্রীনাথপুর মাদরাসা	মাও. হুসাইন আহমদ
১৯	দারুল উলূম ছয়গ্রাম ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	ডা. কবির আহমদ
২০	আনওয়ারুল উলূম মোল্লাপাড়া মাদরাসা	মাও. নূরুল ইসলাম
২১	আবাবিল হিফজুুল কোরআন একাডেমী সুনামগঞ্জ	হা. মাও. নুর হোসাইন
২২	নুরানীয়া হাফিজিয়া পঞ্চগ্রাম মাদ্রাসা লালপুর	মাও. আজমল হোসাইন
২৩	হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদ্রাসা ও এতিমখানা মুসলিমপুর	মুফতি আজিজুল হক
২৪	জামেয়া আবু হুরায়রা (রা.) ছয়গ্রাম বাহাদুরপুর মাদ্রাসা	শায়খ মাও.আব্দুল বছীর
২৫	নূরে মদীনা মাদরাসা, সুনামগঞ্জ	মাও. মোর্শারফ হোসাইন
২৬	শায়খুল ইসলাম হিফজুল কোরআন মাদরাসা	হা. মো. হেলাল আহমদ
২৭	মারকাজু তাহফিজিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদ্রাসা	মুফতি মাও. জামিল আহমদ
২৮	মাদরাসা বাইতুসসালাম সুনামগঞ্জ	হা. মাও. সালাহ উদ্দিন

উপজেলার নাম : দক্ষিণসুনামগঞ্জ

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
২৯	জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া হুসাইনিয়া দারুল উলূম দরগাহপুর	মাও. নুরুল ইসলাম খাঁন
৩০	পঞ্চগ্রাম জাহানপুর ইসলামিয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. ছলিম উল্লাহ
৩১	মদিনাতুল উলূম জামলাবাদ মাদরাসা	শায়খ মাও. আজিজুল হক
৩২	পঞ্চগ্রাম ইমদাদুল উলূম কামরূপদলং মাদরাসা	আলহাজ্ব শায়খ আকবর আলী
৩৩	জামেয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া জয়সিদ্ধী বসিয়া খাউরী	মাও. আব্দুর রকিব
৩৪	পাগলা পশ্চিমপাড়া ইমদাদিয়া মাদরাসা	মাও. আতিকুল হক
৩৫	পাথারিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুর রহীম
৩৬	ডুংরিয়া মদীনাতুল উলূম মাদরাসা	হা: মাও. মিছবাহ উদ্দিন
৩৭	দ্বীনিয়া আহলিয়া আবুবকর রাযি. মাদরাসা ঢালাগাঁও	মাও. আহসান উল্লাহ
৩৮	জামেয়া ইসলামিয়া পাগলা	হা: মাও. মুশাহিদ আহমদ
৩৯	নোয়াখালী হাফিজিয়া আমিনিয়া মাদরাসা	মাও. মুফতি আখলাকুল আম্বিয়া
৪০	ধরমপুর ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. আমির উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
৪১	ইসলামিয়া বালিকা বিদ্যালয় দরগাহপুর	হা. মাও. যইনুল আবেদীন
৪২	বড়মোহা দারুল উলূম ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা	মাও. মুশতাক আহমদ
৪৩	মারকাজুল উলূম হাফিজিয়া মাদরাসা ভমভমী	মাও. আব্দুল খালিক
৪৪	হাসারচর রহমানিয়া এতিমখানা ও মাদ্রাসা	মাও. মুশাহিদ আহমদ
৪৫	শিমুলবাক ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা	মাও. হাবিবুল হক
৪৬	সাপেরকোনা হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. লিয়াকত আলী
৪৭	কাঠালিয়া হাসনাবাজ আলীমপুর মাদরাসা	মাও. নুরুল আমীন
৪৮	হাজী আস্তুরা বিবি ও হাজী জয়তারা মজিদ হাফিজিয়া মদ্রাসা	হা. জিয়াউর রহমান
৪৯	জামেয়া তালিমুল ইসলাম জীবদাড়া	মৌলভী মারিফত আলী
৫০	মুসলিম শিশুশিক্ষা নূরানী বালিকা মাদরাসা জাহানপুর	মাও. বদরুল ইসলাম
৫১	সাওতুল হেরা ইসলামিয়া মাদ্রাসা	মাও. শরাফত আলী
৫২	গাজীনগর দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল মুছাব্বির

উপজেলার নাম : জগন্নাথপুর

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
৫৩	জামেয়া হোসাইনিয়া আরাবিয়া দারুল হাদীস সৈয়দপুর	মাও. সৈয়দ ফখরুল ইসলাম
৫৪	জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম অলৈতলী ও কাতিয়া	হা. মাও. ইমদাদুল্লাহ
৫৫	জামেয়া ইসলামিয়া দারুসসুন্নাহ ইমদাদিয়া ইসহাকপুর	মাও. আবু নছর ইমাদুদ্দীন
৫৬	জালালপুর কাসিমুল উলূম মাদরাসা	মাও. বাহা উদ্দিন
৫৭	হবীবপুর দারুল উলূম ইমদাদিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল মুমিন
৫৮	শেওরা ইসলামিয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মো. আমিনুল ইসলাম
৫৯	দারুল উলূম পাটলী মাদরাসা	শায়খ মাও. আব্দুল হাই
৬০	ইমদাদুল উলূম আদুয়া ও বড়কাপন মাদরাসা	মাও. আব্দুন নূর
৬১	শ্রীধরপাশা দারুল উলূম হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. আপ্তাব উদ্দিন
৬২	পইলভাগ ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. হুসাইন আহমদ
৬৩	কুবাজপুর দারুল উলূম ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. গিয়াস উদ্দিন
৬৪	জামেয়া ইসলামিয়া লামা টুকের বাজার	মাও. ইসলাম উদ্দিন
৬৫	শাহারপাড়া শাহ কামাল (র.) ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল মুনঈম শাহীন
৬৬	জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মোরাদাবাদ ও বুধরাইল	মাও. লুৎফুর রহমান
৬৭	মদীনাতুল উলূম হবিবপুর মাদরাসা	মাও. ফয়েজ আহমদ
৬৮	জামেয়া ইসলামিয়া বাগময়না তাজপুর	মাও. নজরুল ইসলাম
৬৯	হাফিজিয়া নূরানী মাদরাসা	মাও. মো: শামীম আহমদ
৭০	জামেয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া চিলাউড়া পন্ডিতা	মাও. শাহ আলম

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
৭১	জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া হলদিপুর কবিরপুর	মাও. আরশাদ খাঁন
৭২	ফেঁছি শেওরা ও সাতহাল দুস্তি দারুল উলূম আমিনীয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুস সালাম
৭৩	উত্তর দাওরাই দারুল ইসলাম হাফিজিয়া মাদ্রাসা	হা. নুরুল ইসলাম
৭৪	হিফযুল কোরআন একাডেমী জগন্নাথপুর	মাও. জুনাইদ আহমদ খাঁন
৭৫	নাছিরপুর হাফিজিয়া নুরানিয়া মাদরাসা	মাও. হুসাইন আহমদ
৭৬	মদীনাতুল উলূম হরিণাকান্দি মাদরাসা	মাও. মো: আমিরুল ইসলাম
৭৭	জামেয়া মন্তাজিয়া দারুল উলূম কামারখাল	মাও. আব্দুল হামিদ
৭৮	সৈয়দপুর ইমদাদুল উলূম নূরানিয়া মাদরাসা	হা. মাও. সৈয়দ জুনাইদ আহমদ
৭৯	শাহ সৈয়দ শামসুদ্দিন রাহ. তাহফিযুল কুরআন মাদরাসা	মাও. হা. ফখরুল ইসলাম
৮০	জামেয়া মাদানিয়া আমিনিয়া মাদরাসা	মাও. শরীফ উদ্দীন
৮১	গোতগাঁও তাওয়াক্কুলিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. শিহাবুদ্দীন
৮২	মাদরাসায়ে দারুল জান্নাত শুক্লাম্বরপুর	মাও. আব্দুল করীম.
৮৩	পাড়ারগাঁও হাফিজিয়া মাদ্রাসা	হা. সালিম আহমদ
৮৪	সৈয়দপুর সৈয়দিয়া শামছিয়া ফাযিল মাদ্রাসা	ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ
৮৫	জামেয়া ইসলামিয়া ওয়াহিদীয়া মাদ্রাসা	মাও. মো: জিল্লুল হক
৮৬	মদীনাতুল উলূম অলইতলী কাতিয়া মাদরাসা	মাও. জিল্লুল হক

উপজেলার নাম : ছাতক

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
৮৭	দারুল উলূম চরমহল্লাহ আশাকারচর মাদরাসা	মাও. জামিল আহমদ
৮৮	জামেয়া ইসলামিয়া মতিনিয়া লুৎফুল উলূম চরবাড়া	মাও. আব্দুল কাইয়ূম
৮৯	নোয়াগাঁও গণেশপুর তাকবিয়্যাতুল ইসলাম মাদরাসা	মাও. আব্দুল হান্নান
৯০	চাটিবহর ইসলামিয়া মাদরাসা	মুফতি শামসুজ্জুহা
৯১	জামেয়া ইসলামিয়া দারুল হাদীস জাউয়া	মাও. আব্দুস সোবহান
৯২	জামেয়া ছিদ্দিকিয়া বেতুরা	মো: জুবায়ের আহমদ
৯৩	জামেয়া ইসলামিয়া রাউলি	মাও. ইব্রাহিম খলিল
৯৪	অষ্টগ্রাম জামেয়া হাফিজিয়া (কামারগাঁও)	মাও. আমির উদ্দিন
৯৫	মিফতাহুল উলূম মোগলপাড়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল লতীফ
৯৬	চাঁনপুর মদীনাতুল উলূম হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. মুতিউর রহমান নোমানী
৯৭	জামেয়া মুহাম্মদিয়া ভুইগাঁও	মাও. শামসুল ইসলাম
৯৮	জামেয়া ইসলামিয়া দারুসসুন্নাহ মোল্লাপাড়া	মাও. হিফজুর রহমান
৯৯	পঞ্চগ্রাম কামরাঙ্গী তওক্কুলিয়া মাদরাসা	মাও. আবুল খায়ের
১০০	জামেয়া কোরআনিয়া নোয়াকুট মাদরাসা	মাও. কমর উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
১০১	খাইরুল উলূম হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, সিকনিকান্দি	মাও. আব্দুল মতিন
১০২	জামেয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া দারুল কুরআন মৈশাপুর	হা. মাও. আব্দুস সামাদ
১০৩	লক্ষণসোম হাফিজিয়া মাদরাসা	হা. মাও. আকবর আলী
১০৪	জামেয়া ইসলামিয়া রওজাতুল জান্নাত কাঞ্চনপুর	মাও. মুফতি মুহি উদ্দিন
১০৫	চাঁন্দপুর হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. শামছুল ইসলাম
১০৬	জামেয়া উমর বিন খাত্তাব (রা.) লক্ষীবাউর	মাও. ইসলাম উদ্দিন
১০৭	ছাতারপই মাদানিয়া দারুল কোরআন মাদরাসা	মুফতি মঞ্জুর আহমদ
১০৮	জামেয়া ইসলামিয়া বৈশাকান্দি বাহাদুরপুর মাদরাসা	মাও. রফিকুল ইসলাম
১০৯	নোয়ারাই ইসলামপুর ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	হা. মাও. আব্দুর রব ফয়জী
১১০	জামেয়া হাফিজিয়া দারুল উলূম ভাতগাঁও	মাও. সুহাইল আহমদ সুহেল
১১১	শেওতরপাড়া দারুল কোরআন হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা	হা: আঞ্জব আলী
১১২	জামেয়া লুৎফিয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া আরাবিয়া গাগলাজুর	মাও. কামাল উদ্দিন
১১৩	শাহজালাল হাফিজিয়া মাদ্রাসা হাইলকেয়ারী	হা. শরীফ আহমদ
১১৪	কাজীহাটা নোয়াগাঁও দারুল ক্বোরআন মাদরাসা	হা. মাও. সাঈদ আহমদ
১১৫	জামেয়া ইসলামিয়া মিছবাহুল উলুম ছনখাইড়	মো. মোশাহিদ আলী
১১৬	জামেয়া মুহাম্মদিয়া দারুল উলূম ইছাকলস	মাও. লুৎফুর রহমান
১১৭	আমবাড়ী গোপালপুর হেফাজতে ইসলাম মাদরাসা	মাও. সাজিদুর রহমান
১১৮	জামেয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া পঞ্চগ্রাম সোনাপুর	মাও. মঈনুল হক
১১৯	জামেয়া আরাবিয়া মদীনাতুল উলূম দোহালিয়া	মাও. ফজলুল করীম
১২০	জামেয়া এমদাদিয়া দোয়ারাবাজার মাছিমপুর	মাও. আলী আহমদ
১২১	জামেয়া ইসলামিয়া দারুল কুরআন জলসী	মাও. কামাল উদ্দিন
১২২	শামছুল উলূম হাফিজিয়া কাঠাখালী বাজার মাদরাসা	মাও. মিছবাহ উদ্দিন
১২৩	জামেয়া ইসলামিয়া কাওমিয়া বালিউরা	মাও. আখতার হুসাইন
১২৪	খাগুরা তাওক্কুলিয়া মাদরাসা	মাও. গিয়াস উদ্দিন
১২৫	জামেয়া ইসলামিয়া হাশিমিয়া হায়দরপুর	মাও. আব্দুল আজিজ খাঁন
১২৬	দারুল উলূম আবু বকর সিদ্দিক রাযি. মাদরাসা	মাও. আব্দুল হামিদ
১২৭	মুকিরগাঁও মোহাম্মদপুর জামেয়া ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. নুর উদ্দিন
১২৮	জামেয়া ইসলামিয়া হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা	হা. জহুর উদ্দিন
১২৯	জামেয়া ইসলামিয়া পঞ্চগ্রাম নলুয়া মহিলা মাদরাসা	মাও. মো: আলমগীর হোসাইন
১৩০	আছিরনগর কান্দাগাঁও দাইমোল্লাহ মদীনাতুল উলূম মাদ্রাসা	মাও. আব্দুল ওয়াহিদ
১৩১	বাঁশতলা হোসাইনিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. নূর উদ্দিন
১৩২	মাদরাসাতুত তাক্বওয়া আল ইসলামিয়া, দোয়ারা বাজার	মাও. মস্তফা কামাল
১৩৩	বাংলা বাজার নূরানী ক্বাওমী মাদ্রাসা	মাও. হোসাইন আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার নাম : দিরাই

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
১৩৪	জামেয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া জগদল	মাও. রায়হান উদ্দিন
১৩৫	টংগর, রাড়ইল, জারলিয়া ও তারাপাশা ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুর রকিব
১৩৬	চান্দিপুর ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. নূরুদ্দীন আহমদ
১৩৭	কুলঞ্জ বরইতিয়র হাফিজিয়া দারুস সুন্নাহ মাদরাসা	মাও. মারুফ আব্দুল্লাহ চৌধুরী
১৩৮	পঞ্চগ্রাম জকিনগর ইসলামিয়া আরাবিয়া এমদাদিয়া মাদরাসা	মাও. বদরুল আলম
১৩৯	অষ্টগ্রাম ফয়জেআম রফিনগর হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. মুনিরুল ইসলাম
১৪০	নাদিয়াতুল কোরআন ইসলামিয়া মাদরাসা কালিনগর	মাও. নুরুল হক নোমানী
১৪১	জামেয়া ইসলামিয়া টুকদিরাই	মাও. ছাদিকুর রহমান
১৪২	মদীনাতুল উলূম ইসলামিয়া আরাবিয়া পঞ্চগ্রাম কাইমা	মাও. আব্দুর রউফ তালুকদার
১৪৪	রাজনাও ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুস সালাম
১৪৫	ফুরকানিয়া ঘাগটিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. এনামুল হক
১৪৬	পঞ্চগ্রাম বদলপুর ইসলামিয়া হক্কানিয়া মাদরাসা	মাও. আবুল ফজল
১৪৭	সুজানগর দারুল কুরআন মাদরাসা	মাও. হোসাইন আহমদ
১৪৮	ফাতেমানগর কাজুয়াবাদ দারুছছুন্নাহ হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. মাছুম আহমদ
১৪৯	রণভূমি হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. গোলাম রব্বানী
১৫০	ধীতপুর ফুরকানিয়া আরাবিয়া মাদরাসা	মাও. জাকির হুসাইন
১৫১	ভাটিধল হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল হাকিম
১৫২	দারুল কোরআন টানাখালী মাদরাসা	ক্বারী মুতিউর রহমান
১৫৩	কামরীবিজ ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা	মাও. আশরাফ আলী
১৫৪	দাউদপুর রাধানগর নরোত্তম ও রাজপুর ইস হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. হাবিবুর রহমান
১৫৫	মাটিয়াপুর ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. শামছুল হক
১৫৬	দারুল কুরআন কালধর ও বকশিওর	মাও. আব্দুল্লাহ রাজী
১৫৭	জামেয়া ইসলামিয়া শরীফপুর	আলহাজ মাহমুদুল হোসেন সেজু
১৫৮	শাহজালাল রহ. ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা কাদিরপুর	মাও. শাহ জাহান আহমদ
১৫৯	ধীতপুর হযরত রুক্কাইয়্যা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা	মুফতি শফীকুল আহাদ
১৬০	জামেয়া হাফিজিয়া নূরে মদীনা মধুপুর মাদ্রাসা	মাও. শিফাউল করীম
১৬১	জামিয়া ইসলামিয়া দলকুতুব	মাও. আহমদ কবির
১৬২	চারগ্রাম মধুরাপুর আশরাফুল উলূম হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. নূরুল ইসলাম
১৬৩	সপ্তগ্রাম নোয়ারচর দারুল কুরআন মাদরাসা	মুফতি তাজ উদ্দিন
১৬৪	জামেয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মুস্তাফিয়া শাল্লা	মুফতি জিল্লুল হক
১৬৫	মাহমুদনগর মদীনাতুল উলূম হামিদিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল কুদ্দুস

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
১৬৬	সুরমা দারুল কোরআন ইমদাদুল উলূম মাদরাসা	মাও. ইকরাম হুসাইন
১৬৭	পঞ্চগ্রাম টুকচানপুর মদীনাতুল উলূম মাদরাসা	মাও. সাঈদুর রহমান
১৬৮	কাশিপুর ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. হুসাইন আহমদ
১৬৯	আটগাঁও পশ্চিমপাড়া ক্বাসিমুল উলূম মাদ্রাসা	মাও. মোস্তফা কামাল
১৭০	ইয়ারাবাদ দারুস সুন্নাহ হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা	মাও. আমিন উদ্দিন

উপজেলার নাম : জামালগঞ্জ

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
১৭১	নয়াহালট দক্ষিণ কামলাবাজ ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা	মাও. দেলওয়ার হুসাইন
১৭২	অষ্টগ্রাম কাসিমুল উলূম কলকতখাঁ মাদরাসা	মাও. জামিলুল হক
১৭৩	জামালগঞ্জ হাফিজিয়া নূরানীয়া মাদরাসা ও এতিম খানা	হা: আব্দুর রহিম
১৭৪	মদিনাতুল উলূম হোসাইনিয়া পঞ্চগ্রাম শেরমস্তপুর মাদরাসা	মাও. আব্দুল কাদির
১৭৫	চাঁনপুর কাসিমুল উলূম হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. খুরশেদ আলম
১৭৬	আটগাঁও ভুতিয়াপুর সুজাতপুর ইসলামিয়া আরাবিয়া কওমিয়া মাদরাসা	মাও. শফিকুল আলম
১৭৭	সপ্তগ্রাম গজারিয়া হক্বানিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা	মাও. হোসাইন আহমদ
১৭৮	দুর্লভপুর ফাজিলপুর রেহানা আব্দুল মান্নান হুসাইনিয়া মাদরাসা	মাও. হাম্মাদ আহমদ
১৭৯	আল-মারকাজ আল-ইসলামী মাকরখলা	মাও. আবুল হাসান
১৮০	পঞ্চগ্রাম মল্লিকপুর মাদরাসা	মাও. হেলাল উদ্দিন
১৮১	আটগাঁও মাহমুদপুর ইসলামিয়া আরাবিয়া ক্বাওমী মাদরাসা	হা. মাও. মনিরুজ্জামান
১৯২	মুহাম্মদিয়া হাফিজিয়া আরাবিয়া মনসুরাবাদ বাজার মাদরাসা	হা. সাজিদুল বারী
১৮৩	হাজী আব্দুস সাত্তার হাফিজিয়া আরাবিয়া মাদরাসা রামপুর	হা. মাও. মুফিজুর রহমান
১৮৪	দারুন্নাজাত নাজিম নগর হাফিজিয়া আরাবিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল্লাহ আল নোমান
১৮৫	নুরুদ্দীন রহ. জামিয়া ইসলামিয়া সদরকান্দি ও পশ্চিম কালিপুর	মাও. আব্দুল করিম
১৮৬	ছয়গ্রাম আলীপুর দারুল উলূম রশিদিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা	মাও. হাসসান আহমদ
১৮৭	ইক্বরা নূরানী একাডেমী উত্তর কামলাবাজ	মাও. জালাল উদ্দিন
১৮৮	আরিফুন্নেছা নূরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, সুনামগঞ্জ	হা. আজির উদ্দিন

উপজেলার নাম : তাহিরপুর

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
১৮৯	বড়দল দারুল উলূম হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল কাইয়ূম
১৯০	আনোয়ারপুর লোহার চুড়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা	ক্বারী আবুল কাশেম

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
১৯১	আশরাফুল উলূম দশগাঁও নয়াবন্দ মাদরাসা	মাও. হাম্মাদুর রহমান
১৯২	জামিয়া হাফিজিয়া মাজাহিরুল উলূম লামাশ্রম	মাও. আরীফ হুসাইন
১০৩	আশরাফুল উলূম মানিগাও মাদরাসা	মাও. আজিজুল হক
১৯৪	দারুল উলূম আটগাঁও গোলকপুর মাদারাসা	মাও. বদিউজ্জামান
১৯৫	বাঁশতলা দারুল হেদায়াত হা. উ. মাদরাসা ও এতিমখানা	মাও. উমর ফারুক
১৯৬	মাহারাম বড়গোফ দারুল উলূম কওমি মাদরাসা	মাও. আশরাফ আলী
১৯৭	পাঁচগাও ননাই আনওয়ারুল উলূম মাদরাসা	মাও. আব্দুল হান্নান
১৯৮	দারুল উলূম হোসাইনিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ঘাগটিয়া	মাও. আব্দুল্লাহ
১৯৯	বোরখাড়া জামেয়া ইসলামিয়া কেরাতীয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুল জলিল
২০০	দারুল উলূম পুরান খালাশ মাদ্রাসা	মাও. হাবিবুর রহমান
২০১	জামেয়া ইসলামিয়া জামতলা বাজার মাদরাসা	মাও. ফয়েজ আহমদ
২০২	পুরান লাউড় দারুল কুরআন শাহ আরিফিন রাহ. মাদরাসা	মাও. এখলাছুর রহমান
২০৩	দারুল উলূম আটগাঁও রতনপুর তাহিরিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা	মাও. আবুল হাসেম
২০৪	তা'লীমুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা লাউড়েরগড়	মাও. মুঈনুল ইসলাম
২০৫	মদীনাতুল উলূম শিমুলতলা মাদ্রাসা	মাও. জামালুদ্দীন
২০৬	দারুল উলূম মহিয়ুস সুন্নাহ লাকমা মাদ্রাসা	মাও. মুসা
২০৭	জামেয়া দারুসসালাম দিঘীরপাড় পাঁচগাঁও হাফিজিয়া মাদ্রাসা	মাও. আজিজুল হক
২০৮	আনোয়ারপুর লোহার চুড়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা	ক্বারী আবুল কাশেম
২০৯	রওজাতুল উলম উজান ও মধ্য তাহিরপুর মাদরাসা	মাও. সাবিতুর রহমান
২১০	শান্তিপুর উত্তর পুরানঘাট নূরানী হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. কাওছার আহমদ চৌ:
২১১	জামিয়া আরাবিয়া নুরুল উলূম বীরেন্দ্রনগর মাদরাসা	হা. মাও. শুয়াইব আহমদ
২১২	মাটিকাটা রহমানিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. শাহ জাহান
২১৩	চাঁনপুর দারুল হুদা হাফিজিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা	মাও. মুফতি আব্দুল খালিক
২১৪	চারগাঁও কলাগাঁও দারুল উলূম নূরে মদিনা কওমি মাদরাসা	মাও. সেলিম আহমদ
২১৫	বারহাল রমজান আলী নূরানী মাদ্রাসা	মাও. উমর ফারুক
২১৬	লাকমা জাতীয় দ্বীনি মাদ্রাসা	মাও. শায়খুল ইসলাম

উপজেলার নাম : বিশ্বম্ভরপুর

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
২১৭	জামেয়া হুসাইনিয়া দারুল উলূম চিনাকান্দি বিশ্বম্ভরপুর	মাও. আব্দুল হাসীম
২১৮	জামেয়া উসমানিয়া দারুল উলূম পলাশ	মাও. রিয়াজ উদ্দিন
২১৯	পাঁচগাঁও ইমদাদুল উলূম ইসলামিয়া ফুলভরি মাদরাসা	মাও. রফিক আহমদ
২২০	জামেয়া মাদানিয়া পঞ্চগ্রাম কৈয়ারকান্দা দরগাহপুর	মাও. জিল্লুর রহমান
২২১	গাজিরগাঁও দারুল কুরআন হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. রমিজুদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
২২২	মিয়ারচর পাঁচগাঁও হাজী ফর্সামড়ল দারুল উলূম মাদরাসা	মাও. মস্তফা কামাল
২২৩	জামেয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া কাপনা	মাও. শহিদ উল্লাহ
২২৪	সাতগাঁও জামেয়া ইসলামিয়া বাগুয়া মাদরাসা	মাও. আব্দুর রকিব
২২৫	জামিয়া মুহাম্মদিয়া দারুস সুন্নাহ চালবন্দ	মাও. আবুল কাশেম
২২৬	মথুরকান্দি আল ফাতাহ হাফিজিয়া নূরানীয়া মাদ্রাসা	মাও. জিয়াউল হক
২২৭	দশগ্রাম মাহমুদিয়া মিফতাহুল উলূম বসন্তপুর ক্বওমী মাদরাসা	মাও. আব্দুল হাছিব
২২৮	ডা. হাছান জাহেরা নূরানী মডেল একাডেমী হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. হারুনুর রশিদ
২২৯	আহমাদুল উলূম পুরানগাঁও কওমি মাদরাসা	মাও. মো: আব্দুল্লাহ
২৩০	দারুল উলূম সিরাজপুর বাগগাঁও মাদরাসা	মাও. রিয়াজ উদ্দীন

উপজেলার নাম : ধর্মপাশা

ক্রম	মাদরাসার নাম	মুহতামীমদের নাম
২৩১	গোলকপুর বাজার ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. মোয়াজ্জম হুসাইন
২৩২	বৌলাইগঞ্জ বাজার ইসলামিয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা	মাও. এমদাদুল হক
২৩৩	সুখাইড় নোয়াগাঁও বিনোদপুর আশরাফুল উলূম মাদরাসা	মাও. সাদ আহমদ সাদী

এছাড়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য সমগ্র জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১০৫০ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।[৫৯৬] এসব প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় মুসলিম মনীষিগণের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়ে পৃথক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হতে পারে। মুসলিম মনীষিদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সাহায্য-সহযোগিতায় শিশুশিক্ষা সম্প্রসারণে ৭৩টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জেলায় ৯০টির মতো স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ও রয়েছে।

সুনামগঞ্জের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ও দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ‘সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সুনামগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০১৯ সালের ৩০ নভেম্বর সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ মান্নানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুনামগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়।[৫৯৭] আশা করা যায় অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়টি তার কার্যক্রম শুরু করবে এবং সুনামগঞ্জের উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে যুগান্তকারী অধ্যায় রচনা করবে।

---

৫৯৬. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সুনামগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর ২০১৯

৫৯৭. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ : সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধারা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত মুসলিম মনীষিগণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানী নাগরী লিপির প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধারা

অপরূপ প্রাকৃতিক শোভায় শোভিত এ জনপদ হাজার বছর ধরে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে। এ জনপদের শিল্প-সংস্কৃতির ধরন যেমন অন্য জনপদ থেকে ভিন্ন, তা চর্চার ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র রীতি-পদ্ধতি এখানে বিদ্যমান রয়েছে। এ জনপদ কৃষিপ্রধান এবং কৃষিকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন আবর্তিত। এ জনপদের ৮০ ভাগ মানুষই চাষাবাদ ও শিকারবৃত্তিকে আঁকড়ে ধরে জীবন নির্বাহ করে আসছে। এ জীবন নির্বাহের পেছনে শুধু শ্রমদান মুখ্য তা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিল্পচর্চার বিষয়টিও। সাধারণ মানুষ কৃষি উপকরণ, মৎস্য আহরণের উপকরণগুলো একসময় ঘরে বসে তৈরি করেছে। এর মধ্যে লাঙ্গল, জোয়াল, ফুফা, মই, জাল, বাগুড়া, বোঙ্গা, কুচা, ফলো, কুইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখনো এসব উপকরণ গ্রামেই তৈরি হয়। এটি এ অঞ্চলের শিল্প সংস্কৃতি। বিষয়টি গ্রামীণ জনপদে মানুষের অন্তরকে নাড়া দেয়। হাতে তৈরি রুমাল, রুমালের জমিনে আঁকা সুচিশিল্প, হাতপাখা, বেত থেকে তৈরি শীতলপাটি এখানকার মানুষের জীবন থেকে উৎসারিত শিল্প। এখানে বেত, বাঁশ ও কাঠশিল্পের ছোট ছোট কারখানা এবং কুটিরশিল্প রয়েছে। হোগলার চাটাই, বাঁশের চাটাই, মূর্তার চাটাই, বাঁশের তৈরি ডোলা, কুলা, পাইলা, কাটা, বড় ডোলা ইত্যাদি লোকজীবনের মূর্ত সংস্কৃতি।

এখানকার শিল্প-সংস্কৃতির আরেকটি ধারা হলো গ্রাম্যমেলা। এ জনপদে যে স্থানে মেলা হয়, তার মধ্যে সুনামগঞ্জ সদরে পাইকাফনের মেলা, মাইজবাড়ীর মেলা ও আলমপুরের মেলা; ছাতকে ছনখাইড়ের মেলা, পীরপুরের মেলা; দোয়ারাবাজারে মাছিমপুরের মেলা, পানাইলের মেলা; বিশ্বম্ভরপুরে রাধানগরের মেলা, ফুলবাড়ীর মেলা; দিরাইয়ে ধলমেলা, সজনপুরের মেলা, রাজারগাঁওয়ের মেলা, পাঁচগাছির মেলা, বরার গাঁওয়ের মেলা; তাহিরপুরে পণাতীর্থ মেলা; ধর্মপাশায় শিবরাত্রির মেলা, বারুণী মেলা; শাল্লায় সমেশ্বরীর মেলা, হুমাই ঠাকুরানীর মেলা; জগন্নাথপুরে কামারখালের মেলা, রৌওলির মেলা, মীরপুরের মেলা; জামালগঞ্জে নোয়াগাঁয়ের মেলা, সাচনার মেলা। চৈত্রসংক্রান্তি নবান্ন, মহররমপূর্ব লাঠিখেলা, লৌকিক অনুষ্ঠান বা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আজো গান গাওয়া হয়, রচিত হয় কবিতা, ছড়া। পাশাপাশি লোক খেলার মধ্যে ষাঁড়ের লড়াই, নৌকাবাইচ, হাডুডু খেলা, মোরগের

Dhaka University Institutional Repository

লড়াই, কুস্তি, লাঠিখেলা আয়োজন করা হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির লৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান হলো পুঁথিপাঠের আসর। এ জেলার প্রত্যেক উপজেলায় পুঁথিপাঠের রেওয়াজ প্রচলিত আছে। এ জনপদে চিরায়ত ঐতিহ্যের মধ্যে পুঁথিপাঠ অনাড়ম্বর প্রয়াস। লৌকিক প্রেমযুদ্ধ, পৌরাণিক মিথ পুঁথির উপজীব্য বিষয়। এ অঞ্চলের সংস্কৃতি লোক ঐতিহ্যনির্ভর। এ সংস্কৃতি চর্চাকারীর বৃহৎ গোষ্ঠীই বসবাস করে গ্রামে। কবি নজরুলকে যতটা জানে শহরের মানুষ, তার চেয়ে অনেক বেশি চিনে-জানে সৈয়দ শাহনূর, রাধারমণ, হাছন রাজা, শাহ আবদুল করিমকে। গীতপ্রধান এ অঞ্চল সমগ্র দেশে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত শুধু লোককবি, আউল-বাউল ও পীর-ফকিরদের অবদানের জন্যে। তিন শতাধিক লোককবির জন্মভিটা এ সুনামগঞ্জ জেলা। এখনো এ জনপদে ষাট হাজারের বেশি লোকগান পড়ে আছে। প্রবাদ-প্রবচন, ডাকের কথা, ছিলক, কিচ্ছা-কাহিনী আজো লোকমুখে শোনা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে প্রাচীন জমিদার বাড়ি, লাউরের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। ঐতিহ্য-সংস্কৃতির স্বতন্ত্র আড়ত হিসেবে শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস বিবেচনায় সম্প্রতি শিল্প-সংস্কৃতি ও লোকায়ত ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার অভিপ্রায় নিয়ে ২০০৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর সবার জন্য একটি স্বতন্ত্র মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। জেলা প্রশাসন এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করায় সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হাজার বছরের সুষমামণ্ডিত। যুগ যুগ ধরে এ ঐতিহ্য ধারা সুনামগঞ্জের সংস্কৃতিকে করেছে গৌরবান্বিত। সুনামগঞ্জের সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের সৃষ্টির মিলনে ও মিশ্রণে সৃষ্ট এক ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। হযরত শাহজালাল (র.) সিলেট আগমনের ফলে এ অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতির যে গোড়াপত্তন হয় তার রেশ আজো বিদ্যমান। শুরু হয় আরবী, ফার্সী চর্চা। এমনকি মুসলিম জমিদার বাড়িতে শীতের মৌসুমে প্রায়ই কবিদের মোশায়েরা হত বলে জানা যায়। দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "সাধারণত বর্তমান উত্তর প্রদেশ থেকে আগত কবি (শায়ের) ফরাশের উপর বসে ফার্সি কবিতার কটা লাইন উচ্চারণ করতেন এবং মজলিশে উপস্থিত অন্যান্য বাংলা ভাষাভাষী কবিগণ এর দ্বিতীয় পঙ্ক্তি পূরণ করার চেষ্টা করতেন। তাদের চেষ্টা সার্থক হলে আদি মিসরার প্রবর্তক মারহাবা মারহাবা বলে গোটা ঘরকে কাঁপিয়ে তুলতেন। আবার ভুল হলে 'বরবাদ বরবাদ' বলে তাদেরকে অধঃপতিত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন।[১] সুনামগঞ্জ শহরেও এরূপ জলসার ব্যবস্থা ছিল।

মোশায়েরা ব্যতীত আরবী ফার্সির চর্চাও এখানে প্রচুর হত। সুনামগঞ্জের এ সংস্কৃতি ধারায় লালিত হয়ে ভাতগাঁয়ের মৌলভী জিয়া উল্লাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক

১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সোনাঝরা দিনগুলো* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যাপক শেখ আলতাফ হোসেন আলীর 'মুশাদ্দদ' প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের মধ্যে তিনি একমাত্র এর জবাব দিয়েছিলেন।"[২]

সুনামগঞ্জের হিন্দুদের সংস্কৃতি একটি সুপ্রাচীন সংস্কৃতি। দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ-এর মতে : "সুনামগঞ্জের হিন্দু সমাজের সংস্কৃতি গড়ে উঠে শ্রীচৈতন্য দেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা থেকে। চৈতন্য দেবের জন্ম নবদ্বীপে হলেও তার পৈত্রিক নিবাস ছিল সিলেটের ঢাকা দক্ষিণে। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে নবদ্বীপ থেকে দেশান্তরে ভক্তগণসহ ভ্রমণ করলেও সিলেটের কোন কোন স্থানে তার ভক্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠে। এসব ভক্তদের মধ্যে লাউড়ের নবগ্রাম নিবাসী অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের অন্যতম প্রধান ছিলেন। শ্রী চৈতন্য জীবিত থাকাকালেই তিনি চৈতন্য পূজার প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেই চৈতন্য বিষয়ে পদ রচনার সূত্রপাত করেন। লাউড় নিবাসী ঈশান নাগর 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামে অদ্বৈত আচার্যের জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন।"[৩]

তার পুণ্য স্মৃতিবিজড়তি পণাতীর্থ বা পণাতীর্থ নামক স্থান লাউড়ে অবস্থিত। এখানে প্রতিবছর হিন্দুদের পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। এর কাছাকাছি স্থানে শাহ আরেফিন (রহ.)-এর মাজার অবস্থিত। স্থানটি বর্তমান ভারতের এলাকায়। তবুও মেলা উপলক্ষে মানুষজন ঐ মাজার জিয়ারতে যায়।

লোক-সংস্কৃতি ও ধর্মীয়-সংস্কৃতি ব্যতীত সুনামগঞ্জের হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে একটি সাধারণ সংস্কৃতির অভিন্ন সম্পর্ক পাওয়া যায়। তা হলো আবহমানকালের সংস্কৃতি। এতে রয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ- বেদনা-বিরহ গাঁথা, আনন্দানুষ্ঠান প্রভৃতি।

পল্লী সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য আউল, বাউল, পীর, ফকির, বৈষ্ণব দরবেশের রচনা খুঁজে পাওয়া যায়।

সিলেটের গণভোট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি গান রচিত হয়। এটি বৃহত্তর সিলেটের সর্বত্র জনপ্রিয় ছিল। এর রচয়িতা সুনামগঞ্জের পল্লীকবি হাবিব মিয়া। এখানে গ্রাম্য কবির নাগরিক অনুভূতি খুব সহজ ভাষায় বিধৃত হয়েছে।

> "আমরা তো আর আসামে থাকব না
> আসামের জুলুমের কথা, জীবন থাকতে ভুলব না
> ঘরবাড়ী কত ভাঙ্গিল
> পুড়ইয়া ছাই করিল (গো) ....

---

২. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৩. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *অতীত স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

না খাইয়া মানুষ মরিল, দুঃখে প্রাণ বাঁচে না
জুম্মা মসজিদের কথা
শুনলে লাগে প্রাণে ব্যাথা (গো)
ভাঙ্গল মসজিদ হাতি দিয়া, মসজিদের চিন রাখল না
সিলেটে আলখাছ মরিল
গুলিতে শহীদ হইল (গো)
শহীদি দরজা পাইল, পাইল সে বেহেস্তখানা।[৪] (সংক্ষিপ্ত)

কিচ্ছাগান এতদাঞ্চলের এক অতুলনীয় সম্পদ। গাজীর আশা (লোহার ত্রিশূল) গেড়ে এর নীচে পানির হাড়ি বসিয়ে ছবি টানিয়ে বন্দনার মাধ্যমে এ কেচ্ছামূলক গান গাওয়া হতো। আজকাল এগুলো আর দেখা যায় না। একটি কিচ্ছাগান নিম্নে তুলে ধরা হলো :

.... ও আমার মাগো তাপিনী মাগো জননী
(আল্লাহ), আমি যে মরিয়া যাইমু, এরে নাই মোর দায়
পাষাণ বুকে ঝুরিয়া মরবা গর্ভধারিনী মায় (গো জননী)
(আল্লাহ) উড়িয়া যাওরে পশু পাখী উড়িয়া যাওরে দূর
আমার খবর গিয়া দিও মোর মায়। (হুজুর গো জননী)
আল্লাহ এক পুত্র হইতে মায় যত কষ্ট পায়, সেই দুঃখ
কেউ না জানে কেবল যানে মায় (গো ... জননী)॥[৫]

আবাহমান কাল থেকেই নানা সংগীতের সুরে অনুরণিত এ অঞ্চলের আকাশ, বাতাস ও মাটি। গ্রাম প্রধান এ অঞ্চলের আনাচে কানাচে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য সংগীতের কথা ও সুর। সাহিত্য সৃষ্টির এ ধারা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আদিকালীন। যুগযুগ ধরে প্রবাহমান হয়ে এ অঞ্চলের মানব জমিনকে মুগ্ধ ও লালিত করে চিরকাল আকৃষ্ট করেছে এ অপরূপ সৃষ্টি শৈলী। আর এ ঐতিহ্য পড়ে আছে এখানকার মানুষের মন ও মননে।

এ জনপদের অধিবাসীদের পার্থিব, অ-পার্থিব, চিন্তা-চেতনা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মর্ম মূল থেকে উঠে আশা এ অমূল্য সম্পদ এ অঞ্চল তো বটেই, গোটা দেশেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

এ অঞ্চলের রয়েছে লোকসংগীতের অপূর্ব ভাণ্ডার যার ভেতর রয়েছে ধর্ম, ব্যবহারিক জীবন, পারিবারিক জীবন ও সমস্যা, প্রেমানুভূতি, আর্তি, হাস্য, কৌতুক, মিলন, বিরহ, আঞ্চলিক উৎসব

---

৪. সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান, কর্মপ্রেরণা ও ঋতু বৈচিত্র। এ নিয়েই এখানকার বাউল, মারফতী, মুর্শেদী, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, বিয়ের গান স্বকীয় সুরে হয়েছে মুখরিত ও ব্যাঞ্জনাময়।

লোকমুখে প্রচলিত গানগুলোকে সাধারণত লোকগান বা লোকসঙ্গীত বলা হয়। এসব গানের গীতিকারদের নাম-পরিচয় প্রায়ক্ষেত্রেই অজানা। তবে অধিকাংশ গীতিকার রয়েছেন, যারা নিরক্ষর হওয়ার কারণে তাদের রচিত গান কোনো পাণ্ডুলিপি আকারে রেখে যেতে পারেননি। গানপ্রিয় হাওরবাসীর মুখে মুখে এসব গান সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে। এসব গীতিকারদের রচিত গান সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই সংকলিত ও গ্রন্থিত করছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে এসব লোকগানের সুর ও কথার আদলে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই গান রচনা করছেন। গবেষকদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রবিশেষে সেসব গানও লোকগানের মর্যাদা পাচ্ছে।

লোকগানে নিপীড়িত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের কাহিনী ঠাঁই পেয়েছে। সমাজে নিম্নবর্গীয় হিসেবে পরিচিত এসব মানুষের প্রেম-ভালোবাসা-অনুভূতিকে ধারণ করে রেখেছে লোকগান। সহজ-সরল-প্রাঞ্জল ভাষায় এসব গানের পঙ্‌ক্তি রচিত হওয়ায় তা সহজেই নিরক্ষর নিম্নবর্গীয় সমাজের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর ফলে যুগ যুগ ধরে লোকসংগীতের আবেদন গ্রামীণ মানুষের কাছে অনন্য বিশিষ্টতা পেয়ে আসছে। এ গান গাওয়ার জন্য শিল্পীকে গুরুর কাছে কোনো তালিম নিতে হয় না। অনেকটা ঐতিহ্য পরম্পরায় মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালাদের কাছ থেকে এসব গানের সুর, তাল ও লয় শেখেন হাওরের মানুষেরা। অনেকটা দেখে দেখে শেখা–এমনটাই বলা যেতে পারে। এসব গানের ভাষাগত দুর্বলতা কিংবা ছন্দজ্ঞান কখনোই হাওরবাসীর কাছে প্রতিবন্ধকতা রূপে গণ্য হয় না, কেবল সঠিক সুর এবং বিনোদনপ্রিয় কি না সেটাই হাওরবাসী যাচাই করে নেন। হাওরবাসীর নিজেদের জীবনযাপন ও রীতিনীতিগুলোই এসব লোকগানে প্রাধান্য পাওয়ায় এসব গানের আলাদা কদর তৈরি হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলার লোকসংগীতের মধ্যে বাউলগান একটি সমৃদ্ধ ধারা ধরে রেখেছে। হাছন রাজা, শাহ আবদুল করিম, দুর্বিন শাহ, কারী আমিরউদ্দিন, শফিকুন নূর, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, কফিলউদ্দিন সরকার, রোহী ঠাকুরসহ অনেকেই গান রচনা করে এ জেলার বাউলগানকে অনন্য মর্যাদায় উদ্ভাসিত করেছেন। এছাড়া লোকগানের প্রচার ও প্রসারে প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, রামকানাই দাশ, সুষমা দাশ, চন্দ্রাবতী রায়বর্মণদের অবদানও নিছক কম নয়। বাউল গানের বাইরে নানা ধরনের মেয়েলি গীত, বারোমাসি, জারিগান, ধামাইল গান, ভাটিয়ালি, কীর্তন ও বিচ্ছেদ গান সুনামগঞ্জের লোক সংগীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাউল গান

বাংলা লোকসংগীতের প্রধান ধারা হচ্ছে বাউল গান। সুনামগঞ্জে এ ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ইতিমধ্যে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের বাউলদের দেশের অপরাপর অঞ্চল যেমন- কুষ্টিয়া, রাজশাহী, মেহেরপুর এসব জেলার বাউল ঘরনার সাধকদের সঙ্গে ব্যাপক বৈসাদৃশ্যতা রয়েছে। তবে সুনামগঞ্জের পার্শ্ববর্তী সিলেট, নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউলদের সঙ্গে এ জেলার বাউলদের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের বাউলেরা কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলদের মতো ভেক/খিলাফত নেন না। এঁরা সংসারে থেকেও সংসারবিরাগী মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। সুনামগঞ্জের বাউলধারার সাধকেরা মুর্শিদ ধরে বাউল সাধনায় প্রবেশ করেন। যদিও কুষ্টিয়া অঞ্চলের লালনপন্থী সাধকদের মতোই এ অঞ্চলেও মানুষ ভজনার দর্শনেই বাউলেরা বিশ্বাস করেন। কেবল আচরণিক কিছু ভিন্নতা ছাড়া মূল দর্শনের কোনো ফারাক এঁদের মধ্যে নেই। কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক সাধকের লেখা গানের সন্ধান পাওয়া গেলেও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বাউলদের গান লেখার প্রবণতা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। এখানকার অধিকাংশ বাউলেরা দেহতত্ত্ব, মুর্শিদ, গুরু বন্দনা, আত্মতত্ত্ব, কামতত্ত্ব, নিগূঢ়তত্ত্বসহ নানা ধরনের বাউল গান রচনা করেছেন। এসব গানে এ অঞ্চলের বাউলদের দর্শন ও চিন্তা-চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি বাউল গান উদ্ধৃত করা হলো :

১.

আইস হাছন রাজা এই তোর ঘরবাড়ি রে।
হাছন জানে ডাকতে আছে, তাড়াতাড়ি রে ॥
তোমার ঘর তোমার বাড়ি, তোমার বাগিচা
যে দেখিল সত্য দেখছে যে না দেখছে মিছা ॥
বাগিচায় বানাইছ, ফুল টঙ্গি ঘর।
সে ঘরে বসিয়া আমি ডাকি নিরন্তর ॥
খিড়কি দিয়া দেখি আমি বাগিচার মাঝে
দেখিয়া রঙের ঝলক, মন মোর মজে ॥
হাছন জানে বলে দেখিয়া, রূপের ছটক।
চিরকালের জন্যে মন মোর, হইল আটক ॥[৬]

৬. অমিয় অনকর চৌধুরী, *হাছন রাজার সঙ্গীতমালা*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

২.

আপন সাধন আমার হইল না।
আমার পাগলা মনে কি বুঝিল, আপন সাধন কইল না ॥
আমার মাঝে কোন জন, তাঁরে খুঁজল না।
ঠাকুরচাঁন্দ যে ঘরের মাঝে তারে চেয়ে দেখল না ॥
ঘরে থাকতে ধরো তাঁরে, গেলে পাবে না।
গেলে পরে সে যে আর, ফিরিয়া আসবে না ॥
কি বুঝিয়া বসিয়া রইলে, কেন ধরো না।
ঘর থাকিয়া বাহির হইলে খুঁজিয়া পাবে না ॥
বুড়া হইলায় হাছন রাজা, তেও কি বুঝ না।
ঘরে থাকতে ঠাকুর ধরো ছাড়িয়া দিও না ॥[৭]

৩.

আমি আছি আমার মাঝে
আমি করি আমার খবর
আমি থাকলে সোনার সংসার।
আমি গেলে শূন্য বাসর ॥
এ জগতে আমি মূল
এছাড়া মিটে না গেল
আমি বৃক্ষ আমি ফুল
আমি মধু আমি ভ্রমর ॥
আমি আঁধার আমি আলোক
আমি আশেক আমি মাশুক
যে বোঝে না সে বুঝুক
কেবা আপন কেবা রে পর ॥
আমি আছি আমার বেশে

৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বসত করি মাটির দেশে
আমি আমায় ভালোবেসে
বাতাসে বাঁধিয়াছি ঘর ॥
বসে আছি আপন ঘরে
খুঁজতে যাই না অন্য কারে
করিম বলে মরা মরে
আমি নিত্য আমি অমর ॥[৮]

৪.

ভবের জনম বিফল গেল
মিটল না প্রেমপিপাসা
ভালো-মন্দের ধার ধারি না।
লোকে বলে কুলনাশা ॥
মন চলে না ধর্মপথে
পারলাম না স্বভাব নিতে
কাম ক্রোধ লোভ হিংসাতে
মন হয়েছে বেদিশা ॥
মুর্শিদ চান্দের প্রেমবাজারে
যে জনে মাল খরিদ করে
থাকে না সে অন্ধকারে
পূর্ণ হয় মনের আশা ॥[৯]

৫.

আগে জানো আহাদের খবর
আলিফ লাম মীম আহাদ নুরী
করছে খেলা তিন অক্ষরে ॥

৮. শুভেন্দু ইমাম, শাহ আব্দুল করিম রচনাসমগ্র (সিলেট : বইপত্র, মে ২০০৯), পৃ. ৩৩
৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আলিফেতে লাম মিশাইয়া
মীমেতে মায়া লাগায়া রে
আহাদে ইছিম হইয়া দেখাইতেছে করে মক্কর ॥
প্রথমে আহাদ ছিল
ইছিমে মিলিয়া গেল রে
চার অক্ষরে যোগ ধরিল জানতায় নিরন্তর ॥
আলিফেতে আল্লা ছিলা
'হা' শব্দের নুর সৃজন করলা রে
দালেতে দুনিয়া হলো করিয়া দিল পসর ॥
ইয়াতে ইয়াদ করিয়া
ছিনেতে দিলেন ছাকিয়া রে
মীমেতে মায়া লাগাইয়া সৃজিয়াছেন আদম শহর ॥
আলিফেতে খেলা খেলিয়া
লামেতে গেলা মিশিয়া রে
তার ভিতরে মায়া হলো দুর্বিন শাহ কয় মীম অক্ষর ॥[১০]

মেয়েলি গীত

বাংলা লোকসংগীতের চিরায়ত ঐতিহ্যটুকু ব্যাপকভাবে ধারণ করে রয়েছে মেয়েলি গীত। হাওরাঞ্চলের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ধারা সম্ভবত এটিই। রাতের পর রাত নানা উৎসব-পার্বণকে উপলক্ষ করে নারীরা মেয়েলি গীত পরিবেশন করে আচ্ছন্ন করে রাখেন সবাইকে। এখানে পুরুষদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। বিয়ে, ব্রতসহ নানা সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-উৎসব নিয়ে অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর উপস্থাপনা এই মেয়েলি গীতের উপজীব্য। অনেকে এসব গানকে বৈঠকি গানও বলে থাকেন। গবেষকদের ধারণা, বৈঠকের আবহে এসব গান গীত হয়ে থাকেই বলে 'বৈঠকী গান' নামকরণ করা হয়েছে। মুসলিম ধর্মালম্বীরা যখন মেয়েলি গীত পরিবেশন করেন, তখন কোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায় না। তবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মেয়েলি গীত পরিবেশনের সময় ঢোল,

১০. শামসুজ্জামান খান, সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা সুনামগঞ্জ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, এপ্রিল, ২০১৪), পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

করতালসহ বিভিন্ন দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। তবে কোনো কোনো গীতের ক্ষেত্রে হিন্দু-ধর্মাবলম্বীরাও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন না। মুসলিম সমাজে মেয়েলি গীতের মধ্যে বিয়ের গানই সবচেয়ে বেশি পরিবেশিত হয়। হলদি্ তোলা, বাটা, বরকনে সাজানো, বর বরণ, বর-কন্যা বিদায়, পাশা খেলা, বাসি গেসাল, পানচিনি, মেহেদি তোলা, পান খিলি, পানিভরা, বরণ ডালা সহ বিয়ের বিভিন্ন পর্বে গীত পরিবেশিত হয়। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের নারীদের পরিবেশিত এ ধরনের কিছু মেয়েলি গীত নিম্নরূপ :

১

আরি পরি নগরবাসী দেখো গো আসিয়া
নয়া দামান আইছইন দেখো পালকি চড়িয়া ॥
কন্যারে গোসল করাও হলুদ সাবান দিয়া
মেন্দি হাতে সুরমা চোখে সাজাও শাড়ি দিয়া ॥
জারি আর মাখাইন গায়ে হাতে তালি দিয়া
ঝারবাতি জ্বালাইন কত লাগছে রসের বিয়া ॥
দামান কন্যা বিদায় হইলা সুয়ারী পালকি চড়িয়া
চিকন গলায় কান্দইন কন্যায় মাইজি মাইজি কইয়া ॥

২.

দামান্দের ভাগ্য ভালা দেখো গো আসিয়া
বিদ্যান কন্যা আনছইন ঘরে বিয়া করিয়া ॥
কন্যায় করইন বিদ্যাঅর্জন সকলে বুঝাইয়া
লেখাপড়া শিখাইন কন্যা কলম ধরিয়া ॥
শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করইন মনযোগী হইয়া
জামাইর খেদমত করইন কন্যায় নীরবে বইয়া ॥
কন্যার তারিফ করইন সবে গ্রাম জুড়িয়া
বাপের বাড়ি যাইন কন্যা জামাইরে সাথে নিয়া ॥

Dhaka University Institutional Repository

৩.

কন্যার লাগি আনছইন দামান রঙিলা শাড়ি
কানের আনছইন কান পাশা হাতের লাগি চুড়ি ॥
নাকের নোলক গলার হার আনছইন আঙ্গুরী।
মনের মতো সাজাও কন্যা পরিস্থানের পরী ॥
কন্যার লাগি মাটির কলসি বসিবার আনছইন পিড়ি
বিরুইন ভাতর লাগি আনছইন ঘাইয়াড়ী ॥
কাঁথা বালিশ দিছইন আর নলের একখান চাটি
হাঁস মুরগি দিছইন আর বাড়াইবার লাগি ॥

৪.

সাজাও গো সজনী, গিরিরাজ নন্দিনী
বান্ধ গো বিনোদ বেণী।
এগো সিঁথির উপরে, ঝলকে সিন্দুরে
কাজল পরাও গো ধ্বনি ॥
কর্ণের কুণ্ডলে, কি সুন্দর দোলে
গলায় মোহন মালা, হাতে স্বর্ণ চুড়ি, আহা মরি মরি
শঙ্খ পরাইয়া দিলা ॥
সেমিজ আনিয়া, যতনে পরাইয়া
তাহার উপরে শাড়ি আলতা চরণে, দিলা সখিগণে
মধু কয় কি শোভে হেরি ॥

৫.

বড়ো ভাবি কই গো মেজ ভাবি আনো গো।
ছোটো ভাবিএ পিষইন মেন্দি মিহিন করিয়া গো ॥
মাস্টার ভাবি কই গো বাহির হইয়া আসো গো।
দাদা দাদিরে সালাম আগে তোমরা করাও গো ॥

Dhaka University Institutional Repository

মা আর বাবারে গো সালাম করাইও গো।
মেন্দি হাতে দিও তোমরা আল্লার নামটি লইয়া গো ॥
আরি আর পরিরে গো আনিয়া বসাইও গো।
সকলে মিলিয়া তোরা বিয়ার গান গাইও গো ॥[১১]

বারোমাসি

হাওরাঞ্চলে প্রচলিত লোকগানের মধ্যে বারোমাসির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা বছরের প্রতিটি মাসের নামোল্লেখপূর্বক ঋতু বৈচিত্র্যের মাহাত্ম্যের সঙ্গে প্রিয়তমের গুণকীর্তন এবং বন্দনাসূচক গানগুলোই 'বারোমাসি' গান হিসেবে সুপরিচিত। তবে নারী হৃদয়ের আর্তিই এ গানের মূল বিষয়বস্তু। সেই মধ্যযুগে যেমনভাবে বারমাসী গানের প্রচলন ছিল, তেমনি বর্তমান সময়ে এসেও এ গানের জনপ্রিয়তা মোটেই হ্রাস পায়নি। লিখিত ও মৌখিক উভয় সাহিত্যেই বারোমাসী গান জনপ্রিয়। সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার নোয়ারাই গ্রামের বাসিন্দা দুর্বিন শাহ ও শিবনগর গ্রামের বাসিন্দা গিয়াস উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০০৫) বারোমাসি গানের রচয়িতা হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেয়েছেন। দু'জনের লেখা দু'টি বারোমাসি গান নিম্নরূপ :

১.

কুল গেল কলঙ্ক রইল ওলো সহচরী
যৌবন সময় প্রাণের বন্ধু হলো দেশান্তরী রে
কলঙ্কিনী যার লাগি ॥
যৌবন সময় প্রাণের বন্ধু যদি গেল ছাড়ি
আমারই যৌবন সাগরে কে দিবে আর পাড়ি
কালবৈশাখে ফুটল গাছে নানান জাতের ফুল
নতুন মাসে বন্ধুর আশে মন হইল আকুল ॥
আইল জ্যৈষ্ঠ কত কষ্ট বন্ধুহারা হইয়া
নতুন ফুলের টাটকা মধু কারে দেই সঁপিয়া
ভ্রমর হইয়া আসত যদি বন্ধু কালাচান

১১. ১-৫ ক্রমিকে উল্লেখিত মেয়েলী গীত বা বিয়ের গানের নির্দিষ্ট কোন রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। এ সব গীত সুনামগঞ্জের মানুষের মুখে মুখে শুনা যায়। গীতগুলো লোকজ সংস্কৃতি, গ্রন্থমেলা, সুনামগঞ্জ, নন্দলাল শর্মা রচিত *লোক সংস্কৃতি : সিলেট প্রেক্ষিত* (২০০৯) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

আদরে ফুলের মধু সদায় করত পান ॥

আষাঢ় মাসে নদী ভাসে নির্ঝরের জলে
কূল ভাসিয়া নদীর স্রোত অতি বেগে চলে
আমারই যৌবনের স্রোত চলছে অবিশ্রাম
কে আসি খেলিবে সাঁতার ঘরে নাই মোর শ্যাম ॥
আইল শ্রাবণ নতুন যৌবন বারিষা চঞ্চল
যৌবন নদী হলো বাসী করে টলমল
আমারই যৌবন সাগরে দিল না কেউ পারি
বন্ধু বিনে কে হবে মোর যৌবনের বেপারি ॥
ভাদ্র মাসে ছড়া আসে বাড়ির গুয়া গাছে
স্বামী হারা হইয়া নারী আর কতদিন বাঁচে
পন্থপানে চাইয়া রইলাম নারী অভাগিনী
যাইতে নারী তার উদ্দেশ্যে বাদী ননদিনী ॥
ভাদ্র গেল আশ্বিন আইল বারিষা হলো শেষ
আমি রইলাম আসার আশে শ্যাম রইল বিদেশ
যৌবন নিশি প্রভাত হইল বন্ধু না আসিল
অভাগিনীর মনের দুঃখ মনেতে রহিল ॥
আশ্বিন গেল কার্তিক আইল নদী গেল শুকাইয়া
আর কি শ্যাম আসিবে দেশে ভরা নদী বাইয়া

আমি অবলা নারীর আশায় পড়ল ছাই
এ নব যৌবন আমি আর কারে বিলাই ॥
অগ্রহায়ণ মাসে সবে হাসে মাঠে পাকে ধান
গৃহস্থ ভাই ধানের গুলা করতেছে নির্মাণ
আমি অবলা নারী রইলাম আসার আশে
কার জন্যে সাজাইলাম শয্যা বন্ধু নাই মোর দেশে ॥
পৌষ মাসে দারুণ উষে করল অন্ধকার
দুঃখেরই উপরে দুঃখ কত সইব আর

Dhaka University Institutional Repository

গাছেতে কমলা পাকে কত লোক খায়
আমারই যৌবন কমলা ডালেতে শুকায় ॥
পৌষ গেল মাঘ আসিল শীতের বড়ো ভয়
সহায় সম্বল তার পতি যার সদয়
আমি অবলা নারীর অসার জীবন
প্রাণবন্ধু পাইলে তারে করতাম আলিঙ্গন ॥
ফাল্গুন মাসে ডালে বসে কোকিল করে রাও
ডাকিও না রে প্রাণের কোকিল আমার মাথা খাও
যায় বসন্ত প্রাণকান্ত নাইরে আমার দেশে
দায় হইল মোর প্রাণী রাখা শীতল বাতাসে ॥
আইল চৈত্র কালবসন্ত যাবে রে ফুরাইয়া
যৌবন লীলা সাঙ্গ হলো বন্ধু রে না পাইয়া
কয় দুর্বিন শাহ কেন্দে কেন্দে গেল বারমাস
যাইতে হলো ছেড়ে দিয়া, দিয়া বিদেশের প্রবাস ॥

২.

প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে, কান্দে আমার হিয়া
দেশের বন্ধু বিদেশ গেল, আমায় পাশরিয়ারে ॥
প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥
অভাগিনীর কপাল দোষে, আইল বৈশাখি মাস
অভাগিয়ার শাক-নালিতা, দিতাম কারো মুখেরে
প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥
বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ আইল, গাছে পাকা আম
কারো মুখে রস লাগাইতাম, ঘরে নাই মোর শ্যামরে
প্রাণ কান্দে মন কান্দেরে ॥
জ্যৈষ্ঠ গেল আষাঢ় আইল, ভরা নদী নালা
যৌবন তরঙ্গ ভারী, সয় না প্রেম জ্বালারে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥

আষাঢ় গেল শাওন আইল, না পুরিল আশা
না আসিল প্রাণবন্ধু গেল বারো মাসরে
প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥
মইরা গেলে বন্ধু আইলে, কেন্দে কয় গিয়াস
তার চরণে রাইখা দিও, আমার মরা লাশরে
প্রাণ কান্দে মনো কান্দেরে ॥[১২]

ভাটিয়ালি

হাওরাঞ্চলের সাধারণ কৃষক, মাঝি, জেলের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নিয়ে রচিত প্রেম ও বিচ্ছেদমূলক কিছু লোকসংগীত ভাটিয়ালি গান হিসেবে পরিচিত। সাধারণত নৌকা বাইতে, ধান রোপন করতে কিংবা অবসরে এসব গান সাধারণ মানুষের মুখে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে অবসরকালীন এসব গান গীত হওয়ার সময় অনেকে সারিন্দা ও বেহালার ব্যবহারও করে থাকেন। সুনামগঞ্জ অঞ্চলে লোকসংগীতের একটি জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ ধারা হচ্ছে ভাটিয়ালি পর্যায়ের গান। এ ধরনের কিছু সংগৃহীত গান নিম্নরূপ :

১

ওরে দূর বিদেশি নাইয়া যাওরে তরী বাইয়া
বুক ভরা দুঃখ রইল আমার অন্তরায় গাঁথিয়া ॥
বাবারে কইও মাঝি নাইওর নিতা আইয়া
আর কতদিন থাকতাম আমার মনরে বুঝাইয়া ॥
আসবে বাবা নিবে নাইওর থাকি আশায় চাইয়া
কলসি নিয়া নদীর ঘাটে কাঁদি আমি বইয়া ॥
পাখি যদি হইতাম আমি যাইতাম উড়িয়া
জনম মাটি দেইখা আমার কলিজা ঠাণ্ডা হইত গিয়া ॥
আমার কথা রাইখ স্মরণ যাইও না ভুলিয়া
আবদুল আজিজে কয় বাবা আইলে দিব তোরে সাজাইয়া ॥

---

১২. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *গিয়াসউদ্দিন গীত সম্ভার* (সিলেট : গিয়াস গীতি প্রকাশনা পর্ষদ, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৩৭

২.
সুরমা নদীর জলে নৌকা বাওরে মাঝি ভাই
অভাগিনীর খবর কইও ঘাটে নাও লাগাই ॥
সুরমা নদীর তীরে আমি ঘরবাড়ি বানাই
বাবারে কইও খবর নাইওর নিতা ভাই ॥
বাবার বাড়ির আম কাঁঠাল দুধের সীমা নাই
গুয়া নারিকেল সারি সারি তোমাকে জানাই ॥
হেমন্ত গেল, বর্ষা আইল পথপানে চাই
আবদুল আজিজ কয় চোখের জলে কেঁদে বুক ভাসাই ॥[১৩]

মাজারের গান

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে হযরত শাহজালাল ও হযরত শাহপরাণসহ ৩৬০ আউলিয়ার মাজার রয়েছে। এর বাইরে অনেক পীর-ফকিরের আস্তানা/কবর ঘিরেও রয়েছে অসংখ্য মাজার। এসব মাজারে প্রায় নিয়মিতভাবে বিশেষ করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে এ অঞ্চলের সাধু-সন্ত-বাউল-ফকিরেরা গানের চর্চা করে আসছেন। মাজারকেন্দ্রিক রচিত হচ্ছে অসংখ্য গান। এসব গানে পীর-নবী-আউলিয়া-মুর্শিদের বন্দনার পাশাপাশি বিচ্ছেদ, নিগূঢ়তত্ত্ব ও দেহতত্ত্বেরও নানা গান পরিবেশিত হয়। মাজারকেন্দ্রিক সুনামগঞ্জ অঞ্চলের গীতিকারদের লেখা প্রচলিত কিছু গান নিম্নরূপ :

১.
আমি নবীর প্রেমে দেওয়ানা আমায় লইয়া যাওরে সোনার মদিনা
মদিনারই সুগন্ধ বাতাস যা অঙ্গে লাগিল সইগো
পুরল মনের আশা।
আমি দোষী কুলবিনাশী আমার অঙ্গে লাগল না ॥
মদিনারই মূল অধিকারী মুহম্মদ মোস্তফা নবী
ভবের কাণ্ডারী
তান ঐ যুগলচরণ দু নয়নে লাগল না ॥
মদিনারই রওজা গো শরিফ, শিয়রে বসিয়া কান্দে যতেক মোমিন।
মনিরের দিন গেল বিফলে পুরল না মনের আশা ॥

১৩. মাইন উদ্দিন খন্দকার, ভাটি এলাকার লোক সংস্কৃতির এক খণ্ড চিত্র (সিলেট : স্বজন, সেপ্টেম্বর ১৯৯১), পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

২.

থাকেন নবী মদিনাতে আমি কেমন করে যাইগো
অন্তিম কালে চরণ যেন পাই।
যে যাইবায় মদিনার স্বরে, নবীজির পাক রওজায় যাইয়ে
কইও গুনাগার মনিরের সালাম গো।
চারই খলিফা তান বিবিগনা সহিদান
আমার সালাম কইও হাসান হুসাইন বিবি ফাতেমায় গো।
তবেইন তবে তাবিন আর যত আছেন মোমিন
আমার সালাম কইও যত মদিনার নিবাসী গো।
মদিনার নিবাসীগণ সদায় আনন্দ মন
যে জায়গায় মৌলার রহমতেরই হয় বরিশন গো।
মনিরের মন বেহুইন হাউসে রঙ্গে গেল দিন
নবীর পাইলে চরণ দিবা মুক্তি পান গো ॥

৩.

আচ্ছালামু আলাইকুম
মোমিন পড় হে কালাম
রাসুলুল্লার পাক জুনাবে আমার হাজার সালাম ॥
হাসান, হোসেন, হজরত আলী, মা ফাতেমা যার
ওই সবার জুনাবে আমার হাজারো সালাম ॥
চিশতিয়া, কাদারিয়া, নশবন, মজদ্দদিয়া আর
ওই চারি তরিকার পিরের, আমার হাজারো সালাম ॥
সালাম করা সুন্নত ভাইরে, আলেক দেওয়া ফরজ
বয়ান করিয়া কইছেন নবীজি, হাদিসে খবর ॥
আল্লাতালার পাক জাতে, যত আশিকগণ
সবাইকে জানাইন সালাম মনিরও অধম ॥[১৪]

---

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯, ৪২

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক গান

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলেই উপভাষা রয়েছে। আঞ্চলিক উচ্চারণে প্রায় সব জায়গার মানুষেরা কথা বলে থাকেন। এমনকি নানা সাহিত্যও রচিত হচ্ছে কেবল আঞ্চলিক ভাষায়। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের নাম না-জানা অনেক গীতিকারেরা আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনা করেছেন। হালেও অনেক গীতিকারেরা লোকগানের আদলে আঞ্চলিক গান রচনা করেছেন। সেসব কিছু গান নিম্নরূপ :

১.

আমার ধানে হয় না খৈ
এক ছটাক ধান ভাজিয়া সাত টাইল ভইরা থৈ।
লাউড়ের পাড়ে হাল জুড়ছিলাম
সাগরে দিলাম মই
সংসার জুইরা বীজ বুনিলাম নিকাশ পাইতাম কই।
খলই দিয়া গাই খিরাইলাম বস্তা ভইরা দই
জীবন ভরা মাটা পাক দিয়া ঘি পাইলাম না সই।
সংসার জুইড়া হাল জুরিলাম আওজ লইলাম কই।
পাগা ছিইড়া দামা গেল বাদে আওজ লই
গাছ বড় না বীজ বড় বিচার করো সই
গাছে বীজ বীজে গাছ কালাশায় কই।

২.

ওগো দিলবর আলীর মামী
কার লাগি ছিরা কুটো তুমি।
হিদিন কইলায় আমার গেছে বাড়িত নায় তোমার স্বামী।
মনের ঘাইল পবনের ছিয়া আসলে খুব দামী
বখাইর মায় চিরা কুটইন ডাকাইয়া ধুমধুমি
আমির উদ্দিন কয় গো মামী হইয়াছি বদনামী।
ছিয়া ঘাইল ধান তইয়া কুটার শেষ পাইলাম না আমি।

Dhaka University Institutional Repository

৩.

দেউড়ির মাঝে লাঙল তইলাম অনে পাই না কেনে

কওচাই কিতা কয় মোর মনে।

গত মঙ্গলবারে ঔলা নিছিল গি কোদাল

আইজ নিছেগি লাঙল আমার কাইল নিবগি জোয়াল

আনা জিকাইয়া লইয়া যায়গি মানেনি পরণে ॥

লাঙল যদি না পাই আমি কিলা বাইমু আল

হুনিয়াও চুরে মাতে না অইগেছেগি কাল

রাইত থাকিতে গরু লইয়া পুয়া গেছে জমিনে ॥

পরতি বইচ্ছর ক্ষেত করি ইতা আমি জানি

দুইদিন বাদে পুকাইজিবগি জমিনর হকল পানি

দরকার আছিল নিত পরিত কইয়া নেয় না কেনে

বলে আমির উদ্দিনে ॥

৪.

এবোতরি স্বভাবখান তোর ভাল করবা

তওবা তিল্লা কইরা এবো ভালা মাইনসর সঙ্গ ধর ॥

বুইঝ্যা হুইন্যা চিন্তা করি ছাড়ি দে তোর তকব্বরী

ভালা নায় অহংকারী মনটারে পরিষ্কার কর ॥

ধান্ধাবাজি মিছা কথা বকাবকি সব অযথা

যার মাঝে নাই মমতা শয়তান লাইয়া দেয় চক্কর ॥

কয় উদাসী মকদ্দসে সুশিক্ষা শ্রীগুরুর কাছে

ভালোমানুষ যারা আছে চিন্তা করে নিরুত্তর ॥

৫.

লন্ডনী স্বামী আমার লন্ডনী স্বামী।

সিলেটেতে লইয়া ওগো যাইবায়নি তুমি ॥

বাক্কা কয়েক দিন পরে, দেশের মাটিত আইলায় ফিরে,

মানুষে কইন তোমারে বড়ই নামী ॥

Dhaka University Institutional Repository

হুনছি সিলেট বাবার মাঝার, পুস্কুনীতে আছে গজার,
মানুষ দৈনিক হাজার হাজার, দেখলাম না আমি ॥
ঝরনার পানি যে জনে খায়, যে কোনো রোগ কমিয়া যায়,
সোনার কই মাগুর দেখা যায় দেখলাম না আমি ॥
চল একদিন মোরে লইয়া, একবারতা আনো দেখাইয়া,
নাইলে ভাইসাবরে লইয়া যাইমুগি আমি ॥[১৫]

বিচ্ছেদ গান

বিচ্ছেদ গান বাংলা লোকগানের বিশাল অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। হাওরাঞ্চলের কর্মক্লান্ত মানুষ দিনমান পরিশ্রম শেষে যখন বাড়িতে ফেরেন, তখন অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য বিভিন্ন গানের আসরের আয়োজন করে থাকেন। এ আসরের মধ্যে বিচ্ছেদ গানের আয়োজনও থাকে। এসব গান শুনতে শুনতে হাওরের মানুষের অনেকেই ফেলে আসা প্রেমের স্মৃতি কিংবা সামান্য সময়ের জন্য প্রেমে পড়া মুহূর্তের স্মৃতিচারণা করে আকণ্ঠ বিচ্ছেদে নিমজ্জিত থাকেন। আসরে গায়কদের বিরহী সুর বিচ্ছেদপ্রিয় মানুষের বুকে তোলপাড় করা ঝড় ওঠে। হাওরে প্রচলিত এ ধরনের কিছু বিচ্ছেদ গান নিম্নরূপ :

১.

কোনদিন পোহাইবেরে আমার দুঃখের রজনী
ফুলেতে সাজাইয়া শয্যা, ধারে বয় চোখের পানি ॥
রাত্রের প্রথম প্রহরে
দাঁড়াইয়া রহিলাম আমি, ঘরের দুয়ারে
প্রাণবন্ধু রইলে বাহিরে, কেউ দেখে ফেলে কি জানি ॥
দ্বিতীয় প্রহর যায়
তমালের ডালে বইয়া, ডাকে কোকিলায়
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বালায়, নিদারুণ কুহু ধ্বনি ॥
রাত্রের তৃতীয় প্রহরে
হয়তো আসবে প্রাণবন্ধু, আমার বাসরে

১৫. *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা সুনামগঞ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ফুল চন্দন ছিটাইলাম ঘরে, হয়তো আসবে এখনি ॥
রাত্রের শেষ প্রহরে
আইসা ছিল প্রাণবন্ধু, আমার দুয়ারে
গিয়াস রইলে ঘুমো ঘোরে, হারাইলে পরশমণি ॥

২.

তুমি কই যাও পরানের বন্ধু আমায় ছাড়িয়া
তুমি গেলে অভাগিনী যাব মরিয়া ॥
যেথায় যাবে মোরে নিবে সঙ্গে করিয়া
নইলে আমি প্রাণ ত্যাজিব গরল বিষ খাইয়া ॥
আমার নবযৌবন রাখছি তোমার সেবার লাগিয়া
মধুতে বিষ ঢেলে দিল কে বাদী হইয়া ॥
সোনার যৌবন রূপের কিরণ, যায় ভাটা দিয়া
কফিলউদ্দিন থাকবে সেবার দাসী হইয়া ॥

৩.

প্রাণসখিরে প্রেম জ্বালায় আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া
বন্ধু বিনে বৃন্দাবনে কেমনে রই বাঁচিয়ারে ॥
আষাঢ় বরিষার পানিরে যায় বাড়ির পিছন দিয়া
আইল না আইল না রে আমার রসিক সুজন নাইয়ারে ॥
সাথী হারা পাখীর মতোরে সখি ফিরতেছি উড়িয়া
আমার জোড়া নাইরে দেশে, দুঃখে ফাটে হিয়ারে ॥
কফিলউদ্দিন আর কত দিনেরে সখি থাকবে জ্বালা সইয়া
মনে লয় মোর প্রাণ ত্যাজিব বুকে ছুরি দিয়ারে ॥

৪.

আমি যারে ভালোবাসি তারে যদি নাহি পাই
কারে দেখি তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণনাথ বন্ধুয়ার সনে, প্রেম করেছিলাম গোপনে
আমি জানি বন্ধে জানে, কী কইয়া কী করল তাই ॥
পিরিতিকালে বলেছিলে, ভুলবে না জীবনে
কী দোষে ছাড়িয়া গেলে, কুল মানে দিল ছাই ॥
বলে ফকির সমছুলে, কুল ছেড়ে ভাসলাম অকূলে
মরণকালে চরণতলে আমারেনি দিবে ঠাঁই ॥

৫.

আমি পাইলাম না উদ্দেশ্যে
কার কুঞ্জে রইল বন্ধু না জানি কোন দেশে ॥
সুখে কিংবা দুঃখে থাকো ধরো কোন বা বেশ
সুখে থাকো এই কামনা চাই না সুখের লেশ
আমি পাইলাম না উদ্দেশ্যে ॥
তুমি আমার জীবন যৌবন তুমি মাথার কেশ
শূন্যে গৃহে থাকার চেয়েও মরণ আমার বেশ
আমি পাইলাম না উদ্দেশ্যে ॥
নির্দয়া হইয়া প্রাণবন্ধুর মারলাম সাপের ন্যাছ
আলম শাহরে প্রেমের বিষে সর্ব অঙ্গ শেষ
আমি পাইলাম না উদ্দেশ্যে ॥[১৬]

গাজির গীত

সুনামগঞ্জে লোকসংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে গাজির গীত। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর আগে গাজির গীতের ব্যাপক প্রচলন এ অঞ্চলে ছিল। এখন কালেভদ্রে গাজির গীত পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা নানা পেশায় নিজেদের মনোনিবেশ করে ফেলায় গানের সমৃদ্ধ এ ধারাটা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে ঠেকেছে। নৃত্যসহযোগে এ গান পরিবেশিত হয়। গাজির গান নিয়ে নানা ধরনের পালাও রচিত হয়েছে। গাজির গীত মূলত মুসলমানেরা পরিবেশন করতেন, তবে হিন্দু বাড়িতেও এসব গান পরিবেশনের প্রবেশাধিকার ছিল। হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছিল গাজির

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

গানে। এ কারণে অনেকটা অসাম্প্রদায়িক এ ধারাটির একটা আলাদা মূল্যও ছিল সমাজ-সংস্কৃতিতে। কিছু সংগৃহীত গাজির গীত নিম্নরূপ :

১. ও নাতিন কামাই করলে জামাই পাইবায় ভালা।

২. ধমধমাইয়া হাটে নারী চউখ পাকাইয়া চায়।

৩. নন্দঘোষে যা, কালু ঘোষের ঝি
কাইন্দা কাইটা ঘর ভাসাইল
গাজি বলবে কি?

৪. আল্লা আল্লা বলো ভাইরে হরি হরি বলো
ভেদ ভাও ছাড়ি ভাইসব একই পথে চল।[১৭]

দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্ব

দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্ব সাধারণত বাউল গানের পর্যায়ভুক্ত হলেও অধিকাংশ গীতিকারেরা রয়েছেন যাঁরা কেবল দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্বকেন্দ্রিক গানই রচনা করেছেন। এর ফলে এসব গানও বাংলা লোকগানকে দারুণভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এ ধারার গান রচনাকারী সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার সাকিতপুর গ্রামের আবদুন নুর মাস্টার (১৯৩৭-১৯৯৭), জগন্নাথপুর উপজেলার বাসিন্দা আবদুস সাত্তার, দিরাই পৌরসভার মজলিশপুর এলাকার বাসিন্দা বশিরউদ্দিন সরকার (১৯৬৪), সাকিতপুর গ্রামের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম রানার (১৯৭৫) লেখা কিছু সংগৃহীত দেহতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্ব গান নিম্নরূপ :

১.

আঁধার পথে চলা, কঠিন আলো ছাড়া উপায় নাই
কি দিয়া মোর আঁধার ঘরে জ্ঞান বাতি জ্বালাই ॥
অন্তরে মোর ময়লা জমে আলোর পথ করছে বন্ধ
তালা লাগছে নাকের রাস্তায় পাই না ফুলের সুগন্ধ
তাইতো সদায় মনের দ্বন্দ্ব, চলার পথে খুঁজে না পাই ॥
ঘষামাজা জানি না আমি কেমনে করব পরিষ্কার
কবিরাজ খুঁজে পাই না দূর করতে মনের বিকার
চলার পথে সবই আঁধার কেমন করে রক্ষা পাই ॥
থাকো যদি দরদী মোর বলে দাও সু-রাস্তা

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকারকে দূর করিতে করব আমি ব্যবস্থা
হারাই ফেলেছি আস্থা কত কষ্টে দিন কাটাই ॥
অগতিয়ার গতি তুমি ওহে প্রভু মালিক সাঁই
পড়িয়াছি ঘোর সংকটে তোমার কাছে পানা চাই
এ নুরের নাই পুণ্যের কামাই দিতেছি তোমার দোহাই ॥

২.

ঘরের মানুষ ঘরে থুইয়া বাইরে করো দৌড়াদৌড়ি
ঘর ছাড়িবে ঘরের মানুষ তোমারে দোষী করি ॥
তারে তুই করলে না যতন, কুসঙ্গীর সাথে সদা কাটাইলে জীবন
হারাইলে আমানতের ধন মজিয়া মদন বেপারি ॥
মোহে পড়ে হইলে কানা, বাকি তোর মহাজন সব লেনাদেনা
কেন তুই হইলে দেওয়ানা, হারাইয়া গাইটের কড়ি ॥
রূপগঞ্জের বাজারে সস্তায় বিকাইলে মাল
দেশে যাওয়ার আগে তুই সাজিলে কাঙাল
আর তোমার হবে না সকাল পিন্দেছো মায়ার বেড়ী ॥
সময়ে তুই চিনলে না রতন, অসময়ে হায় হায় কে বুঝাবে বেদন
এ নুরের লক্ষ্যহীন জীবন, করে ভুতের বেগারী ॥

৩.

নাচো কেন মাটির পুতুল
রঙ দেখিয়া পাগল হইয়া চলার পথে করতেছ ভুল ॥
সময় তোমার অতি সামান্য, বাছাই করে করে পণ্য
নীতি বিধান করে মান্য, সাগর সেচে মুক্তা তোল ॥
পাইছো তুমি দুই দিনের জিন্দেগী, করো না কেন তার বন্দেগী
একদিন চোখে লাগবে আন্দি, দিতে হবে ভুলের মাশুল ॥
ছেড়ে দিয়া লোভ-লালসা, এক ধিয়ানে করো বন্ধের আশা
মিটবে তোমার মন পিপাসা, গলে বাঁধো নামের ফুল ॥

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষাতে হলে পাস, মিলবে তোমার ভালো নিবাস
এ নুরের মনের আশ, দয়ানি করিবেন রাসুল ॥

ধাঁধা

গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিতে ধাঁধা বিরাট একটি স্থান দখল করে রেখেছে। নানা আচার-অনুষ্ঠান কিংবা বর-কনে দেখার সময় ধাঁধার আসর বসা যেন একটা সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। ধাঁধায় একদিকে যেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রসবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ধাঁধাকে স্থানীয়ভাবে 'ছিলকা', 'ছিল্লক', 'শিলুক', 'হেঁয়ালি' প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। বর্তমানে ধাঁধা-চর্চা খানিকটা হ্রাস পেলেও তা মোটেই হারিয়ে যায়নি। দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মুখে মুখে ধাঁধা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চর্চিত হয়ে আসছে।

সংগৃহীত ধাঁধার নমুনা :

১. ক কার আদি নাম তার, ক-কারে আকার
টলার মুন্ডু কাটি মধ্যে দিয়া তার
লবণের যে বস্তু হয় দেও পাঠাইয়া।
উত্তর : কাঁঠাল।

২. এক গ্লাসে দুইজাত পানি
তারে আমি মুর্শিদ মানি।
উত্তর : ডিম।

৩. জলে থাকে জলকুমারী, জলে তার বাসা
হাড্ডিও নাই, ঘুড্ডিও নাই, তার বড় গোসা।
উত্তর : জোঁক।

৫. গলা আছে তলা নাই
পেট আছে ভর নাই।
উত্তর : চুল।

৬. গরম দিনের বন্ধু তুমি, পরম তোমার নাম
বাতাস দিয়া শীতল করো, ভদ্রলোকের কাম।
উত্তর : পাখা।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আমার বাড়ির পিছন দিয়া হেমলতা গাছ

ফুল নাই, ফল নাই, ধরে বারো মাস।

উত্তর : পান।

৮. এত বড় টুলিটা, ভাত ধরে কুড়িটা

সর্বলোকে খাইয়া যায়, কিছু ভাত থইয়া যায়।

উত্তর : চুন।

৯. গাঙের পাড়ও ভুবি গাছ ওলঅলি করে

একটা ভুবি খাইয়া দেখো, শইলে কিতা করে।

উত্তর : তামাক পাতা।

১০. ঘরে ভিতর ঘর, তার ভিতরে পইড়্যা মর।

উত্র : মশারি।

১১. সোজায় ধরে সোজারে, সোজায় ধরে বেঁকারে

বেঁকায় ধরে মরারে, মরায় ধরে জিতারে।

উত্তর : বড়শি।

১২. যত টানি বাত্তি অয়, কওছাইন তারে কিতা কয়।

উত্তর : সিগারেট।

১৩. মাটির তলে সুন্দরী, কাপড় পিন্দে নয় কুড়ি।

উত্তর : পিয়াজ/রসুন।

১৪. ইজলের জরি মরি, পিতলের ছানি

আজব দেশে দেইখ্যা আইলাম, গাছের আগায় পানি।

উত্তর : নারিকেল।

১৫. একছা খেড়, দুইন্ন্যাই বের।

উত্তর : দিয়াশলাইয়ের কাঠি।

১৬ কাটলে বাঁচে, না-কাটলে মরে।

উত্তর : মানুষের নাড়ী।

১৭. এক টিপায় দুই বিচি, ভাগ্য থাকলে তিন বিচি।

উত্তর : বাদাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. উপরে তক্তা, নীচে তক্তা

মাঝখানে নাচে কলকইল্লা দেবতা।

উত্তর : জিহ্বা।

১৯. গেছলাম অছম্বির দেশে

দেখি গাছের আগায় পানি আছে।

উত্তর : ডাব।

২০. আয়রে ভাই পাহাড়ে যাই, লেম্বুর কেন ডেটা নাই।

উত্তর : ডিম।

২১. এতকুনি গাছটা, গোটা ধরে পাঁচটা

যদি গোটা লাল অয়, হাজার টাকার মাল অয়।

উত্তর : কমলা।

২২. আমি থাকি খালে, তুমি থাকো ডালে

দেখা হবে দুজনের মরণের কালে।

উত্তর : মাছের পোনা ও কাঁচা মরিচ।

২৩. ঘর আছে দুয়ার নাই, মানুষ আছে কথা নাই।

উত্তর : কবর।[১৮]

২৪. এই পাড়ে একটা হাতি ওই পাড়ে একটা হাতি

দুই হাতি করে লাথালাথি।

উত্তর : চোখের পাতা।

২৫. নাকটি চেপে ধরে, কানটি চেপে ধরে

জগতখানা ঘুরে বলো না সে কেরে?

উত্তর : চশমা ।

২৬. আয়রে ভাই পাড় যাই, পাড় গিয়া ঘর বানাই

ঘর বানাইলাম কোঠা কোঠা, এগু বেতের বান নাই।

উত্তর : কুমারের ঘর।

---

১৮. ১ থেকে ২৩ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার সাকিতপুর গ্রামের সরদার শাহরিয়ার হাসান (৪০) পিতা- ওয়াহিদুল হক সরদার, মাতা-গুলশান আরা হকের কাছ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. এত গাছে টান দিলে বেত গাছে লড়ে

কোক্কার এনডা বাইয়া বাইয়া পড়ে।

উত্তর : নলি ঘি।

২৮. মাথায় মুকুট গোল পা, পেটের ভিতরে হাত-পা।

উত্তর : শামুক।

২৯. থাল মাজনি থাল ঘষানি থাল নিলোগি চোরে

হৈ পাড় আগুন ধরলে কে নিভাইতে পারে।

উত্তর : সূর্য।[১৯]

৩০. লটকন থাকে, লটকন খায়, কাইটা দিলে হাইটা যায়। উত্তর।

উত্তর : আমের পোকা।

৩১. থাকে তোমার ঘরে করে তোমার কাম

উঠে তোমার হাতে, মুখে তোমার মুখে।

উত্তর : গ্লাস।

৩২. ইপার থেকে মারলাম তীর ই পারে গিয়া বিরবির।

উত্তর : পোনা মাছ।

৩৩. বন থেকে বারহইল বোইতা আর পাতে দিল মুইতা।

উত্তর : লেবু।

৩৪. গাছ থেকে পড়ল তাল, গেল দুই মাল

দেখল জনে আনল না আনলজনে খাইল না

খাইল আরেক জনে।

উত্তর : মানুষ।

৩৫. এক মারইলে দুই চাল।

উত্তর : কলাপাতা।

৩৬. রাজার বাড়ির গুড়ি, এক বিয়ানে বুড়ি।

উত্তর : কলাগাছ।

---

১৯. ২৪ থেকে ২৯ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে রোজিনা আক্তার রত্নার কাছ থেকে। তাঁর বয়স ২২, গ্রাম- নরত্তমপুর, উপজেলা- দিরাই, জেলা- সুনামগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. চলতে চলতে থেমে যায়, চাকু দিয়ে গলা কাটলে চলে বার বার।

উত্তর : কাঠপেন্সিল।

৩৮. মাটির তলে থাকে বুড়ি, কাপড় ফিনদে সাত কুড়ি।

উত্তর : রসুন/পেঁয়াজ।

৩৯. আল্লার কী কুদরত, লাঠির ভিতর শরবত।

উত্তর : কুইষর/আখ।

৪০. বন থেকে বারাইলা ভট, নীচের দিকে লাঠি মাথায় জট।

উত্তর : আনারস।[২০]

প্রবাদ-প্রবচন

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় কথায়-কথায় প্রবাদ-প্রবচন আওড়ানো একটা স্বাভাবিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সুনামগঞ্জেও অনুরূপভাবে এ সংস্কৃতি ধারণ করে রেখেছেন সাধারণ মানুষেরা। মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অর্থবোধক ভাবপ্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন নিম্নরূপ :

১. স্বভাব যায় না মইলে
ইজ্জত যায় না ধইলে।

২. মাঘ মাইয়া জারে
বইশের হিং লাড়ে।

৩. সুবুদ্ধি ভাই মরণে
দেশ পাইল অরানে
চুরায় গাইল নেয়
ঘন ঘন জিরানে।

৪. অভাবে স্বভাব নষ্ট
মুখ নষ্ট বরনে
জরায় ক্ষেত নষ্ট
স্ত্রী নষ্ট মারনে।

---

২০. ৩০ থেকে ৪০ নম্বর পর্যন্ত ধাঁধা জগন্নাথপুর উপজেলার দেলোয়ার হোসাইন (৫৫) ও সাইফুর রহমান রিপন (৩৫), গ্রাম- ইকড়ছই-এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মানুষ যত ধনী অয়
অভাব থাকে সবসময়
গাও নষ্ট বাদে
খেত নষ্ট খাদে।

৬. জাউয়ার বাজারি আউয়া
ডেফলরে কয় ডেউয়া।

৭. নাও উঠলে মাঝি
গাও উঠলে সাজি
গদীত বইলে রায়
তালুকমীরাশ নীলাম ধইরা
দাশ চধ্রী ফলায়!

৮. বাপ দাদার নাম নাই
চান মড়লের বিয়াই?

৯. মাইনষের মাইঝে বাইট্যা,
কলার মাইঝে আইট্যা।

১০. হূড়ির কুড়ি বুদ্ধি নাপিতের ছয়,
আর জাতের অয় কি না অয়।

১১. ফল খাইয়া জল খায়
যমে বলে আয় আয়!

১২. আগা ভারি, পাছা টান
মারে থইয়া ঝিরে আন।

১৩. দক্ষিণ দোয়ারি ঘরের রাজা
পূর্ব দোয়ারি তার প্রজা;
পশ্চিম দোয়ারির মুখে ছাই
উত্তর দোয়ারির খাজনা নাই।

১৪. বেল খাইয়া খাইল পানি,
বাতে কয় মইলাম আমি;
আম খাইয়া খাইল পানি,
বাতে বলে জিইলাম আমি।

১৫. উঁচ কপালী হেরা দাঁতী,
পিঙ্গল মাথার কেশ;
সেই কইন্যা বিয়া করলে,
ভরমে নানান দেশ!

১৬. নারী ভালা পেঁদলী,
ফল ভালা কদলী;
জল ভালা ভাসা,
মানু ভালা চাষা।

১৭. হাতের ফুলে কান্দায়
পায়ের ফুলে পিন্দায়।

১৮. অভাগীর মুখ নড়ে চড়ে
চৈরের গুতা গালে পড়ে।

১৯. অইব পুলা ডাকব বাপ
তে যাইব মনের তাপ।

২০. অল্প বয়সে প্রেম করা
কাচা বাঁশে ঘূন ধরা।[২১]

এছাড়া যাত্রা, থিয়েটার, গীতগান, কবিতার লড়াই (মালজোড়া), হাডুডু খেলা, নাটক, চড়ক পূজা ঈদ ও পূজা উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেও খাওয়ার ধুম পড়তো। সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ছিল সুনামগঞ্জের জীবন ও সংস্কৃতি।

আজ উৎস থেকে সরে যাওয়ার ফলে এগুলোর স্থান দখল করে নিয়েছে বস্তাপচা নোংরা সিনেমার মারদাঙ্গা ছবি, ভিসিডি এর কুৎসিত স্খলন, পাশ্চাত্য সংগীতের নামে উন্মত্ততা। যা বর্তমান প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তাদের কাছে পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা এখন সময়ের দাবী।

---

২১. প্রবাদগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ১-১১ পর্যন্ত রামকানাই দাশ (৮০) প্রবীন সংগীতশিল্পী থেকে, গ্রাম-পেরুয়া, দিরাই, সুনামগঞ্জ, ১২-১৫ পর্যন্ত ফুলমিয়া (৫৫) কৃষক, গ্রাম- ইয়ারাবাদ, শাল্লা, সুনামগঞ্জ ও ১৬-২০ পর্যন্ত সালেহ আহমদ (৪০) সাংবাদিক, গ্রাম- মাইজবাড়ি, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ-এর নিকট থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন লোক কবি

সুনামগঞ্জের প্রাচীন লোক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

ভেটু শাহ : ভেটু শাহ বিখ্যাত মারফতি সাধক কবি সৈয়দ শাহনুরের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তার অনেক গান আজো লোক মুখে শোনা যায়। তার একটি গানের কথা এরকম–

"দুঃখ কৈমু কোন বাসর
মা অইয়া পুতরে যে করে দুই নজর।"

নিচে তার আরেকটি গান উদ্ধৃত করা হলো :

বন্ধ যদি না আওরে, অভাগিনীর মাথা খাওরে
একেলা মন্দিরে থাকি
শুইলে স্বপনে দেখি
পোহাই নিশি, কান্দিয়া কান্দিয়া
এসে পরাণ রাখ আমার, দরশন দিয়ারে
ফুল শয্যা শূন্য করি
কোথায় রইলায় প্রাণের হরি
ঐ সে দুঃখে ঝুরিয়া মরি
ভাঙ্গিমু হাতেরই শাঁখা
ছিড়িমু গলারই হার
যথা তথা যাইমুরে চলিয়া।
মুরিমু, মুরিমু, আমি জলে ঝম্প দিয়ারে।
আবের ঘরে আতশের ছানি
সোনা মুর্শিদ গুনমণি
বইছইন মুর্শিদ ফুলটঙ্গি ঘরে
সখিরে মিনতি করে, ভেটুশাহ ফকিরে ॥[২২]

আদিল শাহ : সুনামগঞ্জ থানার ডুংরিয়া নিবাসী কবি আদিলশাহ কতিপয় তত্ত্ব সংগীত রচনা করেছিলেন। তাকে হাছনরাজার সমসাময়িক কালের কবি হিসাবে অনুমান করা হয়ে থাকে। সংসার ধর্ম ত্যাগ করে তিনি তার জীবনের অবশিষ্ট অংশ সুনামগঞ্জের শহরতলীতে অতিবাহিত করেন। তাঁকে

২২. নন্দলাল শর্মা, *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন* (সিলেট : জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ)।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে দরবেশ জ্ঞান করেন। তাঁর গান আজো লোক মুখে শোনা যায়। তার একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

"ওমন কেমন আছরে
ভাইরে নূতন বেপারী
রে---ভাংগা নায়ের মাঝি
জাগিয়া দেও দরজা
যাইলে লাপে ফাঁসি
কে তরে পাঠাইল ভবে, সেবা রইল কৈ?
আম খাইলাম রসে রসে
কাঠাঁল খাইলাম কুশে
মনিপুরের ধন হারাইলাম
কামিনীর কোলে
আদিল শাহ থাকিবে হীন
হইয়া কাতর।
ত্রিপাকে বাঁধিয়া রাখবে
গৃহস্থের ছাগল
হায়রে পাগল মন
আগে আদিল কৈ?
কে তরে পাঠাইল ভবে
সেবা রইল কৈ?[২৩]

কবি সৈয়দা সামিনা বানু : সৈয়দ শাহনূরের স্ত্রী কবি সৈয়দা সামিনা বানু নিজেও একজন কবি শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁকে সুনামগঞ্জের প্রাচীন মহিলা কবিদের অন্যতম মনে করা হয়। তাঁর রচিত গানের একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

"কহে বিবি সামিনা ভানু
শাহানূরের তিরি (স্ত্রী)

২৩. মুহাম্মদ নূরুল হক, *সিলেটের পল্লী কবিগণ*, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ৪২; আল-ইসলাহ, কার্তিক ১৩৭১ ব., পৃ. ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদের লাগিয়া আমি
দিবা নিশি ঝুরি।”[২৪]

বাউলশাহ : বাউলশাহের মূলবাড়ি হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচুঙ্গে। সুনামগঞ্জের সাদকপুর গ্রামে তিনি দীর্ঘকাল বসবাস করেন। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে দিরাই থানার মধুরাপুর গ্রামে। তিনি বহু আধ্যাত্মিক গান রচনা করেছিলেন। এখানে তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করা হলো :

“অধরা ধরিতাম কোন কলে গো
সজনী সই ॥
(আর) অধরা ধরি বার কল
দিছইন যেবা বলে
চরণ ধরে তুলে রাখতাম
মস্তকের উপরে গো ...
সজনী সই ॥
(আর) কলে শক্তি কলে ভক্তি
কলে কলে চলে
ভূবন মোহিনী রূপ, দুই নয়নে ধরে গো ....
সজনী সই।
(আর) জীবন বারিষার জল
যমুনায় কি ধরে?
দারুণ গংঙ্গায় দিছইন ভাটি
উজান কোন কালে গো ....
সজনী সই ॥
যে ধইরাছে রাজা হইছে
রাখছে বা কোন কালে
বাউল শাহ সাধ করে কইন
ধইরে রাখ গলে গো ....
সজনী সই ॥[২৫]

---

২৪. মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, *সাহিত্য চর্চায় সুনামগঞ্জ*, *ভাটির কথা*, ১৯৯২, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

নূর আলী খাঁ : শ্রী অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে নূর আলী খাঁর 'মারিফতি গীত' এর উল্লেখ রয়েছে। বইটি একশত দশ (১৯১০ প্রথম প্রকাশ) বছরের পুরানো। এ থেকে নূর আলী খাঁ কত প্রাচীন কবি ছিলেন তা অনুমান করা যায়। তাঁর গান আজ প্রায় বিস্মৃত।

বাছির শাহ মওলা : বাছির শাহ মওলা সৈয়দ শেরআলী শাহর উত্তর পুরুষ। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এঁদের পূর্বপুরুষ কামাল শাহ লাউড়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। খাসিয়াদের অত্যাচারে এঁরা লাউড় ছেড়ে সুনামগঞ্জ শহরের তেঘরিয়া এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। এঁরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মূলত এতদাঞ্চলে আসনে এবং সংসারধর্ম পালনের জন্য বৈবাহিক সূত্রে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[২৬] বাছির শাহ মওলার অনেক কেরামতি আজো লোকমুখে শোনা যায়। জনশ্রুতি রয়েছে 'বাঘ' তার কথা মানত। তিনি যখন জপতপ করতেন তখন অদূরে দাঁড়িয়ে বাঘ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত পোষা বিড়ালের মত। তিনি অনেকগুলো আধ্যাত্মিক গান রচনা করেছিলেন। নিচে তার একটি গান উদ্ধৃত করা হলো।

"মন চিন নিরে তোমার সংগে কোন জন?
তনের মাঝে ছাপিয়া রই ছইন মাবুদ নিরঞ্জন
টাট্টির উপর টাট্টি দিয়া রইয়া ছইন ছাপিয়া
সারি সারি পানছ কোঠা, কোন কোঠায় কালিয়া।
ভাইরে ভাই কথার মাঝে কথা নয়, অল্প একটি কথা
চউল ডউল কিছু নাই চৌদিকে তার মাথা।
হাল বাও হালুয়া ভাইরে তেই তেই বলে
আর দুইটি নাম জপে ভাইরে নাসিকার কলে।
ভাইরে ভাইরে ফুলের বিন্দাবন ভাইরে ফুলের বিছান
কোন দিকে শিওর কালার কোন দিকে পৈথান?
ভাইরে ভাই, বাছিরশা ফকিরে কইন, শুন দিয়া মন
ভাবে দাড়াইয়া ভজ মুর্শিদের চরণ।"[২৭]

---

২৫. *সিলেটের পল্লী কবিগণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪
২৬. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

করিম বকস : করিম বকস হাছন রাজার একজন বিখ্যাত সাগরেদ ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল আরপিন নগর মহল্লায়। করিম বকস নিজেও কবি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সারিয়াল। নৌকা বাইচে সারি গাইতেন। লোক মুখে আজো তার বহু গান ছড়িয়ে আছে। তার গানে হাছনরাজার নাম জড়িত থাকায় অনেকে এগুলোকে হাছন রাজার গান মনে করে থাকেন। আসলে পীর-মুর্শিদ জ্ঞানে করিম বকস তার নিজের গানে হাছন রাজার নাম উল্লেখ করাতে এ ভুলের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন, "ছাড়িলাম হাছনের নাও রে'–এ গানটি হাছনরাজার হাছন উদাসের গান নয়। এটি একটি সারি গান। এটি করিম বকস রচিত বলে মনে করা হয়ে থাকে। এখানে করিম বকসের একখানি গান উদ্ধৃত করা হলো :

"আমি কি দিয়া তৃষিতাম বন্ধের মন গো
(আর) আমার সেই ধন নাই।
শিশু কালে দেখা ছিল, যৌবন বিফলে গেল
ভাবে বুঝি এখন আমার ফুলে মধু নাই।
আমি তোর নামের কলঙ্কে মইলাম রাই গো ...
যে বেলা যৌবন ছিল, প্রাণের বন্ধু না আসিল
এখন আমার বৃদ্ধকাল, উপায় দেখি নাই
আমি কোন কলে প্রাণ বন্ধের মন ভুলাই।
কুল মান সকলি দিয়ে চাইয়া থাকি নিরখিরে
একবার আস প্রাণ প্রিয়ে নয়নে লাগাই
করিম বক্সে চায় তোমার চরণ তলে ঠাই গো ...।[২৮]

আরবদি : সুনামগঞ্জ শহরের লক্ষনশ্রী নিবাসী আরবদি হাছন রাজার একজন সংগী ও ভক্ত। হাছন রাজার গানের আসরেও তার উপস্থিতি ছিল। হাছন রাজাকে এঁরা অনেকে পীর জ্ঞান করতেন। হাছন রাজার ঘোড়া, কোড়া ও মেলার আসক্তি এ গ্রাম্য কবির গানের পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

"সাহেব দেওয়ান হাছনরাজা, মেলা বসাইয়া কইলা আজব তামেশা
প্রথমে উড়িল নাম মহারাণীর ঘরে, তার পরে উড়িল নাম শহরে শহরে।
হাকিমবাবু, মোক্তারসাব আরো কত কোটি। হাছনরাজার সনে কইলা মেলার কুমিটি,
কুমিটি করিয়া সাহেব, বসাইলা মেলা। হাতি ঘোড়া কত আইল লেখা জুখা নাই।

২৮. মোহাম্মদ আলী ইউনুছ, সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ*, সুনামগঞ্জ, ১৯৯০, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

গানেওয়ালা কত আইলা তার সীমা নাই।
"চানমুসকি" ঘোড়া আইল সকলের সর্দার
তার ছোয়াড় দেখ উদাই জমাদার।
আরো একটি ঘোড়া আইল নামে 'সবজার'
তার ছোয়াড় যেন আলখাছ মড়ল।
সাদা একটি ঘোড়া আইল দেখিতে সুন্দর
হাজার টেকার বাজি মাইল, না করল উজ্জর।
বাজি জিতিয়া সাহেবের বড় অইল নাম
..... আরো একটি হাসির কথা শুন মন দিয়া
বুধাইয়ে দৌড়াইয়া ঘোড়ার না পাইল পিছ
'চান মুস্‌কি' ঘোড়া যায় সকল ঘোড়ার আগে
..... মোক্তারসাবের ঘোড়া যায় তার পাছে পাছে
যথায় তান ঘোড়া, কোড়া তথায় তান মন
যেখানে শুনিলা মেলা করিলা গমন।
কান্দিয়া আরবে কয় অইয়া বড় দুঃখী
সাহেবের সুরতের কথা শোন দিয়া মন
খেদমতের লাগিয়া সায়বে রাখছইন ষোল জন।[২৯]

সৈয়দ ইসাক শাহ : সৈয়দ ইসাক শাহ সুনামগঞ্জের লোক কবিদের অন্যতম। সুনামগঞ্জের নলুয়ার পাড় অঞ্চল থেকে তার দু'টি গান প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সংগ্রহ করা হয়। তার একটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"তোরা দেখ গো আসিয়া, প্রাণের বন্ধু কালিয়া
সোনায় কতই রংগের খেইড় খেলে
উপরে তার বালাম খানা
থাকে ফুলে ফুলে
ফুলের সনে যোগ করিয়া খেলা খেলে জলে।

২৯. উদ্ধৃত গানটি ৬০ বৎসর আগে একজন গ্রাম্য মহিলার নিকট থেকে জনাব আবু আলী সাজ্জাদ হোসেন সংগ্রহ করেছেন মর্মে তাঁর রচিত 'ইতিহাস ও ঐতিহ্য' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তোরা দেখ গো আসিয়া, সোনায় কতই রংগের খেইড় খেলে
বোড়দাদের ই আজব কলে
দুই মোকামের তলে
সাধন ভজন সব রইয়াছে
তোরা দেখ গো আসিয়া, সোনায় কতই রংগের খেইড় খেলে
সৈয়দ ইসাক শাহ কইন
আছে যারা জলে
মুই অভাগী ঠেকাইয়া রাইলাম
ভব মায়ার জালে।”[৩০]

মোহাম্মদ সাদিক : কবি মোহাম্মদ সাদিকের জন্ম ১৯৫৫ সালের ৫ অক্টোবর, সুনামগঞ্জ সদর থানার ধারারগাঁও গ্রামে। বাংলা সাহিত্যে মাস্টার্স করা কবি সাদিক একজন সরকারী কর্মকর্তা। বাংলাদেশের কবিতাঙ্গনে কবি সাদিকের অবস্থান সামনের কাতারে। তার লেখা চারটি বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো : ১. আগুনে রেখেছি হাত, ২. ত্রি কালের স্বরলিপি, ৩. বিনিদ্র বল্লম হাতে, ৪. সমুদ্রের শব্দ শুনি।[৩১] তাছাড়াও তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। নিম্নে তাঁর একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হলো।

“এক তারা ভয় নেই, বাজো তুমি বাজো
সময় তোমাকে নেবে তোমাকে নেবেই
ভয় নেই বালি হাঁস উড়ে উড়ে যাও
সময় তোমাকে নেবে–তোমাকে নেবেই
ওতা তো শিকারে গেছে হাতে হাতে তীর
ওরা তো হানতে গেছে নিরীহ পরান
ওরাকি আসবে ফিরে ওরা তো মানুষ
ওরাকি আসবে ফিরে ওরা তো পাষাণ
কাছে এসো ইতিহাস, এসো সুরকার
প্রাণের পড়শি তুমি তোমাকে বাজাই

৩০. বিজিত কুমার দে, সাহিত্য সাধনায় সিলেট, সিলেট কথা, সিলেট ১৯৮৬, পৃ. ৪৬৭
৩১. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

রাত যত গাঢ় হোক, কালো হোক যত
তোমার হৃদয় ছুঁয়ে তোমাকে জাগাই।"[৩২]

মমিনুল মউজদীন : সুনামগঞ্জ পৌরসভার তরুণ চেয়ারম্যান মমিনুল মউজদীন। তাঁর জন্ম ১৯৫৫ সালের ২৯ আগস্ট। তিনি একাধারে একজন কবি, প্রতিবাদী ও রাজনীতিক। হাছন রাজার প্রপৌত্র, সফল কাব্য উত্তরাধিকারী। তাঁর একটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হলো–

"লণ্ঠনের সামান্য আলোয় অসামান্য হয়ে ওঠে
আষাঢ়ের বৃষ্টি ঝরা রাত
বাইরে আঁধার ক্রমে জমে ওঠে, বাতাসের দুপ দাপ
এমন সময় তুমি দাঁড়ালে দরজায়, সেই তুমি
এক দিন যার চোখে রেখেছি এ চোখ
শিমুল ওড়ানো পথে এক দিন যার হাতে ছুয়েছি এহাত
হোস্টেল পালিয়ে আসা যার ঠোঁটে গোধুলির মসৃন আলোয়
ছুঁয়েছি এ ঠোঁট
বাইরে জলের শব্দ পৃথিবীর সবচেয়ে
পুরানো প্রেমের মতো গভীর গভীরতর হয়
দাঁড়িয়ে দরজায় তুমি প্রাচীন মূর্তির মত একা
তোমার শিথিল চুল ঢেকে দেয় সভ্যতার বিশীর্ণ সত্তাকে
লণ্ঠনের আলো বেয়ে আষাঢ়ের রাত বেড়ে ওঠে।"[৩৩]

এছাড়াও সুনামগঞ্জের কবিতাঙ্গন বর্তমান প্রজন্মের যারা সফল পদচারণায় মুখরিত করে চলেছেন তারা হলেন : ইকবাল আহমদ কাগজী, তৃষ্ণাদাশ, গোলাম রাব্বী, জীবন রায়হান, কাজী জাহান, ইজাজ আহমদ ইতু, শামসুন্নাহার পারভীন, শাহনেওয়াজ, বদরুল চৌধুরী, মাসুদ চৌধুরী, হোসনে আরা হেনা, রাহেলা খানম রাজনু, দীপঙ্কর চৌধুরী মিথুন, অপু আহমদ, মোহাম্মদ হোসেন, বাবর বখত, তৌফিক দোলন, জাহেদ মাহবুব, ইকবাল হোসেন, অলক চক্রবর্তী, বাপ্পা, সোহেল খান, নওসাদ মসরু প্রমুখ।[৩৪]

---

৩২. প্রাগুক্ত।
৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতির বিকাশে সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত মুসলিম মনীষিগণ

মরমী কবি হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২)

"লোকে বলে বলেরে, ঘর-বাড়ি ভালা নায় আমার
কি ঘর বানাইমু আমি, শূন্যের-ই মাঝার
ভালা করি ঘর বানাইয়া, কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি, পাকনা চুল আমার।"

এই গান শোনেনি, এমন মানুষের সংখ্যা অনেক কম। গানের রচয়িতা মরমী কবি এবং বাউল হাছন রাজা। দেশ, জাতি, ধর্ম এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের একটি ধর্ম রয়েছে, যাকে মানবতা বলে। এই মানবতা সাধনার একটি রূপ হলো মরমী সাধনা। যে সাধনা হাছন রাজার গান এবং দর্শনে পাওয়া যায়। তিনি সর্বমানবিক ধর্মীয় চেতনার এক লোকায়ত ঐক্যসূত্র রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গানগুলো শুনলে মনের মাঝে আধ্যাত্মবোধের জন্ম হয়। এক সময়কার প্রতাপশালী অত্যাচারী জমিদার পরবর্তীতে একজন দরদী জমিদার এবং মরমীয়া কবি ও বাউল সাধকে পরিণত হন।

জন্ম ও বংশপরিচয়

হাছন রাজার জন্ম ১৮৫৪ সালের ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১২৬১) সেকালের সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী সুরমা নদীর তীরে লক্ষণছিরি (লক্ষণশ্রী) পরগনার তেঘরিয়া গ্রামে। হাছন রাজা জমিদার পরিবারের সন্তান। তার পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী ছিলেন প্রতাপশালী জমিদার। হাছন রাজা তার তৃতীয় পুত্র। আলী রাজা তার খালাতো ভাই আমির বখ্শ চৌধুরীর নিঃসন্তান বিধবা হুরমত জাহান বিবিকে পরিণত বয়সে বিয়ে করেন। হুরমত বিবির গর্ভেই হাছন রাজার জন্ম।[৩৫] হাছনের পিতা দেওয়ান আলী রাজা তার অপূর্ব সুন্দর বৈমাত্রেয় ভাই দেওয়ান ওবেদুর রাজার পরামর্শ মত তারই নামের আকারে তার নামকরণ করেন অহিদুর রাজা।

হাছন রাজার পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। তাদেরই একজন বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহদেব মতান্তরে বাবু রায় চৌধুরী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৩৬] হাছন রাজার পূর্বপুরুষের অধিবাস ছিল অযোধ্যায়। সিলেটে আসার আগে তারা দক্ষিণবঙ্গের যশোর জেলার কাগদি নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ষোড়শ

৩৫. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *সিলেটের মরমী মানস* (সিলেট : মহাকবি সৈয়দ সুলতান সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ, ২০০৯), পৃ. ৫৭

৩৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *হাছন রাজা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীর শেষের দিকে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার কোণাউরা গ্রামে তাঁর পূর্বপুরুষ বিজয় সিংহ বসতি শুরু করেন, পরে কোন একসময় বিজয় সিংহ কোণাউরা গ্রাম ত্যাগ করে একই এলাকায় নতুন আরেকটি গ্রামের গোড়াপত্তন করেন এবং তার বংশের আদি পুরুষ রামচন্দ্র সিংহদেবের নামের প্রথমাংশে 'রাম' যোগ করে নামকরণ করেন রামপাশা।[৩৭]

বাল্যকাল

সিলেটে তখন আরবী-ফার্সির চর্চা খুব প্রবল ছিল। সিলেটে ডেপুটি কমিশনার অফিসের নাজির আবদুল্লা নামক এক বিখ্যাত ফার্সি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ মতে তার নামকরণ করা হয়– হাছন রাজা। বহু দলিল-দস্তাবেজে হাছন রাজা আরবি অক্ষরে নাম দস্তখত করেছেন– হাসন রাজা। হাছন দেখতে সুদর্শন ছিলেন। মাজহারুদ্দীন ভূঁইয়া বলেন : "বহু লোকের মধ্যে চোখে পড়ে তেমনি সৌম্যদর্শন ছিলেন। চারি হাত উঁচু দেহ, দীর্ঘভূজ ধারাল নাসিকা, জ্যোতির্ময় পিঙ্গলা চোখ এবং একমাথা কবিচুল পারসিক সূফী কবিদের একখানা চেহারা চোখের সম্মুখে ভাসতো।"[৩৮] অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি, তবে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। তিনি সহজ-সরল সুরে আঞ্চলিক ভাষায় প্রায় সহস্রাধিক গান রচনা করেন।

পিতার মৃত্যু ও জমিদারী

মাত্র ১৫ বছর বয়সে হাছন রাজা পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর মাত্র ৪০ দিন পূর্বে তার বৈমাত্রেয় বড় ভাই উবায়দুর রাজার অকাল মৃত্যু ঘটে। বাধ্য হয়ে বালক হাছন রাজাকে জমিদারী ও সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। পর পর দু'টি মৃত্যুর শোক তার মনে শেলের মত বিঁধল। সবাই ভাবল দায়িত্ব আর কাজের চাপ হাছন রাজাকে বদলে দেবে–দুই জায়গায় জমিদারী দেখাশোনা করে, আগের মত আর হৈ চৈ করে বেড়াতে পারবেন না; কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক তার উল্টো।

বিলাসিতার জীবন

সবার ধারণা বদলাতে হলো। তিনি পরিবার পরিচালনা ও জমিদারীর জন্য ভাল ভাল পদক্ষেপ নিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিলাসিতাও বেড়ে চলল। তৈরি হল বিরাট ভাওয়ালী নৌকা; প্রস্তুত হল আয়েশ- আরামের সাজসরঞ্জাম। কুড়া পাখী পোষার সখ বেড়ে গেল অতিমাত্রায়। এক একটি পাখির জন্য নিযুক্ত হল একেকজন পরিচারিকা। তিনি হাতীও কিনলেন। হাতীর খেদা দিলেন, হাতীর পিছনে

৩৭. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *বিশ্বনাথের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, মে, ২০০৪, পৃ. ২৪১

৩৮. মাজহারুদ্দীন ভূইয়া, *হানাফী*, ১৩৪৪ হি., ঈদ সংখ্যা, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্যয় করলেন অজস্র অর্থ। ঘোড়াও পুষতেন তিনি। দূর-দূরান্ত থেকে ভাল তাজী ঘোড়া সংগ্রহ করা ছিল তাঁর শখ। প্রতি বছর বিভিন্ন ঘোড় দৌড়ের মেলায় যোগ দিতেন, সঙ্গে থাকত উদাই জমাদার। তাঁর বিখ্যাত ঘোড়া জংবাহাদূর, চান্দ মুশকী ও মিটসন। একবার 'জংবাহাদূর' ঢাকার ঘোড়দৌড়ে নবাব আহছান উল্লার বিদেশী ঘোড়া 'দরিয়া বাজ'কে হারিয়ে দেয়। আজও লোকমুখে শোনা যায়–

"চান্দ মুশকি ঘোড়া জানো সবার সর্দার,
তাহার সওয়ার জানো উদাই জমাদার।"[৩৯]

পাখী ঘোড়া হাতী নৌকা নিয়ে বেপরোয়া বিলাসী জীবনযাপন করতে লাগলেন হাছন রাজা। কামিনী কাঞ্চন নিয়ে তিনি মেতে উঠলেন। তাঁর মা হুরমত জাহান তখন জীবিত। মায়ের শত প্রচেষ্টাও তাঁকে সংযত করতে পারেনি। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে তাঁর ভাবান্তর হয়।

বৈরাগ্যভাবের সূচনা

এক আধ্যাত্মিক স্বপ্ন-দর্শন হাছন রাজার জীবন দর্শন আমূল পরিবর্তন করে দিল। হাছন রাজার মনের দুয়ার খুলে যেতে লাগলো। তার চরিত্রে এলো এক সৌম্যভাব। বিলাস প্রিয় জীবন তিনি ছেড়ে দিলেন। ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরাতে শুরু করলেন। জমকালো পোশাক পরা ছেড়ে দিলেন। শুধু বহির্জগত নয়, তার অন্তর্জগতেও এলো বিরাট পরিবর্তন। বিষয়-আশয়ের প্রতি তিনি নিরাসক্ত হয়ে উঠলেন। তার মনের মধ্যে এলো এক ধরনের উদাসীনতা। এক ধরনের বৈরাগ্য। সাধারণ মানুষের খোঁজ-খবর নেয়া হয়ে উঠলো তার প্রতিদিনের কাজ। আর সকল কাজের উপর ছিল গান রচনা। তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে মগ্ন হলেন। তার সকল ধ্যান ধারণা গান হয়ে প্রকাশ পেতে লাগলো। এ সময়ে তাঁর রচিত বিখ্যাত গান হলো–

"লোকে বলে বলেরে, ঘর বাড়ি ভালা নায় আমার
কি ঘর বানাইমু আমি, শূন্যের-ই মাঝার
ভালা করি ঘর বানাইয়া, কয় দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি, পাকনা চুল আমার।"[৪০]

এভাবে প্রকাশ পেতে লাগলো তার বৈরাগ্যভাব। হাছন রাজা সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। জীব-হত্যা ছেড়ে দিলেন। কেবল মানব সেবা নয়, জীব সেবাতেও তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ডাকসাইটে রাজা এককালে 'চণ্ড হাছন' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি হলেন 'নম্র হাছন'। তার এক গানে আক্ষেপের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে :

---

৩৯. ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি, সিলেটের মানুষ*, এপ্রিল ১৯৯১, পৃ. ২৩১

৪০. দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা সম্পাদিত, হাছন রাজা সমগ্র, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৬৬৩

Dhaka University Institutional Repository

"ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন
সাধন বিনে নারীর সনে হারাইলাম মূলধন।"[৪১]

পরিণত বয়সে তিনি বিষয় সম্পত্তি বিলিবণ্টন করে দরবেশ-জীবন যাপন করেন। তার উদ্যোগে হাছন এম.ই. হাই স্কুল, অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আখড়া স্থাপিত হয়।

সঙ্গীত সাধনা

হাছন রাজার চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তার গানে। তিনি কত গান রচনা করেছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। 'হাছন উদাস' গ্রন্থে তার ২০৬ টি গান সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় ১৯০৭ সালে সিলেট ইসলামিয়া প্রেস থেকে ছাপা হয়। এর বাইরে আরও কিছু গান 'হাছন রাজার তিনপুরুষ' এবং 'আল-ইসলাহ্' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অনুমান করা হয় যে, তার অনেক গান এখনো সিলেট-সুনামগঞ্জের লোকের মুখে মুখে আছে, কালের নিয়মে বেশ কিছু গান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পদ্যছন্দে রচিত হাছনের অপর গ্রন্থ 'শৌখিন বাহার'-এর আলোচ্য বিষয় ছিল স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও কুড়া পাখির আকৃতি দেখে প্রকৃতি বিচার। 'হাছন বাহার' নামে তার আরও একটি গ্রন্থ কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। হাছন রাজার কিছু হিন্দী গানেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

মরমী গানের ছক-বাঁধা বিষয় ধারাকে অনুসরণ করেই হাছনের গান রচিত। ঈশ্বরানুরক্তি, জগৎ জীবনের অনিত্যতা ও প্রমোদমত্ত মানুষের সাধন-ভজনে অক্ষমতার খেদোক্তিই তার গানে প্রধানত প্রতিফলিত হয়েছে। কোথাও নিজেকে দীনহীন বিবেচনা করেছেন, আবার তিনি যে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকের হাতে বাঁধা ঘুড়ি সে কথাও ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গানে :

"গুড্ডি উড়াইল মোরে, মৌলার হাতের ডুরি
হাছন রাজারে যেমনে ফিরায়, তেমনে দিয়া ফিরি ॥
মৌলার হাতে আছে ডুরি, আমি তাতে বান্ধা
যেমনে ফিরায়, তেমনি ফিরি, এমনি ডুরির ফান্ধা ॥[৪২]

এই যে 'মৌলা' তিনিই আবার হাছন রাজার বন্ধু। স্পর্শের অনুভবের যোগ্য কেবল, তার সাক্ষাৎ মেলে শুধুমাত্র তৃতীয় নয়নে :

"আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে, আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে।
আরে দিলের চক্ষে চাহিয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপ রে ॥"[৪৩]

---

৪১. প্রাগুক্ত।
৪২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *মরমী কবি হাছন রাজা*, লোক সাহিত্য পত্রিকা, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭১
৪৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এই বন্ধুর সনে হাছন রাজার প্রেমের আশা বাধা পেত স্বজন ও সংসার। হাছনের খেদ :

"তিরি হইল পায়ের বেড়ি পুত্র হইল খিল।

কেমনে করিবে হাছন বন্ধের সনে মিল ॥"

এদিকে নশ্বর জীবনের সীমাবদ্ধ আয়ু শেষ হয়ে আসে তবু 'মরণ কথা স্মরণ হইল না, হাছন রাজা তোর'। পার্থিব সম্পদ, আকাঙ্ক্ষা আর সম্ভোগের মোহ হাছন রাজাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আবার নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারেন :

"যমের দূতে আসিয়া তোমার হাতে দিবে দড়ি।

টানিয়া টানিয়া লইয়া যাবে যমেরও পুরির ॥

সে সময় কোথায় রইব (তোমার) সুন্দর সুন্দর তিরি।

কোথায় রইব রামপাশা কোথায় লক্ষণছিরি রে ॥

করবায় নিরে হাছন রাজা রামপাশায় জমিদারী।

করবায় নিরে কাপনা নদীর তীরে ঘুরাঘুরি রে ॥

(আর) যাইবায় নিরে হাছন রাজা রাজাগঞ্জ দিয়া।

করবায় নিরে হাছন রাজা দেশে দেশে বিয়া রে ॥

ছাড় ছাড় হাছন রাজা এ ভবের আশা।

প্রাণ বন্ধের চরণ তলে কর গিয়া বাসা রে ॥"[৪৪]

এই আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মোপলব্ধির ভেতর দিয়েই হাছন রাজা মরমী-সাধন লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন।

হাছনের গানে আঞ্চলিক শব্দ

হাছন রাজার গানে আঞ্চলিক বুলি, প্রবচন ও বাগ্‌ধারার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তার গানের ভাষাভঙ্গি ভাষাতাত্ত্বিকদের পর্যালোচনার আকর্ষণীয় উপকরণ হতে পারে। হাছন রাজার গানে ব্যবহৃত কিছু আঞ্চলিক শব্দ ও বাগ্‌ধারার তালিকা এখানে প্রণীত হলো :

আকুল, জিয়ন, ভালা, ঠেকাইলায়, মুঞ্জিয়া, গানা, বেসক, বাড়ৈ, খেইড়, বন্ধে, লাঙ্গ, নাতিন, বুচা, লেইনজ, আজল, হাডুয়া পোক, মাড়ইল, গুড্ডি, ডুরি, হাউস, রেকি, উন্দা কল, মুস্করিয়া, টাটি, ছঙ্গাসন, খেওয়ানী, টন্‌কাইলে, আঞ্জা, খুবী, খেশ, ঢেন্ডুরা, ঠমকাইয়া, নাছন, গছে, ফাল্,

৪৪. মোঃ সুবাস উদ্দিন, *হাছন রাজার জাগতিক ও অজাগতিক ভাবনা*, সাপ্তাহিক স্বজন, সুনামগঞ্জ, ৬ জানুয়ারি ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

পুতলা, ভৈসাল, জুংরা, সামাইল, লাইন্তি, চিনিবায়, কহন, বিকে, চিড়াবারা, কারাকারা, তারাবারচ, আঙ্গে আর ডাঙ্গে, আন্ধাইর গুন্ধাইর।[৪৫]

হাছন রাজার কোনো কোনো গানে স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয় চিহ্নিত আছে। লক্ষণছিরি ও রামপাশা-তার জন্মগ্রাম ও জমিদারী এলাকার উল্লেখ বারবার এসেছে। পাওয়া যায় সুরমা ও আঞ্চলিক নদী কাপনার নাম। কোন কোন গানে প্রসঙ্গ হিসেবে নিজেই উপস্থাপিত হয়েছেন। দিলারাম নামে তার এক পরিচারিকা, বেনামে সাধনসঙ্গিনী মাঝে মাঝে তার গানে উপস্থাপিত হয়েছে :

“ধর দিলারাম, ধর দিলারাম, ধর দিলারাম, ধর।
হাছন রাজারে বান্ধিয়া রাখ দিলারাম তোর ঘর ॥”

কিংবা,

“তোমরা শুন্‌ছনি গো সই
হাছন রাজা দিলারামের মাথার কাঁকই ॥”[৪৬]

হাছন রাজা মুখে মুখে গান রচনা করতেন, আর তার সহচরবৃন্দ, নায়েব-গোমস্তা সেসব লিখে রাখতেন। তার স্বভাবকবিত্ব এসব গানে জন্ম নিত, পরিমার্জনের সুযোগ খুব একটা মিলত না। তাই কখনো কখনো তার গানে অসংলগ্নতা, গ্রাম্যতা, ছন্দপতন ও শব্দপ্রয়োগে অসতর্কতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই ত্রুটি সত্ত্বেও হাছন রাজার গানে অনেক উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি, মনোহর উপমা-চিত্রকল্পের সাক্ষাৎ মেলে। তার কিছু গান, বিশেষ করে ‘লোকে বলে, বলেরে ঘরবাড়ি ভালা নায় আমার’, ‘মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে’, ‘আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপরে’, ‘সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল’, ‘মরণ কথা স্মরণ হইল না হাছন রাজা তোর’, ‘আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে’, ‘কানাই তুমি খেইর খেলাও কেনে’, ‘একদিন তোর হইব রে মরণ রে হাছন রাজা’–সমাদৃত ও লোকপ্রিয় শুধু নয়, সঙ্গীত-সাহিত্যের মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছে।

হাছন রাজার মৃত্যু হয় ১৯২২ সালে। ১৯২৪ সালে প্রভাত কুমার শর্মা নামে এম সি কলেজের প্রথম বর্ষের একজন ছাত্র ‘মরমী কবি হাছন রাজা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটি কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ও স্থানীয় শিক্ষিত সমাজে প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করে। প্রভাত কুমার উৎসাহিত হন ও আবেগের উত্তেজনায় ১৯২৫ সালে শান্তি নিকেতন যান ও কবিগুরুকে হাছন রাজার ৮টি গান এবং নিজের প্রবন্ধের কপি প্রদান করেন।

৪৫. https://www.bd.pratidin.com/rokomari-sahitto/236888
৪৬. মোঃ আফজাল খান, মরমি কবি হাছন রাজা, *স্মৃতির পাতায় জালালাবাদ*, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই দৈবক্রমে হাছন রাজার গান কবিগুরুর নজরে আসে। ১৯২৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর, কলিকাতায় ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : "পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই, সেটি এই যে ব্যক্তি স্বরূপের সাথে সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্ব সত্য।" তিনি গাইলেন–

> "মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন,
> মম কর্ণে পয়দা হইছে মুহাম্মদী দ্বীন।
> শরীলে করিল পয়দা শক্ত আর নরম,
> আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
> নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় আর বদবয়।
> আমি হইতে সব উৎপত্তি হাছন রাজায় কয়।"

এই সাধক কবি দেখছেন যে শাশ্বত পুরুষ তারই ভেতর হতে বের হয়ে তার নয়নপথে আবির্ভূত হলেন। বৈদিক ঋষিও এভাবে বলেছেন যে, পুরুষ তার মধ্যে, তিনিই আধিত্য মণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

> "রূপ দেখিলাম যে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে।
> আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।"

রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত গান দু'খানির অনুবাদসহ মূল ভাষণ দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথ গুণের কদর ও সম্মান করলেন। অখ্যাত পল্লী কবিকে স্বীকৃতি দিলেন বাংলা সাহিত্যে, লালনের সাথে তাঁকে সমমর্যাদা দিলেন। শুধু তাই নয়, এর বছর পাঁচেক পরে ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে তাঁর হিবার্ট লেকচারেও কবিগুরু হাছন রাজার ঐ দু'খানি গানের উল্লেখ করেন একই সুরে। এভাবে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসভায়ও ঘটল হাছন রাজার পরিচিতি। রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট লেকচার "The Religion of Men" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। এ গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় সংস্করণও প্রকাশিত হয়।[৪৭]

মানুষ হাছন রাজা

সৈয়দ মোস্তফা আলী লিখেছেন, "সুনামগঞ্জের তৎকালীন মুকুটবিহীন রাজা ছিলেন দেওয়ান হাছন রাজা। যেমন রাজা বংশ উপাধি ছিল তেমনি তাকে রাজার মত দেখাত। তিনি দীর্ঘকায় পুরুষ সিংহ ছিলেন। তাঁর বর্ণ ছিল তপ্ত কাঞ্চনবৎ। উন্নত নাসা, ঘাড় পর্যন্ত বাবরী চুল, মানানসই গোঁফ তাঁর আভিজাত্যের পরিচয় বহন করত। আমি যখন তাকে দেখি তখন তাঁর কেশ ঘন কালো আভা। তিনি মখমলের পাজামা, চোগা-চাপকান ও জরীর পাগড়ী ছাড়া বের হতেন না।"[৪৮]

---

৪৭. *সিলেটের মাটি, সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৪৮. সৈয়দ মোস্তাফা আলী, *আত্মকথা* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ১ম সংস্ক., ১৯৬৮), পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মোস্তফা আলী তখন সুনামগঞ্জ জুবিলী স্কুলের ছাত্র। হাছন রাজা পশু-পাখিকে ভীষণ ভালবাসতেন। প্রাণী হত্যা ছিল তাঁর কাছে গর্হিত পাপ। কেবল মানব সেবাই নয়, তিনি পশুপাখীর সেবাও করেছেন। হাছন রাজা বর্ষার সময় সুনামগঞ্জ বাজারে মানুষের ঘাড়ে সওয়ার হতেন। দাবা খেলায় শখ ছিল হাছন রাজার। ছুটির দিন সকাল হতে সুনামগঞ্জ শহরে দাবা খেলতে আসতেন। সঙ্গে থাকত মধ্যাহ্নের আহার। সারাদিন তন্ময় হয়ে দাবা খেলতেন, শুধু আহারের বিরতি বাদে।

ধর্ম সম্বন্ধে হাছন রাজার কোন গোড়ামী ছিল না। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁর সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের সহজ মিলনের সুর লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রেমে দেওয়ানা–প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর গানে মূর্ত। ভোগ-বিলাসের মধ্যে থেকেও তিনি সংসারের বাসনা কামনা থেকে নিজের মনকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। কঠিন ছিল এই সাধনা। তাই তিনি বলেন–

> “তিরি হইল পায়ের বেড়ি, পুত্র হইল খিল
> কেমনে করিবায় হাছন বন্দের সঙ্গে মিল।”[৪৯]

মানুষের জীবনের প্রধান অবলম্বন প্রেম। জীব প্রেম, সংসার প্রেম, পরমাত্মার প্রেম–যাই হোক না কেন, বেঁচে থাকার একমাত্র পুঁজিই প্রেম। প্রেমহীন জীবন অসার। আর যখনই উপলব্ধি আসে যে জাগতিক প্রেম অর্থহীন তখনই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

> “ছাড় ছাড় হাছন রাজা এই ভবের আশ
> একমনে চিন্তা করিয়া হও তার দাস।”[৫০]

মৃত্যু

১৯২২ সনের ৭ ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।[৫১] সুনামগঞ্জ পৌর এলাকাধীন গাজীর দরগা নামক পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর সমাধি রয়েছে।

হাছন রাজার জীবন মানস

ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্বে পাক-ভারতে মুসলমানরা ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি এবং সম্পদের দিক থেকে অধিকতর উন্নত। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে যারা ছিলেন দেশের কর্ণধার ও সম্পদের মালিক তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ থেকে অধিকতর খারাপের দিকে ধাবিত হয়। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ উইলিয়াম হান্টার তার ‘ইন্ডিয়ান মুসলমান’ গ্রন্থে এর এক সুন্দর

---

৪৯. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, হাছন রাজায় কয় আমি কিছু নয়, *দৈনিক সবুজ*, সিলেট, ২১ মে ২০০৬।

৫০. প্রাগুক্ত।

৫১. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তুলে ধরেন, যেখানে মুসলমানরা কিভাবে ইংরেজি শিক্ষা, অফিস-আদালত, চাকরি-বাকরি বর্জন করে দারিদ্রের কাঠিন্যে নিঃস্ব হয়ে উঠেন এবং তার বিপরীতে ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায় যারা ইতিপূর্বে ছিলেন বস্তুত প্রজা তারা কিভাবে ইংরেজি আয়ত্ব করে তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন করেন। বিশেষ করে লর্ড হেষ্টিংস এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা চালু হবার পর ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা একেবারে চুলোয় উঠে। এদের মধ্যে দু-একজন জমিদার যারা নিজ প্রতিভা গুণে মুসলমান বা বৃহত্তর বাঙালি সমাজে আজও নিজদের চীর স্মরণীয় করে রেখেছেন এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন হাছন রাজা চৌধুরী। তিনি পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না তবে জমিদার হয়েও সাধারণ প্রজা ও জন মানুষের হৃদয়ের আকুতি, তাদের চিন্তা-ভাবনা, মননশীলতা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের আবেগ-আহ্লাদ নিজের লেখনী ও গানে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

কথিত আছে যে, মরমী কবি হাছন রাজা শুধুমাত্র নিজের স্বাক্ষর দিতে জানতেন এবং তার গান ও কবিতা বিভিন্ন জনদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। তিনি ছিলেন বৃহত্তর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী ও রাম পাশার জমিদার। তার জমিদারীর পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ লক্ষ একর জমি এবং বার্ষিক আয়কর ছিল তৎকালীন মুদ্রায় প্রায় সোয়া এক লাখ টাকা।[৫২] তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাবা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী ও বড় ভাই উবায়দুর রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে তাকেই জমিদারীর হাল ধরতে হয়। প্রথম দিকে অত্যন্ত সবল হাতে তার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি সাজা দেন এবং নির্মম হস্তে নিঃশ্চিহ্ন করে প্রতাপশালী জমিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তবে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য যুবক-জমিদারদের মতো তিনি তার জমিদারীর বিশাল আয় আরাম-আয়েশ বা প্রমোদে বিসর্জন দেন নি, এমনকি তিনি একটি সাধারণ বাড়িতে জীবন যাপন করতেন। কথিত আছে যে, একদিন একদল দর্শনার্থী হাছন রাজার জমিদারী বাড়ি দেখতে আসেন। তারা জমিদার বাড়ির বিশালত্ব বা জাকজমক পূর্ণ অট্টালিকা ও দালান কোঠা না দেখে এক পথিককে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা দূর দেশ থেকে হাছন রাজার জমিদার বাড়ি দেখতে এসেছেন। ঐ পথিকটি হাছন রাজা নিজেই। কথাটি শুনে হাছন রাজা মুচকি হাসি হেসে একটি নিকটস্থ কবর বা গোরস্থানে তাদের নিয়ে যান এবং এক খণ্ড জমি দেখিয়ে বলেন, "ঐখানে হাছন রাজার জমিদার বাড়ি।" তাঁর জমিদারীর অধিকাংশ এলাকা ছিল ভাটা বা নদী-নালা বেষ্টিত। তিনি প্রায়শ নৌবিহারে জমিদারী দেখতে যেতেন। সঙ্গে ৫/৭ টি নৌকার বহর নিয়ে তিনি চলাফেরা করতেন।

---

৫২. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, হাছন রাজা লোক সংস্কৃতি উৎসব এর বিশেষ স্মরণিকা, রঙের বাড়ই, ২৮ ও ২৯ আক্টোবর ২০০৬, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি, নিউইয়র্ক।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি জমিদার হিসাবে ছিলেন কঠিন, তবে মানুষের সাহায্যে ছিলেন দিল-দরিয়া। কথিত আছে যে, একবার তিনি জমিদারী পরিদর্শনে গেছেন। পাশের এক জমিদার বাড়িতে হঠাৎ করে উপস্থিত হন এবং এক গ্লাস পানি খাবেন বলে জানান। ঐ গ্রামে কোন বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্যে কোনো পুকুর ছিল না এবং সে জন্যে প্রতিবেশী গ্রাম থেকে হাছন রাজার জন্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল আনতে সময় লাগে। এত সময় লাগার কারণ তিনি যখন জানতে পারলেন তখন তিনি পার্শ্ববর্তী নিজ জমিদারী থেকে একদল লোক দিয়ে ঐ জমিদার বাড়ির আঙ্গিনায় এক বিরাট পুকুর তৈরির আদেশ করেন। ঐ পুকুরটি তখন থেকে হাছন রাজার দীঘি হিসেবে সুপরিচিত।[৫৩]

হাছন রাজার বংশ-পরিবারে হিন্দু-মুসলমানের মিল থাকায় এবং সেই সময়ের বৃহত্তর সিলেট জেলা হিন্দু ও মুসলমানের তীর্থস্থান রূপে পরিচিতি লাভ করায় হাছন রাজার মানস প্রকৃতি ও ভাবধারা অসম্প্রদায়িক, উদার ও পরমত সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে। বিশিষ্ট গবেষক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেন, "আমি প্রাচীন বিশ্বস্ত লোকের বাচনিক থেকে জানতে পেরেছি কাশিপুর মৌজা পতনের পূর্বে হাছন রাজা ভবিষ্যৎ বসবাসকারীদের দ্বারা কালীপূজা করিয়ে ছিলেন এবং এ পূজা উপলক্ষ্যে সাতশত টাকা প্রজাদের দান করেছিলেন।" এমন উদার আর ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল মানুষ একালেও বিরল বলে হাছন রাজা বিশেষজ্ঞ শামসুজ্জামান খান মন্তব্য করেন।[৫৪]

বস্তুত হাছন রাজার সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশে একদিকে ইসলামিক সংস্কৃতি ও ভাবধারা ইংরেজদের নিপীড়নে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে এবং অন্যদিকে হিন্দু সংস্কৃতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ জীবনে বলিষ্ট হয়। তার ফলে তৎকালীন লেখক-সাহিত্যিক-গবেষকদের জীবনে পরস্পর বিরোধী অবস্থান অবলোকন করা যায়। যেমন, হাছন রাজার সমসাময়িক জমিদার বংশীয় মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৯-১৯১১) যিনি রাজনীতি সচেতন ও সাংবাদিক ছিলেন, তিনি 'কারবালা' কাহিনী ও 'বেহুলা লক্ষিন্দর' উপাখ্যানকে তার বিষয়-বস্তুর মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার 'গোজীবন' বইয়ে গরু হত্যা না করার সুপারিশ করেন। তবে পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক জীবন চেতনার প্রতিফলন তার সাহিত্য ও লেখনীতে প্রকাশিত হয়। হাছন রাজা যুগের এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মের তীর্থস্থান সিলেটের তৎকালীন মানস-প্রকৃতি, সবার উপরে মানুষ সত্য, সেই ভাবাবেগেই ভক্তি- সাধনায় মনোযোগী হন। শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি, সূফি-সাধক শাহজালালের পুণ্যভূমি ও বৈষ্ণব ধর্মের মহাগুরু গৌরাক্ষ্য নাথের আবাস ভূমি সিলেট জেলায় যে উদার

৫৩. প্রাগুক্ত।
৫৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ও সমন্বয়বাদী ধর্মীয় সংস্কৃতির ভাবধারা গড়ে ওঠে– বস্তুতপক্ষে হাছন রাজা এ সূফী-সাধক, পীর-মুর্শিদ-দরবেশ, সাধু-মরমী ভাবুকের যোগ্য উত্তরসূরি ও এক অবিস্মরণীয় নায়ক। তাঁর জীবন চরিত্রে এই মরমী ভাবের অপূর্ব প্রকাশ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁর ধ্যান-ধারণার নিছক ধর্মীয় আদব-কায়দা বা তাসবি জপলেই খোদা পাওয়া সম্ভব নয়– খোদা পেতে হলে অবশ্যই প্রেমিক হতে হবে। বস্তুত সবাইকে সমভাবে ভালবাসার মধ্যেই খোদা পাওয়া সম্ভব। কবির ভাষায়–

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে রে মন,
খোদা মিলে প্রেমিক হইলে
আর যদি খোদা ধরতে চাও
তার মনে পিরীত বাড়াও।[৫৫]

হাছন রাজার গান ও ইসলামী ভাবনা

সিলেট বিভাগের মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারায় হাছন রাজা তার কালজয়ী হৃদয় উদাস করা গানের মাধ্যমেই দেশ-বিদেশে পরিচিত। হাছন রাজা নিজেকে মাবুদের কুদরতের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে সুরময় ভুবনে বিচরণ করে এক দুর্লভ রসোলব্ধির চরম স্বাদ গ্রহণ করেছেন। তাইতো তিনি বলতে পেরেছেন :

'হাছন রাজায় আল্লাহ বিনে কিছু নাহি মাঙে।'

এক সময় হৃদয় স্পর্শকারী গায়কের সাথে হৃদয় স্পর্শ কাতর সমজদার শ্রোতাও ছিলেন। এখন রেডিও টেলিভিশনের বদৌলতে মরমী সঙ্গীত মাঠে ময়দানে গাওয়া হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু সেই হৃদয় নিঙড়ানো ভাব ভক্তি আছে কিনা এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ রয়েছে। এ কারণেই হাছন রাজার অনুরোধ :

"আমি করিরে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না
কিরা দেই, কছম দেই, আমার বইয়ে কেউ হাত দিবে না।
অপ্রেমিকে শুনলে, এ গানের কিছু মাত্র বুঝবে না
কানার হাতে সোনা দিলে লাল ধলা চিনবে না।
হাছন রাজায় কছম দেয়, আর দেয় মানা
আমার গান শুনবে না, যার প্রেম নাই জানা।"[৫৬]

---

৫৫. ইমন সম্পাদিত, হাছন রাজার গান (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৪), পৃ. ১২
৫৬. সৈয়দ মোস্তাফা কামাল, হাছন রাজার গান, রঙের বাড়ই, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের দুনিয়ায় আসা যেমন একা তেমনি বিদায়ও হতে হয় একাই এবং রিক্ত হাতে। এ কারণে হাছন রাজা আক্ষেপ করে বলেন :

"মরণ কালেরে (হাছন) কে যাইব তর সঙ্গে
তুমিত ভুলিয়া আছ তিরি পুত্রের রঙ্গেহ।
কিসেতে কি কররে মন আঙ্গে আর ডাঙ্গে
স্বামীর সেবা না করিলে ধরাইবনি লাঙ্গে।
স্বামীর সেবা না করিলায় দিন গেল গাইয়া
বে-ভুলে মজিয়া রইলায় কারবা পানে চাইয়া।
আমারে ভাসাইলায় গো আল্লাহ সুরমা নদী গাঙ
ভাসিয়া ভাসিয়া হাছন রাজায়, তোমার চরণ মাঙে।"[৫৭]

হাছন রাজা অনুশোচনার তাড়নায় বিরান হয়ে আফসোস করে বিলাপ করেন, শেষ বিচারের কথা চিন্তা করেন–

"কি হইব মোর হাসরের দিন রে মমিন ভাই
মমিন হায়রে কি হইব মোর হাসরের দিন
এই ভাবনায় মরে হাছন, বন্ধেনি বাজে ভিন্।
আল্লাহতায়ালা কাজী হইয়া বসিবা ছঙ্গাসনে।
নেকি-বদি তৌলাইবা এই কথাটা উঠে মনে।
এই কথা মনে লইয়া হাছন রাজা আউলা-ঝাউলা
লক্ষণছিরির লোকে বলে হাছন রাজা হইছে বাউলা।
হাছন রাজা কাঁন্দন করে কি হইব উপায়
দয়া করিয়া বন্ধে যদি, রাখে রাঙা পায়।"[৫৮]

মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। 'কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মাউত' (আল-কুরআন) জীব মাত্রই মউতের পেয়ালা পান করবে। মরণকে কেউ রোধ করতে পারবে না। মরণ অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী। আল-কুরআনে মউত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"মউতের স্বাদ করিব গ্রহণ অবশ্যই প্রতি জন
কর্মের ফল পাবে কিয়ামতে সকলেই বিলক্ষণ

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৫৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নার-হতে দূরে রহিবে যেজন করি জান্নাত লাভ

সেই কামিয়াব, ধরার জীবন ছলনার আসবাব।”[৫৯]

অতএব এই মৃত্যুকে ভুলে আসার দুনিয়ায় নর্তনকুর্দন করা সমীচীন নয়। হাছন রাজাও তাই আক্ষেপ করে উচ্চারণ করেন :

“মরণ কথা স্মরণ হইল নারে

হাছন রাজা তর্, মরণ কথা স্বরণ হইল না।

যখন মইরা যাইবায় মাটিত হইব বাসা

কোথায় রইব লক্ষণছিরি রংগের রামপাশা।

হাড় খাইব হাড়িয়া পোকে মাড়ইল খাইব ঘুণে

পুণ্য পন্থা না চিনিলায় যৈবনের গুমানে।

না রহিব ঘর-বাড়ী না রইব সংসার

না রহিব লক্ষণছিরি নাম পরগণার।

কাঁন্দিয়া হাছন বলে আল্লাহ কর সার

কি ভাবিয়া নাচ হাছন শূন্যের মাঝার।”[৬০]

মানুষ নিয়তির হাতের পুতুল। সে যেমনে চালায় তেমনি চলে। সমগ্র সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার প্রকাশ, তবুও তাঁকে দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে হাছন রাজার দর্শন হচ্ছে :

বারে, কই লুকাইলায়রে-ঘরখানি বানাইয়ারে

বারে, কই লুকাইলায় রে।

ঘরে বাইরে হাছন রাজায় তুকাইল রে।

বরুয়া বাঁশের ঘরখানি মাখাল বাঁশের বেড়া।

উলুছন দিয়া দিছে ঘরের ঐনা ছানি

মেঘ আসিলে চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া পড়ে ঘরে পানি।

সকল ঘরে বিছারিয়া দেখি টুল্লিতে দুয়ার

সেই খানে বসিয়া আছে বন্ধুয়া আমার।

বন্ধুরে দেখিয়া আমার চিত্ত যে ব্যাকুল

হাছন রাজায় গান গায় বাঁজাইয়া ঢোল।”[৬১]

---

৫৯. আল-কুরআন, ৩:১৮৫

৬০. সাব্বির আহমদ চৌধুরী, হাছন রাজার গানে অধ্যাত্মিকতা, হাছন লোক উৎসব স্মারক গ্রন্থ, জানুয়ারি ১৯৯৪।

৬১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকের বিরহ অনলে প্রেমিকার চিত্ত ব্যাকুল। এ অনল দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। বুঝানোও যায় না। যে জ্বলে সেই জানে এ দহনের জ্বালা। মানব মনের প্রজ্বলিত আগুনের জ্বালার বর্ণনা রয়েছে হাছন রাজার একটি গানে :

"আগুন লাগাইয়া দিল কনে, হাছন রাজার মনে
নিভেনা নিভেনা আগুন, জ্বলে দীলে জানে।
ধাক্ ধাক্ কইরা উঠল আগুন ধৈল আমার প্রাণে
সুরমা নদীর জল দিলে নিভেনা সে কেনে।
লাগাইল-লাগাইল আগুন, আমার মনমোহনে
বাঁচিনাগো বাঁচিনাগো, প্রাণ বন্ধু বিহনে।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া যায়রে আগুন কিছু নাহি মানে
বুঝিয়া দেখ্‌রে হাছন রাজা ধরাইল না তর ধনে।"[৬২]

এ আগুন ভাবুকের মনকে করে উতলা। সে তার মাবুদকে পেতে চায় ইশকের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে। আত্মভোলা হয়ে হাছন রাজাও তাই আক্ষেপ করে উচ্চারণ করেন :

"বিকাইলেনি ঐ বন্ধে কিনে গো সজনী, সই–
বিকাইলেনি ঐ বন্ধে কিনে,

ছাইড়া থাকতে পারবনা গো-কি হইল মোর মনে।
তার লাগিয়া মনে আমার মনে ধৈর্য নাহি মানে
কি জানি কি কৈলগো মোরে মন-মোহনে।
তার সম কেহ নাই এই ত্রিভুবনে
তার মত নাহি দেখি ধিয়ানে গিয়ানে।
পাগল করিলগো বন্ধে না জানি কেমনে
বাঁচবনা গো হাছন রাজা প্রাণ বন্ধু বিহনে।
হাছন রাজার মনের মাঝে জীয়নে মরণে
সর্বদা থাকিতাম আমি প্রাণ বন্ধের চরণে।"[৬৩]

---

৬২. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, হাছন রাজায় কয় আমি কিছু নয়, দৈনিক সবুজ, সিলেট, ২১ মে, ২০০৬।
৬৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধের চরণে ঠাঁই পেতে হলে খাঁটি প্রেমিক হতে হয়। এ বাজারের দোকানদার খরিদদার আশেক-মাশুক। ভবের কড়ি দিয়ে ভাবের তেজারত করা যায় না। অথচ–

"প্রেমের বাজারে বিকে, মানিক সোনারে–
যে জনে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় তার দুনা রে।
প্রেমিকেরা প্রেম বাজারে করে আনা-যানা
অ-প্রেমিকে যায় না সেতায় চউখ থাকিতে কানা-রে।
প্রেম বাজারে গিয়া যারা বানাইছে থানা
মরণ তাদের দূর হইয়াছে সর্বদাই জী'নারে।
হাছন রাজা প্রেম বাজারে গিয়া হইল ফানা
নাচন পিছন কইরা গায় প্রেমেরই যে গানারে।"[৬৪]

এই দুনিয়া মায়াপুরী। এখানে থরে বিথরে সাজানো হরেক রঙের মনভুলানো পশরা। মানব মন সহজেই এতে আকৃষ্ট হয়ে যায়। যখন পিছন ফিরে তাকায় তখন আক্ষেপ করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকে না। ভবের বেড়ি পরে হাছন রাজাও তাই আক্ষেপ করেছেন বিভিন্ন গানে। কারণ, মানব সন্তান যখন দুনিয়ার জিন্দেগীর শেষ প্রান্তে উপনীত হয়, তখন তার মনে হতাশার সুর বাসা বাঁধে। সারা জীবনের কৃত কর্মের খতিয়ান টেনে যখন দেখে জমার কোঠায় শূন্য, তখন আক্ষেপের অন্ত থাকে না। এজন্য হাছন রাজাকেও আমরা শেষ জীবনে উচ্চারণ করতে দেখি একই আক্ষেপের পঙ্‌ক্তি মালা। যাতে সব কিছু ত্যাগ করে কেবল মাবুদের রহমতের আশায়–দীদার কামনায় একই সুরে গাইতে :

"আমি যাইমু, আল্লার সংগে। আমি যাইমু....
হাছন রাজায় আল্লা বিনে, কিছু নাহি মাঙে ॥
আল্লার রূপ দেইখা হাছন হইয়াছে ফানা
নাচিয়া নাচিয়া হাছন গাইতে আছে গানা ॥
আল্লার রূপ, আল্লার রং, আল্লার ছবি
নুরের বদন আল্লার কি কইমু তার খুবি ॥
হাছন রাজা দিলের চক্ষে আল্লাকে দেখিয়া
নাচে নাচে হাছন, প্রেমে মাতাল হইয়া ॥

৬৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মাদ হইয়া নাচে, দেইখা আল্লার ভংগী
হুশ্ মুশ্ কিছু নাই, হইছে আল্লার সংগী ॥"[৬৫]

হাছন রাজা অনুভব করেন মহান আল্লাহর শান ও ক্ষমতা অসীম। মানুষ নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র। মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। আল্লাহ পাক অজয়-অমর। তাঁর ক্ষয় নেই, লয় নেই। তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। মানুষের হায়াত মউত রিজিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কখন কোথায় কার মৃত্যু হবে তা কেউ বলতে পারে না। এ কারণে সবাইকে সর্বদা হুশিয়ার থাকতে হয়। মরণকে স্মরণ রাখতে হয় হরদমে হরদমে। তাইতো হাছন রাজা বলেন :

"মরণ কথা স্মরণ হইল নারে–
হাছন রাজা তর, মরণ কথা স্মরণ হইল না। "[৬৬]

এ কারণে হাছন রাজা মানুষকে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে অনুরোধ জানান। তিনি গাইলেন :

"মোমিন ওরে ভাই-ভাইরে ঈমান রাখিও দৃঢ়
ঈমান না থাকিলে মোমিন কিসের নামাজ পড়।
এক আল্লাহ বিনেরে, (মোমিন) শরীক নাহি আর
'লা-শরীক ইল্লাল্লাহ' জানিবায় সার
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী রসুল আল্লাহর।
নবীকে ভেজিলা আল্লায় হেদায়েত কারণ
কোরান নাজিল কৈলা অমূল্য রতন।
আল্লাহর কালাম আইল, নবীজির ঠাঁই
জিব্রাইল ফিরিস্তায় কালাম আনিয়া দিলা ভাই ॥
আল্লাহর কালামের কথা জানিবায় হক
নবীজির হাদীসের কথা মানিবায় বে-শক।
ঈমান রাখিও, ভাব রাখিও, আর রাখিও ভক্তি
ঈমানে মরিলে মোমিন, পাইবায়রে মুক্তি।
হাছন রাজায় ভিক্ষা চায় ঈমান তোমার ঠাঁই ॥
জান্ বাহির হইতে যেন তোমায় দেইখ্যা যাই।"[৬৭]

---

৬৫. *জালালাবাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৬৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মায়াময় পৃথিবীতে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার জিন্দেগীতে মশগুল হয়ে যায়। যখন শেষ জীবনে ফিরে তাকায় তখন দুনিয়ার জিন্দেগীর মেয়াদ শেষ হলেই তাকে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালার সকাশে চলে যেতে হয়।[৬৮] এই সংসার জীবনের অনিত্যতার জন্যে হাছন রাজাও আক্ষেপ করে উচ্চারণ করেছেন :

"লোকে বলে, বলেরে- ঘর-বাড়ি ভালা নায় আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরই মাজার।"[৬৯]

মানব দেহের সৃষ্টির রহস্য ফুটে উঠেছে হাছন রাজার সহজ সরল ভাষায়। এখানে দর্শনের জটিল তত্ত্ব ও তথ্য হৃদয় উৎসরিত গানে একাকার হয়ে সর্বসাধারণের মাঝে ঠাঁই করে নিয়েছে, সবার মনের কথা হয়ে–

মাটি দিয়া ঘর বানাইয়া চামড়ার দিছে ছানি
পত্তন কোইরাছে ঘর মুলধন যে তার পানি।
ঘরখানি বানাইয়া ঘরে বইসা রংগ চায়
ছয়টি রিপু দিছে ঘরে কেমনে খেইড় খেলায়।"[৭০]

দেহ রূপ ঘরের মহান কারিগর কাছেই আছেন অথচ তাঁকে দেখা যায় না। এ কারণে ভাবুকের মন পাগলপারা, তাঁর দর্শনের আশায়, দীদারের কামনায়। তাইতো হাছন বলেন :

"আখী মুজিয়া দেখ রূপরে, আখী মুঞ্জিয়া দেখ রূপ
দীলের চক্ষে চাইয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপ।
কাজল কোঠা ঘরের মাঝে বইসাছে কালিয়া
দেখিয়া প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া।
কিংবা শোভা ধরে রূপে দেখতে চমৎকার
বলা নাহি যায় বন্ধের রূপের বাহার রে।
ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করে রূপে বিজুলীর আকার
মনুষ্যের কি শক্তি আছে চক্ষু ধরিবার রে।
হাছন রাজা রূপ দেখিয়া হইলা ফানা ফিল্লাহ্
হুঁ হুঁ ইয়াহুঁ বল আল্লাহ আল্লাহ-রে।"[৭১]

---

৬৭. *রঙের বাড়ই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৬৮. দেওয়ান হাছন রাজা, *হাছন উদাস* (সিলেট : ইসলামিয় প্রেস, ১৯০৭), পৃ. ২১
৬৯. প্রাগুক্ত।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের অগণিত অসংখ্য গান রচনা করে গেছেন মরমী কবি হাছন রাজা। যেসব গানে শরীয়ত, মারিফত তথা ইসলামী সংস্কৃতির পরিস্ফুটন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গান ও কবিতা যুগ যুগ ধরে দেশ পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সমানভাবে সমাদৃত।

দুর্বিন শাহ (১৯২০-১৯৭৭)

দুর্বিন শাহ শুধু সুনামগঞ্জের নয়, গোটা বাংলাদেশর একজন শ্রেষ্ঠ মরমী গীতি কবি। বাংলা লোক-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ও বাউল সাধক।

তিনি ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৫ কার্তিক, ১৯২০ সালের ২ নভেম্বর ছাতক থানার সুরমা নদীর উত্তর পারে নোয়ারাই গ্রামের তারামণি টিলায় জন্মগ্রহণ করেন।[৭২] এই তারামণি টিলা কালান্তরে দুরবিন টিলা নামে পরিচিতি লাভ করে। তার পিতা সফাত আলী শাহ ছিলেন একজন সূফী সাধক এবং মা হাসিনা ভানু ছিলেন একজন পরহেযগার ও ধার্মিক মহিলা। ফলে সঙ্গীত চর্চার একটা পারিবারিক ঐতিহ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি বাবাকে হারান। ১৯৪৬ সালে সুরফা বেগমের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৭৩]

তাঁর অধিকাংশ গানে সূফী ও মরমিবাদ যতেষ্টভাবে ফুটে উঠলেও এ সবের বাইরে ভিন্ন মেজাজের অসংখ্য গান তিনি রচনা করেছেন। এ সব গানকে বাউল, বিচ্ছেদ, আঞ্চলিক, গণসঙ্গীত, মালজোড়া, জারি, ভাটিয়ালী, হামদ-নাত, মারিফতি, দেহতত্ত্ব, কামতত্ত্ব, নিগূঢ় তত্ত্ব বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তিনি ১৯৬৭ সালে প্রবাসী বাঙালিদের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডে যান। তাঁর অন্যতম সফরসঙ্গী ছিলেন বাউল সাধক শাহ আব্দুল করিম। সেখানে তাঁর গানের কথা ও সুরে বিমোহিত হয়ে সঙ্গীতপ্রেমিরা তাঁকে 'জ্ঞানের সাগর' উপাধীতে ভূষিত করেন।[৭৪]

তাঁর রচিত গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

১. পরদেশীরে দূর বিদেশে ঘর

২. নির্জন যমুনার কূলে, বসিয়া কদম্বতলে

৩. নব যৌবন আষাঢ় মাসে

৪. আমার অন্তরায়, আমার কলিজায়

৫. তোমার মত দরদী কেউ নাই

---

৭২. ভাবের তরঙ্গ, *দুর্বিন শাহ জীবনী*, ১৮ নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৯

৭৩. প্রাগুক্ত।

৭৪. www.bn.m.wikipedia.org

Dhaka University Institutional Repository

৬. ছাড়িয়া যাইও না বন্ধুরে

৭. আমি জন্মে জন্মে অপরাধী তোমারই চরণে

৮. কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু নামটি তোমার সংসারে

১৭৯৪ সালে কলকাতার প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋতিক ঘটক তার 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' চলচ্চিত্রে দুর্বিন শাহের লেখা 'নামাজ আমার হইলনা আদায়' শীর্ষক গানটি ব্যবহার করেন।[৭৫]

তিনি ৫৭ বছর বয়সে ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ৩ ফাল্গুন, ১৯৭৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৬]

বাউলদের সাধনপদ্ধতি এবং এ সম্পর্কিত পদাবলি তাঁদের গোপন-সাধনার অংশবিশেষ। বাউলেরা তত্ত্বসমৃদ্ধ গানগুলো কেবল নিজেদের মধ্যেই আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখতেন। তবে সিলেট ও নেত্রকোনা অঞ্চলের বাউলেরা এসব গান সাধারণ মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্য মঞ্চেও পরিবেশন করতেন। ফলে গোপন-তত্ত্ব সমৃদ্ধ এসব পদাবলির ভাবার্থ শ্রোতাদের কেউ কেউ বুঝতেন, আবার কেউ বুঝতেন না।

দুর্বিন শাহ এই বাউল-পরম্পরারই সার্থক উত্তরসূরি। ভবতোষ দত্তের অভিমত, 'বাউল কবিদের গানের রূপ চিরকাল একই রকম'। বাউলদের সম্পর্কে তাঁর আরও বক্তব্য হলো, "কবিদের ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ তাদের গানে নেই বলে এবং গানগুলো তত্ত্বমূলক বলে তাদের বক্তব্যেও কোনও বিভিন্নতা নেই। কয়েকজন যথার্থ শক্তিমান বাউলকবির রচনা ছাড়া অন্যদের রচনাকীর্তিও একই রকম। যাঁরা শক্তিমান তাঁদের রচনার সৌন্দর্য ভাষায়, বক্তব্যে কোনও বৈচিত্র্য নেই।"[৭৭]

বস্তুত রচনাশৈলীর কিছু ভিন্নতা ছাড়া প্রায় সব বাউলের গানের অর্থ একই। এর বাইরে নন দুর্বিন শাহও। লালনের মাধ্যমে বাউলগান নতুন উচ্চতায় আসীন হয়েছে, এটি প্রায় সকল গবেষকের ধারণা। বলা যায়, লালনের একক প্রভাবেই তৎকালীন নদীয়া, বীরভূম, কুষ্টিয়া, যশোর, রাজশাহী অঞ্চলে বাউলগানের ধারা বেগবান ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। তবে নীরবে-নিভৃতে লালনেরও জন্মের আগে থেকে সিলেট অঞ্চলে বাউল-ফকিরদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ধারা যেভাবে এগিয়ে চলছিল, কোনও কারণে সেটা গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সিলেটের সপ্তদশ শতকের দীন ভবানন্দ ও সৈয়দ শাহনুর (১৭৩০-১৮৫৫)-সহ অন্যরা সে চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মৌলভীবাজারে

---

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. *দুর্বিন শাহ জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৭৭. সুমন কুমার দাশ, দুর্বিন শাহ, তাঁর গান, তাঁর কথা, 'হাওরপাড়ের গল্প' শীর্ষক লোক উৎসবে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২৮ আক্টোবর, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

ফকির ইয়াসিন শাহ (১৮ শতকের শেষ দিকে জন্ম), সিলেটের শিতালং শাহ (১৮০০-১৮৮৯) হয়ে সে ধারা পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময়টাতেই বাউল-ফকিরদের আধিক্য বেড়ে যায়।

দীন ভবানন্দ কিংবা সৈয়দ শাহনুরদের প্রভাবে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ফকিরি ও বাউলগানের স্বতন্ত্র একটি ধারা তৈরি হয়েছিল। সে ধারাটিতে একেক সময় একেক ফকির ও বাউলসাধক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে দৈখোরা, শিতালং শাহ, ইয়াসিন শাহ, শেখ ভানু (১৮৪৯-১৯১৯), হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২), উকিল মুনশি (১৮৮৫-১৯৭৮), রশিদ উদ্দিন (১৮৮৯-১৯৬৪), জালাল উদ্দীন খাঁ (১৮৯৪-১৯৭২), শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯), আবদুস সাত্তার (১৯১৮-১৯৩৯) এবং দুর্বিন শাহ উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃতি, পরিবেশ এবং আঞ্চলিক তারতম্যের কারণে কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলগানের সঙ্গে সিলেট তথা ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউলগানে আচরণ ও রীতি-নীতির মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও বাউল-দর্শনের মোটেই ব্যত্যয় ঘটেনি। কুষ্টিয়া-নদীয়া-বীরভূম-যশোর অঞ্চলে বাউল মতবাদে বিশ্বাসী অসংখ্য সাধকের সন্ধান পাওয়া গেলেও তাঁদের মধ্যে পদাবলি রচয়িতার সংখ্যা খুবই নগণ্য। উপর্যুক্ত অঞ্চলে লালন, কুবির গোঁসাই, জাদুবিন্দু, লালশশী, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহসহ আরও কিছু সংখ্যক পদকর্তাদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সিলেট-সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা অঞ্চলে পদকর্তাদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। সে তালিকার শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের মধ্যে দুর্বিন শাহের নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্বিন শাহর গানে দেহতত্ত্ব এবং বাউল-দর্শনের গুহ্য ও নিগূঢ় বিষয়াবলি পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর গানের ভাষা পূর্বসুরি বাউল সাধকদের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোরান-পুরাণ-শরিয়ত-মারিফত বিশ্লেষণের পাশাপাশি দেহের নানা পরিপাকযন্ত্র ও রেচন-প্রক্রিয়াকে উপজীব্য করে তিনি গানের কাঠামো তৈরি করেছেন। এ কাঠামোর পরতে পরতে রয়েছে নানা রকমের সাংকেতিক ভাষা এবং বাউলদের গোপন তত্ত্ব। তবে এসব তত্ত্বপূর্ণ কথা কোনও অধ্যাত্মবাদী চেতনার প্রতিফলন নয়, বরং তাঁর গান আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত শব্দগুলো ধারণ করে বস্তুবাদী চেতনারই প্রকাশ ঘটিয়েছে। এমনকি জাতিগত বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় হানাহানির বিপরীতে তাঁর গান এক সমন্বয়বাদী চেতনার উৎস। মানবতাবাদ তাঁর গানের অন্যতম অবলম্বন।[৭৮] দুর্বিন শাহের ক্ষেত্রে শুধু নয়, মানবতাবাদ দর্শনটিই বাউলসাধনার প্রধানতম শর্ত।

৭৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাউল বলতে এক কথায় আমরা যা বুঝি তা বাংলায় সূফী আর বাউল সাধনার ধারার সমন্বয়ে সৃষ্ট জীবনদর্শন। এই বাউল ও সূফীরা যে মানুষের সন্ধানী হয়েছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে গূঢ়তত্ত্বের ব্যাপার হলেও সামাজিক দৃষ্টিতে তা ছিল জাত পাত ধর্মের উপরে মানবতা প্রতিষ্ঠা।

লালন যেমনটা তাঁর গানে বলেছিলেন, 'মানবতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে/ সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।' একই সাম্যবাণীর কথা যেন প্রতিধ্বনিত হয় দুর্বিন শাহের গানের পঙ্‌ক্তিতে : 'গরিব দুঃখী চাষি মজুর সবার সমান অধিকার'।

সাম্যবাদ, বাউলতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব যেমন দুর্বিন শাহের গানের পঙ্‌ক্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি অসংখ্য বিচ্ছেদ গানের রচয়িতাও তিনি। খালেদ চৌধুরী যেসব গানকে 'বাউলা গান' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তাঁর অভিমত অনুযায়ী বিচ্ছেদ গানও সেই পর্যায়ভুক্ত। বোধ করি–গীতিকার দুর্বিন শাহ মঞ্চ কিংবা গানের আসরের দর্শক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য এসব গান রচনা করেছিলেন এবং শিষ্য-ভাবশিষ্যদের নিয়ে দলবলসহ গেয়েছিলেন। বিচ্ছেদ গোছের হলেও এসব গানের ভাবার্থ এবং দ্যোতনা শ্রোতাদের কাছে নান্দনিক আবেদন সৃষ্টি করে।

দুর্বিন শাহ মানুষের আবেগ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সেটা সম্ভব হয়েছে বলেই মানুষের প্রেম-বিরহ, দহন-ভালোবাসা নতুন মাত্রা পেয়েছে তাঁর গানে। কোনও গানে পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণ চরিত্র কিংবা কোনও গানে নিজেকেই নারী ভেবে মূল চরিত্র হিসেবে কল্পনা করে প্রাঞ্জল ভাষায় গানের কাঠামো সাজিয়েছেন। ফলে এসব গান সাধারণ মানুষের কাছে পেয়েছে অমরতা। বিচ্ছেদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দুর্বিন শাহর উক্তি :

> "আমার অন্তরায় আমার কলিজায়
> প্রেমশেল বিঁধিল বুকে মরি হায় হায় ॥
> মারিয়া ভুজঙ্গ তীর, কলিজা করিল চৌচির
> কেমনে শিকারী তীর মারিল গো
> বিষ মাখিয়া তীরের মুখে, মারিল তীর আমার বুকে
> দেহ থইয়া প্রাণটি লইয়া গেল গো ॥"[৭৯]

উপর্যুক্ত গানের আবেদনে বিরহী শ্রোতাদের অন্তরে চিরস্থায়ী 'বিরহ-দহন' সৃষ্টি হয়। এ-রকম বেদনা থেকেই হয়তো গীতিকারের আর্তি–'বন্ধু আইও, আইও আমার বাড়ি, বন্ধু আইও/ আইও বন্ধু, আইও বন্ধু, আইও আমার বাড়ি ॥' বন্ধুকে নিজের কাছে একান্তে পেলেই কেবল 'প্রেমশেল' দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার

---

৭৯. দুর্বিন শাহ, প্রেম সাগর পল্লীগীতি, ৫ম খণ্ড, ১৯৭৩, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা অসহনীয় বিরহ যন্ত্রণার আশঙ্কা থাকে না। যুগে-যুগে কালে-কালে 'অবলা নারীরা' পুরুষের 'প্রেমের ফান্দে' পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, অথচ সেই দুঃখ প্রকাশ করার ভাষাও যেন তাঁদের নেই। বন্ধুর বাঁশির সুরে পাগলপ্রায় নারীর অন্তর তাই কেঁদেই চলছে এই ভাবনায় :

"নির্জন যমুনার কূলে বসিয়া কদম্বতলে
বাজায় বাঁশি বন্ধু শ্যামরায় ॥
বাঁশিতে কি মধুভরা আমারে করিল সারা
আমি নারী গৃহে থাকা দায়
কালার বাঁশি হলো বাম বলে শুধু রাধা নাম
কুলবধূ কুলমান মজায়
বাঁশির সুরে অঙ্গ জ্বলে ঘরের জল বাইরে ফেলে
মনে লয় যাব যমুনায় ॥"[৮০]

বন্ধুর প্রতি হৃদয়ের এতই টান, যে টানে চিত্ত সর্বদা ব্যকুল। কীভাবে সার্বক্ষণিক বন্ধুকে নিজের কাছে রাখা যায়–সে চিন্তায় অস্থির প্রেমিকাচিত্ত। তাই বন্ধু-বিরহে আকুল প্রাণ চায় :

'বন্ধু যদি হইত নদীর জল
পিপাসাতে পান করিয়া পোড়াপ্রাণ করতাম শীতল ॥'

এই বিচ্ছেদগান রচনার পাশাপাশি তিনি বারমাসিও রচনা করেছেন। এই বারোমাসিতে প্রেমিকবিহীন এক অবলা-অসহায় নারীর বেদনাতুর চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এই পিরিত প্রেমের পাশাপাশি বাউলদের গানের আরেকটা বড় ধারা আছে দেহতত্ত্ব।

গুরুভজন, দেহতত্ত্ব আর মনঃশিক্ষা এই তিনটিই বাউল সম্প্রদায়ের প্রধান সাধন প্রক্রিয়া। সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে গুরু বলেছেন, তুমি নিজেকে জানো। তোমার দেহের মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজ করছেন।

বাউল সাধনায় যেহেতু গুরু/মুর্শিদের প্রধানতম শর্তই হচ্ছে নিজের স্বরূপ চেনা-উদ্ঘাটন। তাই এ মতবাদে বিশ্বাসীরা সারাক্ষণ নিজের ভেতরের সত্তার সন্ধানে ব্যাকুল থাকেন। এই সত্তা খুঁজতে গিয়ে 'আপন দেহের খবর' জানতে হয়। শরিয়তকে ব্যবহার করে মারফতি ঢঙে দুর্বিন শাহ বলছেন, 'নিজকে নিজে না চিনিলে নামাজ হবে না'। নিজেকে চেনার মন্ত্রও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এভাবেই :

---

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষ আছে ব্যাপিয়া, দুনিয়া জুড়িয়া
দেখে তাল্লাশিয়া কার আছে রে হুঁশ
মানুষ চিনো নয়নে ধরো যাইয়া চরণে
না চিনে মরিও না কেউ হইয়া বেহুঁশ ॥"
"আত্মস্বরূপেতে দেখিবে নিরালাতে
সর্বদায় মনেতে হইবে আক্রোশ
ভ্রহ্মজ্ঞানের ধারায় যাইয়া প্রেমতলায়
আনন্দমনে হও সিদ্ধ পুরুষ ॥"[৮১]

'গুরুর পদে ধরো যদি পাবে সে ভেদবিধি'। এই 'ভেদবিধি' সংক্রান্ত রীতি-নীতির ধারণা কেবল 'গুরু'-ই দিতে পারেন। গুরুপ্রাপ্ত 'ভেদবিধি'/'ভ্রহ্মজ্ঞান' অর্জন করেই 'আত্মস্বরূপ' উন্মোচন সম্ভব। সেই স্বরূপ উন্মোচনের জন্য গুরুর প্রতি একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। সেই একনিষ্ঠতা থেকেই সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় ভক্ত/শিষ্য সার্বক্ষণিক ব্যাকুল থাকেন। তাই তো দুর্বিন শাহ গভীর আর্তি নিয়ে উচ্চারণ করেন :

"জন্মে জন্মে অপরাধী তোমারই চরণে রে
হায়রে আমারে নি আছে তোমার মনে ॥

বন্ধুয়া রে, শুনিয়াছি নামটি তোমার পতিতপাবন
দয়াময় দয়াল তুমি পাতকী তারণ
কিঞ্চিৎ দয়া করো যারে ও তার ভয় নাই ঘোর নিদানে রে ॥

বন্ধুয়া রে, মনপ্রাণ যৌবন দিলাম চরণে তোমার
পদছায়া দিয়া রাখো জেনে দুরাচার
আশাতে নিরাশ কইরো না আমি দীনহীনে রে ॥

বন্ধুয়া রে, কৃপাসিন্ধু ভক্তের অধীন
নিজ গুণে করো দয়া বাসিও না ভিন
দুর্বিন শাহ তোর চিরদাসী জিয়নে মরণে রে ॥"[৮২]

---

৮১. *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৮২. সুমন কুমার দাশ, সম্পাদিত, *দূর্বিন শাহ সমগ্র* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বিন শাহ অপরাপর বাউলের মতো দেহতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্বের অসংখ্য গান রচনা করেছেন। সাধনায় পথ চলতে হলে 'পঞ্চতত্ত্বের ভেদ' জানা আবশ্যক। তাই দুর্বিন শাহ উত্তরসূরিদের আগেই সতর্ক করে দিচ্ছেন–

'পঞ্চতত্ত্বের ভেদ বুঝিয়া করো রে মন সাধনা
দেহে আছে পঞ্চতত্ত্ব তারে আগে চিনো না।"

সে চেনা সম্ভব হলেই মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। তাই দুর্বিনের সাবধানবাণী–

'পাঁচ-পাঁচা-পঁচিশের তত্ত্ব এই দেহতে আছে সত্য
যে জনায় করেছে আয়ত্ত, এই দেহ লয় হবে না ॥"[৮৩]

বাউল মতবাদ অনুসারীদের দেহের কামভাব ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ না করতে পারাটাই চরম ব্যর্থতা। এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে 'ওপারে' যাওয়া সম্ভব নয়। তাই 'মায়াসাগরে' পরিভ্রমণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতার আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানান দুর্বিন শাহ। একই ধরনের সতর্কতার আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর পূর্বসূরিরাও। দুর্বিন শাহ যেমন বলেছিলেন–

"না জানিয়া ডুব দিও না ওই মায়া সাগরে
কত মাঝির ভরা খাইল মারা পড়িয়া নদীর চক্করে ॥"

এই 'নদীর চক্কর' মানে কামবোধ। কামবোধের যাতনা এতই তীব্র যে, 'নদীর পাকে পড়ে কত সাধু মরে'। তাই 'যখন নদী হয় উতলা' তখন সাবধানে পাড়ি দিতে হয়। নতুবা 'ধরে কামকুম্ভীরে হইয়া পাগেলা'। তবে এই 'কুম্ভীর'-এর হাত থেকে বাঁচার উপায়ও রয়েছে। সঠিক পদ্ধতিতে সাধন-প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারলেই 'অকূলে গতি' পাওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কিত নির্দেশনা দুর্বিন শাহ জানাচ্ছেন এভাবেই–

"যদি যাবে সাধনপথে, ও যদি যাবে সাধনপথে
মায়া বন্ধন করে ছেদন বসো যাইয়া কুম্ভকেতে ॥"

সাধনপথে টিকে থাকার জন্য দুর্বিন শাহ প্রাণায়াম, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ ও কাম-ক্রোধকে বশে আনার নির্দেশনার কথাও উল্লেখ করেছেন।

বাউল মত শুধু ভেক ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এটি যে একটি দর্শন–সেটিই পরিস্ফুটিত হয়েছে দুর্বিন শাহের পদাবলিতে। ষড়রিপু থেকে মুক্ত হয়ে জাগতিক সব ধরনের লোভ, লালসা, কাম থেকে দূরে সরে থাকাই বাউলের জীবনাচরণের অন্যতম শর্ত। সেই জীবনাচরণ ও সাধনায় পথ দেখাতে পারেন একমাত্র গুরু/মুর্শিদ। তাই তাঁর উক্তি– 'মুর্শিদ নাম ভরসা

---

৮৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করি বাদামও উড়াও রে মাঝি' অথবা 'জীর্ণ তরি উঠে পানি, ঢেউ দেখে মোর কান্দে প্রাণী/ ঘুচাও আমার পেরেশানি চরণে বিনয় করি'। মুর্শিদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হলে কেবল 'ভাঙা তরি লইয়া' 'ভব নদী বাইয়া' যাওয়া সম্ভব।

দুর্বিন শাহ রচিত পাক বঙ্গ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ গীতি (১৯৭০) পুস্তিকার ৬টি গান দেশাত্মবোধক-গণসংগীত পর্যায়ভুক্ত। সর্বসাকুল্যে এই ৬টি গান তাঁর সার্বিক গানের বিচারে নগণ্য হলেও এগুলোর আবেদন নিছক কম নয়। এছাড়া সোনার বাংলা সংগ্রাম গীতিকা শীর্ষক তাঁর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১০ থেকে ১২টি দেশাত্মবোধক গান ওই পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। পুস্তিকাটি খোদ রচয়িতার পরিবারসহ কারও সংগ্রহে না-থাকায় গানগুলো দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে।

পাক বঙ্গ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ গীতি ও সোনার বাংলা সংগ্রাম গীতিকা ছাড়াও দুর্বিন শাহ প্রণীত আরও ৬টি গানের সংকলন মুদ্রিত হয়েছে। প্রেমসাগর পল্লীগীতি প্রথম থেকে ষষ্ঠ খণ্ড শীর্ষক এই ছয়টি গানের সংকলনে বাউলতত্ত্বকেন্দ্রিক গানের সঙ্গে বিচ্ছেদ পর্যায়ভুক্ত ৩০৮টি গান রয়েছে। মৃত্যুর আগে দুর্বিন শাহ ৭টি গানের সমন্বয়ে প্রেমসাগর পল্লীগীতি সপ্তম খণ্ডের পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করে গেলেও সেটি মুদ্রিত করে যেতে পারেননি। এর বাইরে তাঁর আরও ৭টি অগ্রন্থিত গানসহ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে দুর্বিন শাহর গীতিমালা শীর্ষক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। এ সংকলনটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেছিলেন মনিরুজ্জামান, বীরেন্দ্রকুমার দাস, সিরাজুল ইসলাম, মো. শওকতুল হাসান চৌধুরী ও আলম শরীফ। এর বাইরেও তাঁর বেশকিছু অগ্রন্থিত গান রয়েছে। গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দুর্বিন শাহ রচিত সাড়ে তিনশোর কিছু বেশি গানের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুমন কুমার দাশ কর্তৃক সম্পাদিত দুর্বিন শাহ সমগ্র-তে ৩৫৫টি গান সংকলিত হয়েছে। অগ্রন্থিত গানের মধ্যে ঋত্বিক ঘটকের যুক্তি তক্কো গপ্পো চলচ্চিত্রে একটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। 'নামাজ আমার হইল না আদায়' শীর্ষক এই গানটি এ-রকম :

"নামাজ আমার হইল না আদায়
নামাজ আমি পড়তে পারলাম না, দারুণ খন্নাছের দায় ॥

ফজরের নামাজের কালে, ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে
জোহর গেল আইতে-যাইতে, আছর গেল কামের দায় ॥

মাগরিবের নামাজের কালে, গিয়াছিলাম গোয়াল ঘরে
গাভী রইল হাওরেতে, বাছুর আমার বান্ধা নায় ॥

এশার নামাজ কালে, বিবি বলে চাউল ফুরাইছে
ছেলে মেয়ের কান্দন শুনে কান্দে পাগল দুর্বিন শায় ॥"

Dhaka University Institutional Repository

এক চরম বাস্তব সত্যকে দুর্বিন শাহ তাঁর গানের পঙ্ক্তিতে ধারণ করেছেন। অভাবের তাড়নায় কাজের চাপে পড়ে নামাজ পড়া তাঁর সম্ভব হচ্ছে না। মুসলিম রীতি অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার বিধান থাকলেও সেই নির্দিষ্ট সময়ে সাংসারিক ঝামেলা এবং চরম অভাব তাঁকে নামাজ হতে দূরে রাখছে। নামাজ না পড়ার অব্যক্ত বেদনা ও আক্ষেপ পরিস্ফুটিত হয়েছে তার এ গানে।

শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯)

সুনামগঞ্জ ভাটি অঞ্চল। বছরের বেশিরভাগ সময় এ অঞ্চলের একটা বড় অংশ ডুবে থাকে জলের মধ্যে। মানুষগুলো দীর্ঘ সময় জলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলে এখানকার অনেকেই গান করে নিজেদের অলস সময়গুলো কাটান। গানগুলো জলে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে দারুণ কার্যকর। মনকে একটা শান্তির আবহ এনে দেয়। আর আবহমান কাল ধরেই এই জলের ভূমিতে মানুষগুলোর রক্তে মিশে যায় মাটি থেকে নিংড়ানো অনুভূতির গানগুলো। এ ভাটি অঞ্চলের গানের ধারাকে যিনি সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ করেছেন, যার গানের ভাষা এ মাটির, যার গানের কথায় আছে আধ্যাত্মিকতা, যার গানের সহজিয়া সুরে ভাটির মানুষেরা মুগ্ধ হয়েছে দিনের পর দিন, তিনি আর কেউ নন বাউল শাহ আবদুল করিম। তিনি বাংলাদেশের কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার। তিনি সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁকে 'বাউল সম্রাট' হিসেবে সম্বোধন করা হয়। বাংলা সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০১ সালে তিনি একুশে পদক পুরস্কারে ভূষিত হন।[৮৪]

প্রাথমিক জীবন

শাহ আবদুল করিম ইব্রাহিম আলী ও নাইওরজানের ঘরে ১৯১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই ইউনিয়নের ধলআশ্রম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৫] তিনি খুব ছোটবেলায় তার গুরু বাউল শাহ ইব্রাহিম মাস্তান বকশ থেকে সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা নেন। তিনি মমজান বিবিকে বিয়ে করেন, যাকে তিনি সরলা নামে ডাকতেন। তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে তার জন্মগ্রামের পাশে উজানধল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ, প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি তার গান কথা বলে সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তিনি তার গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন প্রখ্যাত বাউলসম্রাট ফকির লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ এবং দুদ্দু শাহ এর দর্শন থেকে। যদিও দারিদ্র তাকে

---

৮৪. একুশে পদক প্রাপ্তদের তালিকা, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৩ এপ্রিল, ২০০১।

৮৫. সুমন কুমার দাশ, *বাংলা মায়ের ছেলে শাহ আব্দুল করিম জীবনী* (ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ফেব্রু. ২০১১), পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্য করে কৃষিকাজে তার শ্রম ব্যয় করতে; কিন্তু কোন কিছু তাকে গান সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি বাউলগানের দীক্ষা লাভ করেছেন সাধক রশীদ উদ্দীন, শাহ ইব্রাহীম মাস্তান বকশ এর কাছ থেকে। তিনি শরীয়তী, মারফতি, দেহতত্ত্ব, গণসংগীতসহ বাউল গান এবং গানের অন্যান্য শাখার চর্চাও করেছেন।[৮৬]

সঙ্গীত সাধনা

স্বশিক্ষিত বাউল শাহ আব্দুল করিম এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক গান লিখেছেন এবং সুরারোপ করেছেন। বাংলা একাডেমির উদ্যোগে তার ১০টি গান ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। কিশোর বয়স থেকে গান লিখলেও কয়েক বছর আগেও এসব গান শুধুমাত্র ভাটি অঞ্চলের মানুষের কাছেই জনপ্রিয় ছিল। তার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে বেশ কয়েকজন শিল্পী বাউল শাহ আব্দুল করিমের গানগুলো নতুন করে গেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলে তিনি দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। বাউলসাধক শাহ আবদুল করিম জীবনের একটি বড় অংশ লড়াই করেছেন দরিদ্রতার সাথে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেও তা তিনি কখনোই গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে সাউন্ড মেশিন নামের একটি অডিও প্রকাশনা সংস্থা তার সম্মানে 'জীবন্ত কিংবদন্তী : বাউল শাহ আবদুল করিম' নামে বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া তার জনপ্রিয় ১২ টি গানের একটি অ্যালবাম প্রকাশ করে। এই অ্যালবামের বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থ তার বার্ধক্যজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য তার পরিবারের কাছে তুলে দেয়া হয়। ২০০৭ সালে বাউলের জীবদ্দশায় শাহ আবদুল করিমের জীবন ও কর্মভিত্তিক একটি বই প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়, 'শাহ আবদুল করিম সংবর্ধনা গ্রন্থ' নামের এই বইটি সম্পাদনা করেন লোকসংস্কৃতি গবেষক ও প্রাবন্ধিক সুমন কুমার দাশ। শিল্পীর চাওয়া অনুযায়ী ২০০৯ সালের ২২ মে সিলেট বিভাগীয় কমিশনার ও খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি ড. জাফর আহমেদ খানের উদ্যোগে বাউল আব্দুল করিমের সমগ্র সৃষ্টিকর্ম নিয়ে গ্রন্থ 'শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র' প্রকাশিত হয়।[৮৭] শাহ আবদুল করিমের রচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কিছু গান :

- বন্দে মায়া লাগাইছে, পিরিতি শিখাইছে
- আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
- গাড়ি চলে না

৮৬. নাসির উদ্দিন, গানের গুরু প্রাণের গুরু শাহ আব্দুল করিম, *বাংলানিউজ*, ১৪ নভে. ২০১৫
৮৭. শুভেন্দু ইমাম, সম্পাদিত, *শাহ আব্দুল করিম রচনা সমগ্র* (সিলেট : খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াকফ এস্টেট, ২০০৯)।

Dhaka University Institutional Repository

- রঙ এর দুনিয়া তরে চায় না
- তুমি রাখ কিবা মার
- ঝিলমিল ঝিলমিল করেরে ময়ুরপংখী নাও
- তোমার কি দয়া লাগে না
- আমি মিনতি করিরে
- তোমারও পিরিতে বন্ধু
- সাহস বিনা হয়না কভু প্রেম
- মোদের কি হবেরে
- মানুষ হয়ে তালাশ করলে
- আমি বাংলা মায়ের ছেলে
- আমি কূলহারা কলঙ্কিনী
- কেমনে ভুলিবো আমি বাঁচি না তারে ছাড়া
- কোন মেস্তরি নাও বানাইছে
- কেন পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু
- মন মিলে মানুষ মিলে, সময় মিলে না
- সখী তুরা প্রেম করিওনা
- কাছে নেওনা, দেখা দেওনা
- মন মজালে, ওরে বাউলা গান
- আমার মাটির পিনজিরার সোনার ময়নারে
- নতুন প্রেমে মন মজাইয়া
- বসন্ত বাতাসে সইগো
- আইলায় না আইলায় নারে বন্ধু
- মহাজনে বানাইয়াছে ময়ুরপংখী নাও
- আমি তোমার কলের গাড়ি
- সখী কুঞ্জ সাজাও গো
- জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে
- যে দুঃখ মোর মনে

Dhaka University Institutional Repository

- হুরু থাকতে, আমরা কত খেইর (খেইল) খেলাইতাম
- হাওয়াই উরে আমার
- গান গাই আমার মনরে বুঝাই
- দুনিয়া মায়ার জালে
- আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
- দয়া কর দয়াল তোমার দয়ার বলে
- আগের বাহাদুরি গেল কই
- মন বানদিব কেমনে
- আমার মন উদাসি
- আমি তরে চাইরে বন্ধু
- কাঙ্গালে কি পাইব তোমারে
- বন্ধুরে কই পাব
- এখন ভাবিলে কি হবে
- আসি বলে গেল বন্ধু আইলনা
- আমি কি করি উপায়
- প্রান বন্ধু আসিতে কত দুরে
- বন্ধু ত আইলনাগু সখী
- আমি গান গাইতে পারিনা
- খুঁজিয়া পাইলাম নারে বন্ধু
- ভব সাগরের নাইয়া।[৮৮]

প্রকাশিত বই

বাউল শাহ আবদুল করিমের এ পর্যন্ত ৭টি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে তার রচনাসমগ্র (অমনিবাস)-এর মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়াও সুমন কুমার দাশ সম্পাদিত শাহ আব্দুল করিম স্মারকগ্রন্থ (অন্বেষা প্রকাশন) তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এর আগে-পরে শাহ আবদুল করিমকে নিয়ে সুমন কুমার দাশের 'বাংলা মায়ের ছেলে :

৮৮. গীতিকার : শাহ আব্দুল করিম, বাংলা লিরিকস, ৬ এপ্রিল ২০১৫, https://web.archive.org/web/20150106124554

Dhaka University Institutional Repository

শাহ আবদুল করিম জীবনী' (অন্বেষা প্রকাশন), সাক্ষাৎকথায় শাহ আবদুল করিম (অন্বেষা প্রকাশন), শাহ আবদুল করিম (অন্বেষা প্রকাশন), বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিম (উৎস প্রকাশন), গণগীতিকার শাহ আবদুল করিম (উৎস প্রকাশন) প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ ২০১৬ সালে ঢাকার প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা প্রথমা থেকে প্রকাশিত হয় সুমন কুমার দশের 'শাহ আবদুল করিম : জীবন ও গান' বইটি। এ বইটি ইতোমধ্যেই একটি প্রামাণ্য জীবনী হিসেবে বোদ্ধামহলে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। এ বইটিতে করিমের নির্বাচিত বেশ কিছু গানও সংকলিত হয়েছে। শাহ আবদুল করিমের জীবনভিত্তিক প্রথম উপন্যাস সাইমন জাকারিয়া রচিত 'কূলহারা কলঙ্কিনী' প্রকাশিত হয়েছে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে।[৮৯] এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকীতে তাঁর সঙ্গীতের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচিত হয়েছে।

শাহ আবদুল করিম : গ্রন্থ পরিচয়

- আফতাব সঙ্গীত (১৩৫৫ বাংলা)
- গণ সঙ্গীত (১৯৫৭)
- কালনীর ঢেউ (১৩৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন; ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর)
- ধলমেলা (১৩৯৬ বঙ্গাব্দের ১ ফাল্গুন; ১৯৯০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি)
- ভাটির চিঠি (১১ বৈশাখ ১৪০৫; ২৪ এপ্রিল ১৯৯৮)
- কালনীর কূলে (নভেম্বর ২০০১)
- শাহ আব্দুল করিম রচনাসমগ্র (সংকলন ও গ্রন্থনা শুভেন্দু ইমাম, ২২ মে ২০০৯)।[৯০]

সম্মাননা

বাউল শাহ আব্দুল করিম ২০০১ সালে একুশে পদক লাভ করেন। বাংলা একাডেমি তার দশটি গানের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে। শাকুর মজিদ তাকে নিয়ে নির্মাণ করেছেন 'ভাটির পুরুষ' নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র। এছাড়াও সুবচন নাট্য সংসদ তাকে নিয়ে শাকুর মজিদের লেখা 'মহাজনের নাও' নাটকের ৮৮টি প্রদর্শনী করেছে। জীবদ্দশায় যেসব সম্মাননায় তিনি ভূষিত হয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

৮৯. সুমন কুমার দাশ, শাহ আব্দুল করিম : কিছু স্মৃতি কিছু কথা, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ সেপ্টেম্বর-২০১৩

৯০. শুভেন্দু ইমাম, সম্পাদিত, শাহ আব্দুল করিম জন্মশতবর্ষ স্মরণ (সিলেট : শাহ আব্দুল করিম জন্মশত বর্ষ উদ্‌যাপন পর্ষদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬), পরিশিষ্ট ২; শাহ আব্দুল করিম : গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৪২-৫৫ (সংক্ষেপ সার)।

Dhaka University Institutional Repository

- একুশে পদক (২০০১)
- কথা সাহিত্যিক আবদুর রউফ চৌধুরি পদক (২০০০)
- রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার (২০০০)
- লেবাক এ্যাওয়ার্ড (২০০৩)
- মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার আজীবন সম্মাননা (২০০৪)
- সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস আজীবন সম্মাননা (২০০৫)
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি সম্মাননা (২০০৬)
- খান বাহাদুর এহিয়া পদক (২০০৮)
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সম্মাননা (২০০৮)
- হাতিল এ্যাওয়ার্ড (২০০৯)
- এনসিসি ব্যাংক এনএ সম্মাননা (২০০৯)।[৯১]

মৃত্যু

২০০৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মাটি ও মানুষের কিংবদন্তীতুল্য এ বাউল সম্রাট পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।[৯২] হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার প্রাঙ্গণে ১ম জানাযা, দিরাই সদরে ২য় জানাযা এবং সর্বশেষ নিজ গ্রাম ধলশাহী জামে মসজিদে ৩য় জানাযা শেষে তাকে স্ত্রী সরলার পাশে সমাহিত করা হয়।

শাহ আব্দুল করিমের গানে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি ও স্বদেশচিন্তা

শাহ আব্দুল করিম। বাউল নামেই তিনি পরিচিত। অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় ধরে তিনি গান করেছেন। গানের ভূবনে আজন্ম নিবেদিত প্রাণ শাহ আব্দুল করিম বৃহত্তর সিলেটের সঙ্গীত ঐতিহ্যের ধারক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুধীমহলে সমাদৃত। তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র বহুমুখী। তাই কৃষক শ্রমিকসহ খেটে খাওয়া মানুষের কাছেও তিনি প্রিয় শিল্পী। আব্দুল করিম গান করে আসছেন সেই ত্রিশের দশক থেকে। গ্রাম বাংলার বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলের স্থানে স্থানে বিভিন্ন আসরে গান করার মধ্য দিয়ে তিনি গণমানুষের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন। করিমের গান এখন ধ্বনিত হয় অসংখ্য কণ্ঠে।

অভাব-অনটনের সংসারে তাঁর জন্ম। তাই শৈশবেই কঠোর জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হন তিনি। তাঁর নিজের ভাষায় :

---

৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

৯২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

"গরীব কুলে জন্ম আমার আজও তা মনে পড়ে
ছোট বেলা বাস করিতাম ছোট্ট এক কুড়ে ঘরে।"

কুড়ে ঘরে বাস করলেও রাতে চাঁদের জোছনা, বর্ষায় সমুদ্রের মত দিগন্ত বিস্তৃত জল, থৈ থৈ হাওর আর চারদিকের মেহনতী মানুষের জীবনপ্রবাহ আলোড়ন তুলে করিমের হৃদয়ে। প্রখর অনুভূতি আর জন্মগত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী করিম শৈশবেই আবহমান বাংলার চিরায়ত মরমী সুরের টানে মুগ্ধ হন। তাঁর মেধা ও মনন নিবিষ্ট হয় সঙ্গীতে। 'ভাবিয়া দেখ মনে, মাটির সারিন্দারে বাজায় কোন জনে'। বাংলার অন্তর নিংড়ানো এ সুরই বলা যায় করিমের জীবনের রূপ নির্ধারণ করে দেয়। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিভার ছোঁয়ায় করিম হয়ে উঠেন শিল্পী, গীতিকার, বাউল। তাঁর নিজের কথায় :

"নিষেধ বাঁধা না মানিয়া কুলের বাহির হইলাম
একতারা সঙ্গে নিয়া ঘর বাড়ি ছেড়ে দিলাম
ঘর ছাড়া বাউল সাজিলাম
সকলেরই করিম ভাই।"[৯৩]

বাউলের পরিচিতি লাভের বহু আগে থেকেই করিম গায়ক হিসেবে পরিচিত। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মালজোড়া গান গেয়ে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। শৈশবে নৈশ বিদ্যালয়ের সামান্য বর্ণশিক্ষা, প্রখর স্মৃতি এবং গণমানুষের প্রতি অন্তরভরা ভালোবাসা সম্বল করে শাহ আব্দুল করিম এগিয়ে এসেছেন অনেক পথ। দেশ, সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাসসহ সকল বিষয়ে তার ধারণা স্বচ্ছ এবং বলা যায় স্বতন্ত্র। গানের আসরে অথবা ঘরোয়া বৈঠকে তার মুখ থেকে অনর্গল কথামালা ঝরে পড়ত। মানুষ আগ্রহ নিয়ে শোনত তার কথা। জীবনের চড়াই উৎরাই, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন সর্বোপরি আধ্যাত্ম চেতনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি রচনা করছেন গান, গাইছেন নিজে। তাঁর রচিত গান নামকরা অন্য কণ্ঠশিল্পীরাও টিভি, বেতার এবং সভা-সমাবেশে গেয়েছেন।

শাহ আব্দুল করিম বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী ও গীতিকার। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তার প্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে : আফতাব সঙ্গীত, গণসঙ্গীত, কালনীর ঢেউ, ধলমেলা এবং ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত ভাটির চিঠি। করিমের গানের সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশি। মালজোড়া গানের আসরে তাৎক্ষণিক রচনা এবং গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন গানের হিসাব তার নিজেরও জানা ছিল না। তাঁর গানের সংখ্যা বিপুল। তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো করিমের গানের বিষয় বৈচিত্র্য। সুর, ছন্দ ও বিষয়ের বিচিত্র সমাহার ঘটেছে

---

৯৩. শাহ আব্দুল করিম জন্মশতবর্ষ স্মরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

তার গানে। এগুলো পর্যালোচনা করে বলা যায় তিনি সত্যিকার অর্থে একজন শক্তিমান গীতিকার। সিলেট অঞ্চল আউল বাউল মরমী সাধক কবিদের বিচরণভূমি। যুগে যুগে এখানে জন্ম হয়েছে অনেক সূফী-সাধকের যারা সাধনার অনুষঙ্গ হিসেবে রচনা করেছেন সঙ্গীত। তাদের সঙ্গীতে গভীরতা আছে, আত্মার একান্ত চেতনার প্রতিফলন আছে। শাহ আব্দুল করিম তাদের উত্তরসূরী হলেও তার রচনায় পাওয়া যায় নতুনত্ব ও স্বাতন্ত্র। সর্বোপরি তার গানে রয়েছে অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয় বৈচিত্র্য। একদিকে আধ্যাত্মিকতা অন্যদিকে গণমানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটনের কথা তার গানে সহজভাবে এসেছে। সাধারণত আধ্যাত্ম সাধনায় যারা মগ্ন হন বাস্তব জীবন নিয়ে তারা উচ্চবাক্য নন বরং নীরব। গীতিকার করিম এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। একই সাথে তিনি স্রষ্টার ধ্যান করেন এবং কৃষক মজুরেরও গান ধরেন। জারি, সারি, মারফতী, মুর্শিদী, মরমী, গণসঙ্গীত, আঞ্চলিক, ভক্তিমূলক সবখানেই তিনি স্বচ্ছন্দ্য এবং সবখানেই তার সার্থক জনপ্রিয় গান রয়েছে। সমসাময়িক বিষয়ের উপর নিজের রচিত গান গেয়ে তিনি কাগমারী সম্মেলনে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মাওলানা ভাসানীর স্নেহ ও দোয়া পেয়েছেন। সিলেট ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন সমাবেশে গান করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা পেয়েছেন গায়ক করিম।[৯৪]

করিমকে বলা হয় বাউল, তিনি নিজেও নিজেকে বাউল বলেন; কিন্তু প্রচলিত ধারা অনুযায়ী করিমকে শুধুমাত্র বাউল বলে অভিহিত করা যায় না। 'আজব রঙ্গের ফুল ফুটেছে মানব গাছে/চাইর ডালে তার বিশটা পাতা কী সুন্দর আছে'–এমনি রহস্যময় কথার গানে করিম একজন বাউল। যখন করিম বলেন :

> "আশিকের রাস্তা সোজা,
> আশিক থাকে মাশুক ধ্যানে,
> এই তার নামাজ এই তার রোজা। অথবা
> আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে।"[৯৫]

তখন তাকে বলতে হয় মরমী। এ ধরনের প্রচুর গান আছে তার। আবার 'শোষক তুমি হও হুঁশিয়ার চল এবার সাবধানে'-এর মত গানের রচয়িতা হিসেবে করিম গণসঙ্গীত শিল্পী। ভাটির চিঠি, বিলাতের স্মৃতির মত রচনা পাঠ করে অথবা তার কণ্ঠে শুনে বলতে হয়, করিম একজন চারণ কবি। তাই শাহ আব্দুল করিমকে একক অভিধায় চিহ্নিত করা কঠিন। আসলে আবহমান বাংলার বিচিত্র সঙ্গীত ঐতিহ্য

৯৪. বাংলা মায়ের ছেলে শাহ আব্দুল করিম জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬, ৩৯
৯৫. শাহ আব্দুল করিম, *কালনীর কূলে* (সিলেট : লোকচিহ্ন, নভে. ২০০১)।

Dhaka University Institutional Repository

ধারণ করে করিম তার নিজস্ব ভূবন গড়ে তুলেছেন। কখনো তিনি সাধক, কখনো শ্রমজীবি মানুষের বন্ধু, কখনো গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবনের শব্দ কারিগর, কখনো আত্মমগ্ন ঘরছাড়া বাউল। করিমের গানগুলোতে তাঁর এ পরিচিতিই ফুটে উঠেছে।

সিলেট অঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলা ভাটি এলাকা হিসেবে পরিচিত। ভাটির জীবন-জীবিকা, পরিবেশ, জীবন সংগ্রাম অনেকদিক থেকে আলাদা। শাহ আব্দুল করিম অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে সেই জীবনচিত্র জীবন্তভাবে এঁকেছেন। শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য সাহসী প্রতিবাদী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। সমাজ নিয়েও করিম চিন্তা-ভাবনা করেন।

“কৃষক মজুর পড়েছে ঘোর আঁধারে
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে
স্বাধীন বাংলায় রে বীর বাঙালি ভাই
উন্দুর মাররে দেশের জনগণ।”

প্রভৃতি গানে করিমের সমাজ ও স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে। এসব গানে তিনি সংসার বিরাগী বাউল নন; বরং রীতিমত সমাজ সচেতন কবি।

করিম গানের মানুষ। গ্রাম বাংলার জীবন প্রবাহের এবং লোকায়ত বাংলার যাপিত জীবনের ঘনিষ্ট ছবি উঠে এসেছে করিমের গানে। অকৃত্রিম সে ছবি। এত খুটিনাটি চিত্র একজন সূক্ষ্মদৃষ্টির শক্তিমান কবির পক্ষেই তুলে আনা সম্ভব। গ্রামীণ জীবনের একটি চিত্র তিনি এঁকেছেন স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে :

“পুরুষ : খালি বাড়ী থইয়া নাইওর যাইতে দিব না।
নারী : তুমি ইতা কিতা কও, আমি কিছু বুঝি না,
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা ॥
আদিলকিলা কথা কইলে, গায়ে আমার আগুন জ্বলে,
জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস আইলে, কোন বেটি নাইওর যায় না।
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা ॥
পুরুষ : তুমি আমি দুইজন মাত্র, ঘর ভরা জিনিসপত্র
মোরগরে কে গুড়া দিত, আমি ইতা পারি না।
খালি বাড়ী থইয়া নাইওর যাইতে দিব না ॥
নারী : আম-খাইমু, কাঁঠাল খাইমু, নয়া একখান কাপড় পাইমু।
ভাই-বইনরে দেইখ্যা আইমু, আমার কি মনে চায় না?
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা ॥

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ : নাইওর যদি যাইতে চাও, কুনদিন আইবায় কইয়া যাও।

নারী : আনতে যদি তুমি না যাও, আমি ইবার আইতাম না–

আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা ॥"[৯৬]

এসব গানের বাণী ও স্মৃতি গ্রাম থেকে আসা অধুনা শহুরে যে কোন লোকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সমাজ সচেতন করিম শোষণ, নিপীড়ন, ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার। চারদিকের লুটপাট চুরি বাটপারীতে ক্ষুব্ধ করিমের অভিব্যক্তি :

"মওজুতদার কালোবাজারী কেউ করে ইজারাদারী কেউ করে

রিলিফ চুরি আমলাতন্ত্রের আশ্রয় ধরে ।

এই যুগে আর বাঁচবেনা মান করিম বলে গাটুরী বান্দ

আসিবে আজলী তুফান দোহাই দিলে মানবেনারে।"

শাহ আব্দুল করিম মরমী সাধকদের মত স্রষ্টার অনুসন্ধান করেন। সমাজ সচেতন কবি হিসেবে শোষণ নিপীড়ন ও অবিচারের প্রতিবাদ করেন, আবার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেন গানে গানে রচনার নিরিখে, তাঁকে বলা যেতে পারে চারণ অথবা লোক কবি। বলা যেতে পারে বাউল অথবা মরমী কবি। তাঁর প্রতিভা ও সৃজনশীল জন্মগত ক্ষমতার ফসলে সমৃদ্ধ বাংলার সঙ্গীত ভাণ্ডার। শাহ আব্দুল করিম ছিলেন অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন একজন মানুষ। দারিদ্রের সাথে কঠোর সংগ্রাম করেছেন, কারো করুণা চাননি, স্বীকৃতির তোয়াক্কা করেননি। তিনি একান্ত নিজস্ব প্রতিভার বলেই জনমনে লাভ করেছেন আবেগের রঙে সাজানো আসন।

শাহ আব্দুল করিমের বহুমুখী আবেদনের ধারক গানের সংখ্যা অনেক। তাঁর স্মৃতিচারণধর্মী গানে উঠে এসেছে গ্রাম বাংলার চিত্র। আবার মরমী গানে ফুটে উঠেছে চিরন্তন ভাবুকের হৃদয়ের যন্ত্রণা। যেমন, একটি গানে তিনি কতইনা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন :

"আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম!

গ্রামের নওজুওয়ান, হিন্দু মুসলমান

মিলিয়া বাউলা গান, ঘাঁটু গান গাইতাম ॥

বর্ষা যখন হইত, গাজীর গান আইত

রঙ্গে ঢঙ্গে গাইত, আনন্দ পাইতাম

৯৬. আব্দুল হামিদ মানিক, সৃষ্টির বৈচিত্র্যে মোহন শিল্পী শাহ আব্দুল করিম, *দৈনিক জালালাবাদ*, সিলেট, ১২ সেপ্টে. ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

বাউলা গান ঘাঁটু গান আনন্দের তুফান-
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ॥
হিন্দু বাড়ীন্ত যাত্রাগান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম।
কে হবে মেম্বার কে হবে গ্রাম সরকার
আমরা কি তার খবর লইতাম ॥
বিবাদ ঘটিলে পঞ্চাইতে বলে
গরীব কাঙ্গালে বিচার পাইতাম
মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল-
এখন সবাই পাগল বড়লোক হইতাম ॥
করি ভাবনা সেদিন কি পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম।
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন–
করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম ॥”[৯৭]

সাধক শাহ আব্দুল করিম বাউলগানের পাশাপাশি গণসংগীতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার অধিকাংশ গানে স্বদেশচিন্তা ও মানবপ্রেমের বিষয়টি দৃশ্যমান। তাঁর প্রকাশিত গণসঙ্গীত, ভাটির চিঠি শীর্ষক দু'টি গানের সংকলনের নামও সে পরিচয় বহন করে। তার অপরাপর গানের সংকলনগুলোতেও স্বদেশচিন্তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ।

গণসঙ্গীত (১৯৫৭) শীর্ষক গানের সংকলনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ এবং পরবর্তী সময়ে ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠন, মুসলিম লীগ, ছাপ্পান্ন সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষসহ তৎকালীন নানা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শাহ আবদুল করিম নিতান্ত সরল এবং প্রাঞ্জল বাক্য দিয়ে গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের জন্য গান রচনা করে গেছেন। এ বইয়ের ১১টি গানে আবদুল করিমের বিপ্লবী ও প্রতিবাদী সত্তাকে সহজেই চেনা যায়। এসব গান নতুন পথের সন্ধান দেয়। সেটা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ। করিমের অনুভূতির প্রগাঢ়তা ছিল অসামান্য, অন্তত এ গানটি সেটাই প্রমাণ করে : ‘কত দুঃখ সইব পরাণে পাকিস্তানে/আর কত দুঃখ সইব পরাণে’।

৯৭. শাহ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জনজাগরণে শাহ আব্দুল করিমের সংগ্রামী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর আগে কোনো বাউল জাগরণী গান রচনা করেননি। সঙ্গত কারণেই এই বাউল 'গণগীতিকার' অভিধাও লাভ করেছিলেন। গণসংগীত রচনায় বাউলদের মধ্যে নেতৃত্ব ছিল শাহ আব্দুল করিমের। তিনি সর্বহারা, কৃষক, শ্রমিক, মজুরসহ নিপীড়িত ও নির্যাতিত সর্বহারা শ্রেণির মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে গান লিখেছেন। এরপর তার দেখাদেখি অনেক বাউলই গণসংগীত রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ফলে তখনকার সময়ে অনেকের গানেই বিপ্লব আর মুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্থান করে নিয়েছিল। উদ্দীপনা সঞ্চারী গান রচনা ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে শাহ আব্দুল করিম এক উজ্জ্বল নাম। তিনি গানে গানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রতিবাদ। প্রতিবাদী এসব গান স্বদেশচেতনার উৎস হয়ে বাঙালির কাছে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা হয়ে থাকবে।

ভাটির চিঠি (১৯৯৮) বইয়ের শুরুতেই রয়েছে গ্রন্থের নাম সম্বলিত পয়ার ছন্দে লেখা সুদীর্ঘ ৭৮৮ পঙ্ক্তির একটি গান। এতে ভাটি এলাকার উৎপত্তি, নামকরণ, এ অঞ্চলের মানুষের জীবিকা, সুদ-লগ্নি-ঋণ, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ভূমিহীন কৃষকের আর্তনাদ, আমলাতান্ত্রিক শোষণ, গোষ্ঠীগত রেষারেষি, জীবনচিত্র, উৎসব, ঐতিহ্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অতীত-বর্তমান সবকিছুই নিপুণ শৈলীতে তিনি বর্ণনা করেছেন।

'ভাটির চিঠি' শুধু গান নয়, ইতিহাসও বটে। সুদীর্ঘ এ গানটিতে ভাটি এলাকার বিস্তৃতি থেকে শুরু করে পুরো সমাজব্যবস্থার চালচিত্র ফুটে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক ইতিহাস রচিত হলেও ভাটি এলাকার সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়–এ ধরনের কোনো বই/লেখা এর আগে কারো চোখে পড়েনি। শাহ আব্দুল করিম এক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে পথিকৃৎ। কারণ, তার আগে এত বিশদভাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলের ইতিহাস এবং জনজীবন নিয়ে কেউ ভাবেননি। ভাটি এলাকার উৎপত্তি ও ভূগোল-ইতিহাস করিম তার গানে সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর আব্দুল করিম ভাটি এলাকার অতীত এবং বর্তমান চিত্র নিরূপণ করেছেন। অতীতের মাঠভর্তি ধান, গোয়াল ভরা গরু, নদী-খাল-জলাশয় ভর্তি মাছসহ নানা প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর আফসোস! মানুষ সৃষ্ট নানা কারণেই এসব ঐতিহ্য ম্লান হতে চলেছে। মেলা, পূজা-পার্বণ কিংবা ঈদে হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ এবং সম্প্রীতির যে নজির ছিল, সেসবও উল্লেখ করেছেন 'ভাটির চিঠি' শীর্ষক গানে। উল্লেখ রয়েছে যাত্রা, পুঁথি, নিমাই সন্ন্যাস, গাজীর গান, পালাগান, নৌকাবাইচ, ঘোড়দৌড়, কেচ্ছাপাঠের আসরসহ ঐতিহ্যবাহী নানা পর্ব-উৎসবের কথা।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ আব্দুল করিম ছোটবেলায় ভাটির যে ছবি দেখেছেন, সেটা তার জীবদ্দশাতেই মলিন হয়ে পড়েছিল। সেসব ঐতিহ্য হাতড়িয়ে করিম তার প্রতিটি গান লিখেছেন। করিমের এসব অভিব্যক্তি নতুন বিষয় নয়, তার অন্বেষণ বস্তুবাদী। চিন্তা-চেতনার সরসতায় তাঁর অবস্থান স্পষ্ট–সেটা প্রগতিবাদী ও নিগৃহীত জনতার পক্ষে। ভাটির চিঠিতে সেসব বিষয় বারবার প্রত্যক্ষ করা যায়। এ গ্রন্থে আলংকারিক পঙ্ক্তির ছড়াছড়ি নেই, নিতান্তই সাদামাটা তার গানের ভাষা। অথচ সেই ভাষার যে টান এবং দুর্নিবার আকর্ষণ, সেটা পাঠক শ্রোতাদের বিবেকবোধ ও চেতনা জাগ্রত করে। পাঠক ও শ্রোতারাও বুঁদ হয়ে শাহ আব্দুল করিমের গান থেকে সাম্যবাদী পাঠ নেন। একই স্বাদ পাঠকেরা পাবেন তাঁর ‘কালনীর ঢেউ’, ‘কালনীর কূলে’ কিংবা ‘ধলমেলা’ গ্রন্থ তিনটি পাঠেও।

মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ ও তাঁর অপরূপ সৃষ্টি গান ও কবিতা (১৯৩৫-২০০৫)

গিয়াস উদ্দিন আহমদ নিভৃত পল্লী গ্রামে জন্ম নেয়া বাংলাদেশের অসামান্য প্রতিভাধর এক অনন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে একজন কবি, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, লেখক, সমাজসেবকসহ বহুগুণে গুণান্বিত। প্রখ্যাত নাট্যকার ও সাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ুন আহমেদ তাঁর বিভিন্ন নাটকে কবি গিয়াস উদ্দিন রচিত “মরিলে কান্দিসনা আমার দায় রে যাদু ধন” শীর্ষক গানটি সংযোজন করেন। গানটি জাতীয়ভাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেলেও গানের রচয়িতা তেমনিভাবে খ্যাতি লাভ করেননি। অথচ তাঁর সমগ্র জীবনের মরমী সাধনা ও সৃষ্টিকর্ম বিশেষত ইসলামী দিকদর্শন নিয়ে তাঁর কবিতা ও গান জাতির মধ্যে এক নতুন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করতে পারে। বর্তমান প্রজন্মের জন্য তা হতে পারে এক আলোকবর্তিকা। কবি গিয়াস উদ্দিন আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব, মানব সৃষ্টি রহস্য, আল্লাহর অপার মহিমার বর্ণনা, আখিরাত, কবরের আযাব, ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মোহত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা, ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং আত্মসমালোচনামূলক প্রভৃতি বিষয়ের উপর সহস্রাধিক কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তাঁর অনেক সাহিত্যকর্ম সঠিক সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অভাবে জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়নি। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, মরমী কবি গিয়াস উদ্দিনের আরো দু’সহস্রাধিক কবিতা ও গানের পাণ্ডুলিপি বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেগুলো প্রকাশিত হলে জ্ঞানের রাজ্যে এক নূতন সংযোজন হতে পারে। এ ধরনের একজন গুণী ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিশেষত তাঁর কবিতা ও গান নিয়ে আলোচনা গুরুত্বের দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

গিয়াস উদ্দিন আহমদ : জীবন পরিক্রমা

কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ-এর জন্ম ১৪ আগস্ট ১৯৩৫ খ্রি. সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার শিবনগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতার নাম ফতেহ উল্লাহ এবং মাতার নাম অমুরতা বিবি।[৯৮] গ্রামের মক্তবেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা না গেলেও তিনি বাল্যকাল থেকেই মরমী কবি আছাদ উল্লাহর নিকট থেকে মরমীবাদের উপর দীক্ষা নেয়া শুরু করেন। তার সাথে তিনি বিভিন্ন গানের আসরে যেতেন এবং সংগীত বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতেন। এছাড়া তিনি তাঁর ছেলেবেলা সম্পর্কে বিশেষ করে দু'জন সাধকের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন–সাধক পুরুষ আফজল শাহ (র.) ও সাধক হেকিম আলী। শিল্পী গিয়াস উদ্দিনের বাড়ির ঠিক পশ্চিম পাড়ে এই সাধক পুরুষদ্বয়ের বাড়ি। তাঁদের সাহিত্যকর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা কবি গিয়াস উদ্দিনকে এ গানের জগতে আসতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।[৯৯] এতদঅঞ্চলের যেসব কবি-সাহিত্যিক ও মরমী সাধকের সাহিত্যকর্ম, ভাব ও উদ্দীপনা তাঁর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করত তাঁরা হলেন–হাছন রাজা, রাধারমন, সৈয়দ শাহনূর, পীর আছদ আলী, দীনহীন, কালা শাহ, সূফী শিতালং শাহ, আরকুম শাহ, আছিম শাহ, শেখ ভানু, মস্তান শাহ, কাছিম আলী পীর, ইব্রাহীম তসনা এবং দীন ভবানন্দ।[১০০]

সংগীত জীবন

কবি গিয়াস উদ্দিন ১৯৬০ সাল থেকে পাণ্ডুলিপি আকারে গান লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ বেতারের অনুমোদিত গীতিকারের মর্যাদা লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'ক' শ্রেণীর গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।[১০১] ১৯৭৫ সালে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস আয়োজিত জাতীয় লোক সংগীত উৎসবে, ১৯৮৫ সালে সার্ক সম্মেলনে, ১৯৮৭ সালের সিরডাপ সম্মেলনসহ বাংলাদেশ টেলিভিশনের রজনীগন্ধা, বর্ণালী, একতারা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গিয়াস উদ্দিনের লেখা সারিগান, বিয়ের গান, শাহজালাল, শাহপরাণের উপর রচিত গান পরিবেশিত হয়। যেসব শিল্পীগণ এসব গান পরিবেশন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন–রাশ বিহারী চক্রবর্তী, রামকানাই দাস, সুবীর নন্দী, রুনা লায়লা, আকরামুল ইসলাম, হিমাংশু বিশ্বাস, হিমাংশু গোস্বামী, দুলাল

---

৯৮. রুহুল ফারুক, *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১-২০০১)*, (সিলেট : সিটি অফসেট প্রেস, ১ম প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ২৭৬

৯৯. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *গিয়াস উদ্দীন গীতিসম্ভার* (সিলেট : গিয়াস গীতি প্রকাশনা পর্ষদ, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৩

১০০. রুহুল ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ভৌমিক, সাবিনা ইয়াসমিন, শেফালী ঘোষ, শাকিলা জাফর, শুভ্রদেব, লতিফা হেলেন, মলয় কুমার গাঙ্গুলী, বিপুল ভট্টাচার্য, সরদার আশরাফ উদ্দিন বাবুল, সোহরাব হোসেন, জামাল উদ্দিন হাসান বান্না, শফিকুন নুর, প্রখ্যাত মরমী শিল্পী মরহুম আবদুল আলীমের সুযোগ্য সন্তান জহির আলীম, আসগর আলীম, আছিয়া আলীম ও আখতার নাহার আলীম, ইয়ারুন নেছা প্রমুখ।[১০২]

কবিতা ও গানের প্রকৃতি

মরমী সংগীত শিল্পী গিয়াস উদ্দিন আহমদ বিভিন্ন প্রকৃতির গান ও কবিতা রচনায় ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক গান ও কবিতা রচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর স্বভাবই ছিল তাৎক্ষণিক গান ও কবিতা রচনা করা। নিম্নোক্ত ঘটনায় কবি গিয়াসের উপস্থিত গান রচনার অসাধারণ প্রতিভার স্ফূরণ দেখতে পাওয়া যায়। সে ঘটনাটি কবির ভাষায়–"স্বাধীনতার পর পরই বিখ্যাত শিল্পী আবদুল আলীমকে ছাতকে আনা হয় একক একটি গানের অনুষ্ঠানে। তাঁর গাওয়া 'সর্বনাশা পদ্মানদী' গানটি শুনেই কবি গিয়াস উদ্দিন মঞ্চে বসে তাৎক্ষণিকভাবেই রচনা করেন–'শুধাই তোরে সুরমা নদী/নাই কি তোর কিনারা .....'। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বরজিত দে মিলন গানটি গান। গানটি শুনে আব্দুল আলীম মুগ্ধ হন এবং গানের গীতিকার গিয়াস উদ্দিনকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।"[১০৩] গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদ যেসব বিষয়ে গান ও কবিতা লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো হামদ, নাত, পীর-মুর্শিদী, মর্সিয়া, মারফতী, মরমী, জারি, সারি, বিয়ের গান, ধামাইল, বারমাইস্যা, ভাটিয়ালি, নৌকা-বাইচ, আধুনিক, দেশাত্মবোধক, ছাঁদপেটানো গান, পল্লিগীতি, কীর্তণ, আঞ্চলিক, পীর-আওলিয়া প্রেমের গান, ছড়া গান, ভোটের ব্যঙ্গ গান ইত্যাদি।

অন্যান্য সাহিত্য কর্ম

গান রচনা ছাড়াও কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ নাটক, কেচ্ছা-কাহিনী ও গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'সানাউল্লাহর বউ' নামক তাঁর একটি নাটক সিলেট বেতারে প্রচারিত হয়।[১০৪] কবি গিয়াস উদ্দিন রচিত "বিনন্দের কিচ্ছা" দিয়ে সিলেট বেতারের কিচ্ছা-কাহিনী ভিত্তিক অনুষ্ঠান 'শাপলা শালুক' শুরু হয় যা এখনো শ্রোতাদের কাছে একটি জনপ্রিয় এবং নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন উন্নতমানের একটি অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। উক্ত অনুষ্ঠানে কবির রচিত প্রায়

১০২. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *শেষ বিয়ার সানাই* (সিলেট : সুরমা প্রিন্টার্স, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ১২-১৩

১০৩. রুহুল ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

১০৪. নজমূল আলবাব সম্পাদিত, *কর্ণে শুনাইও বন্ধুর নাম* (সিলেট : গিয়াস উদ্দিন আহমদ গীতি সংসদ, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশোর্ধ কিচ্ছা প্রচারিত হয়।[১০৫] গান লেখার পাশাপাশি গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদ সাংবাদিকতা, সমাজসেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও খেলাধুলার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে 'যুগভেরী পত্রিকার' মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন।[১০৬] সাংবাদিকতায় কবি গিয়াস উদ্দিনের অন্যতম অবদান হলো–ছাতক প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠা। তিনি পর পর তিনবার ছাতক প্রেসক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[১০৭] এছাড়া তিনি ধূমপান বিরোধী সংগঠন 'আধুনিক' এবং ছাতক 'খেলাঘর'-এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তাঁর সরব উপস্থিতি ছিল। তিনি 'গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি ডিগ্রী কলেজ', 'গোবিন্দগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়' ও 'শিবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে'র প্রতিষ্ঠার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[১০৮] গীতিকার কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি : ১. গিয়াস গীতিসম্ভার-১, ২. মরিলে কান্দিস না আমার দায় (১৯৯৬), ৩. ভোটের বয়ান (২০০১), ৪. গিয়াস গীতিসম্ভার-২ এবং ৫. শেষ বিয়ার সানাই (২০০৫)।

পুরস্কার ও সম্মাননা

শিল্পী গিয়াস উদ্দিন আহমদ সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ সালে সিলেট বেতারের এবং ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'ক' শ্রেণীর গীতিকারের মর্যাদা লাভ করেন।[১০৯] গুণী এই শিল্পীকে বিভিন্ন সংগঠন বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে। ১৯৮৯ সালে বৃটেন প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে সম্মাননা, ২০০৫ সালে নীলম সংগীতালয় ও শাপলা শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।[১১০] এছাড়াও কবি গিয়াস উদ্দিন তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কারস্বরূপ মহাকবি সৈয়দ সুলতান সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদের 'মরমী সাহিত্য পুরস্কার ২০০১' লাভ করেন।[১১১]

মৃত্যু

মরমী কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদ ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল, ৩ বৈশাখ ১৪১১ বঙ্গাব্দ শনিবার ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। শিবনগর জামে মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১১২]

---

১০৫. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, লেখক পরিচিতি অংশ।
১০৬. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *ভোটের বয়ান এবং ইত্যাদি* (সিলেট : সুরমা প্রিন্টার্স, ২০০১), পৃ. ১১
১০৭. রুহুল ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
১০৮. নাজমুল আলবাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
১০৯. প্রাগুক্ত
১১০. প্রাগুক্ত
১১১. প্রাগুক্ত
১১২. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *শেষ বিয়ার সানাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

কবির দর্শন

দীর্ঘ দেহের অধিকারী, সদালাপী, নম্র, ভদ্র, বিনয়ী এবং অত্যন্ত সহজ-সরল স্বভাবের মানুষ কবি গিয়াস উদ্দিন ছিলেন সূফি দর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামে সূফিবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে জীব আত্মা এবং পরমাত্মা সম্পর্কে প্রেমবাদ। এ প্রেমবাদে আশেক-মাশুক হচ্ছেন মানুষ ও আল্লাহপাক। অর্থাৎ রব ও আবদ। তাঁর লেখা অসংখ্য গানে উক্ত সূফি তত্ত্বের শাশ্বতরূপ ফুটে উঠেছে। নিচের কবিতাংশ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে :

> "দমের জিকির পড় নিরালা, মন পগেলা
> দমের জিকির পড় নিরালা।
>
> ....
>
> দমের জিকির কর সার, গিয়াসে কয় মনরে আমার
> সব ছাড়িয়া হইয়া ফানাফিল্লা, মন পাগেলা ....।"[১১৩]

জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অন্তর্মূখী। বিরাট কেউকেটা হবার শখ তাঁর কোন দিনই ছিল না। তিনি ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতে পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে : "দুঃখের তপস্যাইতো জীবন। অন্তত মানুষের জন্য দুঃখের প্রয়োজন আছে। একজন কবির জন্য আরও বেশি প্রয়োজন। তাঁর বিশ্বাস–দুঃখ ছাড়া কেউ লিখতে পারে না। দুঃখ ছাড়া জীবনকে তিনি জীবন বলে মনে করেন না। দুঃখ তাঁর কাছে পরশ পাথরের মতো। মানুষের জীবনে দুঃখ ভালোবাসার মতোই গভীর।"[১১৪] মৃত্যু চিন্তা সবসময়ই কবিকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় মৃত্যু চিন্তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন : 'মরিলে কান্দিস না আমার দায় রে যাদু ধন', 'শেষ বিয়ার সানাই বাজিল, ডাকছে কাল সমনে', 'আমার বাসর হবে গো সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে প্রাণ বন্ধুর সনে' প্রভৃতিতে তাঁর মৃত্যু চিন্তার কথাই প্রতীয়মান হয়।[১১৫]

কবি গিয়াস উদ্দীনের মতে : "মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক তা যেমন প্রেমের, তেমনি বিচ্ছেদেরও। মানুষের এ সম্পর্ক আধ্যাত্মিকও।"[১১৬] মানুষ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "মানুষ যুদ্ধবাজ, মানুষ খুনি, মানুষ শোষক–তবু মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস অটল। আমি বিশ্বাস করি, এইসব হত্যাযজ্ঞ পেরিয়ে মানুষ একদিন ভালোবাসা শিখে নেবে, মানুষ মানুষের হাতে হাত রাখবে।"[১১৭]

---

১১৩. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *মরিলে কান্দিস না আমার দায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
১১৪. রুহুল ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।
১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

কবি গিয়াস উদ্দিন সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষির মন্তব্য

প্রথিতযশা গীতি কবি গিয়াস উদ্দিনের গান সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে অনেক মনীষি অনেক মন্তব্য করেছেন যা কবির কাব্য জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তন্মধ্যে ১৯৭৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় লোক সংগীত উৎসবে গীতিকার গিয়াস উদ্দীন আহমদের পরিবেশিত সারি গান ও বিয়ের গীতিনক্সা শুনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পল্লী কবি জসিম উদ্দিন অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন : “লোকগীতির যে ভঙ্গি, যে সুর ... তা এই নক্সায় প্রতিফলিত হয়েছে জীবন্তভাবে।”[১১৮] বিশিষ্ট মরমী সাধক ও গবেষক মোস্তফা কামাল বলেন : “সিলেটের লোক সংগীত ও মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারার সফল উত্তরাধিকার বহনকারীদের মধ্যে হাল আমলে গিয়াস উদ্দিন আহমদ স্বনামেই দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। গিয়াস উদ্দিন আহমদ লোক কবি, স্বভাব কবি এবং মরমী মনের অধিকারী। তাঁর হৃদয় স্পর্শকারী গানে শোনা যায় সিলেটের মরমী মানসের সমর্পিত আত্মার প্রতিধ্বনি। পাওয়া যায় আবহমান কালের সিলেটের হৃদয় উৎসারিত সুরময় ভুবনের আহাজারী–যা ভাবুকজনের কানে ও প্রাণে ঢেলে দেয় সঞ্জিবনী সুধা।”[১১৯] প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ বলেন : “আমার একটি প্রিয় গান আছে, গিয়াস উদ্দিন সাহেবের লেখা, মরণ সংগীত, ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’। প্রায়ই ভাবি আমি মারা গেছি, শবদেহ বিছানায় পড়ে আছে, কেউ একজন গভীর আবেগে গাইছে, ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায় ...’।”[১২০]

গিয়াস উদ্দিনের কবিতা ও গানে ইসলামী ভাবধারা

মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ অত্যন্ত ধর্মভীরু ও সূফি দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। ইসলামী সূফি দর্শনের মূল সূত্রকেই তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের জীবন-মৃত্যু, পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য, সৃষ্টি রহস্য, ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পরিবার-পরিজন সবকিছুই তাঁর গানে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মৃত্যু চিন্তায় তিনি সব সময় বিভোর থাকলেও কোনদিন বৈরাগ্যভাব গ্রহণ করেননি। সংসারের যাবতীয় কাজে আবদ্ধ থাকলেও পার্থিব ভোগ-বিলাস তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনদিন। সদা সহজ-সরল জীবন যাপনকারী এই স্বার্থক মরমী কবি অন্তরের পবিত্রতাকে সব কিছুর উপরে স্থান দিতেন। তাঁর রচিত অসংখ্য কবিতা ও গানে তিনি ইসলামী ভাবধারাকে সমুজ্জ্বল রাখার চেষ্টা করেছেন।

---

১১৮. মোহাম্মদ মোমিনুল হক, *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত* (লন্ডন : ব্রিকলেন সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ৩০।

১১৯. প্রাগুক্ত।

১২০. রুহুল ফারুক, প্রাগুক্ত, লেখক পরিচিতি।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য জীবনের শুরুতে কবি গিয়াস উদ্দিন হযরত শাহজালাল, শাহ পরাণ ও ওলী-আওলিয়াদের নিয়ে গান রচনা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ওলী-আওলিয়াগণই নবী-রাসূলগণের স্বার্থক উত্তরসূরী। তাঁর সুরে ভেসে উঠেছে :

আওরে সবাই মিলিয়া
পীর আউলিয়ার গুণ গাই, প্রেমে নাচিয়া।[১২১]

আধ্যাত্মিক সাধক কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের কবিতা ও গানে আল্লাহর নাম, নি'আমত, আল্লাহর অস্তিত্ব, ইবাদত-বন্দেগী, পরকাল, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া এবং রাসূল (সা.)-এর নাত ও প্রশংসা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

১. আল্লাহর নামের প্রশংসা

আধ্যাত্মিক সাধক কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

আল্লাহ, লিল্লাহ, লাহু, হু
জপরে মন আল্লাহু।
এ নামটি করিলে সাধন
পরিষ্কার হবে রুহু।
জপরে মন আল্লাহু।[১২২]

অন্যত্র বলেন :

আল্লাহর আলিফ ছেড়ে দিলে,
লিল্লাহ কেও আল্লাহ বলে,
জপরে মন দীলে দীলে,
আল্লাহ, ইয়া লিল্লাহু।
........................[১২৩]

আল্লাহর নাম জপ করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতেই মগ্ন হন। তিন পূর্ব-পশ্চিম উভয় প্রান্তের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই আপনার কার্য নির্বাহক হিসেবে গ্রহণ করুন।"[১২৪]

১২১. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *মরিলে কান্দিস না আমার দায়*, পৃ. ৭
১২২. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *শেষ বিয়ার সানাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪
১২৪. *আল-কুরআন*, ৭৩:৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহর বিভিন্ন সত্তা ফুটে উঠেছে তাঁর নিম্নের গানে :

তুমি আল্লাহ রহিম রহমান, তোমার মত নাই দয়াবান
তুমি যে হও গফুর ও গফফার।
তোমার এই সব নামের গুণে, পুইড়োনা আমায় আগুনে,
গিয়াসে চায় পবিত্র দীদার। আল্লাহ পরোয়ার ॥[১২৫]

২. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে

মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা এবং তাঁর সৃষ্টি রহস্য সম্যক উপলব্ধিসহ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার চেষ্টা কবি গিয়াস উদ্দিনের গানে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষায় :

কি খেলা খেলিছ আপন মনে গো এলাহী,
কি খেলা খেলিছ আপন মনে।
কেউ বুঝি না তোমার লীলা, পাতিয়াছ এমন খেলা,
চালাইতেছ থাকিয়া গোপনে গো এলাহী ॥
কি খেলা .... ॥
পৃথিবী করিয়া সৃজন, সৃষ্টিতে রয়েছ গোপন,
কেউ তোমারে দেখি না নয়নে।
সর্বজীবে আহার জোগাও, কেউরে হাসাও কেউরে কান্দাও,
কেউ বাঁচিনা তোমার দয়া বিনে গো এলাহী
কি খেলা .... ॥[১২৬]

অন্যত্র বলেছেন :

মালিক তুমি রাজাধীরাজ
জ্ঞান গরীমায় গুরুর গুরু।
সবার জ্ঞানের শেষ যেখানে,
সেখান থেকেই, তোমার শুরু।
প্রশংসা কি করব আমি,
তুমি কি-তা জান তুমি,

১২৫. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *শেষ বিয়ার সানাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

তোমার সৃজন বিশ্বভূমি,
জ্বিন ফেরেশতা মানব গরু।[১২৭]

৩. আল্লাহর নি'আমত

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মানুষের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত নি'আমতের কথা বিনীত চিত্তে প্রকাশ পেয়েছে মরমী কবি গিয়াস উদ্দিনের অনেক কবিতা ও গানে। তিনি বলেন :

"দয়ালরে : জন্ম দিতে পারতে মোরে, জঙ্গলের প্রাণী
মানব কোলে জন্ম দিলে, হাজার মেহেরবানী,
জন্মের পরে দিলে দুগ্ধ, মা জননীর স্তনে।
চুষিয়া চুষিয়া খাইলাম, তোমার দেওয়া জ্ঞানে।
দয়ালরে : জন্ম দিতে যদি আমায়, জন্মান্ধ করিয়া,
সুন্দর ভূবন দেখিতাম না, দুই নয়ন ভরিয়া,
বোবা করে জন্ম দিলে, এই সুন্দর জাহানে।
মনের কথা মনেই রইত, ফুটত না জবানে।
দয়ালরে : হাবিবের উম্মতে জন্ম দিয়াছ আমায়,
এত নিয়ামত পাইয়াও আল্লাহ, চিনলাম না তোমায়;
সবকিছু দিয়াছ তুমি, জানি তনে মনে,
গিয়াসেরে তরাইও আল্লাহ, হাশরের ময়দানে।"[১২৮]

৪. আল্লাহর অস্তিত্ব

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র জড় ও জীব জগতের সর্বত্রই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রভাব ও অস্তিত্ব বিদ্যমান। তিনি যে মানুষের অন্তরেই বিরাজমান এবং তিনি যে অন্তর্যামী তা কবি গিয়াসের কবিতা ও গানে সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে।

আমার মাঝে আছ তুমি পাক হাদিছে শুনি তাই
তবে কেন খুঁজলে পরে তোমারে না পাই।
আছ তুমি প্রাণে প্রাণে, পাওয়া যায় প্রমাণে

---

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

বিরাজিত সর্বস্থানে, কোন জায়গা বাকী নাই।
সর্বজীবে দেখ তুমি, তুমি সবার অন্তর্যামী
তোমায় দেখতে চাইলে আমি, শুধু কেন্দে বুক ভাসাই।[১২৯]

৫. নবীজির নাত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসায় কবি গিয়াস উদ্দিন অনেকগুলো নাতে রাসূল (সা.) রচনা করেছেন যা ইসলামী ভাবধারায় সমুজ্জ্বল। তাঁর লিখনীতে ফুটে উঠেছে :

"নবীজির উপরে ভেজি, দুরুদ ও সালাম।
(যার) সাফায়াতে তরে যাবে, গুনাহগার তামাম ॥
নবীজির উপরে ...।
পাপী উম্মৎ তরাইতে, এলেন যিনি দুনিয়াতে,
নিয়ে এলেন মে'রাজ হতে, নিজ ধর্ম ইসলাম।
নবীজির উপরে ...।"[১৩০]

অন্যত্র বলেন :

"নবীজির প্রশংসা করা
অধমের কি সাধ্য আছে।
যার প্রশংসা আল্লাহ তালা
কালামুল্লায় করিয়াছে।"[১৩১]

৬. ইবাদত সংক্রান্ত

কবি গিয়াস উদ্দিনের গানে ও কবিতায় ইসলামের মৌলিক ইবাদত তথা–ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যা থেকে কবির ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঈমানী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কণ্ঠে শুনা যায় :

"রোজা রাখ নামাজ পড়, ওরে মোমিন মুসলমান,
তিন ফরজ গরীবের জন্য, নামাজ, রোজা আর ঈমান ॥
ঈমান রাখিয়া ধড়, রোজা রাখ নামাজ পড়,

---

১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

পরনিন্দা গুমান ছাড়, যা বাপে কর এহ্সান।

বড়দেরে সম্মান কর, ছোটকে মহব্বত কর,

রোগীকে সেবা কর, এই তো বেহেস্তি নিশান ॥"[১৩২]

এছাড়াও তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গানে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত তথা ধর্মীয় বিধানাবলি যথাযথ পালন করার তাগিদ দৃঢ়ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

৭. ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও ক্ষণস্থায়ী জীবন ও যৌবন

বাউল কবি গিয়াস উদ্দিনের গানে ও কবিতায় আমরা দেখতে পাই, দুনিয়াদারীর অসারতা এবং আখিরাতের যিন্দেগীর স্থায়িত্ব। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

ভেঙ্গে যাবে একদিন তোর এই মায়ার মেলা।

কার দিকে তুই চাইয়া রইলে, ওরে আমার মন পাগেলা।।

এত স্নেহের স্ত্রী পুত্র ধন, সঙ্কটে তোর কেউ নয় আপন

চেয়ে থাকবে পরের মতন যমে যেদিন ধরবে গলা।।[১৩৩]

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃত বসবাসের স্থান হলো আখিরাত; বরং তোমরা তো এই দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতের জীবন এর চেয়ে কতই না উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী।"[১৩৪]

মানুষের জীবন যে কেবল শিশিরের মতই ক্ষণস্থায়ী এবং যৌবন, ধন-সম্পদ এগুলো কোন কিছুই পরকালে কাজে আসে না এসব যে কেবলই মোহ আল-কুরআনের এই মর্মবাণী তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায় বিধৃত হয়েছে–

নিশির শিশির যেমন মানুষের যৌবন, পাগল মন।

সবুজ রঙ্গের দুর্বায়, কি সুন্দর দেখা যায়,

ঝরিয়া পড়ে যায়, আসিলে পবন।

পাগল মন ...।।

ধন আর যৌবনের গৌরব মিছে কর ময়না,

উভয়ই চিরকাল কারো কাছে রয়না।

১৩২. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *শেষ বিয়ার সানাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১৩৩. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *মরিলে কান্দিস না আমার দায়*, পৃ. ২০।

১৩৪. *আল-কুরআন*, ৮৭:১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষণিকের জন্য এসে, কি সুন্দর ঝলসে,

ঊষার কোলে যেন রবির কিরণ।

পাগল মন ...।।[১৩৫]

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

"যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং স্বীয় নফসকে কু-কাজ থেকে বিরত রাখে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"[১৩৬]

৮. পাপ-পুণ্যের হিসাব

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে। তিনি (আল্লাহ) মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব নয়; বরং মানুষের আনুগত্য চান, কারণ তিনি রহীম ও রহমান। তিনি চাইলে পাপীকেও ক্ষমা করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "হে রাসূল! আপনি আমার সেসব বান্দাদেরকে বলুন, যারা নিজের উপর নিজেরাই অপরাধ করে সীমা অতিক্রম করেছে তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয় (যদি তারা কায়মনোবাক্যে, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইচ্ছা করলে) সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন।"[১৩৭]

আল-কুরআনের এই অমোঘ বাণীর প্রতি আমল করে কবি গিয়াস উদ্দিন তাঁর পাপ-পুণ্যের জন্য নিরাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন যা তাঁর অসংখ্য গানে ফুটে উঠেছে এভাবে–

আমার মত পাপী তাপী, কেউ নাই আল্লাহ দুনিয়ায়,

বড় আশা আছে দীলে, রহিম রহমান নাম থাকায়।[১৩৮]

আবার বলেছেন :

আমার আল্লা খুশি, ডাকলে গুনাহগারে

ডাকো কাতরে .....॥

আল্লাহ খুশি, ডাকলে গুনাহগারে।

এটাই তার প্রেমের খেলা, যার জন্য জগৎ সৃজিলা,

---

১৩৫. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *মরিলে কান্দিস না আমার দায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১৩৬. *আল-কুরআন*, ৭৯:৩৭-৪১।

১৩৭. *আল-কুরআন*, ৩৯:৫৩।

১৩৮. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *মরিলে কান্দিস না আমার দায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পাপী ছাড়া মাফ দিবেন আর কারে।
ডাকো কাতরে .....॥
গুনাহগারের চোখের পানি, আল্লাহর কাছে খুব সম্মানী,
আরশে আল্লাহ কাঁপে বারে বারে।
দয়াল আল্লাহর সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে দেন ঘোষণা।
আর কাঁদিস না, দিলাম ক্ষমা করে।
ডাকো কাতরে .....॥[১৩৯]

৯. পরকালের প্রতি বিশ্বাস

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে : "আমি তোমাদেরকে অনাগত দিনের আসন্ন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।"[১৪০] পবিত্র কুরআনের এই বাণীর মর্মার্থই হলো পরকালের প্রতি বিশ্বাস। গীতিকবি গিয়াস উদ্দিন তাঁর গীতি কবিতায় পরকালের বিশ্বাসকেই প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি পরপারের মাঝিকে আহ্বান করেছেন এভাবে–

"(আমায়) পার করে নাও, দয়াল নামের গুণে।
ওপারের কাণ্ডারী দয়াল, তাই ভরসা মনে ॥
পার করে নাও ..... ॥
কালো মেঘে সাজ করেছে, দেখে প্রাণে ভয় লেগেছে,
তুমি ছাড়া আরকে আছে, বাঁচাবে তুফানে।
পার করে নাও .....॥"[১৪১]

১০. কবরের আযাব

মৃত্যুর পর কবরের আযাব এবং সে আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং রাসূলের উম্মতের বদৌলতে ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা কবি গিয়াস উদ্দিনের বহু কবিতা ও গানে ফুটে উঠেছে। কবির লিখনীতে সে প্রত্যাশা নিম্নরূপ :

প্রাণ কান্দে সেই ডরে আল্লাহ, মন কান্দে সেই ডরে
কেমনে থাকিমু আমি একলা কবরে রে।

---

১৩৯. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *শেষ বিয়ার সানাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
১৪০. *আল-কুরআন*, ৭৮:৪০।
১৪১. গিয়াস উদ্দিন আহমদ, *শেষ বিয়ার সানাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ কান্দে সেই ..... ।

দুনিয়ার সুখ-দুঃখে পাইতাম, ভাই বন্ধু সবারে

তুমি বিনে ভরসা নাই কবরের ভিতরে রে।

প্রাণ কান্দে সেই ..... ।

তোমার হাবিবের উম্মৎ, এই আশা অন্তরে

গিয়াসে মাফ কইরো তোমার, হাবিবের খাতিরে রে।

প্রাণ কান্দে সেই ..... ।[১৪২]

এছাড়াও আপন ও পর, নিজের আত্ম সমালোচনা, মৃত্যু চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহুমাত্রিক শত সহস্র গান ও কবিতা রচনা করেছেন যেগুলো প্রত্যেকটিই ইসলামী ভাবধারায় সমুজ্জ্বল।

পরিশেষে বলা যায়, মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন সুখ্যাতি ও সর্ব মহলে পরিচিতি না পেলেও তাঁর কবিতা ও গান তথা গোটা সৃষ্টিকর্ম ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভের দাবী রাখে। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনভর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে আল্লাহরই উপাসনা করেছেন। তিনি তাঁর কবিতা ও গানে শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের উদাত্ত আহ্বান জানানোর পাশাপাশি পরকালের শাস্তি ও পরিণামের বিষয়টি শৈল্পিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সর্ব সাধারণকে নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ড পরিহারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। তাঁর জীবন পরিক্রমা ও সৃষ্টিকর্ম বর্তমান প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

দেওয়ান একলিমুর রাজা কাব্যবিশারদ ও তাঁর কবি মানস
(১৮৮৯-১৯৬৪)

শত বাউল ও মরমীর দেশ সিলেট। অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী জন্ম নিয়েছেন এ মাটিতে। তাঁদের কলকাকলীতে সিলেটের আকাশ মুখরিত। এ মুখরিত কাব্যাকাশের অন্যতম তারকা হলেন দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী কাব্য বিশারদ। তাঁর জন্ম ১২৯৬ বাংলা সনের ২১ শে কার্তিক তাঁর পিতার সুপরিচিত নিবাস লক্ষণশ্রী গ্রামে। তার বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে একলিমুর রাজা বলেন : "অযোধ্যা নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় সূর্যবংশের ক্ষত্রিয় কুলের নক্ষত্রিয় স্থানীয় সন্তান রাম চন্দ্র সিংহ দেব রূপে গুণে ছিলেন অতুলনীয়। কালক্রমে তাঁর বংশধর প্রথমে এলাহাবাদ পরে বাংলাদেশের বর্ধমান জেলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের জনৈক চরম দুঃসাহসী ও পরম উৎসাহী যুবক বর্ধমান হতে যশোহর

---

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

জেলায় চলে আসেন এবং হাবেলী পরগনায় এক খণ্ডরাজ্য স্থাপন করে রাজধানীর নামকরণ করেন কাগদিঘী বা কাগদি। এ যুবকের নাম হল রাজা বিজয় সিংহ দেব। রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি সেখানে অধিককাল তিষ্টিতে পারেননি। লক্ষণতুল্য কনিষ্ঠ ভক্ত ভ্রাতা দুর্জয় সিংহ দেব বিভীষণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ফলে ভ্রাতৃ বিরোধ আরম্ভ হয়। রাজা বিজয় সিংহ পরাস্ত হন এবং আহত নিহত না হলেও মর্মাহত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। রাজা বিজয় সিংহ পরাজিত হয়ে অপরাজিত মন নিয়ে সিলেট জেলার সদর মহকুমায় এসে নতুনভাবে জীবন শুরু করেন ও বংশের আদি পুরুষ 'রামচন্দ্র'-এর স্মৃতি রক্ষার্থে 'রামপাশা' নাম দিয়ে গ্রাম পত্তন করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বারানসী রাম সিংহ দেব সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে চৌধুরী উপাধী গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাঁর একমাত্র পুত্র বীরেন্দ রাম সিংহ দেব অতি সুপুরুষ এবং ফারসী নবীশ কবিও ছিলেন। ইনি ছিলেন বংশের প্রথম কবি। অজ্ঞাত কারণে বীরেন্দ্র রাম সিংহের ধর্মান্তরের ভাবান্তর হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং নাম হয় 'বাবর রাজা খাঁ'। বীরেন্দ্র রাম ধর্মান্তর হলে তাঁর অমিততেজা ক্ষত্রিয়ানী স্ত্রী মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। পরে বাবর রাজা খাঁ লক্ষণশ্রী পরগনার কোরেশ বংশীয় জমিদার ওয়েজ উদ্দিন কুমেদান-এর কন্যার পানি গ্রহণ করেন। বাবর রাজার দুইপুত্র : ১. কেশোয়ার রাজা খাঁ, ২. আনোয়ার রাজা খাঁ। আনোয়ার রাজার দুইপুত্র : ১. আলম রাজা খাঁ, ২. আলী রাজা খাঁ। দেওয়ান আলী রাজা খাঁ চৌধুরীর দুই পুত্র : ১. দেওয়ান ওবেদুর রাজা, ২. দেওয়ান হাছন রাজা। দুই ভাই-ই কবি ছিলেন। হাছন রাজার গান বহুল আলোচিত ও জননন্দিত। ঐ হাছন রাজার পুত্র হলেন দেওয়ান একলিমুর রাজা।[১৪৩] সিলেটের মরমী ভাবধারায় কাব্য সাধনা এখনও চলমান। আধুনিক কালেও অনেকে মরমী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তাঁরা তাঁদের কাব্য সাধনায় মরমী ভাব অব্যাহত রেখেছেন। একলিমুর রাজাও তাঁর কাব্য সাধনায় পিতা হাছন রাজার প্রত্যক্ষ অনুসারী হলেও আধুনিকতার পরশ তার গানে ও কবিতায় পাওয়া যায়। মরমী ও আধুনিক উভয় ধারায় কাব্য রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। উভয় ধারার সমন্বয় তার কাব্যে ও রচনায় দৃষ্ট হয়। এজন্য দেওয়ান একলিমুর রাজাকে বৃহত্তর সিলেটের প্রথম আধুনিক কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাল্যকালেই তাঁর কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। কিশোর বয়সে এক যুবতী নারীর প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে। বিয়ের পর যুবতী স্বামী গৃহ থেকে ফেরত এলে কবির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে ভারাক্রান্ত হৃদয় নয়ন জলে সিক্ত হলে কবির মনে ভাবের উদ্রেক ঘটে। কবি বলেন উঠেন :

"তোমার নয়ন দিয়ে পড়লো যখন
বসন বেয়ে নয়ন ধারা

১৪৩. চৌধুরী গোলাম আকবর, *স্বনামধন্য পিতা-পুত্র* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত)।

Dhaka University Institutional Repository

তখন আমার আঁখির মাঝে

ভিজলো কেন আঁখি তারা?"[১৪৪]

এরপর থেকে একলিমুর রাজার কাব্য সাধনা শুরু। তিনি লিখতে থাকেন কবিতা। সমকালীন ভারতবর্ষ, প্রবাসী বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি সরলা দেবী চৌধুরীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি কলকাতার এক কবিতা পাঠের আসরে সরচিত 'দেবতার পরিণাম' নামক কবিতা পাঠ করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতী পত্রিকায় উক্ত কবিতা প্রকাশ পেলে বংগীয় কবি সমাজে কবি রূপে তাঁর আসন পাকাপোক্ত হয়ে যায়। তাঁর কবি প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ নবদ্বীপের 'স্বারস্বত সমাজ' তাঁকে 'কাব্য বিশারদ' উপাধিমূলক মানপত্র পাঠিয়ে অভিনন্দিত করেন।[১৪৫] তার আগে নবদ্বীপের 'স্বারস্বত সমাজ' কোন মুসলমানকে এরূপ অভিনন্দন জানায়নি। তাতে কাব্য সাধনায় তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে শিলং শহরে ১৯২৫ সনে। কবি তাঁর পিতা হাছন রাজার পরিচয় দিয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী। ছেলের অনিন্দ্য সুন্দর চেহারা দেখে কবিগুরু মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন। একলিমুর রাজা তখন কবিগুরুকে তাঁর রচিত 'কৃপণ' কবিতা পাঠ করে শোনান। এতে কবিগুরু মুগ্ধ হয়ে হাস্যমুখে বলেছিলেন, "তোমার পিতার নিকট থেকে পাওয়া জিনিস যত্ন করে রেখো।"[১৪৬]

১৯২৮ সনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আসাম মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের আমন্ত্রণে সিলেট আসলে এক কবি আরেক কবিকে চা পানে আপ্যায়িত করেন। চায়ের মজলিসে কবিতায় স্থানীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্যাবলির সুন্দর বিবরণ দিয়ে অভিনন্দন জানালে কাজী নজরুল কবি একলিমুর রাজার কাব্যশক্তি অনুভবে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। ফলে উভয়ের মধ্যে পরম প্রীতি ও হৃদ্যতা জন্মে। কারণ উভয়ই একই আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। কবি নজরুল আর একলিমুর রাজার মধ্যে ঐ সময়ে আরও বিভিন্ন বৈঠকে মেলামেশা হওয়ায় নজরুল তার অনেক কবিতা ও গানের পাঠ শুনেন। তাঁর লিখিত "দেবতার পরিণাম' কবিতাই কবির অধিক পছন্দ হয়েছিল। তাছাড়া তিনি একলিমুর রাজার একটি জনপ্রিয় গান :

"কে গো তুমি কোথায় থাকো, হেগো গোপনচারী

ভুবন মোহন রূপ তোমার, ভুবন তুলে ভরি।

---

১৪৪. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৪৫. প্রাগুক্ত।

১৪৬. রাগিব হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, ভিলেজ ডাইজেস্ট, সিলেট, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

স্বপন মাঝে আপনারে গোপন করে রাখো
প্রদীপ খানি আঁচল দিয়ে আড়াল করে ঢাকো;
তবু তোমার বিভা, উজ্জ্বল করি, আমার বিভাভরী
ভুবন মোহন রূপ তোমার ভুবন তুলে ভরি।"[১৪৭]

গেয়ে গেয়ে নৃত্য করতেন। নজরুল মানসের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। যার দরুন তাঁর অনেক কবিতায় নজরুলের মতো বিদ্রোহী ভাব লক্ষ্য করা যায়। 'রাজবন্দী' কবিতায় কবি বলেন :

"মোর মুখে তোর স্বর/বাজাইলে বাঁশী/তব কান্না দিয়ে মোরে
কাঁদাইলে বারে বারে/হাসাইলে দিয়ে তব হাসি/তুমি মোরে করিলে উদাসী।
কত রূপে অপরূপে শোয়াইলে/কত অপরূপ রূপসীর শয়ন মন্দিরে
তোমার বন্দীরে/উঠাইলে নামাইলে উর্ধ্বে আর নীচে।
ডানে আর বামে, কত তরঙ্গের সাথে/কত কুরঙ্গের গাছে, কত বিহঙ্গ কুজনে,
কত ভুজঙ্গ সংগমে।/ মাঠে মাঠে বাটে বাটে,/ বসাইলে রাজ পাটে,
রাজ সিংহাসনে।/ রাজভোগ করাইলে, রাজবেশ পরাইলে,/ রাজার সম্মানে
করিলে সম্রাট হে বিরাট।/ এরপর সোনার পালংক হতে/ প্রিয়সীর অঙ্গ হতে
টেনে মোরে নামাইলে মাটির ধুলায়/ হায় হায়।"[১৪৮]

তাঁর কবিতার বাংকারে মনে হয় এ যেন বিদ্রোহী রাজদ্রোহ। নজরুলের বিদ্রোহী অথবা ইকবালের শিকওয়াহ কবিতার ধ্বনি শোনা যায় তাঁর কাব্যে। অভিযোগ কার উদ্দেশ্যে স্রষ্টা না সৃষ্টির বিরুদ্ধে। পরক্ষণেই প্রশমিত হয়ে আসে ক্ষোভ। তখনই একই কবিতায় :

"না না মহারাজ/ তব বিশ্বরূপ আজ/ কল্পনা আলোকে যতদূর যায় দেখা
তুমিও রয়েছ বন্দী আমি নই একা।/বান্দা পরস্পর/তোমা আমার মাঝে বন্দী সৃষ্টির সুন্দর।
পাতালে আকাশ বন্দী আকাশে পাতাল/ আপনার জালে বন্দী কাল চিরকাল।
সমাজে সংসার বন্দী সংসারে সমাজ/ সর্ববন্ধনের মাঝে বন্দী মহারাজ।"[১৪৯]

---

১৪৭. *সিলেটের কাব্য সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কাব্যে দর্শন চিন্তা আছে, উচ্চাংগের ভাব আছে, বুদ্ধিভিত্তিক সৃজনী চিন্তার বিকাশ আছে। বুদ্ধির অতিরিক্ত আরও সৃজনী শক্তির অস্তিত স্বীকারই তাঁর জীবন দর্শনের মূলকথা। স্রষ্টা আর সৃষ্টির সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক। কোন মাধ্যমকে স্বীকার করতে নারাজ। তার 'জারজ' কবিতায় বলেন :

"পরিচয়হীন কোমল কঠিন জানিত কি কেহ কার
মোল্লার মন্ত্রে কিল্লা ফতেহ হয়েছিল শুধু যার।
তার ছেলে হল কুলে গৌরব এমন বিচারে ছাই
মোল্লার বিধান আল্লার উপরে আমার বিধাতা নাই।
প্রাণ বিনিময়ে পেয়েছি প্রাণ সে হবে কেমনে হীন
এত অবিচার এত অত্যাচার চলিবে কি চিরদিন।
হে মহামহান করুণা নিধান তোমারই হউক জয়
জারজ সন্তান আল্লার সৃষ্টি মোল্লার সৃষ্টি তো নয়।"[১৫০]

সমাজের গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতাকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। মানুষ ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন। পাপকে ঘৃণা ভরে দূরে পাপীকে বুকে টেনে নেওয়াই ছিল তাঁর দর্শন। যার দরুন তাকে দার্শনিক কবিও বলা হয়। মনুষত্বের জয়গান ছিল দার্শনিক মতবাদের বৈশিষ্ট্য। তার কাব্যে এরূপ অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাব পরিস্ফুট। একলিমুর রাজা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক কবি হলেও মাটি আর মানুষকে তিনি কখনও ভুলেননি। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে তাঁর কাব্যে রূপ দিয়েছেন যত্ন সহকারে। তার কবিতায় বিধৃত হয়েছে :

"নদীপারে ছিল আমার ছোট্ট কুড়েঘর/ চালে পাশে খুপে বসে ডাকতো কবুতর।
নদীর জলে হেলেদুলে ভেসে যেত না/ পথিক যেত পথে চলে ধুয়ে যেত পা।
কাকাতুয়া ডালিম গাছে ঝড়াতো বসে ফর/ (আর) চালের পাশে খুপে বসে ডাকতো কবুতর।
আমাদের এই আঙ্গিনাতে ছিল ফুলের রাস/ ফুটতো কত কুসুমকলি ঝরতো বারো মাস।
মুকুল ভরা আকুল ঝরা গল্প ছিল তার/ উষার কুলে হাওয়ায় দুলে ভরত চারিধার।
নাচতো লতা কাঁপতো তরু/ কচিপাতা সরু সরু।
হাসতো ধরা উজ্জ্বল করা তরুণ অরুণ কর/ (আর) চালের পাশে খুপে বসে ডাকতো কবুতর।"[১৫১]

গ্রাম বাংলার ছবি তার কাব্য চিত্রের অন্যতম প্রকাশ। কবি গ্রামীণ জীবনকে ভালোবাসতেন। হৃদয় দিয়ে গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না অনুভব করতেন। তাই কাব্যে গ্রামের শাশ্বত রূপ ধরা দিয়েছে।

---

১৫০. দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী, *গীতিমেখলা*, সিলেট, ১৯৬৩, কবিতা : জারজ।
১৫১. *জালালাবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

"হেসে খেলে গান গেয়ে সময় কাটায়/ ফসলে ভরিছে মাঠ/ নিকটে বারুনীর হাট
নদ-নদী পার হয়ে আসে কেহ যায়।/ বিচারের নাই ঠাট/ নাই এত পরিপাট
আজ হতে সেও সুখী, খেতে যে না পায়।/ ঘাটে ঘাটে সারি সারি/ কাকে কলসী হাতে ঝারি
নারীগণ ফুল্লমন, নুপুর বাজায়।/ চলে যায় হেলে দুলে/ খুপা ভরা রাঙ্গা ফুলে
হেসে ঢলে পড়ে ও উহার গায়।"[১৫২]

কি বাস্তব চিত্র! গ্রাম বাংলার মানুষের করুণ অবস্থাও তিনি অন্তর দিয়ে দেখেছেন। আবেগ দিয়ে তীব্রভাবে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। যেমন :

"ম্যালেরিয়া হয়ে ভাবী উজাড় করে গ্রাম
এমনিভাবে রেখে গেছে তাহার পরিণাম
নিতাই মাঝি মরে গেছে সাধু শেখও হায়
(ঐ) নদীর পারে শ্বশান ঘাটে কবর দেখা যায়।"

একলিমুর রাজা বাংলা সাহিত্যের এক বলিষ্ট কাব্য প্রতিভা। তাঁর কাব্যভাব ও ভাষায় স্বীকায়তার চাপ বিদ্যমান। স্বীয় দর্শনকে কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন অন্তর দিয়ে যত্ন সহকারে। কাব্য প্রতিভা স্রষ্টার এক বিরল সৃষ্টি। জোর করে কবিতা লিখা সবার সাজে না। যিনি সত্যিকারের কাব্য প্রতিভার অধিকারী তার পক্ষেই কবিতার হাটে বিচরণ করা শোভনীয়। অকবির কবিতা চর্চা দেখে একলিমুর রাজা বিদ্রূপের সুরে বলেন :

"কবি চোরে আর গাভী চোরে ভরে গেল দেশটা
হাবুল বাবুল সেও কবি মস্ত কবি কেষ্টা।
অন্তরামের শালী কবি মন্তরামের পত্নী
ধন্য ধন্য পড়ে গেল দেশের দু'টি রত্নী।
সোনা উল্লার ভগ্নী কবি মনা উল্লার ভাগ্না
কবির বাড়ী চাকুরী করে কবি হল মাগ্না।"[১৫৩]

একলিমুর রাজা বাউল ও মরমী ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর গান ও কাব্যে মরমী সুর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। মরমী কবি হাছন রাজার রক্তের প্রবাহ তাঁর মন ও মানসকে উদাস করে তুলে। পিতার প্রভাব পুত্রকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তাই কবি গেয়ে উঠেন :

---

১৫২. প্রাগুক্ত।
১৫৩. ভিলেজ ডাইজেস্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

"মন আমার মদিনারে কাশী বানারশী
মনের মাঝে মনের ঠাকুর
(তবু) সদায় পরবাসী মন আমার মদিনারে।
মনেতে মথুরা আছে মক্কা কাবার ঘর
তার মাঝে বিরাজিছে ঠাকুর সুন্দর রে।
মনের মাঝে মরুভূমি তরু সরু বর
খুঁজিলে পাইতে পার জুবেদা নহর রে।
ভাবিয়া একলিমুর রাজা বলে মক্কা যাওয়া মিছে
মনের মাঝে খুঁজ ঠাকুর (সে) তোমায় খুঁজিছে রে।"[১৫৪]

কবি মনে বৈরাগ্যের চাপ। সংসারের অনিত্যতা কবিকে ভাবিয়ে তুলে। জীবনের পরিণতি সম্পর্কে তিন সন্দিহান। তাই বলেন :

"কত হাসি ভালবাসি কত গাই গান
আঁখির পলকে হবে বেলা অবসান
কত কথা বলিলাম কত রইল বাকী
না বলিতে মুখের কথা মুজিলাম দুই আঁখি।
একলিম রাজা চলিয়া যাবে না পুরিতে আশা
লক্ষণ ছিরি জমিদারী বাড়ী রামপাশা।"[১৫৫]

মরণ চিন্তা ও পরকাল নিয়ে বিভোর মন ভয়ে কিন্তু ভীত নয়। কবি ছিলেন এক সাহসী পুরুষ। সৃষ্টিকে অন্বেষণ করেছেন প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাসের আলোকে। সন্ধানী মন নিয়ে স্রষ্টা পানে অগ্রসরমান। তাই শেষ যাত্রার কালেও কবি বলেন :

"দূর হতে আসিয়াছি যাব বহু দূর
এর মাঝে চলে গেলো সহস্র রজনী
এল গেল কত কত ভোর
পথের তো হলো নাকো শেষ
কোন দেশে চলে যাব হব নিরুদ্দেশ।

১৫৪. প্রাগুক্ত।
১৫৫. সৈয়দ মোস্তাফা কামাল, *ভাবনার বাতায়ন* (সিলেট : হবিগঞ্জ ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭), পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

অনন্তকালে যাত্রী দিনরাত্রি
পথের তো চিহ্ন কিছু নাই
সবকিছু একাকার দাঁড়াবার স্থান নাহি পাই।
কি লিখিব আর, যেদিকে ফিরাই আঁখি
দেখি শুধু অনন্ত অসীম অন্ধকার।
এইখানে থেমে যাই
আগে বেড়ে দেখি
লিখিবার কোন কিছু পাই কি না পাই।"[১৫৬]

একলিমুর রাজা আগে বেড়ে চলে গেলেন অনন্তের পথে। ১৩৭১ বাংলার ২৯ শ্রাবণ কবি ইহলোক ত্যাগ করেন। ফেলে যান বিষয়-সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র ও পরিজন। প্রবাসী আল-ইসলাহ ও ভারতীসহ বহু পত্রিকায় একলিমুর রাজার অসংখ্য গান ও কবিতা প্রকাশিত হয়। তার একমাত্র গানের বই 'গীতি মেখলা' প্রকাশ পায় ১৯৬৩ সালে সৈয়দ মোস্তফা কামালসহ তৎকালীন কয়েকজন তরুণ কবি-সাহিত্যিকের প্রচেষ্টায়। তিনি গদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর 'ভুলন মিয়ার ভুল' ও 'পাকিস্তানী উপকথা' মাসিক আল-ইসলাহ পত্রিকায় প্রকাশ পায়। 'গীতি মেখলা' ছাড়া তাঁর কোন লিখা বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। তার অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি ছিল। পাণ্ডুলিপিগুলো হলো :

১. ঢেউ (কবিতা), ২. হরেক রঙের (কবিতা), ৩. প্রাণের কথা গানে (গান), ৪. পাকিস্তানী উপকথা (রম্য রচনা), ৫. ভুলন মিয়ার ভুল (রম্য রচনা), ৬. আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা (আত্মজীবনী), ৭. হারানো মানিক (গান), ৮. মায়ের বিয়ে (উপন্যাস), ৯. চতুরঙ্গ (উপন্যাস), ১০. বিশুদা (উপন্যাস), ১১. জারজ (কবিতা), ১২. ভাবী (উপন্যাস)।

কবি শুধু কবিতা আর গানই লিখতেন না, দেশ ও সমাজ সেবাও করে গিয়েছেন। রাজনীতিও করতেন। তাঁর চারপুত্র : ১. দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী, ২. দেওয়ান তালেবুর রাজা চৌধুরী, ৩. দেওয়ান তওয়াবুর রাজা চৌধুরী, ৪. দেওয়ান ছয়ফুর রাজা চৌধুরী। পুত্রগণও ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও আছেন। দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণও সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের বংশের যশ সুনাম খ্যাতি এখনও প্রবাহমান।

---

১৫৬. গীতি মেখলা, প্রাগুক্ত, কবিতা : প্রার্থনা।

Dhaka University Institutional Repository

বাউল কামাল পাশা : ভাটি বাংলার সংস্কৃতির প্রবাদ পুরুষ (১৯০১-১৯৮৫)

ভাটি অঞ্চলের বাউল গান, ভাটিয়ালি গান, কবি গান, জারি গান, পালা গানের জনশ্রুতি অতি সুপরিচিত। উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ ভাটি অঞ্চলের মাটি অতি খাঁটি। তাতে প্রচুর ফল-ফসল জন্মে। এর মধ্যে ধান ও পাট অন্যতম। তবে আম কাঁঠালেরও কমতি নেই। গোলা ভরা ধান, হাওর ভরা মাছ, ঘর ভরা হাঁস-মুরগী, গোয়াল ভরা গরু, কি সমৃদ্ধি ছিল ভাটি অঞ্চলের। ছয় মাস কৃষি কাজ। কঠোর পরিশ্রমের ফসল ফলানোর সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা। শ্রমের ফসল ঘরে তোলার পালা বৈশাখে। নতুন ধান ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে নবান্নেরও উৎসব হয় এই মাসে। আম কাঁঠালের সমারোহ, রসে ভরপুর ফলফলাদি।

জ্যৈষ্ঠের আগমনে আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বৃষ্টির বারতা। শুরু হয় আষাঢ়ের গর্জন ও বর্ষণ আর অথৈ পানি আর পানি। মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, নদী-নালা, ধানি জমি সব পানিতে তলিয়ে যায়। হাওর আর শুকনো জমি সব পানিতে একাকার। অকুল সাগর পাড়বিহীন পানি আর পানি। দ্বীপাঞ্চলের মতো ভেসে থাকে বসত ভিটা। শুরু হয় অবসরের পালা, তারই সঙ্গে মাদল বাজে, শুরু হয় জারি গান, ভাটিয়ালি গান আর যাত্রার সমারোহ।

কি আনন্দ, কি সুর, কি সমৃদ্ধি। তার মাঝে ভেসে আসে সুরের মুর্ছনা। বাঁশের বাঁশির হৃদয় স্পর্শ করা অপরূপ সুর। আর এই সুরের তালেই জন্ম নেন ভাটি অঞ্চলের মুকুটহীন সংগীত রচয়িতা, সুরকার গায়ক, সাধক, বাউল সম্রাট, ভাষা সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কামাল উদ্দিন। যার নামের বিস্তৃতি ও প্রসিদ্ধি কামাল পাশা নামে।

জন্ম ও পরিচিতি

প্রায় ছয় হাজার গানের রচয়িতা, ভাটি বাংলার মরমী ভূবনের কালজয়ী সাধক কামাল উদ্দিন বা কামাল পাশা ১৯০১ সালের ৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বাউল কবি আজিজ উদ্দিন ও মাতার নাম আমেনা খাতুন। কামাল উদ্দিন বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চল সিলেট বিভাগের, সুনামগঞ্জ জেলার, দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া ইউনিয়নের ভাটিপাড়া গ্রামের তালুকদার বাড়িতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরমী পরিবারে জন্ম নেয়া এই সাধক ছোট বেলা থেকেই তার পিতার কাছ হতে সঙ্গীত চর্চা করেন।[১৫৭]

১৫৭. www.bn.wikipedia.org/wiki/কামাল-উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা

কামাল উদ্দিন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি বাংলা, উর্দু, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতেন ও সঙ্গীত রচনা করতেন। লেখাপড়ার হাতেখড়ি ভাটি পাড়া গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরবর্তীতে নিজ গ্রাম থেকে দূরবর্তী রাজানগর উচ্চ বিদ্যালয় ও পরবর্তীতে সুনামগঞ্জ জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং সিলেটের এমসি কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন তিনি। এক পর্যায়ে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় হাদীস শাস্ত্রের উপর লেখাপড়া করেন। লেখা পড়ায় উচ্চ মানের ডিগ্রী অর্জন করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি এম.এ পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারেননি। এ হতাশার কথাটি তিনি স্বরচিত একটি আঞ্চলিক গানে প্রকাশ করে গিয়েছেন এভাবে–

> "বলো মোদের সিলেটবাসীর কিসের ভয়
> যে জায়গাতে জালাল বাবা শুইয়ে আছেন সব সময়।
> আদা হলদি পিঁয়াজ রসুন ঐ সিলেটে সব আছে
> স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ভাই জায়গায় জায়গায় বসেছে
> এ কামাল কয় দুঃখের বিষয় এম.এ পড়ার সুযোগ নয়।"[১৫৮]

আন্দোলনে অংশগ্রহণ

ব্রিটিশ আমলের জমিদাররা গরিব অসহায় মজুরদের দিয়ে বিনা মজুরিতে কাজ করাতো এবং জমিদারের সামনে জুতো পায়ে ও ছাতা টাঙিয়ে কোন গরিব মজুররা চলাফেরা করলে অসাধারণ জুলুম অত্যাচার করত। জমিদারদের এই প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিক সমিতির নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে একটি আন্দোলন সংগঠিত হয়। ঐতিহাসিক এই আন্দোলন 'নানকার আন্দোলন' নামে অবহিত। ১৯২২ সালে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ১৯৩৮ সালে সিলেট, বড়লেখা, বিয়ানিবাজারসহ সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় বেগবান হয়। তখন দিরাই উপজেলার রফিনগর ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের নানকার প্রজারা একত্রিত হয়ে ভাটি পাড়া জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মাঠে নামে।[১৫৯] সে সময় স্থানীয় নেতা সুবল দাশ, হাফিজ তালুকদার ও লইট্টা হাফিজ প্রমুখদের সঙ্গে বাউল কামাল উদ্দিনও এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আসাম পার্লামেন্টে প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। পরবর্তীতে প্রজাস্বত্ব আইন জনগণের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কামাল উদ্দিন যেসব সঙ্গীত রচনা করে গেছেন তার একটি হলো–

১৫৮. আল-হেলাল, চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় গানের সম্রাট কামাল পাশা, *দৈনিক সুনাম কণ্ঠ*, ৩ মে, ১৯৮৭
১৫৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

"ভাইট্টার জমিদার পরের জায়গা জমিন পরার
ফিরিঙ্গি বানাইলো তোদের তাবেদার
খুটগাড়ি প্রথা আইনে কৃষক কুল ধরছে ডাইনিয়ে
সাবধান হুশিয়ার।"[১৬০]

এছাড়া সাধক কামাল উদ্দিন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ৪৭-এর রেফারেন্ডাম ও ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে। '৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দিরাই থানার রাজানগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র জনতার সম্মিলিত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নৌকার প্রার্থী সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ আজাদ-এর বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় তিনি পরিবেশন করেন তার স্বরচিত দেশাত্ববোধক গান।

"নৌকা বাইয়া যাওরে বাংলার জনগণ
যুক্তফ্রন্টের সোনার নাও ভাসাইলাম এখন
নৌকা বাইয়া যাওরে।
দেশে আইলো নতুন পানি ঘুচে গেল পেরেশানী
মাছের বাড়লো আমদানী দুঃখ নাইরে আর।"[১৬১]

শীর্ষক ৫৪ লাইনের জাগরণী গান গেয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা স্বায়ত্বশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে হাওরাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আগত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত জানিয়ে তিনি ৫টি নির্বাচনী জনসভায় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নৌকা প্রতীকের পক্ষে নির্বাচনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৫নং সেক্টরের অধীনস্থ টেকেরঘাট সাবসেক্টর মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে জাগরণী গান পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে ছাত্র যুবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন মুক্তিযুদ্ধে যেতে। প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক হিসেবে গড়ে তুলেন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ'।[১৬২]

১৬০. *সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১৬১. অধ্যাপক ডা. মোঃ উবায়দুল কবীর চৌধুরী, আমার স্মৃতিতে বাউল কামাল পাশা, *সাপ্তাহিক হীরামন মানিকের দেশে*, সুনামগঞ্জ, ১৬ ডিসে. ২০২০
১৬২. জেলা তথ্য বাতায়ন, দিরাই উপজেলা, ২১ ডিসেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৯২৮ সালে সিলেটে মুসলিম ছাত্র সম্মিলনী উপলক্ষ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সংবর্ধনা মঞ্চে গান পরিবেশন করেন। সুনামগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে ১৯৩৭ সালে আসাম প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রজাবন্ধু করুণা সিন্ধু রায় এর পক্ষে গণসংযোগ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে সুনামগঞ্জ স্টেডিয়ামে কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনী সভায় গান পরিবেশন করেন। ১৯৭৩ সালে সুনামগঞ্জ স্টেডিয়ামে জাতির জনকের সংবর্ধনা মঞ্চে তিনি সংগীত পরিবেশন করেন।[১৬৩]

সম্মাননা

- অপ্রতিদ্বন্দ্বী গীতিকার ও সুরকার হিসেবে ১৯৬৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন ও আর্টস কাউন্সিল কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বাউল শিল্পীর পদকসহ গানের সম্রাট কামাল পাশা উপাধিতে ভূষিত হন।
- বাউল কল্যাণ পরিষদ সুনামগঞ্জ আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসবে লোক সংস্কৃতিতে গৌরবোজ্বল অবদানের জন্য এই মহাসাধককে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয় ।
- নানকার আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সুনামগঞ্জ জেলা ইউনিট কমান্ড কর্তৃক দেওয়া হয় মরণোত্তর সম্মাননা পদক।
- ভোরের কাগজ বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলন ২০১১ সালে মরমী সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য মরণোত্তর সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

প্রয়াত এই সঙ্গীত সাধকের রচিত “দ্বীন দুনিয়ার মালিক খোদা, এত কষ্ট সয়না, তোমার দীলকি দয়া হয়না” গানটি ভারতের বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাটিয়ালি গানের শিল্পী আব্দুল আলিম, বাউল কামাল পাশা রচিত “প্রেমের মরা জলে ডুবে না/ও প্রেম করতে দুদিন ভাঙ্গতে একদিন এমন প্রেম আর কইরোনা গো দরদী” সহ একাধিক গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছেন।[১৬৪]

সাধক কামাল উদ্দিন রচিত সঙ্গীত নিয়ে নতুন প্রজন্মের সাহসী কিছু তরুণ সেচ্ছাসেবী সংগ্রাহক কয়েকটি বই প্রকাশ করেছেন। তা হলো–

- আল-হেলাল কর্তৃক গানের সম্রাট কামাল উদ্দিন
- ফারুকুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক কালনী তীরের লোকগীতি
- মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাউল কামাল পাশা গীতিসমগ্র

---

১৬৩. প্রাগুক্ত।
১৬৪. *আমার স্মৃতিতে বাউল কামাল পাশা*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

- মরমী গানে সুনামগঞ্জ গ্রন্থ, লোকসাহিত্যে জালালাবাদ গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন বইতে বাউল কামালের জীবন দর্শন আলোচনা অথবা গান এবং অনলাইন পত্রিকাসমূহে বাউল কামালের জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা ছাপা হচ্ছে ।

মৃত্যু

জীবনের শেষ লগ্নে অসুস্থ বাউল কবির চিকিৎসায় অনেকেই এগিয়ে আসেন। এলাকার নির্বাচিত সাংসদ সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ছাড়াও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে রাজধানীর পিজি হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসাসেবা দেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সাথেও তাঁর পরিচয় ছিল। প্রচার বিমুখ নিভৃতচারী এই বাউল সাধক ১৯৮৫ সালের ৬ এপ্রিল, মোতাবেক ১৩৯২ বাংলার ২০ বৈশাখ শুক্রবার রাত ১২ টায় নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

এই মহান সাধক পুরুষ দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, জাতির জন্য, দেশের জন্য, জনগণের জন্য গানে গানে জীবনের ৮৫ বছর বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি গেয়েছেন আনন্দের গান, জয়ের গান, মানব বন্দনার গান, সর্বোপরি জাতি-জাগরণের গান। এই সাধক বাউল কবি গেয়েছেন হৃদয়ের গান, রাজনীতির গান, মুক্তির গান, মরমি গান। সহস্রাধিক স্বরচিত গান তিনি নিজেই গেয়েছেন; কিন্তু লিখতে পারেননি। অবহেলিত পাড়া গায়ে জন্ম তার, লালনের মতো প্রতিভা ছিল কিন্তু আজ তা অন্ধকারে নিমজ্জিত। তার গান, লিখিত বই-কবিতা কিছু নাই। তার অসংখ্য গান ও কবিতা লোকালয়ে লোকগীতি হিসাবে পরিচিত। তিনি ছিলেন চলমান কবি, ধাবমান কবি, শক্তিমান কবি। গানের ছন্দে কেটেছে তার জীবন। লিখে যাননি কোনো পুস্তক, তার জীবন আলেখ্য। এই মহান সাধক সংগীত রূপকারকে বৃহৎভাবে আবিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

আশা করি বর্তমান প্রজন্মে কামাল পাশার সহস্রাধিক গানের মূর্ছনায় তৈরি হবে হাজারও অনুসারী। জনগণের মধ্যে বেঁচে থাকবেন ভাটি অঞ্চলের মুকুটহীন আধ্যাত্মিক বাউল মরমি কবি কামাল পাশা। কামাল পাশা ছিলেন অতুলনীয়, অভুলনীয়, অনস্বীকার্য, অনুপম মহিমায় মহিমান্বিত এক মহাকবি। তিনবার সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে মরেণোত্তর একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করার প্রস্তাবনা পেশ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এমন গুণী শিল্পীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান সময়ের দাবী।

কামাল পাশার গানে ভালোবাসা ও প্রেম

ভালোবাসা শব্দটিকে বিভিন্নভাবে সুর তাল লয় ও উপমায় যিনি সুমধুর সঙ্গীত রচনা করে কালের ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়ে আছেন তিনি হচ্ছেন গানের সম্রাট কামাল পাশা। যিনি তার জীবদ্দশায়

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবেসে জীবনের শেষ গানে গেয়েছেন, "ও বন্ধু ভুইলোনা আমারে, তোমার আমার প্রীতিবন্ধন আওয়ালে আখেরে।" অর্থাৎ খোদাপ্রেমকেই তিনি স্বার্থক প্রেম হিসেবে কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়েছেন। ভালোবাসাকে স্মরণ অর্থে প্রকাশ করতে গিয়ে জীবনের প্রথম গানে এই বাউল কবি গেয়েছেন,

"বিসমিল্লাহ বলিয়া মুখের জবান খুলিলাম
যে বিসমিল্লাহর হয়না ওজন পৃথিবী দিলে তামাম।
"আল্লাহর নুরে নবী হন সৃজন
নবীর নুরে গড়িয়াছেন এ চৌদ্দ ভূবন।
অলি আবদাল হন যতজন
আমি স্মরণ করিলাম।"[১৬৫]

ভালোবাসার আরেক নাম ভাব। ভাব ব্যতীত ভালোবাসা অর্থহীন। ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় স্বার্থক ভালোবাসা। ভালোবাসাকে ভাব অর্থে প্রকাশ করতে গিয়ে কবি গেয়েছেন,

"আল্লাহ ডাকিহে তোমারে বারে বার
তুমি করুণার সিন্ধু দয়া কর বিন্দু
জানাই মুনাজাত আমি গুনাগার ॥
ভাই বন্ধু পাত্র মিত্র সালামতে রাখিও
বেগানা নাদানেরে রহমত দানিও
গাইতে গুণগান ওহে পাক সোবাহান
হৃদয়ে দিও তুমি ভাবেরই সঞ্চার ॥"[১৬৬]

ভালোবাসার আরেক নাম দয়া বা করুণা। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে তা পাওয়া যায় না। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেই ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তা লাভ করতে হয়। এজন্য কবি গেয়েছেন–

"দ্বীন দুনিয়ার মালিক খোদা এত কষ্ট সয়না
তোমার দীলকি দয়া হয়না, তোমার দীলকি দয়া হয়না।
সব কথায় যার ব্যথায় ভরা
কোন কথা সে বলবে
সব পথে যার কাটায় ঘেরা

---

১৬৫. আল-হেলাল, বাউল কামাল পাশা মননে ভালবাসা, হাওরপিডিয়া থেকে সংগৃহীত।
১৬৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কোন পথে সে চলবে।

কাটার আঘাত সয় যার বুকে ফুলের আঘাত সয়না ॥"[১৬৭]

দার্শনিক সক্রেটিস বলে গিয়েছেন, সঙ্গীতকে যারা ভালোবাসে না তারা মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারে। আজকের বিশ্বজুড়ে যে জঙ্গী অপশক্তির আবির্ভাব তা মূলত সংস্কৃতিবিরোধী হওয়ার কারণেই। তাই সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী বা বৈরাগী ভাবসম্পন্ন মানুষ কখনও খারাপ মানুষ হতে পারে না। মানুষকে ভালোবেসে স্রষ্টাকে পাওয়াই তারা জীবনের ব্রত মনে করে। ভালোবাসাকে ভাগী ও বৈরাগী অর্থে প্রকাশ করতে গিয়ে কবি গেয়েছেন–

"বাজনার ভেতরে আছে এবাদত আর বন্দেগী

গানের বিচার করে মানুষ হইয়া যায় সংসার ত্যাগী ॥

ঘুরে কত বনে বনে আল্লাহর নামের জিকির টানে

ছাইড়া দিল মান কুলমান হইয়া সে প্রেমের ভাগী ॥

জপে আল্লাহু আল্লাহু এই নামেতে তাজা রুহু

গাছ তলাতে বসে কেহ হয় নামের বৈরাগী ॥"[১৬৮]

একে অপরের ভালোবাসায় যারা সিক্ত হয় তাদেরকে বলা হয় প্রেমিক। এই প্রেমিকের অপর নাম পাগল। পাগল বা দেওয়ানা না হলে প্রেমিকাকে পাওয়া যায়না। জগৎ জুড়ে প্রেমের যত ইতিহাস রচিত রয়েছে সেইসব ইতিহাসের নায়করাই পাগল বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সৃষ্টি পাগল হবে স্রষ্টার জন্য এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকাল দেখা যায় মানুষ খোদাপ্রেম ও মানবপ্রেমকে তুচ্ছ করে স্বার্থের পাগল হয়ে যায়। এজন্যই কবি তার মনশিক্ষা গানে গেয়েছেন–

"আমার মন পাগলরে আমার দিল পাগলরে

ও তুই পাগল হইলে কার লাইগ্যারে ॥

জয়নব শোকে এজিদ পাগল বন্ধ করলো পানি

ইমাম শোকে হইলেন পাগল আমার ফাতেমা জননী

স্বামীর শোকেতে পাগল বিবি সখীনায়

উম্মতের লাগিয়া পাগল আমার দ্বীনের নবী মোস্তফায়রে ॥

লাইলীর শোকে মজনু পাগল বনে বনে ঘুরে

শিরীর শোকে ফরহাদ পাগল পাহাড় কেটে মরে

---

১৬৭. প্রাগুক্ত।

১৬৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আরেক পাগল ছিলেন আমার দাউদ পয়গাম্বর
১৮ব্যাটা মরলো তার সজিদার ভেতর রে ॥
আরেক পাগল ছিলেন আমার হযরত নবী মুসা
কুহুতুরে নিয়া আল্লায় দেখাইলেন তামেশা।
আরেক পাগল ছিলেন আমার গাজী জিন্দাপীর
রাজত্ব ছাড়িয়া হইলেন জঙ্গলার ফকীর রে ॥
আরেক পাগল ছিলেন আমার ইউনুছ পয়গাম্বর
৪০দিন রইলেন বাঁচিয়া মাছেরও ভেতর।
আল্লাহ তায়ালার শান শওকতে রইলেন বাঁচিয়া
লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ইছিম ও পড়িয়ারে ॥
প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাগল এই বিশ্ব ব্যাপিয়া
আসল প্রেমের পাগলরে ভাই মিলে না খুঁজিয়া
বাউল কামালে কয় প্রেমের বাতাস লাগলো নারে গায়
আমি ভবে হইলাম পাগল ভাত খাইবার দায়রে ॥”[১৬৯]

এ ধরনের শত শত প্রেম-ভালোবাসার গান রচনা করে তিনিও জন মানুষের প্রেম ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

লোক কবি শাহ আছদ আলী
(১৮১৩-১৯০৫)

পরিচিতি

সুনামগঞ্জের উপকণ্ঠে যোলঘর গ্রাম ১২২০ বাংলার পয়লা আষাঢ় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শাহ আছদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। কবি তার নিজের পরিচিতি দিয়েছেন–

“নাকিছ আছদে কয় না পাইয়া ভর
পরগনা লক্ষণছিরি, বাড়ি যোলঘর।
জিলা সিলেট জেনো, বনগাঁও থানা
গায়ের পূর্ব বাড়ি পুষ্করিনী নিশানা।
জন্মদাতা কামাল শাহ মঙ্গিশার নাতি।”

১৬৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মদাতা কামাল শাহ চাচা হাজি জামাল শা
ছোট চাচা আমান আলী নাম।
বড় ভাই মনসুর আলী মাইজলা ভাই কাদির আলী
বড়ই ছুরত ছিল তার।
আমার নছিব বুরা, বাপচাচা গেলো মারা
আমি ছেওয়ায় গরীব নাহি আর।[১৭০]

যোলঘর গ্রাম সে সময় বনগাও থানার অধীন ছিল। তার পিতা শাহ মোহাম্মদ কামাল ও পিতামহ শাহ্ মোহাম্মদ মঙ্গি। প্রায় তিনশ বছর পূর্বে আছদ আলীর পূর্বপুরুষ শাহ আজমান আলী, সিলেটের ফুলবাড়ি থেকে এসে লক্ষণ ছিরি পরগণার যোলঘরে বসতি স্থাপন করেন। সে সময় সুনামগঞ্জ অজ পাড়াগা, সেখানে কোন মসজিদ মক্তব ছিল না। শাহ আজমন আলী সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন ও সে অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করে ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করেন। শাহ আছদ আলীর বাড়ি দেওয়ান হাছন রাজার জমিদারীতে ছিল। তাই তিনি লিখেছেন–

"লক্ষণ ছিরি পরগনায় বাড়ি মোর
গায়ের নাম লেখা যায় যোলঘর।
জাগার মলিক হাছন রাজা জমিদার
জমিদারী কায়েম রাখ পরওয়ার।
আছির আজিম ভালুকতে বসত ঘর
চেরাগী বখশিষ দিছেন, বিরাদর।
জাগাজমি দিয়েছেন, পরওরিশ পাই
তাহার বুনিয়াদের দেওয়া খাইয়া যাই।"[১৭১]

শিক্ষা জীবন

বাল্যকালেই আছদ আলী পিতৃহারা হন। পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, তবে পড়াশুনার প্রতি আছদ আলীর ছিল প্রখর আগ্রহ। জ্ঞাতি পিতৃব্য শাহ আমজদ আলীর নিকট তিনি লেখা পড়া করেন। তিনি লিখেছেন–

"বন্দিয়া কই ওস্তাদের চরণ
শাহ আমজদ আলী নাম, করি স্মরণ।

---

১৭০. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদের নসিহতে মুসলমানী পাই

সাগরিদের আজাদ নাই জিতা জানে ভাই।"[১৭২]

শাহ আমজদ আলীর নিকট তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। তারপর তিনি কুরআন- হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য বিখ্যাত আলীম সৈয়দ নজাবত আলমের নিকট বহুদিন অবস্থান করেন। ইসলামী জ্ঞান লাভের পর আছদ আলী ষোলঘরে ফিরে আসেন।

কেরামত আলী জৌনপুরী

এই সময়ে আছদ আলী, প্রখ্যাত আলিম ও মুবল্লিগ মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর সংস্পর্শে আসেন। তার সম্পর্কে কবি লিখেছেন–

"মুর্শিদ বন্দিয়া মুই সবাকারে বলি

মশহুর মারুফ নাম, কেরামত আলী

মওলানা খেতাব তাঁর জৌনপুর মোকাম

তাহার নামের ধ্বনি, মুল্লুকে তামাম।"[১৭৩]

তিনি কেরামত আলী জৌনপুরীর নিকট মুরিদ হন ও তাবলীগ কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

কর্মজীবন

শাহ আছদ আলী জীবনের অধিকাংশ সময় নিজগ্রামের মসজিদে ব্যয় করেন। তিনি অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীকে ইসলামের মৌলিক বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি সমাজের অনৈসলামিক ও কুসংস্কারপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কলম ধরেন ও সিলেটি নাগরী অক্ষরে পুঁথি-পুস্তক রচনা করে মানুষকে হেদায়েতের দাওয়াত দেন এবং ইসলামী সংস্কৃতির বাস্তব রূপায়নে সচেষ্ট হন।

শাহ আছদ আলী ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী সাধক। তিনি ধর্মীয় সাধনার সাথে ইসলামী তাবলীগ ও সাহিত্য চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

সাহিত্য কর্ম

১৩৯০ বাংলায় শাহ আছদ আলীর শহর চরিত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বাংলা লিপ্যান্তর প্রকাশ পায়। এ পুস্তকের মুখবন্ধে বলা হয়, শাহ আছদ আলী রচিত মোট ৫টি পুঁথি সিলেটি নাগরী হরফে ১২৪০-১২৯৫ বাংলা সনের ভিতরে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পুঁথিগুলি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ষোলঘরের

---

১৭২. প্রাগুক্ত।

১৭৩. *সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মোশাহেদের নিকট 'শহর চরিত' ও 'এবাদতে মগজ' নামক দুটি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। উপরোক্ত মুখবন্ধ থেকে আরো জানা যায় যে, কলিকাতা থেকে শহর চরিতের প্রথম প্রকাশ ১২৮০ বাংলায় ও দ্বিতীয় প্রকাশ ১২৮৫ বাংলায় হয়েছিল।

শিকড় সন্ধানী গবেষক অধ্যাপক আছদ্দর আলী পুঁথি 'শহর চরিত' ও 'এবাদতে মগজ' বাংলা অক্ষরে লিপ্যান্তর ও সম্পাদনা করেছেন এবং অধ্যাপক আতাউর রহমান পীর পুঁথিদ্বয় প্রকাশ করেছেন ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে।[১৭৪] 'শহর চরিত' সামাজিক ও 'বিভিন্ন রকমের লোকচরিত' বর্ণনামূলক তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রখ্যাত গবেষক চৌধুরী গোলাম আকবর লিখেছেন, 'শহর চরিত' পুঁথি বাংলা ১২৮৫ সালে রচিত হয়ে কবির অনুমতি অনুসারে সমির উদ্দিন ও হাফিজ আমিন উদ্দিন ভাতৃদ্বয় প্রকাশ করেন। তাদের ওয়ারিশগণ ১৩৩৫ বাংলায় উক্ত পুঁথির কপিরাইট সিলেট বারুতখানার শেখ আবদুর রহমানের নিকট বিক্রি করেন। আব্দুর রহমান কর্তৃক ১৩৩৫ বাংলার ছাপা একখণ্ড 'শহর চরিত' গবেষক ফজলুর রহমানের কাছে সংরক্ষিত ছিল। শরীয়ত, তরিকত, হাকীকত, মা'রেফত এবং তত্ত্বকথা ছাড়া দেহতত্ত্বমূলক পয়ার ও গান আছে।"[১৭৫]

১৩১২ বাংলার ১০ই ফাল্গুন (১৯০৫ খৃ.) তিনি নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত পুঁথি ও গানে শরীয়ত ও মারিফাতের গুঢ়তত্ত্ব লুকায়িত আছে। একজন মুমিন হিসেবে সর্বদা তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর রচিত 'এবাদতে মগজে' তিনি সকলকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। কবির ভাষায় :

> "নছিহত করতে হায় আছদ তু বেনছিব
> জিন্দেগীকে ভরছা নেহি, মরনা হায় করিব।
> মরনা কু বরহক জানলও, কিছিকু ছুড়েগা নেহি
> মাদার পিদর ভাই বিরাদর কুই রহেগা নেহি
> জন ফরজন্দ ছব যায়েগা মিট্টিকা আন্দর
> কুল্লু নাফসুন যায়িকাতুল মউত কোরানের খবর।"[১৭৬]

আছদ আলী শাহের রচিত 'যাদুয়ার বারমাস' সর্বজন সমাদৃত ও বহুল প্রচারিত কাব্য। উক্ত 'বারমাসী'র

---

১৭৪. *জালালাবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

১৭৫. প্রাগুক্ত।

১৭৬. *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

"যার আছে বেটা পুত্র ঘরে আপনার
খুশী বিনে গমী নাই দেখিল দিদার।
পুত্র বিনে মা বাপের বল অয় খীন্
বলখীন্ অইয়া মা'য় তনু অয় নাশ
মিছা ধনের আরাধনা মিছা গিরোবাস।
এমন দুক্ষের যাদু মাও ছাড়ি যায়
পাশরিবো কেমনোত গুর্দা ফাটি যায়।
নাকিছ আছদে কয় রোগে কইল খীন্
ভাংগা নাও ভাংগা বৈঠা বাইমু কত দিন।"

প্রভৃতি বাক্যাংশগুলো সুরলয়ে গীত হয়ে কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে পরাণ আকুল না করে পারে না। এখানেই কবির কাব্যের সাফল্য। বারমাসী রচনার অন্যত্র কবি বলেন :

"বারমাসে তেরপদ হইল পূরণ
নাকিছ আছদে কয় শুন বন্ধুগণ।
দুক্ষ আছে যার গায় ধছলিয়া যাইব চিত্
যার গায় ছক্ষ নাই গাইয়া যাইব গীত।
হায়রে ভবের মায়া ভবে থইয়া যাই
কি লইয়া দেখাইমু মুখ মাবুদের ঠাঁই।"[১৭৭]

শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মারেফত এর তত্ত্বকথা ছাড়া দেহতত্ত্বমূলক পয়ার ও গান আছে। লোককবির ন্যায় শাহ আছদ আলী স্রষ্টার কাছে অবনত এবং পরকালে মুক্তির আকুল আবেদনকারী। তবে তিনি স্রষ্টাকে–

"নাকিছ আছদে কয় নয়াইয়া ছির
মাফ কর আল্লাতালা আমার তকছির।"

বলে আকুল আকুতি প্রকাশ করলেও লোক কবির স্বভাবজাত ধর্মমূলে স্রষ্টাকে 'কালা বন্ধু' প্রভৃতি রূপক নামেও আহ্বান জানিয়েছেন। তবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রতিবন্ধক কবির ভাষায়–

"মিছা ভবে আসিয়া না ভজিনু তত্
পাপে মজি গেলদিন না কইলু এবাদত।"

---

১৭৭. *মাসিক জালালাবাদ*, সিলেট, ৫ম বর্ষ, বৈশাখ ১৩৭৫ বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

পরকালে 'নাজাত' পাওয়ার একমাত্র পথ হল 'আল্লার এবাদত' এবং তা যেনতেনভাবে করলে হবে না। এজন্য পথ প্রদর্শন হেতু কামিল মুর্শিদের প্রয়োজন। মুর্শিদ বিজ্ঞ না হলে তিনি কখনও মকসুদে মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হবার 'রাহবরী' করতে পারবেন না।

কামিল মুর্শিদ ধরে তাঁর নির্দেশমত দেহমনকে পাকছাফ করে চলার পথে দুস্ত দুশমনকে চিনে অনুকূল প্রতিকূল পরিবেশ পাছান করে শরীয়তের নামাজ রোজা আদায় ক্রমে (সমর্থ হলে যাকাত দিয়ে হজ্জ সমাপনান্তে) তরীকত, হাকীকত আমলকরত মুর্শিদের সবক মতে ......

"আগেতে 'আলিপ' লেখি পাছে লেখি 'লা'
'লা' অক্ষরে তশদিদ্ দিলে বাকী থাকে 'হা'।
'হা' হরফে থেস দিয়া জপনা জপয়
দমেয় জিকির এই শুনিও মহাশয়।
আন্দরে যাইতে 'আলিপ' 'লামে' কর ভর
'হা' হরফে থেস্ দিয়া নিকুলিও স্বর।
এই যে জিকির জান অজপা পরশ
সোয়াগা মিলন দিলে সোনা অয় সরস্।
দিল জিগর তিলি গুর্দায় দিও টান
ছিনায় ভরিয়া নাম করিও জুগান।"[১৭৮]

'দমের জিকির' করলে এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভে সক্ষম হলে সাধক নৌকা মকসুদে মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু মুর্শিদ কামিল না হলে 'মেহনত বরবাদ গিয়া গোনাহ লাজেম' হবে। বলা আবশ্যক, যে সাধনায় সিদ্ধির পথ ফুলদলে সাজানো নয়, তা নিতান্ত বন্ধুর এবং কণ্টকাকীর্ণ। কাজেই আপাত মধুর ফল প্রাপ্তি লিপ্সু দুনিয়াবাজদের লাখে একজনও সেদিকে খেয়াল করে না। তাই কবি আফসোসের সুরে নিজেকে হুশিয়ার করে বলেন :

"মিছা ঘর মিছা বাড়ী মিছা মায়া ছান্দী
সুদাতনু কালি কর পরার রান্ধা রান্ধি।"[১৭৯]

বলে সবাইকে কবি হুশিয়ার হওয়ার সংকেত দিয়েছেন। একথা কারো অজানা নেই 'জন্মিলে মরিতে হইবে'। এ দুনিয়া মরণের পরবর্তীকালীন অমর জীবনের ব্যবসার ক্ষেত্র; কিন্তু অধিকাংশ লোক ভব জঞ্জালে বন্দী হয়ে দেহস্ত ষড়রিপুর প্রভাবে সে দিকে খেয়াল করার ফুরছত পায় না।

---

১৭৮. প্রাগুক্ত।
১৭৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান মনির এক কিংবদন্তীতুল্য গীতিকার (জন্ম ১৯৫২)

বাংলা তথা বাংলাদেশের গানের ভাণ্ডার এক অমৃত সুধা। যে এই ভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছে তাকে আর কোন ভাষার গান তৃপ্তি দিতে পারবে না। বাংলাদেশের গানের ভাণ্ডারে ডুব দিলেই মনিরুজ্জামান মনির নামের এক মহারথীর সন্ধান পাওয়া যায়। মনের অজান্তে প্রশ্ন জাগে একজন মানুষ এতো এতো দারুণ গান কিভাবে সৃষ্টি করতে পারেন? আধুনিক, দেশাত্মবোধক, ফোক, চলচ্চিত্র সকল ধারার গানে মনিরুজ্জামান মনিরকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে : 'প্রথম বাংলাদেশ আমার, শেষ বাংলাদেশ'; 'সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি', 'যে ছিল দৃষ্টির সীমানায়', 'কি যাদু করিলা, পিরিতি শিখাইলা' প্রভৃতি। সঙ্গীতে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০০৪ সালে একুশে পদকে ভূষিত করেন।[১৮০]

মনিরুজ্জামান মনির ১৯৫২ সালের ২৮ জানুয়ারি সুনামগঞ্জের তেঘরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাই, তিন বোনের মধ্যে মনিরুজ্জামান মনির তৃতীয়। স্কুল জীবনে পড়ার সময়েই ছড়া কবিতা লিখে লিখার হাতেখড়ি শুরু এবং সেইসময় 'দৈনিক পয়গাম', 'দৈনিক পাকিস্তান', 'সবুজ পাতায়' প্রায় নিয়মিত ছড়া লিখতেন। সিলেট বেতারের কণ্ঠশিল্পী উজির মিয়া ছিলেন মনিরুজ্জামান মনিরের মামা যিনি হাছন রাজার গানের জন্য বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। মামা উজির মিয়ার সুবাদে কিশোর বয়সেই মনিরুজ্জামান মনির রেডিওতে গান লিখার সুযোগ পান। এভাবে গান লিখতে লিখতে ১৯৭০ সালেই বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার হয়ে যান।[১৮১] সেই যে গান লিখার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে তা আর ছাড়তে পারেননি। বিজ্ঞান বিভাগে মেট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর বাবা মা চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হবে, তাই ভর্তি করালেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে; কিন্তু ছেলে আর ডাক্তার হয়নি, মনিরুজ্জামান মনির হয়ে গেলেন বাংলাদেশের গানের চিরস্মরণীয়, দেশসেরা, অসাধারণ গীতিকারদের একজন। আসলে মনিরুজ্জামান মনিরের মনের ভেতরেই ছিল পেশাদার গীতিকার হওয়ার বাসনা যার কারণে ডাক্তারি পড়ার কারণ দেখিয়ে ঢাকাতে চলে আসার সুযোগটি তিনি কাজে লাগান।

এরই মাঝে বাংলাদেশ টেলিভিশনে নওয়াজিশ আলী খান প্রযোজিত 'বর্ণালী' অনুষ্ঠানের জন্য 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি দেশাত্মবোধক গান লিখেন, যার সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন আলাউদ্দিন আলী। শিল্পী শাহনাজ রহমতউল্লাহ'র কণ্ঠে বিটিভিতে গানটি

---

১৮০. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১৮১. সৈয়দ আওয়াল, গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির, *সিলেট এক্সপ্রেস*, ৪ অক্টোবর ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারিত হওয়ার পর দারুণ সাড়া পান। যার ফলে বিটিভির 'মালঞ্চ' অনুষ্ঠানের দুই পর্বে সৈয়দ আব্দুল হাদির কণ্ঠে 'সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি' এবং নিয়াজ মুহাম্মদের গাওয়া 'রাঙামাটির রঙে চোখ জুড়ালো' গান দু'টি প্রচারিত হয়। সে গান দু'টিও প্রচুর জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' গানটির জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান মনিরুজ্জামান মনিরকে দু'বার ডেকে পাঠান।

মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' গানটি জিয়াউর রহমান বিএনপির দলীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেন যা আজ অবধি বিদ্যমান আছে। সেদিন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন জানলেন যে, মনিরুজ্জামান মনির শিক্ষিত বেকার যুবক তখনই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে অফিসার পদে নিয়োগ দেন যার থেকে পরবর্তীতে মনিরুজ্জামান মনির পরিচালক হিসেবে অবসর নেন।[১৮২] সরকারী-বেসরকারী সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি অথবা দলনেতা হিসেবে ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া, আরব আমীরাত, ইরান, চীন, তুরস্কসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি ঘুরে এসেছেন। সরকারী সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে সর্বশেষ ঘুরে আসেন মিসর। তিনি ছিলেন টিম ম্যানেজার এবং দলনেতা ছিলেন সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারী। মিসরে তারা জসীম উদ্দীনের 'সুজন বাধিয়ার ঘাট' গীতিনাট্য পরিবেশন করেছিলেন।[১৮৩] তাঁর লিখা গানগুলোর মাঝে বাংলাদেশের মানুষের মনের সহজ সরল কথাগুলো নান্দনিকভাবে ফুটে উঠেছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মেজর মুতালিবের কন্যা ফাতেমা মনিরকে তিনি বিয়ে করেন যিনি কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করেন।

মনিরুজ্জামান মনির বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানকে করেছিলেন সমৃদ্ধ। 'সন্ধিক্ষণ' ছবিতে 'চলতি পথে বাধা আসে, তাই বলে কি পথ চলবে না' গানটি দিয়েই যুক্ত হন চলচ্চিত্রের গানের সাথে। এরপর ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের গানে মনিরুজ্জামান মনির হয়ে যান অপরিহার্য একজন গীতিকার। 'প্রাণসজনী', 'নীতিবান', 'দুই জীবন', 'ভেজা চোখ', 'চেতনা', 'সত্য মিথ্যা', 'পিতা মাতা সন্তান', 'প্রথম প্রেম', 'অন্তরে অন্তরে', 'স্বপ্নের ঠিকানা', 'প্রেমের অহংকার' এর মতো অসংখ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলোর সবগুলো গান তিনি একাই লিখেছিলেন।[১৮৪] এছাড়াও গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মোঃ রফিকুজ্জামান, আমজাদ হোসেন, মিলটন খন্দকার এর মতো গীতিকারদের সাথেও অসংখ্য চলচ্চিত্রে গান লিখেছেন।

---

১৮২. ফজলে এলাহী, গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির ও আমাদের কৃতজ্ঞতা, নাগরিক, সুনামগঞ্জ, ২৪ অক্টোবর ২০০৯।

১৮৩. প্রাগুক্ত।

১৮৪. মনিরুজ্জামন মনির একুশে পদক পাপ্ত গীতিকার, https://bangla.bdnews24.com>glitz

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গানের সুর সম্রাট আলম খান ও কিংবদন্তী তুল্য কণ্ঠশিল্পী অ্যান্ড্রো কিশোরের অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার হলেন মনিরুজ্জামান মনির। প্রায় ৫ শতাধিক ছবিতে গান লিখেছেন যার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৮৮ (দুই জীবন), ১৯৮৯ (চেতনা), ১৯৯০ (দোলনা) টানা তিনবার শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছিলেন।[১৮৫] এছাড়াও অর্জন করেছেন চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি পুরস্কার। কয়েকবার পেয়েছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কারসহ আরো অনেক পুরস্কার। বাংলাদেশের এমন কোন চলচ্চিত্র পরিচালক নেই, যার ছবিতে তিনি গান লেখেননি। ভারতের বাংলা চলচ্চিত্রের জন্যেও তিনি গান লিখেছেন।

বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিল্পী রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, সৈয়দ আবদুল হাদী, শাহনাজ রহমতুল্লাহসহ দেশের সকল বিখ্যাত শিল্পীই তার গান গেয়েছেন। ভারতের হৈমন্তী শুক্লা, শ্রাবন্তী মজুমদার, কুমার সানু, অনুরাধা পাড়োয়াল, অভিজিৎ, অলকা আগ্নিকসহ বিখ্যাত শিল্পীরাও তার গান গেয়েছেন। মনিরুজ্জামান মনির আমাদের শুধু দিয়েই গেলেন; কিন্তু পেলেন না কিছুই যা আমাদের চিরায়ত অকৃতজ্ঞতার সংস্কৃতির চরম উদাহরণ। এমন কি আমাদের অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে নেই অসাধারণ এই গীতিকার সম্পর্কে কোন পরিপূর্ণ তথ্য। এটা জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়।

মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা অসংখ্য গান থেকে কিছু গান উল্লেখ করা হলো :

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি, রাঙামাটির রঙে চোখ জুড়ালো, যে ছিলো দৃষ্টির সীমানায়, নাই টেলিফোন নাইরে পিওন, ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে, কী জাদু করিলা পিরিতি শিখাইলা, কত রঙ্গ জানো রে মানুষ, চোখ বুজিলে দুনিয়া আন্ধার, বাড়ির মানুষ কয় আমায়, জীবন মানে যন্ত্রণা, নয় ফুলের বিছানা, তুমি যেখানে আমি সেখানে, তিনকন্যা এক ছবি, আজ রাত সারারাত জেগে থাকবো, গুনে গুনে এক দুই তিন, বুকে আছে মন, ভেঙেছে পিঞ্জর মেলেছে ডানা, আবার দুজনে দেখা হলো, আমি একদিন তোমায় না দেখিলে, তুমি ছাড়া আমি একা, তুই তো কাল চলে যাবি, জীবনের গল্প আছে বাকী অল্প, প্রিয়া আমার প্রিয়া, কি দিয়া মন কাড়িলা, শূন্য এ হাতে হাত রেখে, আমার এ ঘর যেন স্বর্গ, মন্দ হোক ভালো হোক, তুমি আরও কাছে আসিয়া, পিতা মাতার পায়ের নীচে, মনে প্রেমের বাত্তি জ্বলে, তুমি আমার প্রথম প্রেম, আমি চিরকাল প্রেমেরই কাঙ্গাল, তোমাকে ভালোবেসে দিতে পারি প্রাণ, এই মাটি আমার মায়েরই কান্না মাখা, আমার এ গান তোমারই জন্য, জীবনের গান আজ গাইবো, তুমি আমার জীবন প্রিয়া, কাল তো ছিলাম ভালো, এখানে দুজনে নির্জনে, টেলিফোনে কিছু কথা হলো, এইদিন সেইদিন কোনদিন– ইত্যাদি।

---

১৮৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কারী আমির উদ্দিন ও তাঁর বাউল গান
(জন্ম ১৯৪৩)

পৃথিবীতে কোন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু কিছু মানুষ ইতিহাসে অমর হয়ে যুগের পর যুগ কালের পর কাল তাঁদের কর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকে। মানুষের কর্মই তাকে অমরত্ব দান করতে পারে। যেমন মরমী সম্রাট হাছন রাজা, বাউলসম্রাট শাহ আব্দুল করিম প্রমুখ তাদের কর্ম, তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। বাংলা লোকসংগীতকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন, লোকসংগীতের শিরায় শিরায় যাদের সৃষ্টি মিশে আছে, যাদের রচনা ও গায়কিতে জমে উঠত আসর, তাদের মধ্যে একজন জীবন্ত কিংবদন্তী হলেন বাউল কারী আমির উদ্দিন। বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ বাউলদের মধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয়। তার লেখা গান করেননি এই-রকম বাউলগানের শিল্পী হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। কমবেশি প্রত্যেক বাঙালিই তার রচিত গান শুনেছেন। তবে অনেকেই জানে না যে, এই গানগুলোর রচয়িতা সেই মরমী বাউলকবি কারী আমির উদ্দিন এখনও জীবিত। বর্তমান বাংলাদেশের নবপ্রজন্মের চাইতে ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালিদের কাছে তিনি অধিক জনপ্রিয় বা পরিচিত। কারণটা হলো, দীর্ঘ সময় থেকে আমাদের কাছে না-বলা কোনো অভিমানে প্রবাসেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এই বাউল সাধক। যদি উনি দেশে থাকতেন তাহলে তাঁর শিষ্য-ভক্তদের অভাব হতো না। শতশত ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান কখন বাউল দেশে আসবেন, আর তাঁর শিষ্যত্ব তথা গুরুর দর্শন লাভ করে তারা ধন্য হবে। জানি না ভক্তদের সেই আশা কোনোদিন পূর্ণ হবে কি না। যদিও বাউল দেশে বসবাস করছেন না তারপরও ভুলে যাননি দেশ ও দেশের মানুষকে। এখনো এই মরমী কবি অনবরত লিখে যাচ্ছেন গান। শতশত দেশী-বিদেশী শ্রোতাদেরকে কণ্ঠের জাদু দিয়ে আকৃষ্ট করছেন। তাঁর লিখিত গানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি। বলতে গেলে বাউলকবিদের মধ্যে সর্বাধিক গানের লেখক কারী আমির উদ্দিন।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম ১৯৪৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার উত্তর খুরমা ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে। পিতার নাম শাহ মুহাম্মদ রুস্তম আলী শেখ, মাতার নাম আলফ জান বিবি।[১৮৬] তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি গ্রামের আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। এখানে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পরবর্তীকালে ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বেশ-কয়েকটি মাদরাসায় ভর্তি হন; কিন্তু কোনো স্থানেই মন স্থির করতে পারেননি। অবশেষে সিলেট আলিয়া মাদরাসা ও সৎপুর কামিল মাদরাসায় কিছুকাল লেখাপড়া করেন। এই সময়

---

১৮৬. *সুনামগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী হতে 'কারীয়ানা' পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং তখন থেকেই নামের শুরুতে 'কারী' টাইটেল যুক্ত হয়। দেশে থাকাকালীন তিনি কারী আমির উদ্দিন নামেই পরিচিত ছিলেন। তখন তাঁর নামের সঙ্গে বাউল, কারী, সাধক ইত্যাদি যুক্ত ছিল না; বরং সকলের প্রিয় কারীসাব নামেই মানুষের হৃদয়ে তিনি স্থান পেয়েছিলেন। কারী আমীর উদ্দিন বায়আত গ্রহণ করেন তাঁর পীর মরহুম শাহ মুহাম্মদ আনাছ আলী (রহ.)-এর নিকট। তিনিই ছিলেন কারী সাহেবের মুর্শিদ বা গুরু। কারী সাহেবের পিতা-মাতাপ্রদত্ত নাম ছিল রওশন আলী। অধিকাংশ জীবনীকারদের মতে 'আমীর উদ্দিন' উনার মুর্শিদপ্রদত্ত নাম। কেউ কেউ বলেন, তাঁর আসল নাম ছিল মোঃ আমিরুল ইসলাম। তবে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের মুখে এখনো প্রচলিত আছে, আমির উদ্দিন নামটি প্রদান করেছিলেন বাউলসাধক দুর্বিন শাহ।[১৮৭]

কারী আমির উদ্দিনের পূর্বসূরিরা ফকিরি ধারার লোক ছিলেন, তাই তার রক্তের সাথে ফকিরি টান বংশগত বলা যায়। পিতামাতা উভয়ই ছিলেন সংগীত অনুরাগী। দশ বছর বয়স থেকেই পিতার অনুপ্রেরণায় তাঁর গান গাওয়া শুরু। তিনি এতটাই মেধাবী ছিলেন যে, কোনো গান একবার শ্রবণ করলেই মস্তিষ্কে গেঁথে যেত; সেটা আর ভুলতেন না। তাছাড়া শৈশব থেকেই এই সাধকের বিশেষ দক্ষতা ছিল দেশীয় বাদ্যযন্ত্র বাজানোর। যেমন, বাঁশি, কাসি, ঢোল, একতারা, বেহালা, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি খুবই সুন্দরভাবে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আনুমানিক ১৯৬৩ সাল থেকেই তিনি পূর্ণভাবে সংগীতের সাথে যুক্ত হয়ে যান।

সিলেটের অনেক মরমী কবির গান করেছেন কারী আমির উদ্দিন; যেমন সৈয়দ শাহনুর, রাধারমণ, হাছন রাজা, আরকুম শাহ, শীতালং শাহ, ইব্রাহীম তশনা, কামাল উদ্দিন, দুর্বিন শাহ, শাহ আব্দুল করিমসহ তাঁর পূর্বসূরিদের অনেকেরই।[১৮৮] ধীরে ধীরে তাঁর শ্রোতাসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। দুর্বিন শাহের আখড়া তাঁর এলাকার কাছে হওয়ায় সেখানে যাতায়াত বেশি ছিল। সেই সময় জীবিত বাউলকবিদের মধ্যে দুর্বিন শাহের জনপ্রিয়তা ছিল অনেক উর্ধ্বে। তাঁর রচনা ছিল জ্ঞানগর্ভ। তিনি জীবনে নিজের রচিত গান ব্যতীত অন্য লোককবিদের মধ্যে দুর্বিন শাহের গান সবচাইতে বেশি গেয়েছেন। দুর্বিন শাহের গান করেই প্রথমদিকে তিনি আলোচনায় আসেন। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধাশক্তি। অনেকেই তাঁর জীবনে সৌভাগ্যের নিয়ামক হলেও এটা সত্য যে, এই পর্যায়ে তিনি এসেছেন তাঁর মেধা, শ্রম, সাধনার বিনিময়ে। তদুপরি সৌভাগ্যের নিয়ামক হিসেবে দুইজন ব্যক্তির

---

১৮৭. কারী আমির উদ্দিন, *ভবঘুরে কথা*, সুনামগঞ্জ, ১৯৭৯

১৮৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিলক্ষিত হয়। তারা হলেন, বাউল সাধক দুর্বিন শাহ ও তুরন মিয়া। তিনি বেশিরভাগ আসরে দুর্বিন শাহের গান করতেন। সিলেট অঞ্চলের অনেক মানুষ জানত বা বিশ্বাস করতো তিনি দুর্বিন শাহের সন্তান। কারণ, তাঁর রচনা, শব্দচয়ন, গভীর অর্থবোধক শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদিতে দুর্বিন শাহের প্রভাব ছিল। হয়তো এজন্য মানুষ মনে করতো তিনি দুবিন শাহের ছেলে। তাছাড়া তাঁর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় দুর্বিন শাহের মৃত্যুর পর। অর্থাৎ দুর্বিন শাহের অভাব তাকে দিয়েই পূরণ হয়। তাই দুর্বিন শাহ ছিলেন তাঁর জন্য সৌভাগ্যের এক নিয়ামক। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হলেন জনাব তুরন মিয়া। তিনি বাউল, গীতিকার কিংবা শিল্পী নন; কিন্তু বাউলজগতের এক অভিভাবক ছিলেন। কারী আমির উদ্দিনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পিছনে জনাব তুরন মিয়া সাহেবের ভূমিকা অনেক বেশি। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ক্যাসেট নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতা করতেন। কারো কারো মতে এটা ছিল তাঁর বাণিজ্যিক কাজের অংশ। তুরন মিয়া আমির উদ্দিনের প্রচার-প্রসারের জন্য ছায়ার মতো লেগে ছিলেন। সিলেট অঞ্চলের অনেক শিল্পীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পেছনেও তাঁর ভূমিকা ছিল। কিছু লোকের প্রত্যক্ষ অবদান থাকলেও মূলত মালজোড়া গান, কিচ্ছা গান, সুললিত কণ্ঠ, রচনাশৈলী ইত্যাদি গুণে তাঁর জনপ্রিয়তা শূন্য থেকে শীর্ষে উপনীত হয়।

মানুষের মনের গভীরে তিনি অবস্থান করে নেন তাঁর প্রাণভোলানো মালজোড়া গান দ্বারা। যেটাকে সিলেটের বাইরে কবিগান বলা হয়। মালজোড়া গানে কারী আমির উদ্দিনের মতো বিচক্ষণ বাউল পূর্বেও ছিলেন না আর কখনো আসবে বলেও মনে হয় না। মালজোড়া গানের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক হলেন কারী আমির উদ্দিন। তিনি সর্বপ্রথম বাউল মফিজ আলী নামের এক বাউলশিল্পীর সাথে মালজোড়া গান করেন। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে তৎকালীন সকল বর্ষীয়ান বাউলদের সাথে তিনি মালজোড়া গান করেন। তাঁর জীবনে তিনি কোনো মালজোড়া গানে হারেননি; বরং প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছেন কথার মারপ্যাঁচে।[১৮৯] উপস্থিত গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা এ ক্ষেত্রে তাঁকে ঈর্ষণীয় সাফল্য দান করেছে।

কারী আমির উদ্দিন অসংখ্য বিখ্যাত বাউলের সহচার্য পেয়েছেন। একই আসরে একসাথে গান করেছেন অনেক মরমী মহাজনের সাথে। যেমন, বাউল কামাল উদ্দিন, বাউলসম্রাট শাহ আব্দুল করিম, জ্ঞানের সাগর দুর্বিন শাহ, বাউল মানউল্লাহ, বাউল মিরাজ আলী, বাউল শফিকুন্নুর, বাউল আবেদ আলী, বাউল কফিল উদ্দীন, বাউল আব্দুল হামিদ, বাউল ছাবলু মিয়া, রজ্জব দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, আব্দুর রহমান বয়াতি প্রমুখের সঙ্গে।[১৯০]

---

১৮৯. আজিমুর রাজা চৌধুরী, কারী আমির উদ্দিন ও আমাদের লোক সঙ্গীত, *গানপার*, সুনামগঞ্জ, ১৯৮১

১৯০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদ আছে 'সাগর জানে না যে তার কত জল'। সেরূপ কারী আমির উদ্দিন নিজেই বলতে পারবেন না উনার জীবনে কত গান গেয়েছেন, আর কত গান রচনা করেছেন। ধারণা করা হয় তিনি এ পর্যন্ত পাঁচ হাজারের অধিক গান রচনা করেছেন। তাঁর গান নিয়ে লিখিত গ্রন্থ 'গোলজারে মা'রেফাত' ও 'আমিরী সঙ্গীত'। যার ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। তাছাড়া 'প্রেমের জগত' নামে ৭০০-এর অধিক গান নিয়ে তাঁর একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত রয়েছে।[১৯১]

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গানগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(১) লোকে বলে আমার ঘরে নাকি চাঁদ উঠেছে। না গো না চাঁদ নয় আমার বন্ধু এসেছে।

(২) হেলায় হেলায় মনের আনন্দে দিন ফুরাইল সই।

(৩) আমি তোমার সেবা করমু আমার ঘরে আইলে / বড় লজ্জা পাইমু রে বন্ধু তোমারে না পাইলে।

(৪) হেলায় হেলায় কার্য নষ্ট রে।

(৫) আমার প্রতি ভালোবাসা থাকে যদি মনে / কদমতলায় দেখা দিয়ো বন্ধু কেউ যেন না জানে।

(৬) তোমারে দেখিবার মনে চায় / দেখা দেও আমায়।

(৭) মন কাড়িয়া নিলো গো প্রাণ কাড়িয়া নিলো সখি, খালি আমার দেহপিঞ্জিরা।

(৮) আমারে খুঁজিয়া দেখি আমি নাই / মিছামিছি আমার, করছি যা রঙ্গের বড়াই।

(৯) সোনারও যৌবন গেল রে বিফল / আমি কাঁদি অবলা / কোকিলা দিস না রে জ্বালা।

(১০) কে এমন চাঁদরূপসী / জাদুভরা মুখের হাসি ।

(১১) মায়া লাগাইয়া রে বন্ধু এত লাঞ্ছনা জানলে আগে নবযৌবন সপে দিতাম না।

(১২) বন্ধু তুমি আমার জানের জান / তুমি আমার প্রাণের প্রাণ / হৃদয়ে থাকো আমার হৃদ আকাশের চান।

(১৩) যদি ভালোবাসো না, কাছেও আসো না, দেখেও দেখো না/ কোনোদিন আমি তোমারে বন্ধু বাসিব না ভিন।

(১৪) শাহজালালের পুণ্যভূমির নাম জালালশরিফ, আমার আল্লাজির তারিফ।

(১৫) শিখাইয়া পিরিতি করিল ডাকাতি/ ভুলিয়া রইয়াছে আমায় / সখি কি করি উপায় ...

(১৬) আগে ভক্তির চুলা বানাও, সবুরের হাড়ি বসাও। / ভাবের লাকড়িতে জ্বালাও প্রেমেরই চিতা/ স্বার্থবাদী প্রেম করে যায় না কভু জিতা।

(১৭) জগতস্বামী নিজেরে প্রকাশ করিবার তরে / অপূর্ব কৌশলে করেন মানুষ তৈয়ারি / এই মানুষে মানুষে কেন মারামারি।

(১৮) বন্ধুর দেশের পাখিরে তুই বল আমারে আমার বন্ধু কেমন আছ?

---

১৯১. *সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

(১৯) বাংলা আমার মায়ের ভাষা বাংলা আমার মা জননী।

(২০) আমানতের খেয়ানত হইব রে, ও ভাই কেয়ামতের আলামত আইব রে।

(২১) বন্ধুর আশায় আর কতদিন থাকি প্রাণসখি গো ফিরে নি আর আসবে হৃদয়পাখি।

(২২) নৌকা বানাইয়া দিলো সুজন মেস্তরী ময়ুরপঙ্কি নায়ে রে আপন কাণ্ডারী।

(২৩) সৃষ্টিতে যার সকল প্রাণের দাবি সেজন আমার নবি

(২৪) ইসলামেরই চেরাগ তৌহিদি দেমাগ আশিকে রাসুলুল্লাহ আল্লাহর ওলি

(২৫) হাছা কথায় শরম করে, মিছা মাতলে আরাম পাই / কি জাতের মুছল্লি আমি কইয়া যাই।

(২৬) সাধ করে তোর নামের মালা পরেছি আমার গলে / আমি যে তুই বন্ধুর পাগল দেখতা সকলে।

(২৭) কবর দেখলে চমকিয়া উঠি, ভয় জাগে মোর মনে / একা থাকব কোন পরানে।

(২৮) তোরা কেউ দেখছো নি বন্ধুয়ারে।

(২৯) বন্ধু যাইয়ো না রে বন্ধু যাইয়ো না রে/থাকো রে আমার হৃদয়বাসরে থাকো রে প্রাণবন্ধু যাইয়ো না।

(৩০) নিষ্ঠুর বন্ধু রে কোন পরানে তুমি রইলা বৈদেশে।

(৩১) বন্ধুয়ারে বিফলে সজ্জা সাজাইলাম।[১৯২]

কারী আমির উদ্দিন লোকসংগীতপ্রেমীদের কাছে অনুপ্রেরণার আদর্শরূপে গণ্য হয়ে থাকবেন। তাঁর রচনা মানুষের চিন্তার জগতকে প্রসারিত করে। তাঁর অনুপ্রেরণায় আজ অনেকেই বিখ্যাত গীতিকার হয়েছেন। যেমন, প্রয়াত পল্লিকবি রমিজ আলী, গীতিকার সৈয়দ দুলালসহ অসংখ্য গুণীজন। তাঁর ছাত্রসংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়েছে। লন্ডনে বসবাসরত অনেক শিল্পী, গীতিকার সরাসরি আমির উদ্দিনের শিষ্য।

বলতে গেলে তাঁর গান গেয়েছেন দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সব গায়ক-গায়িকারা। যেমন, পবন দাস বাউল, গনি সরকার, আরিফ দেওয়ান, ফকির শাহাবুদ্দিন, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মমতাজ বেগম, বেবী নাজনীন, আসিফ আকবর, শাহনাজ বেলী, কায়া, আশিক, রিন্টুসহ অনেকেই।[১৯৩]

বাউল সাধকরা পদ-পদবীর লোভে কাজ করেন না; বরং তাঁরা গানের প্রতি ভালোবাসার টানেই গান রচনা করেন, গেয়ে থাকেন। কারণ, গান তাদের প্রাণরক্ষার মহৌষধের মতো। সত্যিকারের বাউল যারা তারা প্রচারবিমুখ হয়। কে তাদের মূল্যায়ন করল, কে তাদের বিরোধিতা করল সেটা চিন্তার সময় তাদের নেই। কারণ, ছয় রিপুর ভেদ ভেঙেই তারা এই পর্যায়ে এসেছেন। তারা দেশ ও জাতিকে অনেক দিয়েছেন। তাই আমাদেরও উচিত তাদের ন্যূনতম সম্মানটুকু দেয়া।

---

১৯২. কারী আমির উদ্দিন ও আমাদের লোক সঙ্গীত, প্রাগুক্ত।

১৯৩. সুমন কুমার দাশ, আমিরী জলসা, জালালাবাদ বার্ষিকী-২০১৮, পৃ. ৮৫-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

কবি রাগিব হোসেন চৌধুরী (জন্ম ১৯৫২)

ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতীক, হাজার বছরের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রভূমি, হযরত শাহজালাল (র.), শাহপরান (র.) ও অসংখ্য অলি আউলিয়ার স্মৃতিধন্য, আউল-বাউল সূফী দরবেশদের চারণভূমি পবিত্র সিলেটের সুপরিচিত সাহিত্য যোদ্ধা রাগিব হোসেন চৌধুরী। সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার কুবাজপুর গ্রামে ১৯৫২ সালের ১১ এপ্রিল তাঁর জন্ম।[১৯৪] নীরব সমাজসেবী বাবা মরহুম আব্দুল লতিফ চৌধুরী ৪০-এর দশকে সাগর পাড়ি দেন। মা জান্নাতবাসিনী রাবেয়া খাতুন চৌধুরীর আদর্শিক প্রভাব রাগিব হোসেন চৌধুরীর জীবনে ব্যাপক। তাঁর অনুজ মহিব হোসেন চৌধুরী (মহিব চৌধুরী) লন্ডন থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিক 'নতুন দিন'-এর সম্পাদক এবং লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি। কনিষ্ঠ ভাই জাকির হোসেন চৌধুরীও ব্যতিক্রমী প্রতিভার অধিকারী অংকন শিল্পী। রাগিব হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী লায়লা রাগিব ছিলেন একজন শক্তিমান কবি ও সাহিত্য সংগঠক। 'ঠোঁটের ভাষায় কবিতা লিখুন' আন্দোলনের নেত্রী কবি লায়লা রাগিব সাহিত্য পত্রিকা 'কবি সংলাপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা, সিলেট লেখিকা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ– কিংখাবে মোড়া (কবিতা), বৃষ্টি আমার জন্মাবধি দুঃখ মুছে নাও (কবিতা), নীড়াঙ্গনে পাখী (প্রবন্ধ)।

১৯৮৬ সালে এই শক্তিমান মহিলা কবি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। জুমা ও লবিদ তাঁর রেখে যাওয়া দুই সন্তান। এ দু'সন্তানের জনক রাগিব হোসেন চৌধুরী সিলেট শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন পরিবার-পরিজন নিয়ে নিজস্ব বাসভবন–রাবেয়া নিকেতন, পাঠানটুলায়।

রাগিব হোসেন চৌধুরী একজন সুপরিচিত সাহসী সাহিত্য যোদ্ধা ও সংস্কৃতি কর্মী। তিনি সত্তর দশকের শুরুতে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন। সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর আগমন কোন আড়ালে আবডালে নয়, বরং সরবে, সদলবলে। সে এক রীতিমত স্মরণীয় ঘটনা। এসেই তিনি গড়ে তোলেন সাহিত্য সংগঠন, প্রকাশ করেন পত্র-পত্রিকা, একটি নয়-দুটি নয় অনেক, সম্পাদনা করেন বেশ ক'টি পত্রিকা। করেন সাহিত্য সভা, কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান, সম্মেলন-সেমিনার। ঝিমিয়ে পড়া সিলেটের সংস্কৃতিকে অল্পদিনের মধ্যে নাচিয়ে তোলেন।

শুধু শহরে নয়, বৃহত্তর সিলেটের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে ঝাঁকিয়ে নাড়িয়ে সবল ও বেগবান করে তোলেন। সাংগঠনিক যোগ্যতা ও কর্ম চঞ্চলতায় তরুণ কর্মীদের নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তাতে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খ্যাতিমান প্রবীণরাও যুক্ত হন। এভাবে সত্তর ও আশির

---

১৯৪. আব্দুল মুকিত অপি সম্পাদিত, সরস প্রতিনিধি, রাগিব হোসেন চৌধুরী সংবর্ধনা স্মারক, মে ২০০২, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

দশক সিলেটকে রাগিব চাঙ্গা করে রাখেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। তার এই সাড়া জাগানো সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেশের সচেতন সকল কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দেশের কবি-সাহিত্যিকদের তিনি অনেকটা সিলেটমুখী করে তোলেন। 'জাগৃতি প্রকাশনী' থেকে প্রকাশ করেন সাহিত্য মাসিক 'জাগরণ'। সত্তর দশকের শুরুতে প্রকাশিত 'জাগরণ' সাহিত্য পত্রিকাটি ছিলো স্বাধীনতা উত্তর সিলেট সাহিত্যের ব্যতিক্রম ও বহুল পরিচিত জনপ্রিয় পত্রিকা। তাঁর সম্পাদিত পত্র- পত্রিকা ও সংকলনের কয়েকটি হচ্ছে, স্মরণিকা : 'জগন্নাথপুর উপজেলা', 'সব মানুষের ধ্যানের ছবি', 'পাক্ষিক রেঁনেসা', 'পাক্ষিক সিলেট পরিদর্শক', 'সুরমা প্রবাহ', 'জগন্নাথপুরের কথা', 'পাক্ষিক জগন্নাথপুর পরিক্রমা'। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত কবিতাপত্র 'কবি সংলাপ' ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি আমিনূর রশীদ চৌধুরী সংবর্ধনা স্মারক ও ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মেলন স্মারকের সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং আছমা হামিদ চৌধুরীর সাথে যৌথভাবে সম্পাদনা করেন 'বন্ধন'। সম্প্রতি তিনি সম্পাদনা করেন ভাষা সৈনিক সংবর্ধনা স্মারক ২০০২।[১৯৫] এক সময় তিনি সিলেট রেডিওতে প্রচুর সাহিত্য প্রোগ্রাম করতেন। এখনও করেন মাঝে মাঝে। জাগৃতি প্রকাশনী থেকে তিনি নিজ ব্যয়ে বেশ কয়েকজন লেখকের বই প্রকাশ করেন।

সাহিত্যিক সাংবাদিক রাগিব হোসেন চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। সাপ্তাহিক 'সিলহট্ কণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রাগিব হোসেন চৌধুরী 'দৈনিক সিলেটের ডাক'-এ নিয়মিত কলাম লিখেছেন ৯০ দশক পর্যন্ত। বহুদিন বহুল প্রচারিত 'সচিত্র স্বদেশ'-এর প্রতিনিধি হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রাচীনতম বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগভেরী'তেও বহুদিন কর্মরত ছিলেন। তবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে। তিনি সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাহজালাল জামেয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষকদের একজন। আল-ইসলাহ, বাংলার মুখ, আবির্ভাব, সমীকরণ, সিলেটের ডাক, আজাদ, দৈনিক বাংলা, বিচিত্রা, জাহানে নও, সোনার বাংলা, হককথা, সংগ্রাম, স্বদেশ, বিক্রম ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'নতুনদিন' পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকাতে বিভিন্ন সময়ে প্রতিনিধি, সংবাদদাতা, বিভাগীয় সম্পাদক ও কলাম লেখক হিসেবে কাজ করেছেন ও করছেন।[১৯৬] প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্য মাসিক 'আল-ইসলাহ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হকের ইনতেকালের পর রাগিব হোসেন চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'আল-ইসলাহ' নিয়মিত চার বছর। তার বলিষ্ঠ সম্পাদনায় আল-ইসলাহ ও সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে রেঁনেসা এসেছে। তিনি সম্পাদনা করেছেন ১৯৪০ সালে খোলা সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম

১৯৫. প্রাগুক্ত।
১৯৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সংসদের পরিদর্শক খাতা। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিদর্শক খাতাটি গ্রন্থাকারে রূপ লাভ করে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের এক স্মরণীয় দলিল হলো।

সাহিত্যিক সাংবাদিক রাগিব হোসেন চৌধুরী বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। ৭০ দশকের শুরুতে সুরমা সাহিত্যগোষ্ঠী ও শেখ ফজলুল হক মণি প্রতিষ্ঠিত শিশু-কিশোর সংগঠন শাপলা কুড়ির আসরের সিলেট জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও জালালাবাদ মজলিস, আবির্ভাব সাহিত্যগোষ্ঠী প্রভৃতির অন্যতম কর্মতৎপর তরুণ কর্মী ছিলেন। ছিলেন সিলেট একাডেমির সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), তিনি সংলাপ সাহিত্য সংস্কৃতি ফ্রন্টের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন একটানা কয়েক বছর। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-এর আজীবন সদস্য রাগিব হোসেন চৌধুরী সিলেট লেখক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। তিনি ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৯৪ সালে প্রথমবার। দ্বিতীয় বার ১৯৯৬ সালে রাগিব হোসেন চৌধুরী আবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে নিরলসভাবে সংসদের উন্নয়ন ও সাহিত্য কর্মকাণ্ডে তৎপরতায় সংসদকে আবার মুহাম্মদ নূরুল হক যুগের মতো সাহিত্যমুখী করে তোলেন। তাঁরই সময়ে সংসদের বাণিজ্যিক ভবন বিদায়ী কমিটি প্রথম তলার ছাদ ঢালাই-এর আগেই বিদায় নিলে সভাপতি দেওয়ান ফরিদ গাজী ও তার চার বছরের সাধারণ সম্পাদক কালীন কমিটি চার তলা পর্যন্ত সমাপ্ত করে সংসদকে আর্থিক সংকট থেকে বের করে আনে। তিনি শিশুকিশোর সংগঠন ফুলকুড়ি আসরের উপদেষ্টা, তার এসব কর্মকুশলতার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বাংলা সংবাদপত্রের প্রাচীনতম সাপ্তাহিক 'যুগভেরী' তার প্রথম গ্রন্থের আলোচনার এক পর্যায়ে বলে, "রাগিব হোসেন চৌধুরী প্রত্যয়দীপ্ত সৈনিক মেজাজের একজন স্বপ্নবদ্ধ রিভ্যুলিউশনারী। বিপ্লবী বাংলার দলিল দস্তাবেজের পৃষ্ঠায় এখনও যাদের স্মৃতি অবসিত নয়, তেমনি কোন ক্ষুদিরাম বা বেনজির আহমদের মেজাজের একজন উত্তরসূরি তিনি।"[১৯৭]

বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক নন্দলাল শর্মা তার 'সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন' গ্রন্থে রাগিব হোসেন চৌধুরীর উপন্যাস কর্ম, সাংবাদিকতা ও কবিতা প্রসঙ্গের আলোচনাতে বলেছেন, "তার কলমে ধরা পড়েছে সমকালীন রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সমাজ জীবন। .... কবিতার ক্ষেত্রে ..... সহজ স্বচ্ছন্দ্য অথচ সাবলিল কাব্য ভাষায় চিন্তা-চেতনা, অনুভব ও বিশ্বাসকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করার সচেতন প্রয়াসে তিনি নিয়োজিত।"[১৯৮]

১৯৭. *সাপ্তাহিক যুগভেরী*, সিলেট ১১ এপ্রিল, ২০০২
১৯৮. *সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

..... সমাজ চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক সমসাময়িক তরঙ্গ তার কবিতায় আন্তরিক এক প্রবাহে পরিবেশিত। স্বতঃস্ফূর্ততা তার কবিতার বড় গুণ, উপন্যাস রচনাতেও তিনি তাঁর বিশ্বাসে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। রাগিব হোসেন চৌধুরীর বইপত্র সম্পর্কে সিলেটের পত্র-পত্রিকা ছাড়াও জাতীয় পত্র-পত্রিকাতে আলোচিত হচ্ছে। তিনি সাহিত্য আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ কথাশিল্পী মরহুম মাহবুব উল আলম থেকে শুরু করে প্রিন্সিপাল ইবাহীম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, সুফি জুলফিকার হায়দার, আ. ন. ম. বজলুর রশিদ, আবু ফাতেমা মোঃ ইসহাক, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, কবি আহসান হাবিব, সৈয়দ মোস্তফা আলী, জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কালজয়ী কথাশিল্পী শাহেদ আলী, আমীনূর রশীদ চৌধুরী, চৌধুরী গোলাম আকবর, আকাদ্দস সিরাজ, আব্দুল হামিদ, মুসলিম চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হক তাঁর সাহিত্য কর্মের প্রশংসা করে গেছেন। আবু তালেব, আব্দুল মান্নান তালিব, কবি আল-মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল ইসলাম, কবি বেলাল মোহাম্মদ, কবি আফজাল চৌধুরী, আবু আলী সাজ্জাদ হোসেন, শাসুল করিম কয়েস, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আব্দুল হালিম খাঁ, মোঃ আতাউর রহমান, কবি আব্দুল ওয়াদুদ, কবি নূর-ই-সাত্তার ও সিলেট বিভাগের সকল নবীন-প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিকরা তার সাহিত্য কর্ম ও সাহিত্য সেবার বিভিন্ন বিষয় লেখালেখি করেছেন এবং করছেন। সিলেট বিভাগের সব মত-অমতের সাহিত্য সংস্কৃতি সেবীর সাথে তার সম্পর্ক খুবই গভীর। বর্তমানে তিনি সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সহ-সভাপতি।

কবি রাগিব সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ লাভ করেন ইংল্যান্ডের বি.এন.এস-এর পুরস্কার এবং তার থানা জগন্নাথপুরবাসীর পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সালে গ্রামবাংলা উন্নয়ন সংস্থা যুক্তরাজ্য শাখা প্রদান করে গণ সংবর্ধনা ও American Biographical Institute, Inc তাদের Sixth Edition এ তার পরিচিতি প্রকাশ করছে বলে সংস্থার Director Mr. J. M. Evans এক পত্রে জানিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ইংল্যান্ড সফর করেন। এ সময়ে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁর সম্মানে সংবর্ধনা সভা ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ৫টি বাংলা সাপ্তাহিকের উদ্যোগে 'সিলেট ও সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ' বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাগিব হোসেন চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রবাসী নেতা মরহুম তছদ্দুক আহমদ। ১৯৯৯ সাল থেকে তাঁরই সম্পাদনায় সিলেট লন্ডনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সিলেট লন্ডনের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা 'ভিলেজ ডাইজেস্ট'। ইতিমধ্যে পত্রিকাটি ইউরোপ আমেরিকার

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরীসমূহে স্থান লাভ করেছে। ব্রিকলেন ট্রাস্ট লন্ডন মিলেনিয়াম-২০০০ পুরস্কার প্রদান করেছে পত্রিকা সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রমুখকে। তার সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০২ সালে মহাকবি সৈয়দ সুলতান পুরস্কার পেয়েছেন।[১৯৯]

রাগিব হোসেন চৌধুরীর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

(১) মুক্তির ময়দান কখনো নীরব নয় (উপন্যাস), (২) কথকতা : কবিতা প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ), (৩) ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না (নাটক), (৪) কমলের কণ্ঠ (শহীদ জিয়ার জীবনী), (৫) ফোরাতের তীর বেয়ে (প্রবন্ধ), (৬) স্বাগত সংলাপ (কবিতা), (৭) নিষিদ্ধ কবিতা, (৮) রোকেয়া ভাবী কেমন আছেন (কবিতা), (৯) রাগিব হোসেন চৌধুরীর কলাম, (১০) অশ্রু নয় রক্ত (উপন্যাস)। এবং প্রকাশিতব্য গ্রন্থ হচ্ছে : (১) কথকতা : সাহিত্য প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ), (২) কে আছিস বিপ্লবী আয় (উপন্যাস), (৩) কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের ইতিহাস, (৪) হাজার বছরের বাংলার ক্ষমতা বদলের পালা, (৫) পীর শাহজালাল বীর শাহজালাল (র.) (জীবন ও কর্ম), (৬) ওদের চোখে স্বপ্ন ভাসে (কিশোর গদ্য), (৭) জালালাবাদের শত বছরের মনিষা, (৮) রাণীর দেশে রাজকীয় সফর, (৯) নির্বাচিত প্রবন্ধ, (১০) তাপসীর বড় ছেলে, (১১) স্মৃতির সাথে কথকতা ইত্যাদি।[২০০]

জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত, প্রিয়জন হারানোর শোকে ম্রিয়মান, উচ্চ রক্তচাপের উৎপাত সত্ত্বেও রাগিব হোসেন চৌধুরী তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনায় নিরলস ও বিরামহীন। কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশার শেষ নেই। তাঁর ভাষায় :

> "প্রতিটি সুবহে সাদেক
> ঘুম থেকে জেগে মনে হয়
> সদ্য জন্ম নেয়া শিশু
> আমি বুঝি পৃথিবীতে
> এইমাত্র এলাম।"[২০১]

আলো ঝলমলে অনাগত দিনে সুলেখক রাগিব হোসেনের সৃজন সাধনায় আমাদের সাহিত্য ভূবন আরো সমৃদ্ধ হবে, আমাদের বিশ্বাসী সাহিত্য ধারা হবে গতিশীল ও বেগবান, আমাদের সংস্কৃতি হবে আরো সমৃদ্ধ–এ প্রত্যাশা আমাদের।

---

১৯৯. রাগিব হোসেন চৌধুরী : একটি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য, সরস প্রতিনিধি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২০১. রাগীব হোসেন চৌধুরী, *স্বাগত সংলাপ*, মে ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানী নাগরী লিপির প্রভাব

১৩০৩ সালে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিলেট জয় করে। ফলে সিলেটে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তখন স্থানীয় অধিবাসীর ভাষা ছিল দেবনাগরীজাতসংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ। আবার বিজয়ী মুসলিমগণের ভাষা ছিল আরবী ও ফার্সী মিশ্রিত। ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যার তাৎক্ষণিক ফল ছিল সিলেটি মুসলমানী নাগরী লিপির উৎপত্তি। হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে এই লিপি বৃহত্তর সিলেটের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটায়। এই লিপি উদ্ভবের ফলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গঠনমূলক ও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ধর্মপ্রচার, সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিলেটি কথ্যবুলি এবং নাগরী লিপি ছিল মুসলমানদের প্রধান বাহন। এমনকি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মুদ্রায় নাগরী লিপির অস্তিত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই নাগরী লিপি ছিল বৃহত্তর সিলেটের মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অনন্য নিদর্শন। এ লিপি কেবল একটি লিপিই ছিলনা বরং তা ছিল একটি চেতনা বা কালচার। আলোচ্য পর্যায়ে সিলেটে মুসলমানী নাগরী লিপির উৎপত্তি এবং সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

নাগরী লিপির পরিচয়

চতুর্দশ শতকে সিলেটে মুসলমানগণ কর্তৃক 'নাগরী ভাষা' নামে একটি উপভাষা জন্ম নেয়। এ ভাষা নিজস্ব লিখন পদ্ধতি, বর্ণমালা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর সহজ বাংলা লিপির নামই সিলেটি লিপি। হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলে এই লিপির উদ্ভব ও প্রচলন হওয়ায় কেউ কেউ এটাকে 'জালালাবাদী লিপি' হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। এটি মূলত কথ্য ভাষা ছিল। স্থানীয় লোকজনের কথ্য বুলির সাথে বিজয়ী জনগোষ্ঠীর ভাষা আরবী-ফার্সীর সমন্বয় ঘটিয়েই এই ভাষার উৎপত্তি। তবে মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর এই লিপি স্থানীয় দেবনাগরী লিপির প্যারালাল হিসেবে 'মুসলমানী নাগরী' তথা 'সিলেটি নাগরী' নামে সমধিক পরিচিত।[২০২] সিলেটের মুসলিম সমাজ প্রধানত এই নাগরী লিপির উদ্ভাবক, লালনকারী ও পৃষ্ঠপোষক।

২০২. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা : উত্তরাধিকার ও মুসলমানী নাগরী* (সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিচার্স, লন্ডন, ১৬ই অক্টোবর, ২০০১ ইং), পৃ. ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণপরিচয় ও অন্যান্য ভাষার প্রভাব

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাষা যুক্তক্ষর বর্জিত। সিলেটি নাগরীতেও যুক্তক্ষর নাই। অক্ষর সংখ্যা ৩২, স্বর চিহ্ন ৫টি[২০৩] উদাহরণস্বরূপ–

সিলেটি নাগরীবর্ণ	বাংলা বর্ণ
	আ
	ই
	উ
	এ
	অ

মুসলমানগণ কর্তৃক সিলেট বিজয়ের সাথে সাথে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার উপর আরবী ও ফার্সী ভাষার প্রভাব পড়তে শুরু করে। হিন্দুয়ানী অনেক শব্দের মুসলিম রূপান্তর হয়। যেমন- 'জল' মুসলমানদের কাছে 'পানি' এবং 'স্নান' গোসল হয়ে গেল। অযু, নামায, রোযা, সালাত, হালাল, হারাম, যিয়ারত প্রভৃতি অসংখ্য আরবী/ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। নাগরী ভাষা বিশেষজ্ঞ অধ্যপক ড.এস.এম. গোলাম কাদিরও লিখেছেন : "সিলেটি নাগরীর বর্ণ বাছাই ও বিন্যাসে আরবী বর্ণমালার বিন্যাসিক অবস্থান ও উচ্চারণগত প্রভাব পড়েছে প্রচুর। সিলেটি উপভাষার উচ্চারণ স্বাতন্ত্র নির্মাণ করেছে মূলত ফার্সী (উর্দু'র) প্রভাব। সিলেটি উপভাষার উচ্চারণ তথা সিলেটি নাগরী লিপি ও উচ্চরণ বিশ্লেষণে ফার্সী (উর্দুর) উচ্চারণ প্রভাবকেও তাই আরবী বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশ ভিন্ন বিকল্প নাই।"[২০৪]

নাগরী পুঁথির শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক ও গবেষক কবি মোহাম্মদ সাদিকের ভাষ্য মতে : "সিলেটি লিপিতে রচিত পাণ্ডুলিপির অবয়বে সেমেটিক প্রভাবের দিকটি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। অর্থাৎ সিলেটি লিপির কিছু কিছু নমুনায় লিপিকারগণ আরবী ও ফার্সী ক্যালিওগ্রাফির নিকটবর্তী থাকার প্রয়াস পেয়েছেন। উৎস বিচারের ক্ষেত্রে এ লিপিকারগণ আরবী ও ফার্সী ক্যালিওগ্রাফির নিকটবর্তী থাকার প্রয়াস পেয়েছেন। উৎস বিচারের ক্ষেত্রে এ লিপির স্টাইল ও স্ট্রোক বিচারের বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।"[২০৫]

সিলেটি নাগরী হরফ (ড) আরবী ' ' এর মত। কেবল মাত্রা যোগ করতে হয়। এছাড়া নাগরী আরবী و ا ও আরবী যতিচিহ্ন ' ٥ ' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অনুরূপ সিলেটি নাগরীর নিজস্ব হরফ (আ), (র) (ল) প্রভৃতি আরবী যযম এর সাথে মাত্রা যোগ করে লিখতে হয়। এসব কারণেও সিলেটি নাগরী লিপি মুসলমানী নাগরী বলে চিহ্নিত।

---

২০৩. ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯১, পৃ. ১৪৬-৪৭

২০৪. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২০৫. মোহাম্মদ সাদিক, সিলেটিলিপি ফকিরি ধারার সোনালী ফসল, সিলেট, *আল-ইসলাহ*, এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০০০ পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটি নাগরী লিপি প্রবর্তনে আরবী ও ফার্সী ভাষা মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করলেও ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা যেমন- কাইথি, দেবনাগরী, আফগান ও পূর্ব ভারতীয় বাংলা লিপির প্রভাবও নেহায়ত কম ছিল না। উল্লেখ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে মূল 'নাগরী' লিপির জন্ম। এই নাগরী থেকে জন্মলাভ করে দেবনাগরী, কাইথি ও গুজরাটি লিপি। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতেরাই এর স্রষ্টা। এসব ভাষা ছিল হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্য নির্ভর।[২০৬] ভারতে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের আগমনের ফলে ব্যাপক সংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু এ সব ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মাতৃভাষা পরিবর্তন হয়নি। আবার নবাগত মুসলমানদের সাথেও তাদের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে তাদের প্রচেষ্টায় প্রচলিত ভাষার কিছু বর্ণও সিলেটি নাগরী লিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে আরবী, ফার্সী, বাংলা, কাইথি, দেবনাগরী, আফগানী প্রভৃতি ভাষার লিপি থেকে কিছু কিছু হরফের নমুনা সংগ্রহ করে সিলেটি নাগরী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিজস্ব একটি লিপিমালা সৃষ্টি করে, যা এই ভাষাকে গতিশীল ও প্রাণান্ত করে তোলে। সিলেটি কথ্যনির্ভর এই লিপি গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ভাষা সহজে আয়ত্ব করা যেত, কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হতো না। ফলে ধীরে ধীরে তা এতদাঞ্চলের সব শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

নাগরী লিপির উদ্ভব

হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.) ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট বিজয় করার পর সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন। কসবে সিলেটেই গড়ে উঠে তাঁর খানকা ও লঙ্গরখানা। এই খানকাই ছিল তৎকালীন এ অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। যেখানে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা হত। খানকার আশ-পাশের লঙ্গরখানায় খাবারের সময় ঢোল পিটিয়ে সংশ্লিষ্টদের জানান দেয়া হলে অনেক লোক খাবার গ্রহণ করতে আসত। পাশাপাশি তাদেরকে গণশিক্ষার আওতায় আনারও ব্যবস্থা করা হয়।[২০৭] কিন্তু তৎকালীন সিলেটে প্রচলিত হিন্দু ঐতিহ্য নির্ভর জটিল দেবনাগরী ও জটিল বাংলা লিপি দ্বারা বহুভাষিক এসকল মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিলনা। এ কারণে ঐ জনগোষ্ঠীর ও স্থানীয় এবং আশ-পাশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর (এদের সকলকে নিয়ে গড়ে উঠে মুসলিম কমিউনিটি) দ্বারা বহু ভাষার লিপির নমুনা সমন্বয়ে সহজবোধ্য ও সহজে লিখিত-পঠিত একটি বিকল্প ভাষা ও লিপির প্রয়োজনীয়তা তখন ছিল অবশ্যম্ভাবী। যা সিলেটি নাগরী লিপির উদ্ভবে বিরাট ভূমিকা রাখে। সিলেটি কথ্যনির্ভর নাগরী লিপি গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া দেবনাগরীজাত হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে মুক্তি লাভ

---

২০৬. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

করত স্বকীয় সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে সহজতর মুসলমানী নাগরী লিপির সৃষ্টি করা হয়। হিন্দুয়ানী কথ্য বুলিকে মুসলমনী বাংলার আদলে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধ করা হয়। সিলেটী জনগণ নাগরী ভাষাকেই স্বকীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং বাংলা ভাষার ইতিহাসে সিলেটি নাগরীর উদ্ভাবন এক যুগান্তকারী ঘটনা। নাগরী লিপির উদ্ভব, প্রচলন ও গ্রহণযোগ্যতার পেছনে হযরত শাহ জালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার যে আশীর্বাদ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। এমনকি ৩৬০ আউলিয়ার কেউ কেউ যে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এর প্রমাণ সিলেটি নাগরী লিপিতেই বিদ্যমান আছে।

ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল মুসাব্বির ভূঁইয়ার মতে : The history of the Advent of Islam and Sufism in also connected with the history of the script.[২০৮]

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক জগমল সিং ড. আব্দুল মুসাব্বির ভূঁইয়ার সূত্র ধরে বলেন, Dr. A. M Bhuiya is of opinion that this language and script came in to existence during the time of Shahjalal.[২০৯]

প্রকৃতপক্ষে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার নেতৃত্বাধীন মুসলিম সমাজ নাগরী তথা মুসলমানী নাগরী সৃষ্টিপূর্বক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইসলামীকরণ করে মুসলমানী বাংলারই (ভাষা ও সাহিত্যেরই) কেবল গোড়াপত্তন করেননি; বরং হিন্দু ঐতিহ্যনির্ভর দেবনাগরীর প্যারালাল মুসলমানী নাগরীরও গোড়াপত্তন করেন। তাঁরা বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ সিলেটি কথ্যবুলিকেও মুসলমানী বাংলায় ঢেলে সাজান। সিলেটি নাগরীর মাধ্যমে হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়া বহুজাতিক (রাষ্ট্রীয়) বহুভাষিক জাতিসমূহকে তাদের কর্মস্থলে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন এতদঞ্চলের সমাজ বদলের রূপকার। কারণ, সিলেটি নাগরী এবং কথ্যবুলি ছিল তৎকালীন সমাজ বদলের ও নতুন সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার।[২১০]

নাগরী লিপির ক্রমবিকাশ

১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটে সংগঠিত ইসলামী বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত ভাষা সংকট মুকাবিলার লক্ষ্যেই সিলেটি নাগরী তথা মুসলমানী নাগরীর উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালেও এর লালন ও বিকাশ সাধিত হতে হতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে। নাগরী সমগ্র সিলেট ও আসামের কাছাড়ের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সিলেটি নাগরী ভাষার মুখ্য অংশই ইসলাম ধর্মের বিধি-

২০৮. Dr. Md. Abdul Musabbir Bhuiya, *JALALA VADI NAGRI,* Sylhet, August 2000, P. 22
২০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
২১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

বিধান ও কাহিনী বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে। মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক বিষয়, মরমী প্রেম ও রোমান্টিক কাহিনীর সন্ধানও মিলে এ ভাষায়। দলিল দস্তাবেজে অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও সরকারী কার্যকলাপে তা তেমন একটা ব্যবহৃত হয়নি। মূলত সূফী-সাধক ও ফকীর-দরবেশগণ নাগরী লিপিতে সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁদের হাতেই এই লিপির তথা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। এ জন্য নাগরী সাহিত্যকে ফকীরী ধারার সাহিত্যও বলা হয়। এ সম্পর্কে নাগরী গবেষক কবি মোহাম্মদ সাদিক বলেন, "সিলেটি নাগরী লিপির চর্চা ও বিকাশ সাধিত হয় মূলধারার মুসলমান অর্থাৎ ফকীর দরবেশদের দ্বারা। এ সকল ফকীর-দরবেশ সমাজে সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা কোন ক্রমেই সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ ছিলেন না।"[২১১]

একথা বলাই বাহুল্য যে, পীর ফকীর দরবেশদের মর্যাদা ছিল সমাজে সবার উপরে এবং সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের উপর তাঁদের প্রভাব ছিল ব্যাপক। ফলে তাঁদের হাতে বিকশিত নাগরী লিপি যে সিলেটের তৎকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নাগরী লিপির প্রভাব

চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে উদ্ভূত হয়ে প্রায় দু'শ বছরের গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নাগরী লিপির ভাষা ও সাহিত্য একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়।কালক্রমে এই লিপি সিলেটের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। আরাকান রাজ সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২ খ্রি.) পনের শতকেই আরবী, ফার্সী ও নাগরী লিপিতে মুদ্রা চালু করেন।[২১২] দিনারপুরের বড় খান,[২১৩] কুরেশী মাগন ঠাকুর (পীর বখশ খান)[২১৪] ও তরফের সৈয়দ মুসা[২১৫] প্রমুখের প্রভাবেই চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে নাগরী

---

২১১. মোহাম্মদ সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

২১২. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *শিকড়ের সন্ধানে শিলালিপি ও সনদে আমাদের সমাজ চিত্র*, ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৭

২১৩. আরাকান রাজসভার সমরমন্ত্রী ছিলেন। বৃহত্তর সিলেটের দিনার পুরের অধিবাসী হযরত শাহজালাল (র.)-এর অন্যতম সঙ্গী দেওয়ান শাহ তাজ উদ্দিন কুরায়শীর বংশধর। [আসমা চৌধুরী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে সিলেট* (এল্যাইট প্রিন্টার্স), ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ৬৯]

২১৪. মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলিম কবি। রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান আমাত্য, 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের রচয়িতা ও মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতি' কাব্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সমরমন্ত্রী বড়খানের পুত্র। [দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস* (ই.ফা.বা.) ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১২৮]

২১৫. তরফের অধিবাসী হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর সফরসঙ্গী সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার বংশধর। আরাকান রাজের প্রধানমন্ত্রী। মহাকবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে 'সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল' রচনা সমাপ্ত করেন। [ড. শরীফ উদ্দিন, হযরত শাহজালালের সিলেট বিজয়, *দৈনিক জালালাবাদী*, সিলেট, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৩]

Dhaka University Institutional Repository

লিপি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এছাড়া আফগান শাসকগণও তাঁদের মুদ্রায় সিলেটি লিপি উৎকীর্ণ করে এ লিপির প্রতি সম্মান জানিয়েছিলেন।[২১৬]

সাহিত্য চর্চায় নাগরী লিপির প্রভাব

চতুর্দশ শতকে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক কাল পর্যন্ত কয়েক'শ বছর সিলেটি নাগরী সাহিত্য বৃহত্তর সিলেটের গ্রামীণ সাহিত্য রসিক জনগোষ্ঠীর সাহিত্য পিপাসা নিবৃত্ত করেছে। আরবী, ফার্সী ও বাংলা সাহিত্য রচনার পাশাপাশি মুসলমানী নাগরী সাহিত্য চর্চা বৃহত্তর সিলেটি সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক হলায়ূদ মিশ্র নাগরী লিপিতে 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থ রচনা করেন।[২১৭] মৌলভী বাজারের লংলার অধিবাসী কবি গোলাম হুসন (জন্ম ১৪৬৮ খ্রি.) 'তালিব হুসন' নামে নাগরী লিপিতে কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।[২১৮] প্রথম দিকের নাগরী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুনামগঞ্জের কবি সৈয়দ শাহ হুসন আলম (১৫০০-১৬৫০ খ্রি.) তিনি সিলেটী নাগরী লিপিতে 'ভেদশার' ও 'রিছালাত' নামে দু'খানি কাব্য রচনা করেন। মহাকবি সৈয়দ সুলতান তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

> "আল্লার নাম আগে মনে করি শার
> পরথমে আগাজ পুঁথি নামে ভেদশার।"[২১৯]

প্রখ্যাত মরমী কবি সৈয়দ শাহনূর (১৭৩০-১৮৫৮ খ্রি.) নগরী লিপিতে 'নূর নসিহত' 'রাগনূর' 'নূরের বাগান', 'সাত কন্যার বাখান' ও 'মনিহার' নামে পাঁচ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়ে সিলেটি নাগরী খুব জনপ্রিয় ছিল। তাই কবি লিখেছেন–

> "আরবী ফারসী কেহ বুঝিতে না পারে
> নাগরী করে লিখে দিলু সবে বুঝিবারে।"[২২০]

মধ্যযুগের অন্যান্য নাগরী সাহিত্যিকদের মধ্যে- কবি শেখচান্দ, দীন ভবানন্দ, ভেলা শাহ, শাহ আছদ আলী, শেখ ভানু অন্যতম।

---

২১৬. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহ জালাল (রঃ) ও ৩৬০ আউলিয়ার সিলেট*, জালালাবাদ : ঐতিহাসিক রূপরেখা, ঢাকা, ৩রা মে ২০০৪ ইং, পৃ. ২৬

২১৭. অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলা একডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১৫০

২১৮. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

২২০. আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, *উত্তরাধিকার ও মুসলমানী নাগরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

নাগরী লিপির স্বর্ণযুগ

সূফী বা ফকীরী ধারার নাগরী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ শুরু হয় অষ্টাদশ শতকে। এ সময়ের নাগরী লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুন্সি সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২খ্রি.)। নাগরী লিপিতে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- 'হালতুন্নবী', 'রদ্দেকুফুর', 'হাসর মিসিল', 'মহব্বত নামা' প্রভৃতি। 'হালতুন্নবী', নাগরী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও 'হালতুন্নবী' ঘরে ঘরে পঠিত হতো।[২২১]

আধুনিক যুগেও বহু লেখক নাগরী লিপিতে সূফী বা ফকীরী ধারার অনেক সাহিত্য রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে- আশরাফ হোসেন সাহিত্য রত্ন, চৌধুরী গোলাম আকবর, সৈয়দ মুর্তজা আলী, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, আব্দুল হামিদ মানিক, ফাতেমা চৌধুরী, মতিয়ার রহমান চৌধুরী ও কবি মোহাম্মদ সাদিক উল্লেখযোগ্য।[২২২]

নাগরী লিপি ও সাহিত্যের প্রকাশনা শিল্প

ঊনবিংশ শতকের পূর্বে নাগরী শুধু হাতে লিখা হতো। টাইপ না থাকার দরুণ সিলেটি নাগরীতে বই ছাপানো সম্ভব ছিল না। সিলেটের কৃতি সন্তান মরহুম মুন্সি আব্দুল করিম সর্বপ্রথম নাগরী অক্ষরের টাইপ চালু করেন ও পুস্তক ছাপানোর কাজে হাত দেন। সিলেটে 'ইসলামিয়া প্রেস' (১৮৬০-৭০), 'সরদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' এবং কলকাতায় আপার চিৎপুর রোডের রতু সরকার লেনে 'জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে' অনেক নাগরী পুস্তক ছাপা হয়।[২২৩] ড. সোলয়েড উইলিয়ামস ও জেমস লয়েড উইলিয়ামস নামক দু'জন বিদেশী কম্পিউটারে নাগরী ফ্রন্ট (সুরমা) প্রবর্তন করেছেন।[২২৪] এছাড়া Mr. Roger Gwymn (ইংল্যান্ডের নাগরিক), সিলেটের ফুলবাড়ির মি. আব্দুল জলিল চৌধুরী এবং বার্মিংহাম প্রবাসী ছাতক থানার এম.এ হামিদের প্রচেষ্টায় নাগরী হরফের কম্পিউটার ফ্রন্ট প্রস্তুত করা হয়।[২২৫]

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে প্রভাব

সিলেটি নাগরী লিপি উদ্ভবের পর তৎকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্মান্তরিত মুসলমান ও বহিরাগত মুসলমান জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নাগরী লিপি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এমনকি নারীগণও খুব সহজেই এই লিপির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে

---

২২১. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
২২২. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
২২৩. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
২২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হন। যা তৎকালীন সমাজে নারী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। তাছাড়া নাগরী লিপিতে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে লোক জীবন গাঁথা, ফকীরী ও মরমী ভাবধারা, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন আখ্যান রচিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির উৎকর্ষতা সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, দেবনাগরীজাত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মুসলমানী নাগরী স্বকীয় ঐতিহ্যনির্ভর সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ঐতিহাসিক নিদর্শন।

নাগরী লিপির বর্তমান অবস্থা

হযরত শাহজালাল (র.) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর সিলেটে উদ্ভূত নাগরী লিপি তথা নাগরী ভাষা কয়েকশত বছর সিলেটের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখলেও বর্তমানে এই লিপি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। রাষ্ট্রীয় ভাষা বা দাফতরিক ভাষা হিসেবে ফার্সী ও বাংলার ব্যবহার নাগরী লিপি বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। তাছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠী ফার্সীকে মেনে নিলেও মুসলমানী নাগরীকে মেনে নেয়নি, কারন তা ছিল হিন্দুয়ানী দেব নাগরী লিপির প্যারালাল চ্যালেঞ্জিং মুসলমানী লিপি। পরবর্তীতে উর্দু ভাষার প্রচলন দেশ ব্যাপি সিলেটি নাগরী লিপি চালু না হওয়ার অন্যতম কারণ। বর্তমানে মুসলমানদের স্বকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নির্ভর এ লিপির পুনর্জাগরণে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নাগরীর উৎকর্ষতায় সুনামগঞ্জের কৃতি মনীষিগণের অবদান

নাগরীতে সূফী বা ফকীরী ধারার সাহিত্যই রচিত হয়েছে বেশি। যাতে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির পাশাপাশি আরবী ও ফার্ষী ভাষার অনেক শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং প্রকারান্তরে নাগরী লিপির মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতিরই উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছে। সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্যের সব চেয়ে আলোচিত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সুনামগঞ্জের সৈয়দ শাহনুর, শাহ সৈয়দ হুসন আলম, পীর মজির উদ্দিন, আফজল শাহ, শাহ আছদ আলী প্রমুখ। এরা সকলেই গীতিকবি। সকলেই মরমি গান রচনা করেছেন এই নাগরী লিপিতে। গবেষক ফতেমা চৌধুরীর মতে, "সিলেটের মরমী সাধক ও কবিরা সিলেটি আঞ্চলিক বাংলা ভাষাকে পুঁজি করে জন্মদেন সিলেটি নাগরী লিপি আর এ লিপিতে চতুর্দশ শতক থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বৎসর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অজস্র গান রচনা করে যান। সিলেটি বাংলা কবিতা, গানের বিপুল রসভান্ডার সিলেটি নাগরী লিপির ফসল। যুগ সভ্যতার এ সংকট লগ্নে আমাদেরই আত্মিক ও পার্থিব স্বার্থে সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্য পূর্ণাঙ্গরূপে পুনরুদ্ধারের আশু প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য।"[২২৬]

---

২২৬. ফাতেমা চৌধুরী, *সিলেটী নাগরী লিপি সমীক্ষা* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

নাগরী লিপির সর্বাধিক গ্রন্থ হচ্ছে ধর্ম বিষয়ক সংগীত, মারিফতি, মুর্শিদী ও বাউল এবং সুফিতত্ত্ব বিষয়ক পুঁথি, ষোড়শ শতকে রচিত সুনামগঞ্জের সৈয়দ হুসন আলমের 'ভেদসার' একখানা বিশিষ্ট মারেফতি সংগীত ও তত্ত্বগ্রন্থ। এ ছাড়া মুন্সি ইরফান আলীর রচিত 'মফিদুল মুমিনিন', 'আখবা রুল ইমান', শাহ আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরীর 'ভেদকায়া', 'হাশর তরাণ', ওয়াহেদ আলী রচিত 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি গ্রন্থ ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নাগরি লিপি মাইলফলক হিসেবে গণ্য।[২২৭] আলোচ্য পর্যয়ে সুনামগঞ্জের কৃতী মনীষিদের মধ্যে যারা নাগরী চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতির উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের সম্পর্কে এবং তাঁদের নাগরী বিষয়ক সৃষ্টি কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

মরমী কবি আফজল শাহ : সূফি সাধক মরমী কবি আফজল শাহ ওরফে আরমান আলী সিলেটের অসংখ্য সূফী সাধকদের অন্যতম যোগ্য উত্তরসূরী। সিলেট ছাতক রেল লাইনে অবস্থিত 'আফজলাবাদ' রেল স্টেশনটি তাঁরই নামের পূন্য স্মৃতির সাথে সম্পৃক্ত। ১২১৪ বাংলার ১৫ই ফাল্গুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩৪ বাংলার ২রা আষাঢ় ১২০ বছর বয়সে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।[২২৮] শুধু সুফী সাধক এবং মরমী কবিই নন, একজন কামেল পীর হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি নাগরী হরফে 'নুর পরিচয়' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। অমুদ্রিত থাকার পরও কেবল লোকমুখে প্রচারিত হয়ে 'নুর পরিচয়' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতকের শুরুতে এর রচনাকাল বলে গবেষকদের ধারণা। উনিশ শতকের প্রারম্ভে আফজল শাহ এর মাজারের খাদেম শাহ মোশাহিদ আলী নূর পরিচয় গ্রন্থের একখানা বাংলা লিপান্তরের ব্যবস্থা করেন। পয়ার, ত্রিপদী, গান ও গজল ইত্যাদি মিলে গ্রন্থের পঙ্ক্তি সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি।[২২৯] পুঁথির প্রায় অর্ধেকই পয়ার ছন্দে রচিত, বৃহদাংশ রাগ বা গীত সমষ্টি। পুঁথির অবয়ব জুড়ে রয়েছে নূরের সঙ্গে পরিচয় দেওয়ার অভিপ্রায়। স্রষ্টার মাহাত্ম্য, তাঁর নৈকট্যলাভের উচ্চারণ। এটি ফকীরী সাধনার এক অমূল্য তত্ত্বগ্রন্থ। দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এক চমৎকার আখ্যান।

সুরের জগতে হারিয়ে যাওয়া, চোখের জলে আপ্লুত এক মহান মরমী সাধক ছিলেন আফজল শাহ। সারারাত এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। বালিশের পরিবর্তে মাথার নীচে এক টুকরো কাঠ ব্যবহার করতেন। গান করা, গান শুনা এবং গান রচনা করা এই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তিনি আরো ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যথাক্রমে ঘন্টানামা, বাটুরা নামা, আমুয়া নামা, কলান্দর নামা, দস্তর নামা,

২২৭. মোস্তফা সেলিম, *সিলেটী নাগরীলিপি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : আত্মপুরান, অক্টোবর ২০১৮), পৃ. ৪৬-৪৭
২২৮. মুহম্মদ আসাদ্দর আলী, *সূফী শান্ত গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ* (সিলেট : তাইয়্যীবা প্রকাশনী, জানু. ১৯৯৮), পৃ. ৫
২২৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ফিকিরি সিজরা ও রিসালায়ে মারিফাত।[২৩০] তাঁর রচিত এসব মূল্যবান গ্রন্থাদী আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপাদান।

পীর মজির উদ্দিন : সুনামগঞ্জ জেলার জনগন্নাথপুর থানার বিখ্যাত সৈয়দপুর গ্রামে ১২৮৩ হিজরীর ২১ জমাদিউস সানী শুক্রবার সকালে জন্ম গ্রহণ করেন কাদেরীয়া ও চিশতিয়া তরীকার অন্যতম সূফী সাধক ও নাগরী সংস্কৃতির অন্যতম রূপকার পীর মজির উদ্দিন। প্রায় ৭০ বছর বয়সে ১৩৫৩ হিজরীর ১৫ জমাদিউস সানী মোতাবেক ১৩৪০ বাংলার ৭ই আশ্বিন সোমবার দিবাগত রাত ১ টার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৩১] আধ্যাত্ম সাধনার পাশাপাশি তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছেন। নাগরী হরফে লেখা 'প্রেমমালা' প্রথম খণ্ড, 'প্রেমমালা' দ্বিতীয় খণ্ড, 'শাহাদাতে বুজুর্গান', 'জারী জঙ্গনামা' এবং 'ভেদ জহুর', তাঁর অমূল্য গ্রন্থ। বাংলালিপিতেও 'প্রেমরতন' এবং 'গুলরুখ' নামে তিনি দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।[২৩২]

পীর মজির উদ্দিনের 'প্রেমমালা' প্রথম খণ্ড বাংলায় লিপ্যান্তর করে ১৩৬৪ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পুত্র এস. জেড মনফর উদ্দিন। প্রথম খণ্ডে গানের সংখ্যা ৪৪টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৯টি, কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার উপর তার লেখা 'শাহাদাতে বুজুর্গান' ৮০০ পৃষ্ঠার মহাকাব্য হিসেবে গণ্য। 'ভেদ জহুর' তাঁর রচিত উচ্চ মার্গের একটি সূফি বিষয়ক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে তাঁর রচিত গানগুলোর মধ্যে রয়েছে :

"মজির কহে পাগল মনরে আর কত বুজাই, কথা হুনে কথা জাএ থাতথিননি, শকলের ভেদাভেদ মুরশিদের ঠাই/মুরশিদ বিনে তরিবার আর উপাএ নাই।" অনুরূপ উক্ত গ্রন্থে শতাধিক গান সংকলিত হয়েছে বলে গবেষক আসাদ্দর আলী উল্লেখ করেছেন।[২৩৩] মজির উদ্দিনের বাংলা লিপিতে রচিত সুফি বিষয়ক গ্রন্থ 'প্রেমরতন' ১৩৬৪ সালে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটি মুসলিম সংস্কৃতির উৎকর্ষতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য গান হলো :

"এক নিরঞ্জন বিনে দুই নাহি আর
আচার বিচার রহু আঠার হাজার
হিন্দু বলে রাধা-কিরিশনঅ দেবতা তারার

---

২৩০. *সিলেটী নাগরীলিপি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৮৬
২৩১. *সিলেট বিভাগের পাচঁশ মরমী কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
২৩২. প্রাগুক্ত।
২৩৩. আসাদ্দর রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, দ্য এথনিক মাইনরিটিজ অরিজিন্যাল হিস্ট্রি এন্ড রিসার্চ সেন্টার, লন্ডন, ইউকে, ফেব্রু, ২০০৩, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

আমি ভাবি এই সবের নাহি দরকার
তন রাধা মন কানু ভাবিআ দেখ মনে
রাধা কানু বিচারিআ চাও আপন তনে।"[২৩৪]

হাজী শাহ পীর সুকুর আলী চিশতী : ছাতক থানার শান্তিগঞ্জ বাজার এলাকার কামারগাঁও পীর বাড়িতে ১৩২১ বাংলায় হাজী শাহ পীর সুকুর আলী জন্মগ্রহণ করেন।[২৩৫] তিনি মাদরাসায় লেখাপড়া করে মারেফাতী তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁর পিতার নাম শাহ ছাবাল আলী। তার অন্ধ পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত মরমী কবি এবং শরীয়তের একজন উঁচুমাপের সূফী সাধক। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে মারেফাতের দীক্ষা লাভ করেন। শাহ ছাবাল আলী পীরই ছিলেন তাঁর মুর্শিদ। তাঁর সঠিক ইন্তেকালের সন জানা যায়নি। তাঁর রচিত সূফী শাস্ত্র গ্রন্থের নাম: 'এসকুল আছরার'। ১৩৯২ বাংলায় গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৬৬টি কালাম এবং কতিপয় পদ্য নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৪ বাংলা বা ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।[২৩৬] দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট (১০+৯৬)=১০৬। মোট ২৬ পঙক্তির যে মোনাজাত দিয়ে গ্রন্থখানা শুরু হয়েছে, সে মোনাজাতের কিয়দংশ হলো :

"সর্ব শক্তিমান খোদা কুদরত অসীম
দয়া কর ওহে দয়াল আমিত এতিম।
জোড় হাতে মিন্নতী করি দরবারে তোমার
পাপীরে কর মুক্তি প্রার্থনা আমার।
আউয়াল্লে আখেরে তুমি জাহির বাতিন
তোমার কুদরতে পয়দা আছমান ও জমিন।"[২৩৭] (সংক্ষিপ্ত)

চার তরিকার বিবরণ, আসমান জমিন সৃষ্টি সংক্রান্ত বিবরণ, আল্লাহ ও নবী প্রেম, যিকির-আযকার ও মুর্শিদ বন্দনাসহ অসংখ্য কালাম ও পংক্তি গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষাংশে পীর সুকুর আলী পরম করুণাময়ের দয়া কামনা করেছেন এভাবে :

"হাজী সুকুর আলীর জীবনভরা, নামাজ আদায় হৈল না সারা

---

২৩৪. *সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
২৩৫. *সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
২৩৬. প্রাগুক্ত
২৩৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হায়মাবুদ উপায় কি করা, বলি আমি কাতরে

যদি দয়া করে নিজ গুনে, আমি কাঙ্গালেরে রাখো মনে

আপনার মেহের গুনে সব যাবে দূরে।"[২৩৮]

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম একটি গ্রন্থ হিসেবে 'এসকুল আছরার' সর্বজন স্বীকৃত।

ফকির ওয়াহেদ আলী : ফকির ওয়াহেদ আলী সিলেটী নাগরী লিপিতে রচিত সুবৃহৎ গ্রন্থ 'জঙ্গনামা' রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ থেকে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল :

"শাকিন বসত বাড়ি শকলের জানা

চন্দবুজের বসতি এক আছে ফকির খানা

আমি অধম মুরখমতি ওআহেদ আলি নাম

ছাবডিভিশন শুনামগঞ্জ নামজাদি বড়া

অধিনের নিরাশ জান মহলে ফকির পাড়া।"[২৩৯]

সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী পরগনার ষোল ঘরের অধিবাসী ছিলেন ওয়াহেদ আলী। কারবালার হৃদয় বিদারক কাহিনীর কাব্যরূপ হচ্ছে তাঁর রচিত 'জঙ্গনামা'। পাঁচ শত পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ 'জঙ্গনামা' পাঠক সমাজের কাছে ছিল খুবই জনপ্রিয় ও সমাদৃত। তাঁর কাব্যভাষার একটি নমুনা :

"তীর তরকশ ছুলফা খনজর কামান

নেজাগুর্জ ছংগ পাশী আরবি নিশান

সাজান করিলা ঘোড়া দুলদুল সংকার

অতিশয় উচা ঘোড়া পর্বত আকার।"[২৪০]

'জঙ্গনামা'র রচয়িতা ফকির ওয়াহেদ আলী দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সিলেটি নাগরী লিপিতে। একটি হলো 'শহীদে কারবালা' এবং অন্যটি হলো 'হুশন শহীদ'। গ্রন্থ দু'টি মুদ্রিত হয়নি। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে 'জঙ্গনামা' ছিল কালজয়ী পুঁথি। পুঁথির কাহিনী মানুষের হৃদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দিত। এ পুঁথি শুনে অনেকেই অঝোরে কাঁদতেন। ট্রাজেডির করুণ উপাখ্যান এই পুঁথিকাব্যে দারুণ দক্ষতার সাথে তিনি চিত্রিত করেছেন। অসামান্য সৃজনশীলতায় তিনি নিপুণভাবে এঁকেছেন কারবালার মর্মান্তিক দৃশ্যপট। তাঁর রচিত গ্রন্থাদী ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য উপাদান।

---

২৩৮. *সিলেট বিভাগের পাঁচশত মরমী কবি*, পৃ. ১২৩

২৩৯. মোহাম্মদ সাদিক, *সিলেটি নাগরী: ফকিরি ধারার ফসল* (ঢাকা: বাংলাদেশএশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর, ২০০৮), পৃ. ১৩২

২৪০. সৈয়দ মোর্তাজা আলী, *প্রবন্ধ বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

নাগরী লিপির লিপিকর মহরম আলী : সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার মনোহরপুরের মহরম আলী সৈয়দ শাহনুর রচিত 'নুর নছিহত' এর লিপিকর ও পাঠক। মহরম আলীর পিতাও সিলেটী নাগরী লিপির পেশাদার লিপিকর ও পাঠক ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এখনও বজায় রেখে চলেছেন মহরম আলী। তাঁর দৃষ্টিশক্তি আগের মত নেই কিন্তু তাঁর অসাধারণ কণ্ঠ এখনও বহাল আছে। সুনামগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে সৈয়দ শাহনুরের পুঁথি পাঠক ও গায়ক হিসেবে তাঁর একক খ্যাতি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মহরম আলীর নিবাস সৈয়দ শাহনুরের অন্যতম শিষ্য কুরবান শাহ এর মাজারের অদূরে।[২৪১] এই এলাকায় আজো ফকির, ফকিরি ঘরানার মানুষেরা এ সব পুঁথি ও সংগীতের আসরের নিয়মিত শ্রোতা।হাওর-নদী-বিল বিধৌত উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে সুনামগঞ্জের খালেরআগাম গ্রামে কুরবান শাহের মাজার। তাঁকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষেরা এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যুগ যুগ ধরে লালন করে আসছে। এই জনপদেরই কীর্তিমান পুরুষ মহরম আলীর সুরেলা কণ্ঠে 'নূর নছিহত' এর পয়ার ও সুর আপ্লুত করে যে কোন ভাবুক হৃদয়।

সুনামগঞ্জের আরো যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান পুরুষ নাগরী চর্চা করেছেন এবং নাগরী লিপিতে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাদীর নাম নিম্নে প্রদান করা হলো।[২৪২]

রচয়িতার নাম	গ্রন্থের নাম
শাহ সৈয়দ হুসন আলম	ভেদসার
সৈয়দ আকবর আলী ওরফে ছাবাল শাহ	এশকে দেওয়ানা
	যৌবন বাহার
	ফানায়ে জান
মুনশি মুশাহেদ আলী	কবিতা বাউলা দুখখিত
	স্ত্রী পুরুষের আখবার
ভেলা শাহ	খবর নিশান
কুদরত উল্লা	কুদরত উল্লাহর পুঁথি
মুনশি ফজল উদ্দীন	ওলিগণের কবিতা
শাহ রহমত আলী পীর	ইসমে তাসাউফ
কারি ছমির উদ্দিন	ইবরতুল ইনছান

২৪১. *সিলেটি নাগরী : ফকিরি ধারার ফসল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

২৪২. সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের 'নাগরী লিপিতে রচিত পুঁথি ও বই এবং লেখকের তালিকা' শীর্ষক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৮৪-১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ হাতেম	মুহববত নামা কেতাব
সৈয়দ রাগীব আলী	মা'আরিফুল আহদত

বৃহত্তর সিলেটের প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্রবোধের স্মারক নাগরী লিপির প্রাচীন এ গৌরবগাথাঁকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয়ার ব্রত নিয়ে অনেকেই নাগরী লিপির উপর বিভিন্ন ধর্মী গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলার দু'জন কৃতি পুরুষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তারা দু'জন ইতোমধ্যে নাগরী লিপির উপর গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। প্রথমজন এস.এম গোলাম কাদির যিনি সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা থানার চামরদানী গ্রামের সন্তান। তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "সিলেটি নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।[২৪৩] সিলেটি নাগরীকে জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপনের এ কৃতিত্ব ড. গোলাম কাদিরের। দ্বিতীয়জন ড. মোহাম্মদ সাদিক। যিনি ১৯৫৫ সালে সুনামগঞ্জ থানার বারারগায়ে জন্ম গ্রহন করেন। "সিলেটি নাগরী : ফকিরী ধারার ফসল" বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য আসাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ২০০৬ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করেছে।[২৪৪] এছাড়া সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ আসাদ্দর আলী নাগরীর উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্তে বহু গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন (১) জালালাবাদ : ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, সিলেট ১৯৯৯ পৃ-২৭-৩৮, (২) সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ, সিলেট, ১৯৯৮ পৃ.৩ (৩) সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় জালালাবাদ ১ম খণ্ড, সিলেট, ১৯৯৬, পৃ. ৩৭-৫৩ (৪) সিলেট জেলা পরিক্রমা ১৯৯৪ পৃ. ৪৩ প্রভৃতি।[২৪৫] তাছাড়া সুনামগঞ্জের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে জাগ্রত করার প্রয়াসে নিয়োজিত রয়েছেন। নাগরী লিপি ও তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা, চর্চা ও সংরক্ষণ তাই জাতিসত্তার গৌরব সন্ধানেরই নামান্তর। এ বোধ বিশ্বাসে এবং চেতনায় অধুনালুপ্ত এ বর্ণের সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিচর্যায় প্রত্যেককে এগিয়ে আসা উচিত।

সিলেটি নাগরী সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ভাষা ও লিপি। কালের আবর্তে তা হারিয়ে গেলেও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রভাব কোন অংশেই কম ছিলনা। সিলেটি নাগরী ভাষা ও লিপি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

২৪৩. গোলাম কাদির, *সিলেটি নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৯৯) পৃ. লেখক পরিচিতি

২৪৪. সিলেটী নাগরী, *ফকিরি ধারার ফসল*, লেখক পরিচিতি

২৪৫. *আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা*, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সুনামগঞ্জ জেলা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ভৌগোলিক অবস্থান ও অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে একে আরো গুরুত্বময় করে তুলেছে। প্রাচীন আমল থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এ জেলার ঐতিহ্য সর্বজন স্বীকৃত। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট বিজয়ের পর তাঁর সঙ্গী-সাথী অনেক সুফী দরবেশ সুনামগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁরা এতদাঞ্চলের মানুষকে ধর্মের পথে আহ্বান ছাড়াও দ্বীনি শিক্ষা প্রদান, দুনিয়ায় চলার পথ ও আখিরাতের মুক্তি পথ প্রদর্শন করতে থাকেন। তাঁদের এ অঞ্চলে আগমনের কারণে ধর্ম-কর্ম ছাড়াও এতদাঞ্চলের মানুষের আচার অনুষ্ঠান, চাল-চলন, কথাবার্তা, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সংগীদের মধ্যে যারা এ জেলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আলা উদ্দিন বাগদাদী (রহ.), হযরত শাহ কামাল (রহ.), হযরত শেখ কালু (রহ.), হযরত সৈয়দ আহমদ (রহ.), হযরত দাওর বখস খতির (রহ.), হযরত ইউসুফ ইরাকী (রহ.), হযরত শাহ শাসছুদ্দিন (রহ.), হযরত হাফেজ ফাসিহ (রহ.) সহ আরো অনেক ওলীর মাজার ও কীর্তি এ জেলায় বিদ্যমান রয়েছে। এদের কীর্তিগাঁথা এতদাঞ্চলে আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। মূলত এ সব কীর্তিমান মহাপুরুষদের মাধ্যমেই এ জেলায় ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট ইসলামী ভাবধারা ও চেতনা আজো সুনামগঞ্জবাসীর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

ইংবেজ পূর্ব আমলে সুনামগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা আবর্তিত হয় মূলত তৎকালীন সমাজের প্রভাবশালীদের সহায়তায়। তৎপরবর্তীত টোল ও মক্তবের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা অবর্তিত হয়। ১৭৬৫ সালে সুনামগঞ্জ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভূক্ত হলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সুনামগঞ্জে সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু ছিল। ইংরেজ পরবর্তী সময়েই সুনামগঞ্জে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। উপরোক্ত সময়ে শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে অনেক মুসলিম মনীষি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দানে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুনামগঞ্জের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। রিফর্মড মাদরাসা স্কিমের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক হলেন সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান শামছুল উলামা আবু নছর মুহাম্মদ ওহীদ। তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে মাদরাসা শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধীত হয়।

ওলী-আউলিয়াদের পদস্পর্শে ধন্য সুনামগঞ্জের মাটিতে অনেক প্রতিভাবান গুণী ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। যারা বিভিন্নভাবে কাজ করে নিজ জেলাকে গৌরবান্বিত করেছেন। কেউ ধর্মীয় দিকে, কেউ

Dhaka University Institutional Repository

কেউ আত্মানুসন্ধানে আবার কেউ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে। শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ সুনামগঞ্জ জেলা। এ জেলার অসংখ্য গৌরবের মধ্যে একটি হলো নাগরী লিপিতে সাহিত্য সৃষ্টি। এক সময় এ জেলায় নাগরী লিপিতে প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছিল এখন তা পুঁথি সাহিত্য হিসেবে পরিচিত। পুঁথি যুগে সুনামগঞ্জে সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে পুঁথি পাঠের আসর বসত। একজন সুর করে পাঠ করত আর সকলে ভিড় করে শুনত। কখনও কখনও পাঠ বন্ধ করে পুঁথির কাহিনী ব্যাখ্যা করা হতো। পুঁথি পাঠের এ সংস্কৃতি বর্তমানে নেই বললেই চলে।

লোক সংগীত ও বাউল গানের এক বিশাল খনি রয়েছে সুনামগঞ্জে। হাছন রাজা, দুর্বিন শাহ, গিয়াসউদ্দীন আহমদ, বাউল শাহ আব্দুল করিম প্রমুখ মরমী সাধক ও বাউল সম্রাটগণ জীবন ও জগতের সন্ধানে গান বেঁধেছেন, গানের মাধ্যমে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছেন। তাদের সে গানগুলো আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ। আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এ জেলার কৃতি মনীষি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, শাহেদ আলী, আসাদ্দর আলী প্রমুখের অবদান জাতীয়ভাবে স্বীকৃত।

সুনামগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি সুনামগঞ্জ জেলার প্রখ্যাত মনীষি ও গুণীজনদের নিয়ে এ পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ প্রামান্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। বিক্ষিপ্তাকারে কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও তার সংখ্যা একেবারে নগণ্য। আবার প্রকাশিত গ্রন্থাদিও খুব তথ্যনির্ভর নয়। এমতাবস্থায় "সুনামগঞ্জ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলিম মনীষিগণের ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাবার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রবীণ ব্যক্তি, সুনামগঞ্জ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকার সন্ধানে একাধিকবার ছুটতে হয়েছে। বিভিন্ন মনীষির জীবন ও কর্মের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তাদের বর্তমান প্রজন্মের বংশধরদের কাছে একাধিকবার যোগাযোগ করতে হয়েছে। সরকারী বিভিন্ন অফিসের সংরক্ষিত রেকর্ড ফাইলও অনুসন্ধান করতে হয়েছে। এ সব-তথ্য উপাত্তে ভিত্তিতেই আমি অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছি। উপাদানের অপ্রতুলতার মধ্যেও সুনামগঞ্জের ইতিহাস বিষয়ক নিম্নোক্ত গ্রন্থাদি আমাকে গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে : রাগিব হোসেন চৌধুরীর জগন্নাথপুর উপজেলা (নভেম্বর- ১৯৮৩), জগন্নাথপুরের কথা (৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৭), দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর জালালাবাদের কথা (জানু ১৯৮৩), মুজিবুর রহমান চৌধুরীর ঐতিহ্যের পুণ্যভূমি সিলেট (১৯৯৮), হারুন আকবরের জীবন যেখানে ইতিহাস (২০০২),

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দপুর কল্যাণ সমিতির সৈয়দপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৯৯), মোহাম্মদ মুমিনুল হকের সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত (২০০১), আবু আলী সাজ্জাদ হোসেনের সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক কর্তৃক সুনামগঞ্জ পরিচিতি (২০০২), বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত সুনামগঞ্জ লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (২০১৪), ফজলুর রহমানের সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ (১৯৯৯), রুহুল ফারুকের ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (২০০৪), ও গোলাম মর্তুজার জামালগঞ্জের ইতিহাস (২০০০) প্রভৃতি। আমি তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুনামগঞ্জ জেলার মুসলিম মনীষিদের জীবন, চিন্তাধারা ও সৃষ্টিকর্ম সুনামগঞ্জের সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যেমন উচ্চমাত্রায় আসীন করেছে তেমনি সুনামগঞ্জবাসীর আত্মিক ও জাগতিক পথপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে। তাদের জীবনধারা যেমন একদিকে ছিল আদর্শের পরিবাহী, তেমনি তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতির বিষয়ক চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারা অনন্ত প্রেরণার উৎস হিসেবে সুনামগঞ্জবাসীকে যুগ যুগ ধরে উচ্চকিত ও উদ্দীপ্ত করবে। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সুনামগঞ্জের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং এতদসংশ্লিষ্ট মুসলিম মনীষিদের জীবনধারা ও সৃষ্টিকর্ম বিষয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশেষত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের দিক নির্দেশনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করছি। অদূর ভবিষ্যতে সুনামগঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ও অবস্থান নিয়ে আরো অধিক গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

- **আল-কুরআনুল করীম** :
- অচ্যুতচরণ চৌধুরী : *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, শিলচর, ১৯১০
- অন্নদা শংকর রায় : *বাংলার রেনেসাঁস*, ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৬২
- অনুপম সেন : *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ*, ঢাকা, ১৯৬৮
- অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : *বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম*, ফার্মা, কে, এল, এম, কলিকাতা, ১৯৬৬
- অমিত গুপ্ত : *বাংলার লোক জীবনে বাউল*, সংবাদ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩
- অমলেন্দু ভট্টাচার্য (সম্পা.) : *বরাক উপত্যকার বারমাসী গান*, কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর, ১৯৮৪
- অমিয়নাথ সান্যাল : *প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৪০৬
- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) : *নব চর্যাপদ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯
- অসীমকুমার দত্ত ও অন্যান্য (সম্পা.) : *শ্রীভূমি শ্রীহট্ট*, দুর্গাপুর শ্রীহট্ট সম্মিলনী দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৫
- আব্দুল হামিদ মানিক ও কাজী আবদুর রউফ : *সিলেট গাইড*, দি বিজনেস পোস্ট পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৩
- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.)
- অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব ও এ. এস. এম আলাউদ্দীন : *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯ খ্রি.)
- আবদুল আগফার : *তরফের ইতিহাস*, ১৮৮৫
  : *ইসলাম দর্পণ*, কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ
- আবদুল আজিজ মাষ্টার : *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস*, ১৯২৭
  : *হযরত শাহজালাল (রঃ)*, সিলেট, ১৯৫৭
- আব্দুল করিম : *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪
  : *বাংলার সূফী সমাজ*, ঢাকা, ১৯৮০
- আমিনুল ইসলাম : *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯১
- আব্দুল করিম ও মুহাম্মদ এনামুল হক : *আরাকান রাজ্য সভায় বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৩৫
- আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইন : *সুনামগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

- আব্দুল ওয়াহিদ (সম্পাদিত) : *দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ: ব্যক্তি ও জীবন*, আল্ আমীন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১
  : *উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান*, ঢাকা, ১৯৮৩
- আবদুল মওদুদ : *মুসলিম মনীষা*, ঢাকা, ১৯৭০
  : *ওহাবী আন্দোলন*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫
- আবু জাফর : *রাষ্ট্র দর্শনে মুসলিম মনীষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৯
- আজহার ইসলাম : *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২
- আবু যাকারিয়া মো. ইব্রাহীম আলী আরবী : *শ্রীহট্ট বিজয় কাব্য*, সিলেট, ১৩৯৩
- আছদ আলী পীর, শাহ : শহর চরিত, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ
- আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
- আবদুল করিম : মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪
  : বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
  : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭
- আহমদ ছফা : বাঙালী মুসলমানের মন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১
- আহমদ সিরাজ : ফকির ইয়াছিন শাহ্ ও তাঁর সাধনতত্ত্ব, আলফাজ মঞ্জিল, মৌলভীবাজার, ২০০০
- আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮
  : মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৯৩০-১৯৮১), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯
- আ. ন. ম. বজলুর রশিদ : পাকিস্তানের সুফী সাধক, ঢাকা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ
  : আমাদের সুফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭
- আনোয়ারুল করীম : বাউল কবি লালন শাহ, আমেনা আনোয়ার কর্তৃক প্রকাশিত, কুষ্টিয়া, ১৯৬৬
  : বাংলা সাহিত্য ও বাউল গান, লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, কুষ্টিয়া, ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

- আব্দুল মওদুদ জাষ্টিস (অনূদিত) : দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স (মূলঃ ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
- আব্দুর রাজ্জাক (অনূদিত) : বাংলার মুসলমান (মূলঃ খোন্দকার ফজলে রাব্বী), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
- আবু জাফর শামসুদ্দীন (অনূদিত) : মুসলিম বাংলা আমার যুগে (মূলঃ নওয়াব আব্দুল লতিফ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
- আজিজুল হক : মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৯
- আব্দুল হাই : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৬৫
- আবদুস সাত্তার : সংগ্রামী মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, সিলেট, ১৯৭২
- আবুল কাসিম মোহাম্মদ আদমুদ্দীন : পুথি সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৯
- আহমদ হাসান দানী : বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইন্সক্রিপসন্স অব বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৫৭
- আবদুল মান্নান কাজী : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬৯
- আহমদ শরীফ : মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৩৬
  : বাংলার সুফী সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯
  : বাউল তত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩
  : বাঙালীর সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
  : বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩
- আবু তাহের মোহাম্মদ হেলাল : মুসলিম সাহিত্য প্রতিভা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০
- আবুল ফজল : সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিসার্স লিঃ, ঢাকা, ১৯৬৫
- আবদুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিকফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪
- আব্দুর রশীদ ফকির : সুফী দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০
- আবু মুহাম্মদ হবিবুল্লাহ : সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪
- আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক : মুসলিম রেঁনেসায় নজরুলের অবদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭
- আলী আহমদ : বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
- আশা দাস : বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলিকাতা,১৯৬৯
- মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনূদিত) : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড (১২০৩-১৫৭৫), (মূলঃ ডঃ এম, এ, রহিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

: বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহস, ২য় খন্ড (১৫৭৬-১৭৫৭), (মূলঃ ডঃ এম, এ রহিম)ম বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

- আব্দুল গফুর (অনূদিত) : ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তার স্বাধীনতা ও সভ্যতা, (মূলঃ কুতুব মোহাম্মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৯
  : ইসলামের জীবন দৃষ্টি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০
  : ইসলাম, কমিউনিজম ও ভাববাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০
- আবুল কালাম সামসুদ্দীন : পলাশী থেকে পাকিস্তান, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৮
- আব্দুল হাফিজ : বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫
- আব্দুল মান্নান সৈয়দ : সৈয়দ মুর্তাজা আলী (জীবনীগ্রন্থ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০
- আবুল ফাতেহ ফাত্তাহ : সিলেট-গীতিকার বৈচিত্র্যঃ সমাজ ও সংস্কৃতির নিরিখে [অপ্রকাশিত থিসিস] বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ২০০১
- ই, এ, গেট : হিস্টরী অব আসাম, ১৯০৬
- ইব্রাহীম খাঁ ও অন্যান্য (অনূদিত) : ইসলামে ধর্মীয় চিন্তায় পুনর্গঠন (মূলঃ মুহাম্মদ ইকবাল), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১
- ইব্রাহিম মুহাম্মদ : শিক্ষা বিজ্ঞান দর্শন, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫
- ইমরান হোসেন : বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবিঃ চিন্তা ও কর্ম (১৯০৫-১৯৪৭), বাংলাএকাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
- উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৫৭
- উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২
- উষারঞ্জন ভট্টাচার্য : শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ ও পত্রিকা, কলিকাতা, ১৪০০ ব.
- এনাম-উল-হক : ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
  : বঙ্গে সুফী প্রভাব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১
- এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল : দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ, ঢাকা, ১৯৮৩
- এম. উবায়দুল হক : বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ফেনী, ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

- এ, জেড, আব্দুল্লাহ : লাইন প্রথার পটভূমিকা, সিলেট (তারিখবিহীন)
- এস.এম. গোলাম কাদির : সিলেটী নাগরী লিপিঃ ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯
- এস. খলিলউল্লাহ : সুফিবাদ পরিচিতি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩
- এ. কে. এম শাহনেওয়াজ : মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি [১২০০-১৫৩৮], বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৯৯
- এম. এ. রহিম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস [১৫৭৬-১৭৫৭] [প্রথম খণ্ড], অনুবাদঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬
  : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস [১৫৭৬-১৭৫৭] [দ্বিতীয় খণ্ড], অনুবাদঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬
- ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত) : উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা (১ম ও ২য় খন্ড) বাংলা একডেমী, ঢাকা,১৯৮৩
  : বাঙালীর চিন্তাধারাঃ আধুনিক যুগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯০
  : বাঙালীর দর্শনচিন্তা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২
  : বাংলার লোক-সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৪
- ওসমান গণি [অনু.] : পল্লী বাংলার ইতিহাস [ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার], বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৬৬৯
- কালিদাস নাগ : স্বদেশ ও সভ্যতা, কলকাতা, ১৯৪১
- কৈলাশ চন্দ্র সিংহ : রাজমালা, ১৮৯৫
- কুলসুম আক্তার চৌধুরী ও তাহেরা বেগম : হযরত শাহজালাল (রঃ), পাবনা, ১৯৮১
- কাজী আবদুল মান্নান : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, রাজশাহী, ১৯৬৯
- কাজী নাসির (সম্পাদিত) : হাসন রাজার গান, ঢাকা, ১৯৭৭
- কাজী দীন মুহম্মদ : সুফীবাদের গোড়ার কথা, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭০
  : সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ বিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯
- কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী (সম্পাদিত) : সিলেট কথা, সিলেট, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

- কনক মুখোপাধ্যায় : বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯
- কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী : শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস, শ্রীহট্ট, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ
- কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য : সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান, বঙ্গীয় সাহিত্য

  কিশোরগঞ্জ জেলা ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি : কিশোরগঞ্জের ইতিহাস, কিশোরগঞ্জ, ১৯৯৩
- খন্দকার ফজলে রাব্বী : বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭
- খন্দকার মোজাম্মিল হক : বাঙলা পুঁথির বানান সমস্যা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

  : পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সম্পাদনা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০০

  : বাঙলা রসূল-চরিত-ধারায় কবি শেখ চাঁদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

  : মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭
- খন্দকার সিরাজুল হক : মুসলিম সাহিত্য সমাজঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৮৭
- ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতে হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনা, কলকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

  : বাংলার বাউল, কলকাতা, ১৯৫৪
- ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী : বাংলার বাউল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩
- গোলাম সাকলায়েন : বাংলাদেশের সুফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২

  : মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ঢাকা, ১৯৬৫
- গোলাম মর্তুজা : জামালগঞ্জের ইতিহাস, সুনামগঞ্জ, ২০০০
- গোলাম রহমান : বানিয়াচঙ্গ দর্পণ, সিলেট, ১৯৮৯
- গিয়াস উদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত : বৃটেনে মাতৃভাষা বিতর্ক, থার্ডবেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১
- গিয়াস উদ্দিন আহমদ : মরিলে কান্দিসনা আমার দায়, সিলেট, ১৯৯৮
- গিরীন্দ্রনাথ দাস : বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, শেহিদ লাইব্রেরী, চব্বিশ পরগণা, ১৯৭৬
- চৌধুরী গোলাম আকবর : সিলেটী নাগরী পরিক্রমা, জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

- সাহিত্যভূষণ : লোক সাহিত্যের কথা, জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৮৮
  : লোক সাহিত্যে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭
  : জালালাবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সিলেট, ১৯৯৮
- জয়নাল আবেদীন : সিলেটের ইতিহাস ও শ্রীহট্ট দর্পণ, সিলেট, ১৯৯৯
- জাহান আরা বেগম : বাংলাদেশের মরমী সাহিত্য, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬
- জেলা প্রশাসন সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জ পরিচিতি, জেলা প্রশাসন সুনামগঞ্জ ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, সুনামগঞ্জ, ২০০২
- জ্যোতিন্দ্রনাথ চৌধুরী ও অন্যান্য [সম্পা.] : শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, ১৯৯৬
- তাজুল মোহাম্মদ : ভাষা আন্দোলনে সিলেট, ঢাকা, ১৯৯৪
  : সোনার মলাট, সিলেট, ১৯৯০
  : সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫
- তরফদার মুহাম্মদ ইসমাইল : সূফী দার্শনিক কবি শেখ ভানু, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪
- তাজুল মোহাম্মদ : সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন, আগামী প্রকাশন, ১৯৯৫
- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : তমদ্দুনের বিকাশ, তমদ্দুন মজলিস, সিলেট, ১৯৪৯
  : সত্যের সৈনিক আবু জর, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা, ১৯৫১
  : ইতিহাসের ধারা, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা, ১৯৫১
  : নতুন সূর্য, পূর্বাচল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৯
  : জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, ইসলামিক একডেমী, ঢাকা, ১৯৫৯
  : ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০
  : ইসলাম ও মানবতাবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০
  : সন্ধানী দৃষ্টিতে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২
  : আমাদের আজাদী আন্দোলনের তিন অধ্যায়, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

	:	আমাদের জাতীয়তাবাদ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৬
	:	মরমী কবি হাসন রাজা, মঞ্জিল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ
	:	ইতিহাস উপেক্ষিত একটি চরিত্র, আবু জর গিফারী সোসাইটি, ঢাকা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
	:	ধর্ম ও দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬
	:	নয়া জিন্দেগী, ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৭
(অনূদিত)	:	হাসন রাজা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০
	:	ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মদিনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৫
	:	অতীত জীবনের স্মৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭
	:	*সিলেটে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫
(সম্পাদিত)	:	ইসলাম : মনীষার আলোকে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৮
	:	মুক্তির ডাক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০
	:	দুহালিয়া ধর্মপুরের পীর বংশের ইতিহাস, সুনামগঞ্জ, ১৯৯৬
	:	বিশ্বসভ্যতায় আল্লামা ইকবালের আবদান, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ২০০০
	:	The background of the culture of Muslim Bengal, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka.
	:	Philosophy of Histroy, Islamic Cultural Center, Dhaka, 1982
	:	Science and Revelation, Islamic Cultural Center, Dhaka, 1980
	:	Abu Dharr Ghifari, Islamic Foundation Bangladesh,. Dhaka, 1995
	:	Islamic Movement, Pakistan Tmaddon Majlish, Dacca, 1952.
• দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	:	জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩
	:	হযরত শাহজালাল (রঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭
	:	আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

: বিচারপতি সৈয়দ এ, বি, এম, মাহমুদ হোসেনঃ জীবন ও কর্ম, ঢাকা, ১৯৯৯

: হযরত শাহ দাউদ কুরায়শী (রঃ) ও তাঁর বংশধরগণ, ঢাকা, ২০০০

: হযরত শাহজালাল (রঃ) দলিল ও ভাষ্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯

: আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭

: শিলালিপি ও সনদে আমাদের সমাজচিত্র, ঢাকা, ২০০১

: আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাঃ উত্তরাধিকার ও মুসলমানী নাগরী, সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ, লন্ডন, ২০০১

- দেওয়ান শমসের রাজা : হাছন রাজার তিন পুরুষ, সিলেট, ১৯৭৮
- দেওয়ান হাসান রাজা চৌধুরী : হাছন রাজা সমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০
- নন্দলাল শর্মা : শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের ইতিকথা, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৯৪

: সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৯৪

: সিলেটের বারোমাসি গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২

: সিলেটের ফোকলোর রচনাপঞ্জি, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৯৮

- নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, বুক এমপোরিয়াম, কলকাতা, ১৩৫৮
- প্রভাত চন্দ্র গুপ্ত : গানের রাজা হাসন রাজা, ঢাকা, ১৯৮৫
- প্রফুল্ল কুমার ঘোষ : প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, সিগনের প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ
- পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য : সুফীমতের সন্ধানে, বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, কলিকাতা, ১৯৮১
- ফজলুর রহমান : *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, সিলেট, ১৯৯১

: সিলেটের মরমী সংগীত, ঢাকা, ১৯৯৩

: সিলেটের কাব্য সাধনা, ঢাকা, ১৯৯৩

: সিলেটের আরও একশত একজন, ঢাকা, ১৯৯৪

- ফণীন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীহট্ট দর্পণ, সিলেট, ১৯৭৯
- ফকির আব্দুর রশীদ : সূফী দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িকী পত্র, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
- বদরুদ্দীন উমর : সাংস্কৃতিক সংকট, গ্রন্থনা, ঢাকা, ১৯৬৭
  : ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৪
- বজলুল মজিদ খসরু (সম্পাদিত) : একাত্তরের সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ১৯৭৯
- বাংলা একাডেমী (সংকলিত) : বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৯৪
- বিজনবিহারী পুরকায়স্থ : শ্রীহট্টের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, কলকাতা, ১৯৯৮
- ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ : শ্রীহট্টীয়কথ্যভাষা, শ্রীহট্ট, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ
- বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল : বাংলা সাহিত্যে সিলেটিদের গৌরব গাঁথা, পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯
- মুহাম্মদ আসদ্দর আলী : চর্যাপদে সিলেটী ভাষা, সিলেট, ১৯৯৩
  : লোক সাহিত্যে জালালাবাদ, সিলেট, ১৯৯৫
  : সিলেটের মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারা, সিলেট, ১৯৮২
  : সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ, সিলেট, ১৯৯৮
  : গৌরবময় সিলেট বিভাগ, সিলেট, ২০০২
- মুস্তাফা নূরুল ইসলাম : সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
- মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ : মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা, (১৯০১-১৯৪৭) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫
  : স্যার সৈয়দ আহমদঃ ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২
- মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান : সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি, নিউ এমদাদিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬
- মোহাম্মদ মুমিনুল হক : সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত, সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ, লন্ডন, ২০০১
- মোস্তফা সেলিম : সিলেটি নাগরীলিপি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আত্মপুরান, ঢাকা, ২০১৮
- মোহাম্মদ সাদিক : সিলেটি নাগরীঃ ফকিরি ধারার ফসল, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৮
- মোস্তফা কামাল : ভাষা আন্দোলনঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

- মোশাররফ হোসেন : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৮
- মোহাম্মদ আব্দুল হাই : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৬৫
- মোখলেছুর রহমান : একান্তে অগ্রগামী চেতনা, ঢাকা, ১৯৮৭
- মোহাম্মদ আলী ইউনুছ : মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ১৯৯০
- মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন : শিলহটের ইতিহাস, সিলেট, ১৯৯০
- মল্লিক আজিজুর রহমান : বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
- মুফতী আজহার উদ্দীন : শ্রীহট্রে ইসলাম জ্যোতি, সিলেট, ১৮৮৫
- মো. আবদুল রহিম চৌধুরী [সম্পা.] : ভেদকায়া [শাহ আব্দুল ওহ্হাব চৌধূরী], সিলেট, ১৯৮৭
- মোহাম্মদ সুবাস উদ্দিন : বৈষ্ণব কবি রাধারমণ দত্ত ও তাঁর ধামাইল গান, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ২০০২
- মুহাম্মদ করম আলী : মুহাম্মদপুর দরগাহ, সুনামগঞ্জ, ১৯৯০
- মকদ্দস আলম উদাসী : পরার জমিন, লোকচিহ্ন, সিলেট, ১৯৯৯
- মুহম্মদ আসাদ্দর আলী [সম্পা.] : পুঁথি শহর রচিত এবং আগাজ পুঁথি এবাদতে মগজ [শাহ আছদ আলী পীর], সুনামগঞ্জ, ১৯৯৭
- মুহম্মদ আবদুল জলিল : লোক সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫
- মো. সোলায়মান আলী সরকার : বাংলার বাউল দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২
- মোহাম্মদ আলী খান [সম্পা.] : অন্তরে তুষের অনল, সুনামগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, সুনামগঞ্জ, ২০০৩
- মোমেন চৌধুরী : বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮
- মযাহারুল ইসলাম [সম্পা.] : বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর, বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৭
- মুহাম্মদ আবদুল খালেক : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
- মির্জা নাথান : বাহারীস্তান-ই-গায়বী, (১ম খণ্ড), অনুবাদঃ খালেকদাদ চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
- মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান : আধ্যাত্মিক সাধক ও মরমী কবি সৈয়দ শাহ্ নূর (র.) মৌলভীবাজার, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

- মোহাম্মদ আলী খান [সম্পা.] : মরমী গানে সুনামগঞ্জ, অফিসার্স ক্লাব, সুনামগঞ্জ, ২০০২
- রশীদ আহমদ : বাংলাদেশের সুফী সাধক, মডার্ণ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৮
- রমেন্দ্র নারায়ণ সেনগুপ্ত : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৮২
- রাগিব হোসেন চৌধুরী : মুসলিম সাহিত্য সংসদ ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, সিলেট, ১৯৯৭
- রুহুল ফারুক : *ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সিলেট, ২০০৪
- রিজিয়া রহমান : বং থেকে বাংলা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫
- রামাই পণ্ডিত : শূন্যপুরাণ, [সম্পাদনাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়], বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ
- রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪
- শামসুল আলম : ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪
- শাহেদ আলী (সম্পাদিত) : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্বর্ধনা গ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৯৭
  : ইসলামী চিন্তার বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২
  : ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০
- শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
- : বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা সুনামগঞ্জ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৪
- শামীম আহমদ চৌধুরী : সিলেটের আকাশে দশটি উজ্জ্বল তারকা, সিলেট, ২০০০
- শামসুল করিম কয়েস : বাংলা সাহিত্যে সিলেট (১ম, ২য়, ও ৩য় খন্ড), সর্বশেষ সংস্করণ, সিলেট, ১৯৯৩
- শামসুর রহমান চৌধুরী : সুফীতত্ত্বের মর্মকথা, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭০
- শাহনেওয়াজ এ. কে. এম : বিশ্ব সভ্যতায় প্রাচীন যুগ, সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩
- শরীফ হারুন (সম্পাদিত) : বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪
  : বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, (২য় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯
  : বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, (৩য় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

- শাহজাহান মনির : বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
- শিবতপন বসু : বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি, বদরপুর, আসাম, ২০০১
- শাহ আবদুল করিম : কালনীর কূলে, লোকচিহ্ন, ছিলেট, ২০০১
  : কালনীর ঢেউ, সিলেট, ১৯৯৯
  : ভাটির চিঠি, সিলেট, ১৯৯৮
  : ধলমেলা, চারুমুদ্রণ, সিলেট, ১৯৯০
- সৈয়দ মুর্তাজা আলী : হযরত শাহজালাল (রঃ) ও সিলেটের ইতিহাস, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৮
  : মুজতবা কথা অন্যান্য প্রসঙ্গ, এ. বি. বুক স্টোর, ঢাকা, ১৯৭৬
  : আমাদের কালের কথা, বিপনী বিতান, চট্রগ্রাম, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ
  : প্রবন্ধ বিচিত্রা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭
- সৈয়দ মোস্তফা আলী : আত্মকথা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স লিঃ, ঢাকা, ১৯৬৮
- সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তিন খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩
- সৈয়দ মুহাদ্দিস আহমদ (সম্পা.) : ভাটির কথা, সিলেট, ১৯৯২
- সাদেক শিবলী জামান : বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া, ঢাকা, ১৯৮৫
- সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : বাংলার বাউলঃ কাব্য ও দর্শন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
- সৈয়দ আলী আশরাফ : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক বেন্দ্র, ফরিদপুর, ১৯৮০
- সৈয়দ মোকাম্মেল হোসেন : মোসলেম সমাজ, দিনাজপুর, ১৯০৮
- সৈয়দ আলী আহসান : আল্লাহর অস্তিত্ব, ঢাকা, ১৯৯৭
  : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বইঘর, ঢাকা, ১৯৬৮
- সৈয়দ জয়নাল আবেদীন : কর্মবীর মাওলানা আব্দুর রহমান সিংকাপনী, ঢাকা, ১৯৭৭
- সুশীল কুমার মিত্র : উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ, কলিকাতা, ১৯৭৭
- সোলায়মান আলী সরকার : বাংলার বাউল দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২
- সৈয়দ শামসুল ইসলাম : মুসলমানদের অবনতি ও তার কারণ, সিলেট, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ
- সৈয়দ মোস্তফা কামাল : সূফী সাধক শিতালং শাহ্ (রহ.), সিলট একাডেমী, সিলেট, ১৯৯৭
- সৈয়দ আশরাফ আলী [সঙ্ক] : সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামী প্রেক্ষিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

- সুজিৎ চৌধুরী : শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস (১ম খণ্ড), প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২
- সুমন কুমার দাশ : শাহ্ আব্দুল করিম জীবনী, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১
- যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য : বাঙ্গালার বৈষ্ণর-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কলকাতা, ১৯৬২
  : বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কলকাতা, ১৯৮৪
  : শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র, শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
- এস. এম. জাফর : মুসলিম ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮
- এস. এম. লুৎফুর রহমান : লালন জিজ্ঞাসা, ধারনী সাহিত্য সংঘ, ঢাকা, ১৯৮৪
  : লালন শাহঃ জীবন ও গান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩
  : বাউলতত্ত্ব ও বাউল গান, ধারনী সাহিত্য সংঘ, ঢাকা, ১৯৯০
- সম্পাদনা পরিষদ : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, একাদশ সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.)
- হাসান জামান : সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭
- হাছন রাজা : গণ সঙ্গীত, সুনামগঞ্জ, ১৯৭৭
- হারুন আকবর : সংবর্ধনা স্মারক গ্রন্থ, মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট, ১৯৯৪
- হাবিবুর রহমান : বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
- হেমাঙ্গ বিশ্বাস : লোকসঙ্গীত সমীক্ষা/বাংলা ও আসাম, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ
- হৃষীকেষ চৌধুরী : শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিকথা, কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গব্দ
- Abdur Rahim : The Muslim Society and Politics in Bengal, The University of Dacca, Dacca, 1978.
- Abdul Bari : The Reform Movement in Bengal, Vol. 1, Karachi, 1957.
- Abdul Karim : Social History of Bengal, Dhaka, 1959.
- Aziz ahmed : Studies in Islamic Culture in India Environment, Oxford, 1964.
- Allama Iqbal : The Re-Construction of Religious thought in Islam, London, 1964.
  : The Development of Metaphysics in Persia, London, 1908

Dhaka University Institutional Repository

• Abid Ali Khan	:	Memoirs of Gour and Pandua (Edited by H.E. Stapleton), Calcutta, 1930.
• A.J. Arberry	:	Sufism (an account of the mystic of Islam) London, 1968
• A.M. Chowdhury	:	Dynastic History of Bengal, Asiatic society of Bangladesh, Dacca, 1967.
• A.K.M. Ayub Ali	:	History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Dhaka, 1983.
• Abdul Wadud	:	Bengali Literature: Contemporary Indian Literature, New Delhi, 1959.
• A.F. Salahuddin Ahmed	:	Bangladesh: Tradition and Transformation, Dhaka, 1987
• D.N. Majumdar	:	Races and cultures of India, Bombay, 1967.
• Fazlur Rahman	:	The Bengali Muslims and English Education (1775-1835), Dacca, 1973.
• Ishwari Prashad	:	A Short History of Indian Philosophy, Sinha Publishing House Pvt. Ltd. Calcutta, 1973.
• M.M. Sharif	:	Muslim Thought; its origin and Achievements, London, 1959.
• P. Hardy	:	Modern European and Muslim Explanation of Conversion of Islam in South Asia, New York, 1979.
	:	The Muslims of British India, Cambridge, 1972.
• Promud lal paul	:	The Early History of Bengal, Vol. II. Calcutta (N.D.)
• Robert Lindsay	:	Oriental Miscellanies: Anecdotes of an Indian Life, 1840.
• Rafiuddin Ahmed (ed.)	:	The Bengal Muslims (1871-1906), Delhi, 1981.
	:	Islam in Bangladesh, Dhaka, 1983.
	:	Bangladesh: Society, Religion and Politics, Chittagong, 1985
• S.N.H. Rizvi	:	District Gazzetteer, Sylhet, 1975.
• Syedur Rahman	:	An Introduction to Islamic Culture and Philosophy, Mallick Brothers, Dacca, 1970.
• Sufia Ahmed	:	Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dacca, 1974.
• A.M.A Shushtery	:	Outlines of Islamic Culture, Lahore, 1966.
• Edward Gait, Sir	:	A History of Assam, Tacker, Spink & Co, 1926.
• H.K. Sherwani	:	Cultural Trends in Medieval India, Asia Publishing House, Bombay, 1968.

Dhaka University Institutional Repository

- H.D. Sankalia : Prehistory of India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. New Delhi,1977
- Kamalakanta Gupta : Copper-Plates of Sylhet, Volume I, 1967.
- Lord Lindsay : Lives of the Lindsays, John Murray, Albemarle Street, London, 1849.
- Latifa Akanda : Social History of muslim Bengal, Islamic CulturalCentre, Dacca, Islamic Foundation Bangladesh, 1981.
- Mujeed Bukht Mujmadar : The Mujmadar Family of Sylhet, Chronicle Press, Sylhet, 1902.
- Muhammad Muzammil Haq : Some Aspects of the principal Sufi Orders in India, Islamic Foundarion Bangladesh, 1985.
- Md. Abdul Musabbir Bhuiyan : Jalalavadi Nagri: A Unique Script & Literature of Sylheti Bangla, National Publishers, Assam, 2000.
- Nagendra Nath Mazumdar : A History of Education in Ancient India, Calcutta, 1932.
- R.C. Majumder & others : An Advanced History of India, Macmillan and company limited, London, 1963.
- R.C. Majumdar : The History of Bengla, Vol-I [Hindu Period], University of Dacca, 1943.
- Sirajull Islam [Ed.] : History of Bangladesh [1704-1971], Vol.1, 2 & 3, Asiatic Society of Bangladesh, 1997.
- Syed Murtaza Ali : The History of Jaintia, ANM Sulaiman, Dacca, 1954.
- S.R. Sharda : Sufi Thought, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt, Ltd, 1998.
- Suniti Kumar Chatterji : The Origin and Developement of the Bengali Language, Rupa & Co, New Delhi, 2002.
- Sharif uddin Ahmed : Sylhet, History and heritage, Bangladesh History Association, 1999.
- W.W. Hunter : A Statistical Account of Assam, Vol.II, Trubner & Co., 1879.

জার্নাল, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা

- ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা (ত্রৈমাসিক গবেষণা)
- ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, (ত্রৈমাসিক গবেষণা)
- অগ্রপথিক (মাসিক/সাপ্তাহিক), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
- ঐতিহ্য (মাসিক), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা
- Journal of the Asiatic society of Bangladesh, Asiatic society of Bangladesh, Dhaka.
- বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
- উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
- Journal of Islamic Administration, dept, of public Administration, Chittagong University, Chittagong.
- মাসিক কৈফিয়ৎ, ঢাকা
- মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা
- মাসিক সওগাত, ঢাকা
- মাসিক মাহে নও, ঢাকা
- মাসিক দ্যুতি, ঢাকা
- মাসিক পরিক্রম, ঢাকা
- মাসিক আল্ ইসলাহ, সিলেট
- মাসিক শাহজালাল, সিলেট
- মাসিক পবন, সিলেট
- মাসিক পৃথিবী, ঢাকা
- মাসিক আদর্শ নারী, ঢাকা
- বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, ঢাকা
- সমাজ দর্পণ, ঢাকা
- সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা
- নুতন কলম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
- জালালাবাদ দর্পণ, ঢাকা
- জালালাবাদ বার্ষিকী, ঢাকা
- সুবহে সাদিক, সিলেট
- Islamic Quarterly, London.
- Islamic Culture, India.
- Islamic studies, Pakistan.
- কথা সাহিত্য, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

- জলসা, কলকাতা
- বুদ্ধ পূর্ণিমা স্মরণিকা, ঢাকা
- বৈদগ্ধ, ঢাকা
- প্রতিভা, সিলেট
- তরঙ্গ, সিলেট
- উদ্বীপন, শ্রীবৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা
- মরমী বাংলা, ঢাকা
- ঢাকা ডাইজেস্ট, ঢাকা
- জিগীষা, জিগীষা সাংস্কৃতিক সংসদ, চট্রগাম
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা
- দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা
- দৈনিক সংবাদ, ঢাকা
- দৈনিক মানবজমিন, ঢাকা
- দৈনিক বাংলা, ঢাকা
- দৈনিক জালালাবাদী, সিলেট
- দৈনিক সিলেটের ডাক, সিলেট
- দৈনিক যুগভেরী, সিলেট
- দৈনিক সিলেট বানী, সিলেট
- দৈনিক জালালাবাদ, সিলেট
- দৈনিক সিলেট কণ্ঠ, সিলেট
- দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর, সুনামগঞ্জ
- দৈনিক সুনাম কণ্ঠ, সুনামগঞ্জ
- সাপ্তাহিক ভাটি বাংলা, সুনামগঞ্জ
- সাপ্তাহিক হাওর বার্তা, সুনামগঞ্জ
- রঙের বড়াই, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতিম নিউইয়র্ক
- কালের প্রবাহ, গোবিন্দগঞ্জ হাইস্কুল বার্ষিকী ২০১৪
- উন্মীলন, সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ বার্ষিকী ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

- মুকুলিকা, এইচ,এম,পি উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিকী ২০০৮
- স্মৃতির তরঙ্গমালা, ছাতক মডেল স্কুল বার্ষিকী ২০১৫
- দ্যুতিময় গাংচিল, আব্দুল হক স্মৃতি কলেজ বার্ষিকী ২০১৬
- শতবর্ষ পূর্তি স্মারক- ২০০৪, সৈয়দপুর শামছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা